শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ

শ্রীগৌরদাস হালদার এম. এ. (ডবল), বি. টি,
অধ্যাপক, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়
শিক্ষণ (বি. এড.) বিভাগ,
তমলুক, মেদিনীপুর।

ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫।১ এ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫।১এ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫

মুদ্রাকর ঃ
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪৪ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-৯
ও
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫/৭ কলেজ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-১২

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে
উৎসর্গীতপ্রাণ ভারতীয় এবং
বাংলাদেশীয় বীরদের পুণ্যস্মৃতির
উদ্দেশ্যে

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

বিদ্যালয় সংগঠন

প্রথম অধ্যায়

বিষয় **পৃষ্ঠা**

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

তৃতীয় খণ্ড

স্বাস্থ্য-শিক্ষা

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

সাধারণ শিক্ষণ পদ্ধতি

(General Methods of Teaching)

প্রথম অধ্যায়

পদ্ধতিতত্ত্বের তাৎপর্য

(Significance of Methodology)

[**অধ্যায়-পরিচয় :** এই অধ্যায়ে চারটি বিষয় আলোচনা করা হল। প্রথম অংশে শিক্ষণ-পদ্ধতি কাকে বলে? শিক্ষণ-পদ্ধতি শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাই ব্যাপক অর্থে ও আনুষ্ঠানিক অর্থে শিক্ষা কাকে বলে আলোচনার পর শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে আলোচিত হয়েছে শিক্ষণ-পদ্ধতির স্বরূপ। স্বরূপ আলোচনা-প্রসঙ্গে ইংরেজী নানা শব্দের অর্থগত দ্বন্দ্ব মনে আসে। তাই Methodology এবং Method, Special Method, General Method ইত্যাদি শব্দের অর্থগত ও ব্যবহারিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে আলোচনা করা হল আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি। চতুর্থ অংশে আলোচিত হল আধুনিক প্রগতিশীল পদ্ধতির বিভিন্ন দিক। শিক্ষণ-পদ্ধতির তাৎপর্য ও স্বরূপ উপলব্ধির জন্য এ সবের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের দিকে লক্ষ্য রেখেই এসব বিষয় আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।]

১। শিক্ষণ-পদ্ধতি কাকে বলে? (What is the Method of Teaching ?) :

'শিক্ষা' শব্দটির ব্যবহার ব্যাপকতর। অল্পকথায় ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদির সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বাঞ্ছনীয় বিকাশই শিক্ষা নামে অভিহিত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তিবিশেষের পার্থিব শিক্ষার কাল বিস্তৃত। ব্যক্তির জীবনকালই শিক্ষার কাল, জীবনধারাই হল শিক্ষার ধারা, আর শিক্ষাই হল জীবন। এর মধ্যে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-প্রসঙ্গে শিক্ষণ-পদ্ধতি (Methods of Teaching) আমাদের আলোচ্য বিষয়। ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত শিক্ষার ভাবধারা থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মোটেই সম্পর্কচ্যুত নয়। প্রথমটিকে সমুদ্র ও দ্বিতীয়টিকে নদীর সাথে তুলনা করা চলে, দ্বিতীয়টি প্রথমটির দিকে গতিশীল ও অনুকূল। শিক্ষার্থীরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ভেতর দিয়ে তথ্য

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা

সংগ্রহ করে ও জ্ঞান অর্জন করে। পরিণতিতে শিক্ষার্থী অর্জিত জ্ঞানকে জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। তখন শিক্ষা ও জীবনে 'কোন পার্থক্য থাকে না। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা লাভে সাহায্য করার জন্যই মূলতঃ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষণ-প্রক্রিয়া একটি জটিল বিষয়। এর দুটি প্রান্তের একদিকে আছেন শিক্ষক অন্যদিকে আছে শিক্ষার্থী। শিক্ষক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান পরিবেশন করেন, আর শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করে। পরিবেশন করা ও গ্রহণ করাকে যুক্তভাবে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, এক দিকে আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান আর অন্যদিকে আছে জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষার্থী। শিক্ষক বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বন করে শিক্ষার্থীর মনের সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিক্ষককে কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর জ্ঞান অর্জন করলে চলে না, তাঁকে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হতে হয়। তারপর তাকে অবলম্বন করতে হয় পদ্ধতি, যে পদ্ধতি শিক্ষার্থী ও বিষয়-জ্ঞানের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপন করতে সমর্থ হয়। তাই শিক্ষাবিদ রাস্ক (*R. B. Rusk*) পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, পদ্ধতি হল শিক্ষার্থী ও বিষয়-বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা করার প্রক্রিয়া (the process of establishing and maintaining contact between the pupil and the subject-matter)। পরিবেশন প্রান্তের (the giving end) শিক্ষক গ্রহণ প্রান্তের (the receiving end) শিক্ষার্থীর জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় পদ্ধতি কাকে বলে ?

২। পদ্ধতির স্বরূপ (Nature of Teaching Methods) :

সাধারণ বা সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষাকর্ম সম্পাদনের উপায়কে বলা হয় শিক্ষণ-পদ্ধতি। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় কতকগুলি তথ্য সরবরাহ করেই শিক্ষাকর্ম সম্পাদন করা হত। বিস্তীর্ণ অর্থে শিক্ষণ-পদ্ধতি এরূপ কোন যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে পুস্তকে লিখিত বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের নিকট পুনরুল্লেখ করলেই শিক্ষাকর্ম সম্পাদন করা হয় না। শিক্ষা যেমন গতিশীল, চিরচঞ্চল এবং তার প্রবাহও মানুষের জীবনের সঙ্গে সমব্যাপক ; তেমনি শিক্ষণ-পদ্ধতি হল মনোবিজ্ঞানসম্মত ; জীবন ও সমাজভিত্তিক এক প্রকার প্রগতিশীল জীবন্ত

প্রক্রিয়া। শিক্ষক যখন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাকর্ম শুরু করেন তখন কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করলে পাঠ্যবিষয়ের ভাবধারা শিক্ষার্থীর নিকট সহজবোধ্য হয় এবং বিষয়টি শিক্ষার্থীর মনে রেখাপাত করতে পারে সে-সম্পর্কে শিক্ষককে চিন্তা করতে হয়। কারণ, ব্যক্তিসত্তার বিচারে শিশু স্বীয় দেহ-মন নিয়ে সমষ্টিগত পরিবেশে দিনে দিনে বর্ধিত হয়। তাই শিশুর দেহ ও মনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমতালে শিক্ষককে বিষয় পরিবেশনের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। একদিকে অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার অন্য দিকে সীমিত অথচ ক্রমবিকাশমান শিশুমন—এ দুয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাই হল পদ্ধতির সার্থকতা। এজন্যে শিক্ষককে শুধু বিষয়বস্তুর জ্ঞান অর্জন করলে চলে না, তাঁকে শিশু-মন সম্পর্কে জানতে হয়। বস্তুতঃ, শিক্ষকের কাছে পদ্ধতি হল এক ধরনের শিল্প-সাধনা। শিল্পীর মন জানে কতটুকু কালি-তুলির টান চিত্রটিকে সজীব করতে পারে। শিল্পীর ন্যায় শিক্ষককেও জানতে হয় কোন্ ক্ষেত্রে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে শিশুকে বাঞ্ছনীয় পথে গড়ে তোলা যাবে। তাই দরদী, নিষ্ঠাবান ও সার্থক শিক্ষকের কাছে শিক্ষণ-পদ্ধতি হল একপ্রকার শিল্পকলা।

পদ্ধতি হল জীবন্ত। গতিশীল শিল্প-ক্রিয়া

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পদ্ধতিপ্রসঙ্গে শিক্ষককে পাঠ্যবিষয়বস্তু এবং শিশু-মন সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত হতে হয়। মাতৃগর্ভ থেকে শিশুর দেহ ও মন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করতে থাকে। শিক্ষক কর্তৃক গৃহীত শিক্ষণ-পদ্ধতি হবে শিশুর দেহ-মনের ক্রমবর্ধমান স্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে যে, সব শিশুর বৃদ্ধি যেমন সমান নয়, তেমনি বিশেষ বিশেষ শিশুর দেহ-মনের বৃদ্ধি ও বিকাশ নানা অসামঞ্জস্যে ভরপুর। তাই শিক্ষার্থীর শিক্ষায় সাহায্য করার সময় তার দেহ-মনের পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ, বিচার-বিশ্লেষণ করে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এলোমেলো অথবা সর্বক্ষেত্রে যান্ত্রিক উপায়ে একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আজ শিক্ষণ-পদ্ধতিকে বিজ্ঞানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। পদ্ধতি নিজেই একটি বিজ্ঞান—এটাই হল পদ্ধতি-বিজ্ঞানের (Methodology) সার কথা।

পদ্ধতি হল এক প্রকার বিজ্ঞান

শিক্ষণ-পদ্ধতির তাৎপর্য উপলব্ধির জন্যে ইংরেজী কয়েকটি শব্দের অন্তর্নিহিত ও ভাবগত অর্থ উপলব্ধি করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ, আমরা Methodology

এবং Method শব্দ দুটিকে পরস্পরের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করি। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় Methodology শব্দটির মধ্যে একটা সামগ্রিকতার ভাব বিদ্যমান। শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করার জন্য শিক্ষক নানা ধরনের নীতি (Maxims), পদ্ধতি (Methods), কলা-কৌশল (Techniques and devices) অবলম্বন করে শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। শিক্ষাদান কর্ম সম্পাদনের মিলিত বা সামগ্রিক ধারণা ও উপায়কে Methodology বলা যেতে পারে। পক্ষান্তরে—শিক্ষক শ্রেণীবিশেষের নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়(Topic) শিক্ষাদানের জন্য মূর্ত ও বিশেষ কৌশল (a concrete and specific device) অবলম্বন করেন। বিষয়বস্তু, শ্রেণী-শিক্ষার্থী, তাদের বয়স ও সামর্থ্য ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাদান প্রণালীর পার্থক্য থাকতে পারে। এরূপ বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রণালী বা কৌশলকে এক কথায় পদ্ধতি (Method) বলা যেতে পারে। পদ্ধতি (Method) হল পদ্ধতি-বিজ্ঞানের বা পদ্ধতিতত্ত্বের (Methodology) অংশবিশেষ। কারণ, পদ্ধতি কোন একটি বিশেষ প্রণালী, বা কৌশলের কথা ব্যক্ত করে, পক্ষান্তরে পদ্ধতিতত্ত্ব দ্বারা সামগ্রিকতার ভাবধারা ব্যক্ত হয়।

Methodology এবং Method

পদ্ধতি-বিজ্ঞানের উদ্ভবের মূলে পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষক-সমাজের অবদান রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে শিক্ষকরা চেষ্টা করে আসছেন কিভাবে শিক্ষার্থীকে তার বাঞ্ছনীয় উপায়ে শিক্ষা দেওয়া যায়, কিভাবে সহজ উপায়ে শিক্ষার্থীর দেহ-মনের বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে শিক্ষদান-কর্ম সম্পাদন করা যায়। এরই ফলে উদ্ভব হয়েছে ডাল্টন পরিকল্পনা (*Daltan Plan*), ডেক্রলি পদ্ধতি (*Decroly Method*), মন্টেসরী এবং কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি (*Montessori and Kindergarten methods*), উইনেটকা পরিকল্পনা (*Winnetka plan*), সেবাগ্রাম পদ্ধতি (*Sevagram method*) প্রভৃতি। একটু বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায়, পদ্ধতিগুলি বিশেষ কোন স্থান বা নামের সাথে বিশেষভাবে জড়িত। এর কারণ হল: শিক্ষকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অথবা আঞ্চলিক প্রয়োজনে এসব পদ্ধতির উদ্ভব। তাই এরূপ পদ্ধতিকে বিশেষ পদ্ধতি (Special method) বলা যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, দেশ, কাল ও ব্যক্তি বিশেষের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি স্বরূপ যে-ভাবে যে পদ্ধতিরই উদ্ভব হোক না কেন

বিশেষ পদ্ধতি (Special Methods)

কোনটিই আর বিচ্ছিন্নভাবে স্থান বা ব্যক্তি বিশেষের সীমায় সীমিত নেই। সবই আজ সামগ্রিক শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যে-কোন দেশে যে-কোন শিক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত ও পর্যালোচিত হচ্ছে। তাই এগুলি সবই আজ পদ্ধতি-বিজ্ঞানের বা পদ্ধতি-তত্ত্বের (Methodology) অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

প্রয়োগযোগ্যতার মাপকাঠিতে **বিশেষ পদ্ধতি** (Special method) পাঠক্রমের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে অন্বিত। যেমন, সংস্কৃত শিক্ষণ-পদ্ধতি, গণিত শিক্ষণ-পদ্ধতি, ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি, সমাজবিদ্যা শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ শিক্ষণ-পদ্ধতি। ইংরেজী শেখানোর জন্য প্রয়োগযোগ্য বিশেষ পদ্ধতি বাংলা শেখানোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না। সংগঠন-মূলক কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি (যথা—প্রকল্প পদ্ধতি) যেমন ইতিহাস বা সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, ঠিক তেমনিভাবে অংকশাস্ত্র শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীকক্ষে বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষণপ্রসঙ্গে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগের রীতির প্রচলন আছে। আবার কতকগুলি পদ্ধতি আছে যেগুলিকে বহুবিধ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। এগুলিকে বলা হয় **সাধারণ পদ্ধতি** (General method)—যেমন, মৌখিক পদ্ধতি (Oral Methods), কর্মভিত্তিক পদ্ধতি (Learning by doing Methods), আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Methods) ইত্যাদি। তবে সামগ্রিক শিক্ষাদর্শের বিচারে পদ্ধতিগুলিকে পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করা যায় না। কারণ বিশেষ পদ্ধতি সাধারণ পদ্ধতির অংশবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই শ্রেণী-শিক্ষণের ক্ষেত্রে সাধারণ পদ্ধতির কোন কোন কলাকৌশল বা টেকনিক্‌কে প্রয়োজনমত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। মূলতঃ বিশেষ পদ্ধতি সাধারণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত বিষয়। কারণ, সাধারণ পদ্ধতিকে সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থী ও বিষয় নির্বিশেষে অংশতঃ অথবা পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা চলে। সাধারণ পদ্ধতির মধ্যেও একটা সামগ্রিকতার সুর ধ্বনিত হয়। তাই সাধারণ পদ্ধতিগুলিকেও কার্যতঃ Methodology বা পদ্ধতি-বিজ্ঞানরূপে গণ্য করা হয়।

বিশেষ পদ্ধতি (Special method), সাধারণ পদ্ধতি (General method)

৩। আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি : (Modern Methods of Teaching) :

পদ্ধতির তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে 'শিক্ষা' (Education) শব্দটির গভীর তাৎপর্য পুনরুল্লেখ করা অত্যাবশ্যক। স্কুল-কলেজে যে বিষয়গুলি শেখানো হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা নয়, এগুলি শিক্ষার উপায় মাত্র।[1] স্কুল কলেজের পাঠ্যবিষয় শিক্ষার্থীকে প্রথমে জানতে হয়, শিখতে হয়। পাঠ্যবিষয় সংক্রান্ত তথ্যগুলি শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনের দিশারী মাত্র। দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষার্থী এই জানা বিষয়গুলি স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রে বাস্তব জ্ঞান লাভ করে। তৃতীয় স্তরে অর্জিত বাস্তবজ্ঞান শিক্ষার্থীর আচার-আচরণে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন সাধন করে। যখন স্কুল-কলেজের ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লব্ধ বহির্বিশ্বের জ্ঞান শিক্ষার্থীর বাস্তবজীবনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তখনই প্রকৃত 'শিক্ষা' লাভ করা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থী যাতে উল্লিখিত প্রকৃতশিক্ষা লাভ করতে পারে তার জন্যেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা। সুতরাং বলা যেতে পারে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষার দিশারী। শিক্ষণ-পদ্ধতি হবে প্রকৃত শিক্ষালাভের অনুকূল। বস্তুতঃ, প্রকৃত শিক্ষালাভের অনুকূল পদ্ধতিই হল সন্তোষজনক অথবা প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতি (Satisfactory or Progressive methods of teaching)।

প্রাচীন যুগ থেকে শিক্ষণ-পদ্ধতি সমাজ বিবর্তনের গতিপথে আধুনিক যুগের চিন্তাধারায় পরিণতি লাভ করেছে। সর্বাধুনিক কালে আমরা যে শিক্ষণ-পদ্ধতির কথা চিন্তা করি তাকে বলা হয় প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতি (Progressive methods of Teaching)। স্বাধীনতোত্তর ভারতের শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌দের চিন্তাধারায় উদ্ভূত আরও দুটি নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে—যথা, (১) গতিশীল শিক্ষা পদ্ধতি (Dynamic methods of Teaching—মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ১৯৫২-১৯৫৩); (২) প্রাণবন্ত ও গতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতি (Elastic and Dynamic Methods of Teaching—শিক্ষা কমিশন, ১৯৬৪-৬৬)। শব্দের হেরফের যতই থাকুক তাৎপর্য অনুসারে এ-দুটি পদ্ধতিকে একত্রে আমরা প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতি নামে

'Method' শব্দের সমার্থক বিশেষণ ও প্রগতিশীল পদ্ধতি

1. The things taught in schools and colleges are not an education, but the means of education.—*Emerson*.

অভিহিত করতে পারি। প্রগতিশীল পদ্ধতি আজও শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের চিন্তান্তরে রয়ে গেছে। এর বাস্তবায়ন আজও সম্ভব হয়নি। তাই উপহাস করে অনেকে একে ট্রেনিং-কলেজকেন্দ্রিক শিক্ষণ-পদ্ধতি নামে অভিহিত করেন।

বাস্তবক্ষেত্রে বিদ্যালয়ন্তরে যে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করি তাকে ঐতিহ্যবাহী গতানুগতিক বা এককথায় চিরাচরিত শিক্ষণ-পদ্ধতি নামে অভিহিত করা যায়। 'ঐতিহ্যবাহী' শব্দটির মধ্যে রয়েছে গুরুগম্ভীর ভাব। পক্ষান্তরে 'গতানুগতিক' শব্দটির মধ্যে এলোমেলো দায়িত্বহীনতার ভাব বিদ্যমান। তাই ঐতিহ্যবাহী গতানুগতিক পদ্ধতিকে দুটি নামে অভিহিত কবতে পারি—যথা, (১) পাণ্ডিত্য কেন্দ্রিক পদ্ধতি (Pedagogic Method) এবং (২) গতানুগতিক পদ্ধতি (Traditional Method)। এ পদ্ধতিদ্বয় পবস্পবের পরিবর্ত (Substitute) হিসেবে গণ্য হয়। বিদ্যালয়ের বাস্তবক্ষেত্রে প্রযোজ্য পদ্ধতির স্বরূপ ও চরিত্র এই শেষোক্ত পদ্ধতিদ্বয়েব দ্বারা অভিব্যক্ত।

চিরাচরিত পদ্ধতি

৪। প্রগতিশীল সার্থক পদ্ধতির বিভিন্ন দিক (Different Aspects of Progressive Methods):

যুগ-পরিবর্তনে চাহিদা মেটাতে পারে এমন যে পদ্ধতি তাকে আমরা এক কথায় প্রগতিশীল বা সার্থক পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করতে পারি। সর্বাধুনিক এই সার্থক পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে হলে নিম্নরূপ বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা দরকার। যথা—

(১) পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট উপাদান
(২) সার্থক পদ্ধতির লক্ষণ
(৩) সার্থক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব
(৪) বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি জ্ঞানের সম্পর্ক
(৫) সুষ্ঠু পদ্ধতির মূল সূত্র।

(১) পদ্ধতিসংশ্লিষ্ট উপাদান (Factors involved in Methods):

সাধারণ অর্থে পদ্ধতি হল কর্ম সম্পাদনের উপায়। শিক্ষণ-পদ্ধতি বলতে শিক্ষাকর্ম সম্পাদনের উপায়কে বোঝায়। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় এটাই

ছিল শিক্ষণ-পদ্ধতির প্রচলিত অর্থ। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব দেখিয়েছে যে পদ্ধতির এই প্রচলিত অর্থ সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট। কারণ, শিক্ষা হল একপ্রকার সজীব প্রক্রিয়া। শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি মৌলিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়, যথা—শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান।

পদ্ধতি কাকে বলে?

শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থী ও নির্বাচিত তথ্য বা বিষয়বস্তুর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা। এটাই ব্যাপক অর্থে গৃহীত পদ্ধতি। শিক্ষাবিদ রাস্কের (*R. B. Rusk*) কথায় বলা যায়, শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা করার প্রক্রিয়াকেই বলা হয় শিক্ষণ-পদ্ধতি।

শিক্ষণ-পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করলে প্রথমতঃ পাই, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তু। দ্বিতীয়তঃ, বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজন হবে শিক্ষার উপকরণ (Aids and appliances) এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত কৌশল। তৃতীয়তঃ, লব্ধ জ্ঞানকে

পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত উপকরণ

জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন হবে সক্রিয়তার, জীবন ও সমাজ-মুখী বিভিন্ন অভিজ্ঞতার। তা হলে পর্যালোচিত উপাদানগুলিকে আমরা মোট তিনটি স্তরে ভাগ করতে পারি, যথা—(ক) ব্যক্তিভিত্তিক উপাদান, যথা—শিক্ষক, শিক্ষার্থী প্রভৃতি, (খ) বস্তুভিত্তিক উপাদান, যথা—বিষয়বস্তু, শিক্ষোপকরণ, (গ) ভাবব্যঞ্জক উপাদান, যথা—সক্রিয়তা, জীবন ও সমাজমুখীনতা প্রভৃতি।

(ক) ব্যক্তিভিত্তিক উপাদান (Personal Factors): শিক্ষাকর্ম সম্পাদনার অনুকূল পরিবেশ (Teaching learning situation) শিক্ষক স্বীয় অভিজ্ঞতা ও কৌশল অবলম্বনে শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। যে শিক্ষক পাঠ্যবিষয়ে, কৌশল প্রয়োগে, নীতি নির্ধারণে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনে অক্ষম তাঁর শিক্ষণ-পদ্ধতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সুতরাং শিক্ষকের

শিক্ষক

সামার্থ্য, কৌশল, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি পদ্ধতির অপরিহার্য উপাদান। কার্যকরী শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষককে নানা দিক থেকে প্রস্তুত হতে হয়। শিক্ষকের আত্মোৎসর্গী মানসিকতা, পাঠ্যবিষয়ের ওপর তাঁর পর্যাপ্ত ও গভীর জ্ঞান, বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা

ও কৌশল, যুক্তি সহকারে বিষয়বস্তু উপস্থাপনা ও তার বাস্তবায়নের নিপুণতা সার্থক ও কার্যকরী পদ্ধতি প্রয়োগের বিশেষ অঙ্গ।

ব্যক্তিভিত্তিকতার বিচারে শিক্ষার্থী হল পদ্ধতি প্রয়োগের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান। সার্থক পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুপ্রাণিত করে। স্বাভাবিকভাবে সে শিক্ষকের উপদেশ ও নির্দেশ পালনে যত্নবান হয়ে ওঠে।

শিক্ষার্থী

শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের অনুকূল হলে পদ্ধতি সজীব, সক্রিয় ও সার্থক হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীর বিচার দুভাবে হতে পারে, যথা—ব্যক্তিগতভাবে এক একজন শিক্ষার্থী এবং সমষ্টিগতভাবে শ্রেণীকক্ষের সকল শিক্ষার্থী। ব্যক্তিগতভাবে এক এক শিক্ষার্থীর মানসিকতা এক এক প্রকার। ব্যক্তি বৈষম্য বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (Individual difference) একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম। এই নিয়ম অনুসারে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রয়োজন ভিত্তিতে পদ্ধতি প্রয়োগ করলে তা সার্থক হতে পারে। আবার শ্রেণীকক্ষের সামগ্রিক শিক্ষার্থীর সাধারণ মানসিকতার ওপর নির্ভর করে পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। এক কথায় শিক্ষার্থীর স্বকীয়তাকে বিচার-বিবেচনা না করে পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় না। শিক্ষার্থীর অভাবে পদ্ধতি প্রয়োগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং সার্থক পদ্ধতি রূপায়ণের অন্যতম উপাদান হল শিক্ষার্থী।

শুধু শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নিয়ে শিক্ষা-পরিবেশ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না। শিক্ষালাভের সামাজিক পটভূমির সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে অমূল্য শিক্ষা-সম্পদ। অনুকূল কোন সম্পদ যাতে অবহেলিত না হয় তার জন্যে আধুনিক পদ্ধতিতে সামাজিকীকরণের কর্মসূচী (Programme for socialisation) গৃহীত হয়েছে।

শিক্ষাবিদ ও গুণীজন

সামাজিকীকরণ প্রসঙ্গে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষকের সহযোগিতায় বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রের নেতা, যেমন—অভিভাবক, সমাজসেবী, আইনসভার সভ্য, পৌর সংস্থার সদস্য, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্, বৈজ্ঞানিক, অর্থবিদ্, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ করে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষার, বক্তৃতা শ্রবণ, প্রশ্নোত্তর ও সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে পারেন। আবার শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সান্নিধ্যে নিয়ে প্রশ্নোত্তর ও সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। সুতরাং আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে অভিভাবক, শিক্ষাবিদ ও গুণিজনরাও অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গৃহীত।

(খ) বস্তুভিত্তিক উপাদান (Material Factors) : সার্থক পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য পাঠ্যবিষয়বস্তুর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিভাবে পড়াতে হবে (how to teach) সেটা নির্ভর করে কি পড়াতে হবে (what to teach) তার ওপর। সুতরাং পাঠ্যবিষয়ের গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য, তাৎপর্যের ওপর শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ভরশীল। সুষ্ঠু পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে পাঠটীকা পরিকল্পনার কথা সর্বজনবিদিত। পাঠটীকায় লক্ষ্য নির্ধারণ ও বিষয়বস্তুর পূর্বাপর সঙ্গতি রেখে বিষয় উপস্থাপন করতে হয়। উপস্থাপন কৌশলের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য বিন্দুতে পৌছানোর প্রচেষ্টাই হল সার্থক পদ্ধতি প্রয়োগ। বিষয়বস্তু না থাকলে যেমন লক্ষ্য নির্ধারণ করা যায় না, তেমনি কৌশল প্রয়োগ করাও অসম্ভব। সুতরাং পাঠ্যবিষয় সার্থক পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ।

পাঠ্য বিষয়বস্তু

বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বাস্তব রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ বিশেষ শিক্ষোপকরণ (Aids and appliances)। উপকরণ মোটামুটি চার প্রকারের হতে পারে, যথা—দৃষ্টিনির্ভর, শ্রুতিনির্ভর, দৃষ্টি-শ্রুতিনির্ভর ও পরিবেশজনিত উপকরণ। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে এসব উপকরণ শিক্ষার্থীর মনে বিশেষ প্রবণতা ও প্রেরণা সঞ্চার করে। ফলে, পদ্ধতি হয়ে ওঠে বেগবান (Dynamic) এবং প্রগতিশীল (Progressive)। সুতরাং পদ্ধতির উপাদান হিসেবে উপকরণের মূল্য অনস্বীকার্য। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে উপকরণবিহীন পদ্ধতি শিক্ষণ-পদ্ধতি নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

উপকরণ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চার দেওয়ালে মধ্যে ব্যবহৃত উপকরণ ছাড়াও সমাজ-ক্ষেত্রে পড়ে আছে অসংখ্য শিক্ষা-সম্পদ। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে ভ্রমণ, পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহ প্রভৃতিও শিক্ষণ-পদ্ধতির অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত। এককথায় এগুলিকে পরিবেশজনিত উপকরণ বলা যেতে পারে। শিক্ষার্থীর সামাজিকীকরণ প্রসঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরে রক্ষিত শিক্ষাসম্ভার আধুনিক পদ্ধতির বিশেষ উপাদান।

(গ) ভাবব্যঞ্জক আদর্শগত উপাদান (Immaterial-Ideological Factors) : আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষণ-পদ্ধতি তথ্য সরবরাহের যন্ত্র মাত্র নয়। এটা হল শিক্ষার প্রয়োজনভিত্তিক লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায়। শিক্ষা যেমন জীবন ও সমাজের সঙ্গে একাত্ম তেমনি শিক্ষণ-পদ্ধতি নিজেই জীবন ও সমাজ-

প্রক্রিয়াকে প্রগতিশীল করার উপায়। তাই পদ্ধতির উপাদান হিসেবে সক্রিয়তা, ক্রীড়াপ্রবণতা, জীবন ও সমাজভিত্তিকতা প্রভৃতি অবস্তুগত উপাদানগুলি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সক্রিয়তা ও ক্রীড়াপ্রবণতার সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রথম জীবনের স্বাভাবিকতা বিদ্যমান। শিশুর সহজাত প্রবণতার অনুকূল পদ্ধতি অবলম্বনের অর্থ হল মনোবিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা। আবার আজকের শিক্ষার্থীরা হবে ভাবী কালের সমাজের ও রাষ্ট্রের সুসভ্য ও সুনাগরিক। সুতরাং তাদের শিক্ষা হবে সমাজভিত্তিক। সমাজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া হয়। সুতরাং শিক্ষণ-পদ্ধতির মধ্যে জীবন ও সমাজভিত্তিকতার আদর্শ থাকা উচিত। তাই বলা হয়, সার্থক পদ্ধতির অপরিহার্য উপাদান হল মনোবিজ্ঞান ও সমাজভিত্তিকতা।

(২) সুষ্ঠু পদ্ধতির লক্ষণ (Criteria of Good Methods)ঃ আধুনিক শিক্ষায় গতানুগতিক শিক্ষণ-পদ্ধতির ব্যর্থতা এবং যুক্তিপূর্ণ, বিজ্ঞান-ভিত্তিক সার্থক পদ্ধতির অপরিহার্যতা সর্বজনস্বকৃীত। এ সম্পর্কে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুচিন্তিত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। কমিশনের মতে, সার্থক পদ্ধতির দ্বারা বাস্তবায়িত না হলে সবচেয়ে সুন্দর পাঠক্রম এবং ত্রুটিহীন পাঠ্যসূচীও অকেজো বা মৃতবৎ হয়ে পড়ে। একথা আজ অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ মাত্রেই জানেন এবং স্বীকার করেন।[1] তাই গতানুগতিক শিক্ষণ-পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক প্রগতিশীল পদ্ধতির উৎকর্ষসাধনের চেষ্টা চলছে দিকে দিকে। অবশ্য এটা আঠারো শতকের চিন্তাবিদ রুশোর বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। রুশোর পর থেকে প্রগতিশীল আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে পরবর্তী শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌দের চিন্তাধারা অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে।

সার্থক পদ্ধতির কার্যকারিতা অনস্বীকার্য

এখন প্রশ্ন হল, কি কি বৈশিষ্ট্য থাকলে কোন্ শিক্ষণ-পদ্ধতি সার্থক হয়ে উঠতে পারে? অথবা সার্থক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কি কি?—প্রশ্নগুলির সমাধানের জন্যে আমরা নিম্নরূপ বিষয়গুলি আলোচনার প্রস্তাব রাখছি:

(ক) পদ্ধতি হবে লক্ষ্যভিত্তিক (Method should be objective-based)ঃ শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা সাধারণতঃ মৌলিক

1. "But every teacher and educationist of experience knows that even the best curriculum and the most perfect syllabus remain dead unless quickened intc life by the right methods of teaching and the right kind of teacher."—Secondary Education Commission—P. 84.

তিনটি স্তরের সন্ধান পাই ; যথা—(১) লক্ষ্য নির্ধারণ, (২) লক্ষ্যের অনুকূলে বিষয় উপস্থাপনা এবং (৩) লক্ষ্যে কতটুকু পৌছানো গেল সে সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন। নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছানো হল পদ্ধতি-প্রয়োগের প্রাথমিক যোগ্যতা। যে পদ্ধতি অবলম্বন করলে লক্ষ্যে পৌছানো যায় সেটাই হল সার্থক পদ্ধতি। তাই আধুনিক শিক্ষায় ব্যবহারিক পর্যায়ে পাঠটীকা (Lesson Plan) প্রস্তুতের প্রথা সর্বজনস্বীকৃত। পাঠটীকার প্রথম স্তরে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও চরিত্র অনুসারে লক্ষ্য স্থির করা হয়। এরূপ লক্ষ্যভিত্তিক পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে বাঞ্ছনীয় পথে পরিচালিত করে।

(খ) **পদ্ধতি হবে নীতিভিত্তিক ও সুপরিকল্পিত (Method should be maxim-based and well-planned) :** কতকগুলি মৌলিক নীতির ওপর ভিত্তি করে শিক্ষণ-পদ্ধতি সংগঠিত। যেমন, সহজ থেকে জটিল, জানা থেকে অজানা, বাস্তব থেকে অবাস্তব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থেকে বিমূর্ত চিন্তামূলক, সমগ্র থেকে অংশ, বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লেষণ ইত্যাদি হল সুষ্ঠু পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট নীতি। এলোমেলো না হয়ে সার্থক পদ্ধতি হবে এরূপ এক বা একাধিক মৌলিক নীতি ভিত্তিক (Maxim-based)। নীতিবিবর্জিত পদ্ধতি সার্থক হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, সুষ্ঠু পরিকল্পনাবিশিষ্ট পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা কার্যকর। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় কোথায় গল্প, কোথায় অভিনয়, কোথায় শিক্ষোপকরণ ব্যবহার করতে হবে সে-সম্পর্কে সুষ্ঠু পূর্ব-পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। লক্ষ্যের অনুকূলে পাঠদান প্রক্রিয়া সুচিন্তিত ও পূর্ব-পরিকল্পিত না হলে কোন পদ্ধতি সার্থক ও ফলপ্রসূ হয় না।

(গ) **পদ্ধতি হবে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক (Method should be psychological) :** শিক্ষার্থীর মন যে শিক্ষা গ্রহণ করে তাই তার আচার-আচরণে রূপান্তরিত হয়ে জীবনের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়। তাই শিক্ষার্থীর মনের ইচ্ছা ও প্রবণতা অনুসারে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়। এই নীতি অনুসারে বলা যায় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান হল বাস্তবতঃ শিক্ষণ-পদ্ধতির ভিত্তি। জন্ম থেকে শিশুর দেহ-মন ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও বিকাশপ্রাপ্ত হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, অভিরুচি, সামর্থ্য প্রবণতা ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পদ্ধতি প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। তাহলে পদ্ধতি সার্থক হয়ে ওঠে। সুতরাং মনোবিজ্ঞানভিত্তিকতাই হল সার্থক পদ্ধতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

(ঘ) পদ্ধতি হবে ক্রীড়া ও কর্মভিত্তিক (Method should be based on play and activity) : শিশুরা সদা চঞ্চল ও ক্রীড়াপ্রবণ। উৎসাহ-উদ্দীপনায় তাদের দেহ-মন ভরপুর। তারা খেলতে, ছুটোছুটি ও হুড়োহুড়ি করতে ভালবাসে। শিশুর এই স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে যথাযথ প্রেরণা দেওয়াই (motivate) হল পদ্ধতি-বিজ্ঞানের মূল কথা। তাই কর্মের মাধ্যমে, খেলার ছলে শিক্ষাদানের পদ্ধতি শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। ধৈর্য ধরে, নীরবে পুস্তক পাঠ করা বা শিক্ষকের বক্তৃতা শোনা শিশুদের স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার। আবার এক এক বয়সের শিশু এক বা একাধিক ক্রীড়া বা কর্মে অনুপ্রাণিত হয়। এটা শিশু মনস্তত্ত্বের একটি দিক। সুতরাং, যে বয়সের শিশু যে কাজ করতে বা যেরূপ খেলা খেলতে ভালবাসে তার ক্ষেত্রে সেরূপ কাজের বা খেলার মাধ্যমে শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তাই বলা হয়, খেলা ও কর্মভিত্তিকতাই হল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

(ঙ) পদ্ধতি হবে জীবন ও সমাজভিত্তিক (Method should be society and life-based) : আজকের শিশুই হবে আগামী দিনের নাগরিক ও সমাজের সভ্য। সামাজিক জীবনের নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শুরু হবে তার জীবন-সংগ্রাম। বাল্যাবস্থাই হল সেই জীবন-সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্ব। তাই শিক্ষা ও শিক্ষণ-পদ্ধতি এমন হবে যেন শিক্ষার্থী ভাবীকালে রাষ্ট্রের সুনাগরিক ও সমাজের আদর্শ সভ্য হয়ে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। মানব-জীবন কর্মময়। জ্ঞানভিত্তিক কার্যই হল জীবনের বাস্তবতা। একথা স্মরণ রেখে পাঠ্যবিষয় থেকে তথ্য সংগ্রহ, অনুধাবন, জ্ঞানার্জন এবং পরিণতিতে জীবন-ক্ষেত্রে সেই জ্ঞানের বাস্তবায়ন করাই হল প্রকৃত শিক্ষা। সুতরাং সার্থক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হবে সমাজ ও জীবনভিত্তিক উপাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা।

(চ) পদ্ধতি হবে যুক্তি, তর্ক ও বিচার-ক্ষমতা বৃদ্ধির অনুকূল (Method is to develop thinking and reasoning power) : গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষককে কেন্দ্র করে শিক্ষাকর্ম অনুষ্ঠিত হত। শিক্ষক তাঁর বয়স্ক মনের যুক্তি, তর্ক ও বিচার-বুদ্ধি অনুসারে বিষয় পরিবেশন করতেন। কিন্তু আধুনিক গতিশীল ব্যবস্থাপনায় এই পদ্ধতি ভ্রান্তি বহুল ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত। পদ্ধতি হবে সর্বদা শিশু বা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। পদ্ধতির

বৈশিষ্ট্য হবে শিক্ষার্থীর মনকে যুক্তি ও বিচারধর্মী করে তোলা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, শিশু-মন প্রথমাবস্থায় যুক্তি ও বিচারধর্মী থাকে না। তখন যুক্তির পরিবর্তে বা বিমূর্ত বিষয়ের পরিবর্তে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত বিষয় পরিবেশন করা যুক্তিসঙ্গত। শিক্ষার্থীর মনে যখন যুক্তির সঞ্চার হয় তখন ধীরে ধীরে বিষয় পরিবেশনে যুক্তি, তর্ক ও বিচারশক্তি বিকাশের অনুকূল পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত।

(ছ) **পদ্ধতি হবে ব্যক্তি ও শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষণের উপযোগী** (Method should be useful for individual and group work) : অতীতের তুলনায় বর্তমান শিক্ষা দেশের সর্বত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যেমন দিকে দিকে গড়ে উঠেছে তেমনি ছাত্রসংখ্যাও প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই ব্যক্তিভিত্তিক পঠন-পাঠনার পরিবর্তে শ্রেণী বা সমষ্টিগত শিক্ষণের দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়। এক একটা শ্রেণীতে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে একত্রে বসতে দেখা যায় ; যথা—অগ্রসর, সাধারণ ও অনগ্রসর। এদের মধ্যে মধ্যম স্তরের মেধাযুক্ত শিক্ষার্থীব সংখ্যা বেশী থাকে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক কর্তৃক অবলম্বিত পদ্ধতি সাধারণতঃ সাধারণ মেধাযুক্ত ছাত্রদের জন্য প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু শ্রেণীশিক্ষণে অনগ্রর ও অগ্রসর বা মেধাবী ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য দেবার তেমন অবকাশ বা সুযোগ থাকে না। কুশলী ও দক্ষ শিক্ষক অবশ্য তিন প্রকারের শিক্ষার্থীর কথা মনে রেখে পদ্ধতি প্রয়োগ করেন এবং সকলকেই কর্মে নিয়োজিত রাখেন। উপরন্তু বিষয়বস্তুর গুণগত ও পরিমাণগত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে সকলের জন্য ব্যক্তিভিত্তিক উপায়ে বিষয় পরিবেশন করেন। ব্যক্তিগতভাবে কোন শিক্ষার্থী যাতে অবহেলিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে পদ্ধতি প্রয়োগ করলে সে পদ্ধতি স্বাভাবিকভাবে সার্থক হয়ে ওঠে। সুতরাং ব্যক্তি ও সমষ্টি বা শ্রেণীর জন্য সঠিক অনুপাত বা ভারসাম্য রক্ষা করাই হল সার্থক পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

(৩) **সার্থক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব** (Need for Satisfactory Methods) : *শিক্ষাবিজ্ঞানের অপরিহার্য অংশ হল শিক্ষণ-পদ্ধতি। শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যেই শিক্ষক পদ্ধতি

* এই অংশে পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব, মূল্য শব্দগুলির ভাবধারা নিয়ে একত্রে আলোচনা করা হল।

অবলম্বন করেন। শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব অথবা মূল্য কতখানি তা নিম্নরূপ নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায় :

(১) শিক্ষার প্রকৃতি-বিচারে পদ্ধতির গুরুত্ব : শিক্ষা হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও বাস্তবায়ন। স্কুল-কলেজের আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় যে জ্ঞান ও কৌশল শিক্ষা করা হয় সেটা নিছক জীবন-বিকাশের গলিপথ। এপথ ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়ে সুবিস্তৃত রাজপথে মিশে যায়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে লব্ধ জ্ঞান তখন জীবনের আচার-আচারণ ও অভ্যাসে পরিণতি লাভ করে। শিক্ষার এই যাত্রাপথকে সুগম করতে সার্থক পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এখানেই সার্থক পদ্ধতির প্রয়োজনীতা বা গুরুত্ব নিহিত।

(২) লক্ষ্যের বিচারে শিক্ষণ-পদ্ধতির গুরুত্ব (Importance of methods from the point of view of aims) : 'শিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত বা ব্যাপক অর্থ হল জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতা আমাদের আচরণে পরিবর্তন আনে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে, আচরণের পরিবর্তন যদি অবাঞ্ছিত হয়, তবে সে পরিবর্তন 'শিক্ষা' নামের অযোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—অপরাধমূলক অনেক কর্ম ও অভিজ্ঞতা জীবনের পরিবর্তন আনতে পারে। কিন্তু কোন অনৈতিক বা অসামাজিক ও অবাঞ্ছনীয় পরিবর্তন 'শিক্ষা' নামে অভিহিত হতে পারে না। তাই পরিবর্তন পরিপ্রেক্ষিতে বাঞ্ছনীয় দিকে শিক্ষার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করতে হয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাকে পরিচালিত ক'ার ব্যাপারে সন্তোষজনক পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজনীতা অনস্বীকার্য।

পরিবর্তন মাত্রই শিক্ষা নয়

সমাজতত্ত্বের বিচারে শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে সমাজের আদর্শ সভ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। সভ্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি ব্যক্তির যেসব বাঞ্ছনীয় গুণ ও কর্মক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি প্রয়োজন সেদিকে শিক্ষার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করতে হয়। এই লক্ষ্যপথে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে লব্ধ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা যাতে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় সেরূপ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। এ শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থী যে জ্ঞান লাভ করবে তা তার স্বীয় ব্যবহারে, আচার-আচরণে অভিব্যক্ত হবে। এর জন্যে চাই উপযুক্ত শিক্ষা-পদ্ধতি। সে পদ্ধতিতে থাকবে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক গুণ ও দক্ষতা বিকাশের সঠিক পরিকল্পনা।

সমাজতাত্ত্বিক লক্ষ্য ও পদ্ধতিব গুরুত্ব

(৩) **শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টি কোণ থেকে পদ্ধতির গুরুত্ব** (Importance of methods from the point of view of educational psychology) ঃ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই পদ্ধতি আজ গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকে নিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। বিষয়বস্তুর ওপর শিক্ষকের গভীর পাণ্ডিত্য এককভাবে সে-সমস্যা দূরীকরণে সমর্থ হয় না। কেননা, শিক্ষার্থীকে কিভাবে পাঠে মনোযোগী করে তোলা যায়, কিভাবে তার মনে আগ্রহের সঞ্চার করা যায়, তার গ্রহণ ক্ষমতা অনুসারে অল্প সময়ে কিভাবে অধিক বিষয়ে জ্ঞানদান করা যায়, কিভাবে শিক্ষার্থীর মনে লব্ধজ্ঞান দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে—ইত্যাদি সমস্যা প্রতিনিয়ত শিক্ষককে বিব্রত করে। তাই শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ মাত্রই সার্থক শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

শিক্ষকের সমস্যা ও পদ্ধতির গুরুত্ব

আধুনিক গবেষণার ফলে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে এমন কতকগুলি শিক্ষা-সহায়ক নীতি আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলিকে মোটেই অবহেলা করা যায় না। বরং বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার জন্য সেগুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সার্থক পদ্ধতি অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত; উল্লেখযোগ্য নীতিগুলি হল—ব্যক্তি-বৈষম্য (Individual Difference), শিক্ষণের নিয়মাবলী (Principle of Learning), ব্যক্তি-বিকাশের নিয়ম (Genetic Principle), বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ (Nature and Measurement of Intelligence), সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct), প্রক্ষোভ (Emotion), বংশধারা (Heredity), পরিবেশ (Environment), মনোবিজ্ঞানভিত্তিক পরিমাপ (Psychological Testing) প্রভৃতি।[1] আধুনিক মনোবিজ্ঞান এসব তথ্য প্রকাশ করে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার পথকে সার্থক করে তুলেছে। কিন্তু এদেরকে কার্যকর পথে পরিচালিত করার জন্য সুষ্ঠু শিক্ষণ-পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

শিক্ষা-সহায়ক মনোবিজ্ঞান ও পদ্ধতির গুরুত্ব

এছাড়া মনোযোগ দেওয়া (attending), মনে রাখা (retaining), মুখস্থ করা (memorising), স্মরণকরা (remembering), ভুলে যাওয়া (forgetting)

1. শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান—সেনগুপ্ত ও রায়, পৃঃ ১৬।

চিন্তা করা (thinking) প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়া শিক্ষার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। আবার এসব মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দৈহিক বৃদ্ধি (growth) ও বিকাশের (development) নিয়মাবলী। দৈহিক ও মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সেসব সম্পর্কবিষয়ে যথাযথ অবগত হওয়া ও শিক্ষাকর্মকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সার্থক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

দৈহিক ও মানসিক প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির গুরুত্ব

অতীতে পদ্ধতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হত না। কারণ মনো-মনোবিজ্ঞানের এই প্রয়োজনীয় অংশগুলি সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদরা তখন অবগত ছিলেন না। তাঁরা দৈহিক বিচারে শিশুকে বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষুদ্রতর সংস্করণ (miniature form) হিসেবে গ্রহণ করতেন। আর বয়স্কদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে শিশুদের ক্ষেত্রে শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন। ফলে, সে পদ্ধতি মোটেই মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক ছিল না। আজ মনোবিজ্ঞানের ধারায় শিক্ষা-সহায়ক নীতির আবিষ্কার সুষ্ঠু শিক্ষণ-পদ্ধতির গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

(৪) আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে পদ্ধতির গুরুত্ব (Importance of methods from the point of view of formal organisation) ঃ প্রথমতঃ, আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পদ্ধতির গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায়। স্কুল-কলেজে পরিচালিত হয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। স্কুল-কলেজের শিক্ষায় আছে নির্দিষ্ট শ্রেণী, পাঠ্য বিষয়বস্তু, তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক শিক্ষার বিষয়, সাজ-সরঞ্জাম, সময়-তালিকা, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যবিধানের প্রশ্ন। এরূপ ব্যাপক সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিচালিত হয়। এর মধ্যেই শিক্ষার্থীর সীমিত ও বিচিত্র সামর্থ্য এবং আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক শিক্ষণীয় বিষয় পরিবেশন করতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু একটি নয়, বহু। প্রতিটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সময় নির্দিষ্ট। নির্ধারিত সময়-তালিকার মধ্যে আবার বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বা সমন্বয় সাধনের প্রশ্ন জড়িত।

তৃতীয়তঃ, আধুনিক যুগে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে গেছে। তাই এখানে ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষার সাথে সমষ্টিগত শিক্ষার প্রশ্ন যেমন রয়েছে তেমনি স্বল্পমেধা, মাঝারী ও অগ্রসর শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের সমস্যাও রয়ে গেছে।

চতুর্থতঃ, এক একটি বিদ্যালয় বহুস্তর (streams) ও শ্রেণীকক্ষে বিভক্ত। প্রতিটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিচালন (administration) ও সংগঠনের (organisation) সমস্যা রয়েছে। নানা সমস্যার ভেতর দিয়ে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর শিক্ষায় সাহায্য করতে হয়। এ সব সমস্যা-বিজড়িত আধুনিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঠিক পথের দিশারী হল সার্থক ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটুকু জানা গেল যে, সুষ্ঠু পদ্ধতির গুরুত্ব এবং শিক্ষণ-প্রসঙ্গে তার প্রয়োজনীয়তা অসীম। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার যে, শিক্ষণ-পদ্ধতি মূলতঃ শিক্ষকের নিজস্ব কলাকৌশল। শিক্ষক হলেন প্রকৃত শিল্পী। শিল্পীমনের মানসিকতা নিয়ে শিক্ষককে শিক্ষাদানে অগ্রসর হতে হবে। চিকিৎসা-শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়েও ডাক্তারকে বাস্তব জীবনে বিফল হতে হয়। মৃত্তিকা-বিজ্ঞান ও কৃষিশাস্ত্রে বিজ্ঞ হলেই যে-কোন ব্যক্তি ভাল কৃষক হতে পারেন না। সঙ্গীতশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও গায়ক বা গায়িকা হওয়া যায় না। তেমনি, ট্রেনিং কলেজের পাঠ্যবিষয়ে কৃতকার্য হলেই সকল শিক্ষক ভাল শিক্ষক হতে পারেন না। শিক্ষণের জন্যে চাই শিল্পীমনের মানসিকতা, ঐকান্তিকতা ও আত্মোৎসর্গী প্রেরণা। পুস্তক থেকে অধীত অথবা ট্রেনিং কলেজের তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক পর্যায়ে লব্ধ শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা শিক্ষকের মনে ও কর্মে যদি একাত্ম হয়ে যায় তাহলে তিনিই মাত্র সার্থক শিক্ষকের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। আর এরূপ যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করাই তাঁর বাঞ্ছনীয় কর্তব্য। কারণ, শিক্ষণ-পদ্ধতি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি জৈবিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এ সম্পর্ক শিক্ষার্থীর শুধু যে মানসিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা নয়, উপরন্তু শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব, কর্ম, বিচার-বুদ্ধি এবং প্রাক্ষোভিক স্তরে প্রভাব বিস্তার করে জীবনের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীকে সঞ্জীবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং শিক্ষণ-প্রসঙ্গে সুষ্ঠু পদ্ধতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(৫) **বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি-জ্ঞানের সম্পর্ক (Relation between Knowledge of Subject Matter and Teaching Method):** আধুনিক শিক্ষাকে সামাজিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে দুটি স্তরে ভাগ করা যায়, যথা—(ক) সাধারণ শিক্ষা (General Education) এবং (খ) পেশাগত বা বৃত্তিগত শিক্ষা (Professional Education)। উভয় ক্ষেত্রেই স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষালাভ করার ও বিশেষজ্ঞ হওয়ার উপায় নির্ধারিত আছে। উল্লেখ-যোগ্য বৃত্তি-শিক্ষার মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যা (Medical Science), কারিগরীবিদ্যা (Technical Science), কৃষিবিদ্যা (Agricultural Science) প্রভৃতির নাম করা যায়। বৃত্তিগত বিচারে শিক্ষকতা (Teaching) উল্লিখিত বৃত্তিগুলির সমপর্যায়ে পড়ে। তবে চিকিৎসা-শাস্ত্র, কারীগরী-বিদ্যা ও কৃষিবিজ্ঞান সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন, স্বতন্ত্র ও পৃথক এক একটি বিদ্যা। বিদ্যালয় স্তরের সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে এসব বিশেষ বিশেষ বিদ্যা কয়েক বছর ধরে অধ্যয়ন করার পর বিশেষজ্ঞ হওয়ার সুযোগ আসে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা রূপ পেশার ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষককে একই বিষয় (শিক্ষক যা শিখেছেন) শিক্ষার্থীর কাছে পরিবেশন করতে হয়। এখানে শিক্ষকের অধীত বিদ্যার সঙ্গে শিক্ষার্থীর জন্য পরিবেশিত বিদ্যার পার্থক্য নেই বললেও চলে। তাহলে পৃথক পেশা হিসেবে শিক্ষকতার পৃথক তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কোথায়?

পেশাগত বিকাশে শিক্ষকতার স্থান

যেখানে পাস করার পরেও ডাক্তারকে হাউস সার্জন্, ইঞ্জিনিয়ারকে এ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে শিক্ষানবিস থাকতে হয় সেখানে পৃথক শিক্ষণ-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন না করেই একজন সাধারণ শিক্ষায় (General Education) শিক্ষিত ব্যক্তিকে শিক্ষকতা-কর্মে নিয়োগ করা হয়। কি পড়াতে হবে (What to teach) তা তিনি জানেন, কিন্তু কি করে পড়াতে হবে (How to taach) এটুকুও তিনি জানেন না। শিক্ষকতা-কর্মে নিযুক্ত হয়েই তিনি বিদ্যালয় বা কলেজ-জীবনের শিক্ষকদের পড়ানোর কৌশলগুলি স্মরণ করতে থাকেন। স্কুল-শিক্ষকদের চেয়ে কলেজ-শিক্ষকদের কৌশলগুলি তাঁর মনে তাড়াতাড়ি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ, কলেজের ঘটনাগুলি শিক্ষকতায় নিয়োজিত হওয়ার ঠিক পূর্ব-ঘটনা। কিন্তু কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন

পেশার বিচারে শিক্ষকতা অবহেলিত

কৌশল (প্রধানতঃ বক্তৃতা) বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার ক্ষেত্রে মূল্যহীন। তাহলে বিদ্যালয়ের উপযোগী শিক্ষণ-পদ্ধতিতে অজ্ঞ হয়েও শিক্ষক (untrained teacher) শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত হন। সুতরাং শিক্ষণপ্রাপ্ত নন এরূপ শিক্ষকের নিকট থেকে অধিক কিছু আশা করা যায় না।

সার্থক শিক্ষকতা-কর্ম সম্পাদনের ভিত্তি হল শিক্ষকের পাঠ্যবিষয়ক এবং পদ্ধতি-তত্ত্বে গভীর জ্ঞান। উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহারিক দক্ষতা থাকলে তবেই শিক্ষাদান-কর্মে সাফল্য অর্জন করা যায়। একটির অভাবে অন্যটি ব্যর্থতায় পরিণত হয়। আমাদের দেশে শিক্ষকরা সাধারণতঃ বিষয়বস্তুর জ্ঞান নিয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরে সময় ও সুযোগমত ট্রেনিং কলেজে কয়েক মাসের জন্যে পদ্ধতি-তত্ত্ব ও তৎ-সম্পর্কিত ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করেন। এভাবে শিক্ষকতা বৃত্তির ভিত্তি পাকা করার ব্যবস্থাপনা আমাদের দেশে প্রচলিত।

শিক্ষকতা কর্মের ভিত্তি

শিক্ষকতা কর্মের প্রথম বিচার্য বিষয় শিক্ষকের পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা। যে বিষয়টি শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের শেখাবেন সে বিষয়ে যদি তিনি অনভিজ্ঞ হন অথবা তাঁর জ্ঞান অপর্যাপ্ত বা অগভীর থাকে, তাহলে তাঁর পক্ষে সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত বিষয় পরিবেশন করা শক্ত। অগভীর জ্ঞান নিয়ে পরিবেশিত বিষয় স্বতঃস্ফূর্ত না হয়ে যান্ত্রিক ও ক্লান্তিকর হয়ে পড়বে। ফলে, শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়টি হবে দুরূহ, অবোধ্য। তাই শিক্ষকতা কর্মে শিক্ষকের বিষয়জ্ঞান ও জ্ঞানের গভীরতা প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয়।

শিক্ষকতা বৃত্তির প্রাথমিক বিচার্য বিষয়।

শিক্ষকতা বৃত্তির দ্বিতীয় বিচার্য বিষয় পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকের গভীর তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক জ্ঞান। বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের উপায় হল শিক্ষণ-পদ্ধতি। পদ্ধতি-সম্পর্কে গভীর তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক জ্ঞান থাকলেই শিক্ষক সহজে সার্থক উপায়ে বিষয় ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগসূত্র রচনা করতে পারেন। সুতরাং, শিক্ষকতা বৃত্তিতে শিক্ষকের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞানের গভীরতার ন্যায় পদ্ধতির তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক জ্ঞানের পর্যাপ্ততা অপরিহার্য।

শিক্ষকতার দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয়

অনেকে বলেন, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর ওপর পাণ্ডিত্য থাকলে শিক্ষক অনায়াসে শিক্ষকতায় সাফল্য অর্জন করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেছে

পদ্ধতিতে অনভিজ্ঞ অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি সহজে শিক্ষার্থীর মন আকর্ষণ করতে পারেন না। অনেক শিক্ষার্থীকে আপসোস করতে শোনা যায়, 'উনি জানেন অনেক কিছু কিন্তু পড়াতে পারেন না', অথবা একটা বিষয় পড়াতে পড়াতে বিষয়ান্তরে চলে যান—ইত্যাদি। এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকের অনভিজ্ঞতার ফল। তাছাড়া আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে মনোবিজ্ঞান সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে শিক্ষাদান সার্থক পদ্ধতি ভিন্ন পরিচালিত হতে পারে না। অভিজ্ঞ প্রত্যেক শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ জানেন যে উত্তম পাঠ্যতালিকা এবং ত্রুটিহীন পাঠ্যসূচী সুশিক্ষক কর্তৃক সার্থক পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবেশিত না হলে সেগুলিও নির্জীব হয়ে পড়ে। তাঁরা বলেন, শিক্ষক পাঠ্যবিষয়ের সর্বস্তরে সমান অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করবেন—এটাও আশা করা যায় না। পদ্ধতি সম্পর্কে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করলে তিনি শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুসারে পাঠ পরিচালনা করতে পারেন।

বিষয়বস্তু ও পদ্ধতিগত জ্ঞানের সম্পর্ক

অনেকে বলেন, 'শিক্ষককে তৈরি করা যায় না, তিনি জন্মগ্রহণ করেন।' প্রতিভাবান জাতশিক্ষক (born teacher) অনায়াসে শিক্ষকতা বৃত্তিতে সাফল্য অর্জন করেন। বরং পদ্ধতি অনেক সময় বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের মতে, পদ্ধতি চলে একটা সীমিত নির্দিষ্ট পথে। এরূপ সীমিত পথে বিষয়বস্তুর জ্ঞানও সীমিত হয়ে পড়ে। এটা বিষয়বস্তুর চরিত্র ও গভীরতা অনুসারে পদ্ধতি নির্বাচন ও প্রয়োগের তারতম্য মাত্র। বাস্তবক্ষেত্রে এটা মোটেই অন্তরায় নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, অর্থনীতি-চর্চায় পদ্ধতি (Methods of studying Economics) হিসেবে (ক) অবরোহী ও আরোহী পদ্ধতি, (খ) গাণিতিক পদ্ধতি, (গ) সামগ্রিক ও একক আলোচনা পদ্ধতি, (ঘ) সামগ্রিক ও আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি, (ঙ) স্থির ও গতিশীল পদ্ধতি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় উক্ত পদ্ধতিগুলি যেমন বিষয় চর্চার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি আবার শিক্ষার্থীদের শেখাবার সময় ঐগুলিই শিক্ষণ-পদ্ধতি (Methods of Teaching) হিসেবে গৃহীত। সুতরাং পদ্ধতি কখনও বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের অন্তরায় হতে পারে না।

পদ্ধতি বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের অন্তরায় কিনা

পক্ষান্তরে জাতশিক্ষকের সংখ্যা অতি নগণ্য। এদিকে জাতির প্রয়োজনে শিক্ষায়তনের সংখ্যা ও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং জাতশিক্ষক ছাড়া আরও অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা সত্যিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁদেব নিকট পদ্ধতি-শিক্ষণ অপরিহার্য কর্ম। অধিকন্তু ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা নিয়ে যাঁরা শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেছেন তাঁরাও পদ্ধতি-শিক্ষণের মাধ্যমে আপন প্রতিভাকে যেমন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রয়োগ করতে পারবেন তেমনি শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণার ফলে নতুন নতুন পথের সন্ধান দিতে পারবেন। তাই বৃত্তি-বিচারে সকল প্রকাব শিক্ষকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যেমন গভীর জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন তেমনি শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যবহারিক গবেষণা ও নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনে আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য।

(৬) সুষ্ঠু পদ্ধতির মূল সূত্র (Maxim of Good Methods):

মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণ-প্রণালী বিশ্বের শিক্ষা-জগতে এনেছে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন। শিক্ষার্থীর মানসিকতার ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছে নানাপ্রকার সূত্র। এর যে কোন এক বা একাধিক সূত্র অবলম্বনে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে, বা যে কোন শিক্ষা পবিবেশে শিক্ষাদান-প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে পারেন। শিক্ষণ-পদ্ধতি হল বাস্তব প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করার জন্য পশ্চাতে থাকে কতকগুলি মৌলিক সূত্র। অন্তরাল থেকে সেই সূত্রগুলি শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। সূত্রগুলি বিমূর্ত, কিন্তু তার আভ্যন্তরীণ যুক্তিগত শক্তি শিক্ষণ-পদ্ধতির বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করে। নিম্নে কতকগুলি প্রয়োজনীয় সূত্র আলোচনা করা হল:

(ক) জানা থেকে অজানা (From Known to Unknown): অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, অনতিক্রম্যকে অতিক্রম করার নামই শিক্ষা। কিন্তু নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা-অর্জনের মৌল ভিত্তি হল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। পুরাতন জ্ঞান থেকে নতুন তথ্যরাজি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। অধীত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে শিকড় বিস্তার করে আছে। তাকে ভিত্তি করে নতুন জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টা শিক্ষালাভের উৎকৃষ্ট পন্থা। এই নীতি অনুসারে নতুন পাঠ পরিবেশনের পূর্বে শিক্ষার্থীর কি জানা আছে তার সন্ধান করা শিক্ষকের প্রাথমিক কর্তব্য। নতুন পাঠের আয়োজন-পর্বে এই প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ। শিক্ষাবিদ হারবার্টের তত্ত্বে 'apperception mass' কথাটির মর্মার্থ

এই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি আয়োজন-পর্বে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা বা তার জানা বিষয় সন্ধান করার কথা বলেছেন। শিক্ষার্থীর জ্ঞাত বিষয় নানাধরনের হতে পারে—যেমন, অধীত পাঠ, চলিত প্রসঙ্গ (Current problems), শিক্ষার্থীর কাজকর্ম, ব্যবহৃত সামগ্রী, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় প্রসঙ্গ ইত্যাদি। মনে রাখা উচিত, জানা থেকে অজানা বিষয়ে পাড়ি দেওয়ার সময় প্রসঙ্গটি যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক হয়।

(খ) **সহজ থেকে জটিল** (From Simple to Complex)ঃ সহজ থেকে জটিলতার দিকে অগ্রসর হওয়া শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের অন্যতম মনস্তাত্ত্বিক নীতি। তবে শিক্ষকের নিকট যা কিছু সহজ শিশুর কাছে তা সহজ নাও হতে পারে। তাই 'সহজ' কথাটিকে শিশুর অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। শিশু বিমূর্ত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব ও মূর্ত সামগ্রী সম্পর্কে সহজে ধারণা করতে পারে। তার কাছে যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাই সহজবোধ্য। সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সামগ্রী বা সহজবোধ্য বিষয় থেকে ক্রমশঃ জটিল তথ্য বা তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া পদ্ধতি-প্রয়োগের উপযুক্ত নীতি।

তবে শিশুর কাছে কোন্‌টি সহজ—এটা বুঝে নেওয়া যথেষ্ট কঠিন। যেমন, এক বা একাধিক অক্ষর মিলে গঠিত হয় শব্দ, কয়েকটি শব্দ মিলে কোন ভাব বা অর্থ প্রকাশ করলে তাকে আমরা বাক্য বলি। তাহলে শিক্ষণ-প্রসঙ্গে প্রথম প্রয়োজন অক্ষর পরিচয়, দ্বিতীয় প্রয়োজন শব্দ-জ্ঞান, তারপরে প্রয়োজন হয় বাক্য-গঠন। কারণ, বিষয়বস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকে একটি অক্ষরকে জানা সহজ, তার চেয়ে একটু জটিল শব্দ-গঠন, আর শব্দের চেয়ে জটিল হল বাক্য-গঠন। তাই স্বাভাবিকভাবে মনে হবে উক্ত যুক্তিতে সহজ থেকে জটিল বিষয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শিক্ষার্থীর মানসিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় তার কাছে একটি অক্ষর বা শব্দ অপেক্ষা একটি পুরা বাক্য অনেক সহজবোধ্য। জ্যামিতি শেখানোর সময় শিক্ষক মনে করতে পারেন বিন্দু, তল, রেখা ইত্যাদি থেকে শুরু করা ভাল। কারণ, এগুলি তাদের কাছে সহজবোধ্য। কিন্তু একটু চিন্তা করলে জানা যায় শিশুর কাছে এগুলি অমূর্ত। তাই শিশুর পরিচিত পরিবেশে ব্যবহৃত সামগ্রীর চেহারা, আকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদি আলোচনা ও অঙ্কনের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়াই জ্যামিতির ক্ষেত্রে 'সহজ থেকে জটিলতার' দিকে অগ্রসর হওয়ার উপায়। গরু, পাখী, ঝুমড়া

ইত্যাদি অঙ্কনের জন্তে শিক্ষক যদি সরলরেখা, বক্ররেখা অঙ্কন শেখানো শুরু করেন তাহলে শিশু-মনের দৃষ্টিকোণকে অবহেলা করা হয়। শিশু উল্লিখিত জন্তু ও সামগ্রীকে ভাল করে চেনে ও জানে। তাই ঐসবের সামগ্রিক চেহারা অঙ্কন করতে বলাই বাঞ্ছনীয়। এক কথায় শিশুর দৃষ্টিকোণ থেকে যেটি সহজ সেটিকে শিক্ষার শুরু হিসেবে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

(গ) মূর্ত থেকে বিমূর্ত (From Concrete to Abstract) ঃ বহুকাল যাবৎ আমাদের দেশে পুস্তকপাঠ ও শিক্ষকের বক্তৃতা শ্রবণই ছিল তথাকথিত শিক্ষণ-প্রক্রিয়া। আধুনিককালে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদানের নানা কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্ত বিষয় থেকে বিমূর্ত বিষয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া এরূপ একটি বিশেষ নীতি। শিশুর জীবন শুরু হয় এলোমেলো, অসমঞ্জস ভাব, অস্পষ্টতা ও অপ্রতিভ অবস্থার ভেতর থেকে। পরিবেশের বাস্তব ও মূর্ত সামগ্রীর সংস্পর্শে শিশু-মনে প্রথমে মূর্ত চেতনার সঞ্চার হয়। প্রকৃতপক্ষে মূর্ত চেতনা জেগে ওঠে ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে। দেহের পঞ্চেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক যথাক্রমে পাঁচ ধরনের উদ্দীপক (stimulus) সৃষ্টি করে, যেমন—দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ ও স্পর্শ। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চ উদ্দীপনা অনুভূতিতে রূপান্তরিত হলে সৃষ্টি হয় অভিজ্ঞতা। ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিমূলক (Sense Perception) শিক্ষাই স্থায়ী ও জীবন্ত। আধুনিক শিক্ষাধারা আজ এই পথে অনেকখানি অগ্রসর। তাই শিক্ষাবিদ কমেনিয়াস (*Comenius*) বলেন, 'সকল প্রকার শিক্ষার ভিত্তি হল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পূর্ণ উন্মেষ, যাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদি অনায়াসে অনুধাবন করা যায়।'[1]

শিক্ষার বাস্তবায়ণ উপকরণ ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার দৃষ্টি-নির্ভর তত্ত্ব (Theory of Visual Education) প্রকৃতপক্ষে মূর্ত থেকে বিমূর্ত বিষয়ে পৌছানোর মৌলিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষক এগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, কৌশল, বোধশক্তি ও সুষ্ঠু ধারণালাভে সাহায্য করেন।

(ঘ) সমগ্র থেকে অংশ (From Whole to Parts) ঃ মনস্তত্ত্ব ও যুক্তিভিত্তিক পদ্ধতিদ্বয়ের প্রয়োগ-পরিপ্রেক্ষিতে 'সমগ্র থেকে অংশের দিকে'

---

1. "The foundation of all learning consists in representing clearly to the senses, sensible object so that they can be appreciated easily."

—*Comenius*

অগ্রগতির নীতি ক্ষেত্রবিশেষে কার্যকর। ড্রইং শেখানোর সময় সরল রেখা, বক্র রেখা, জ্যা, বৃত্তাংশ, কোণ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। গরু, ঘোড়া বা ফুলের আকৃতি অঙ্কন করার পূর্বে শিক্ষক যদি জ্যামিতির বিশেষ বিশেষ অংশ শেখাতে শুরু করেন তাহলে ভুল করা হবে। এর পরিবর্তে গরু, ঘোড়া বা ফুলের সামগ্রিক চেহারা সামনে রেখে ড্রইং শেখানো যুক্তিযুক্ত। কারণ, সামগ্রিক চেহারাটি শিশুদের কাছে পরিচিত। বিজ্ঞান-শাখায় 'ফুল' পড়ানোর সময় পৃথক পৃথক পাপড়ি, ডিম্বকোষ, রেণু ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষাদান শুরু করার পরিবর্তে সামগ্রিক ফুলটি আলোচনার পর অংশের দিকে অগ্রসর হওয়াই যুক্তিযুক্ত। মানসিকতার দিক থেকে একটি সামগ্রিক বিষয় বা সামগ্রী শিশু-মনে সহজে রেখাপাত করে। তাই সমগ্র থেকে অংশে গমনের নীতি যুক্তি ও মনস্তত্ত্বের বিচারে গ্রহণযোগ্য।

আধুনিক শিক্ষাবিদ ও মনস্তাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেন, অংশের জ্ঞান থেকে সমগ্রের জ্ঞান হয় না। গেস্টাল্ট (*Gestalt*) মতের সমর্থক মনস্তত্ত্ববিদরা দেখিয়েছেন, 'শিক্ষার পদ্ধতি হবে সমগ্র থেকে অংশের দিকে গতিশীল। শিক্ষার্থীরা প্রথমে সমগ্র পরিস্থিতি (whole situation) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত এবং সরল হলে এ নীতি প্রয়োগ সার্থক হয়ে ওঠে। কিন্তু পরিস্থিতি জটিল ও ব্যাপক হলে সমগ্র বিষয় সম্বন্ধে ধারণা সংগঠন করা সম্ভব নাও হতে পারে। অর্থাৎ, ক্ষেত্রবিশেষে এই নীতি কার্যকর। প্রাচীন যুগের ইতিহাস শেখাতে সমগ্র অতীত যুগের আলোচনা শুরু করলে মনস্তত্ত্ব ও যুক্তির দিক থেকে অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে। ভূগোল পাঠে সমগ্র ভূ-মণ্ডলের আলোচনা শুধু নিষ্ফল নয়, দুরূহও বটে। সুতরাং 'সমগ্র থেকে অংশে' অগ্রসর হওয়ার নীতি কোথায়, কোন্ প্রসঙ্গে এবং কিরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কর্তব্য তা শিক্ষকের বুদ্ধি ও বিবেচনা সাপেক্ষ।

(৬) **বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লেষণ** (From Analysis to Synthesis) : 'বিশ্লেষণ' শব্দটির মধ্যে একটি মূল বিষয় বা সামগ্রিকতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ, একটা সামগ্রিক সত্তা না থাকলে বিভাজন বা বিশ্লেষণের প্রশ্ন আসে না। শিক্ষাদানের সময় আমরা পাঠ্যবিষয়ের বিভিন্ন উপাদানকে পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা করতে পারি। এভাবে পাঠদানে অগ্রসর হওয়া পদ্ধতিকে বিশ্লেষণমূলক প্রক্রিয়া (Analytical process) বলা হয়। উপাদান বিশ্লেষণের

পর আমরা সামগ্রিক বিষয়বস্তুর মূল কাঠামোতে পৌছতে পারি। বস্তুতঃ, বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লেষণে (The Synthetic whole) পৌছতে পারলে বিষয়-গত বাস্তব চিত্রটি শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি সত্যিই যুক্তিসিদ্ধ। জ্যামিতি শিক্ষণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলা চলে, একটি উপপাদ্যে (Théorem) থাকে সাধারণ সূত্র (General enunciation) এবং একটি বিশেষ সূত্র (Particular enunciation)। বিশেষ সূত্রের উপাদান বা অংশগুলির বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করতে হয় মূল বিষয়টির সত্যতা। বিশেষ সূত্রে কতকগুলি বিষয় দেওয়া থাকে; তার সূত্র ধরে সাধারণ সূত্রের সত্যতা প্রমাণ করতে হয়। এভাবে শিক্ষার্থী জানা থেকে অজানার দিকে অগ্রসর হতে পারে। বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লেষণের দুটি ধারা বিদ্যমান। প্রথমতঃ, উপাদান বিশ্লেষণের সূত্র ধরে সমগ্রের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, সামগ্রিক বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করা এবং পুনরায় বিশ্লেষিত উপাদান অবলম্বন করে সমগ্রের দিকে ফিরে যাওয়া যায়। শিশু-মনের কাছে দ্বিতীয়টি গ্রহণযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি' কবিতা পড়ানোর সময় সমগ্র কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরলে সেটি সম্পর্কে তাদের মনে একটি সামগ্রিক ধারণা জন্মায়। পরে তার অংশগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তাদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এর পর পুনরায় সংশ্লেষিত সামগ্রিকতার দিকে অগ্রসর হলে বিষয়টি পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এই বিধি যুক্তিসিদ্ধ। অশোকের সমগ্র চিত্রটি প্রথমে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরার পর একে একে সিংহাসন আরোহণ, রাজ্য-জয়, বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ ও প্রচার ইত্যাদি বিষয় ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশেষে সম্রাট অশোক সম্পর্কে সামগ্রিক চিত্রটিকে পুনরায় তুলে ধরলে বিষয়টি অধিক চিত্তাকর্ষক হয়।

সুষ্ঠু পদ্ধতিপ্রসঙ্গে উল্লিখিত নীতিগুলির সমগোত্রীয় আরও কয়েকটি নীতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন—(১) বিশেষ থেকে সাধারণ (from Particular to General), (২) অভিজ্ঞতাবাদ থেকে যুক্তিবাদ (from Empiricism to Rationalism), (৩) অনির্দিষ্ট থেকে নির্দিষ্ট জ্ঞান (from indefinite to definite), (৪) মনস্তাত্ত্বিকতা থেকে যুক্তিভিত্তিকতা (from Psychological to Logical) ইত্যাদি।*

* পুস্তকের বিভিন্ন অংশে এগুলি আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষণ-পদ্ধতির বিবর্তন ও পরিণতি

[Evolution of Teaching Methods & Results]

[**অধ্যায়-পরিচয় :** এই অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে দেখানো হয়েছে বিবর্তনের সূক্ষ্ম ধারাটিকে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দেওয়া হল পাণ্ডিত্য কেন্দ্রিকতা থেকে প্রগতিশীলতায় শিক্ষা পদ্ধতির বিবর্তন। প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতির ভিত্তি হল যুক্তি ও মনোবিজ্ঞান। যুক্তি ও মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক প্রক্রিয়া (Approach) থেকে উদ্ভূত হয়েছে আধুনিক প্রগতিশীল সার্থক পদ্ধতি। তাই তৃতীয় অনুচ্ছেদে আলোচিত হল যুক্তিবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক প্রক্রিয়া। পদ্ধতির বিবর্তন প্রসঙ্গে এসব স্বাভাবিক পরিণতির কথা এসে যায়।

১। বিবর্তনের ধারা (Stream of Evolution) :

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষণ-পদ্ধতি ব্যাপকতর অর্থে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। শিক্ষণ-পদ্ধতি আজ আর কতকগুলি নীরস তথ্য পরিবেশনের কাজে ব্যবহৃত হয় না। শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদির সামগ্রিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য পদ্ধতি নির্বাচন ও প্রয়োগ করা হয়। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে 'শিক্ষা' আর 'জীবনের' মধ্যে এতটুকুও ব্যবধান নেই। আজ শিক্ষা জীবনকে গড়ে তোলার উপায় বা ধাপ স্বরূপ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে শিক্ষা নিজেই জীবন রূপে অভিব্যক্ত। এরূপ জীবনধর্মী শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহৃত শিক্ষণ-পদ্ধতি বিশেষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী সঞ্জাত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এই হল শিক্ষণ-পদ্ধতির আধুনিক চরিত্র ও প্রকৃতি। সুদূর অতীত থেকে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের আগ্রহ, অভিজ্ঞতা ও সুচিন্তিত গবেষণার ফল স্বরূপ শিক্ষণ-পদ্ধতির এই বিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষণ-পদ্ধতি

শিক্ষা মূলতঃ সামগ্রিক সমাজ-প্রক্রিয়ার (Social process) অংশবিশেষ। সমাজ-বিবর্তনের ধাপে ধাপে শিক্ষাও বিবর্তিত হয়ে আধুনিক যুগে পরিণতি লাভ করেছে। মানুষের দ্বারা গঠিত হয় সমাজ, আর সমাজ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই সমাজের প্রয়োজন অনুসারে মানুষকে চলতে হয়। যুগে যুগে সমাজের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হয়েছে। নিরূপিত লক্ষ্যে পৌছাতে গেলে অনুকূল

সামাজিক প্রয়োজনে পদ্ধতির বিবর্তন

শিক্ষাদান-পদ্ধতি নির্বাচন ও প্রয়োগ করা দরকার। তাই আমরা দেখি বিবর্তিত সমাজের শিক্ষার লক্ষ্য-পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষণ-পদ্ধতিও যুগসাপেক্ষে ভিন্নতর রূপে অভিব্যক্ত।

সমাজ-বিবর্তনের আদিতে আনুষ্ঠানিক চিন্তামূলক শিক্ষা সম্পর্কে মানুষ ছিল অজ্ঞ। ব্যক্তি ও সমষ্টির আত্মরক্ষার তাগিদে নানা কৌশল শিক্ষা করাই ছিল তৎকালীন মানুষের একমাত্র প্রচেষ্টা। বয়স্করা বন্য পরিবেশে সাধারণতঃ খাদ্য সংগ্রহ, শিকার, পারস্পরিক দলগত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকত। বয়স্কদের কাজে সাহায্য করতে করতে ও তাদের সঙ্গে মিশতে মিশতে অনুকরণমূলক সহজাত প্রবৃত্তির বশে স্বাভাবিকভাবে নাবালক ও নাবালিকারা নানা কৌশল শিখতে পারত। একে অনুষ্ঠানবিহীন স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষণ-পদ্ধতি বলা যেতে পারে। এতে বাহ্যিক আচার-আচরণের দ্বারা সীমিত ও নিয়মভিত্তিক পদ্ধতির প্রয়োজন হত না। এরূপ শিক্ষালাভের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল কায়িক শ্রমভিত্তিকতা, একই কর্মের পুনরাবৃত্তি ও অনুকরণ। হাতে-কলমে একই কাজ বারে বারে করতে করতে অল্পবয়স্করা স্বাভাবিকভাবে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করত।

আদি পর্বের শিক্ষণ-পদ্ধতি

পরবর্তী স্তরে সমাজজীবনে এল যথেষ্ট সংহতি ও শৃঙ্খলা। তবে আধুনিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষার স্বরূপ তখনও মানুষের জানা ছিল না। লিখন ও পঠন রীতি তখনও সুষ্টুরূপ পায়নি। আদিপর্বের শ্রমভিত্তিকতা, পুনরাবৃত্তি, অনুকরণ ও অনুসরণ তখনও বিদ্যমান। তবে নতুন পদ্ধতি হিসেবে শ্রুতিনির্ভরতা যুক্ত হল। ভারতের আদি বৈদিক যুগ এই অংশের অন্তর্গত। পুরোহিত বা সামাজিক জীবনের পুরোগামীদের কাছ থেকে ছোটরা লোকশ্রুতি, গাথা বা কাহিনী শ্রবণ করে শিক্ষা লাভ করত। এ যুগকে সভ্য সমাজের আদিপর্ব বলা চলে। আদিপর্বের শিক্ষণ-পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করলে দুটি দিক লক্ষ্য করা যায়। (১) **প্রথমতঃ**, বয়স্কদের কর্মের অনুকরণ ও অনুসরণ। এর মূলে আছে দৈহিক শ্রমভিত্তিকতা। তাই একে বলা চলে কর্ম-পদ্ধতি (Doing Method)। (২) **দ্বিতীয়তঃ**, পুরোগামীদের বা বয়স্কদের নিকট থেকে কাহিনী শ্রবণ। শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে যুক্ত হয় চিন্তন, স্মরণ ও অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়া। তাই একে এক কথায় বলা যায় চিন্তন-পদ্ধতি (Thinking Method)। সুতরাং সভ্যতার

সংহত সমাজজীবনের প্রথম স্তর ও শিক্ষণ পদ্ধতি

আদিপর্বে সমাজজীবনে চলল কর্ম ও চিন্তার যুগপৎ অনুশীলন। শিক্ষার ব্যাপারেও এই দুটি রীতি যুগপৎ প্রযুক্ত হল। সমাজে লিখন ও পঠন রীতি চালু হওয়ার পরও বহুকাল যাবৎ উক্ত পদ্ধতি দুটি শিক্ষাস্তরে যুগপৎ অনুশীলিত হয়েছে।

কালক্রমে প্রবর্তিত হয়েছে লিখন-পঠন ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। সে শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ছিল না। সমাজের পুরোহিত শ্রেণী ধীরে ধীরে জ্ঞান-চর্চার প্রেরণায় শিক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পুরোহিতরা তত্ত্বগত জ্ঞান-চর্চার জন্য চিন্তাশক্তির বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। এর ফলে পূর্বোক্ত দুটি শিক্ষণ-পদ্ধতি পরস্পর সম্পর্কহীন দুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হয়ে গেল। কর্মের সঙ্গে চিন্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল। সমাজের পুরোহিত শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল চিন্তন অংশের (Thinking part) ওপর। কর্ম-ভিত্তিক অংশটি (Doing part) গেল কায়িক শ্রমশীল ব্যক্তিদের অধিকারে। প্রতিষ্ঠিত হল দুটি সামাজিক শ্রেণী—(১) মানসিক শ্রমিক (Intellectual worker) এবং (২) কায়িক শ্রমিক (Manual worker)। সমাজের এই দ্বিতীয় অংশের মানুষ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হল। কারণ, পুরোহিত এবং তথাকথিত উচ্চবর্ণের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ওপর। ফলে শিক্ষণ-পদ্ধতি একটা নির্দিষ্ট ও সীমিত নিয়মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো। এ শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের প্রভুত্ববৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাই একে বলা যেতে পারে—**শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষা**। শিক্ষক স্বীয় ইচ্ছা অনুসারে শিক্ষার্থীকে তৈরি করার জন্য শিক্ষা দিতেন। তাকে শেখানোই ছিল তখন বড় কথা। শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা, রুচি-অভিরুচি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আগ্রহ-প্রবণতা ইত্যাদি এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় ছিল না। তবে শিখতে গেলে মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয়। তাই শিক্ষার্থীর মানসিক বৃত্তিগুলির (Faculties of mind) বিকাশসাধনের ওপর শিক্ষক অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। শিক্ষক মনে করতেন পদ্ধতি যত কঠিন ও জটিল হবে মানসিকবৃত্তির বিকাক ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা ততই সুদৃঢ় হবে। শিক্ষকের রক্তচক্ষু, বেত্রাঘাত, কঠিন শাস্তিবিধান ছিল স্বীয় ইচ্ছানুরূপ পথে শিক্ষার্থীকে পরিচালিত করা ও শৃঙ্খলাবিধানের উপায়। শিক্ষক কর্তৃক গৃহীত পাঠদান-

প্রাচীন যুগ ও শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষণ-পদ্ধতি

পদ্ধতি ছিল যুক্তিধর্মী ও বাক্‌সর্বস্ব। শিক্ষার্থী বারে বারে সেগুলি পুনরাবৃত্তি করে মুখস্থ করা ও স্মরণ রাখার চেষ্টা করত। যে যত পুঁথিগত জ্ঞান বা তথ্য স্মরণ করে রাখতে পারত তার মানসিক শক্তি তত বেশী বলে মনে করা হত। শিক্ষকরা অনুমান করতেন যে, বালক-বালিকা বা অপ্রাপ্ত বয়স্করা বড়দের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ (Miniature form)। তাই শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, ইচ্ছা, প্রবণতা, সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা না করে বয়স্কদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা সেযুগে প্রচলিত ছিল। সে শিক্ষায় শিশুর ভিন্ন সত্ত্বা ও বৈশিষ্ট্যের কোন স্থান ছিল না।

ইউরোপ ভূখণ্ডের গ্রীস, রোম এবং পরবর্তীকালে গীর্জার যাযকদের মধ্যে এরূপ শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার চলন দেখতে পাওয়া যায়। সেকালে ভারত ও চীনে প্রায় একই শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার প্রচলন ছিল। তবে ভারতে ও চীনে মুখস্থ করার সাথে অনুধাবনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। হিন্দু শিক্ষাব্যবস্থায় যেমন বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি মুখস্থ করতে হত তেমনি মুসলমানদের শিক্ষাতেও কোরান ও শাস্ত্রাদি মুখস্থ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে উভয় ক্ষেত্রে পরম সত্য সম্পর্কে অনুধাবন করাই ছিল শেষ লক্ষ্য।

নবজাগরণেব যুগ ও পদ্ধতির বিবর্তন

ইউরোপের রেনেসাঁ বা নবজাগরণের যুগে তৎকালীন শিক্ষারীতির কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ সময় দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক চেতনা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের অবসান ঘোষনা করে। তাই এযুগেব শিক্ষাচিন্তায় এবং শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় মানবজীবনকেই গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার দেওয়া হল। অতীতের প্রয়োজনীয় ধর্মীয়-বিশ্বাস, [illegible] নীতিকে যুক্তির ভিত্তিতে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা দিল। ফলে, বাস্তব জীবনবোধ, সামাজিক পরিবেশে মানুষের অস্তিত্ব হয়ে উঠলো শিক্ষাশিস্তার কেন্দ্রীয় বিষয়। মনীষীদের মনে জেগে উঠলো যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক চেতনা। শিক্ষাচিন্তায়ও এল বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রভাব। তাই মানবজীবনকে কেন্দ্র করে শিক্ষাচিন্তা প্রকট হল। ফলে, পূর্বেকার শিক্ষকের রক্তচক্ষু, বেত্রাঘাত, দৈহিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ভেতর থেকে মানবতাবর্জিত অংশগুলি হ্রাস পেল। কালক্রমে এই মানবধর্মিতা শিক্ষাচিন্তায় প্রতিষ্ঠা করল যুক্তিভিত্তিক প্রত্যক্ষধর্মিতা। তাই নবজাগরণের যুগ ছিল শিক্ষণ-পদ্ধতির বিবর্তনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সময় থেকে

শিক্ষাচিন্তায় আধুনিকতা ও বৈজ্ঞানিকতার সূত্রপাত হল। অতীত **শিক্ষাচিন্তার আমূল পরিবর্তন** লক্ষ্য করা যায় রুশোর বিপ্লবাত্মক আদর্শের প্রভাবে। তিনি শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে স্থাপন করলেন শিক্ষার্থীকে। শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আগ্রহ, প্রবণতা, মানসিকতা ও শক্তি-সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষাদান-পদ্ধতির কথা ব্যক্ত করলেন। রুশোর পূর্বে বহু শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্ শিক্ষা-সংস্কারের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কমেনিয়াসের (*Johann Amos Comenius*) নাম করা যেতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীতে তিনি তাঁর Great Didactic-এ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকরণ শিক্ষানীতির কথা ব্যক্ত করেন। কিন্তু অন্যান্য শিক্ষাবিদ্‌দের বক্তব্যের ন্যায় কমেনিয়াসের বক্তব্যও ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামির স্রোতে ভেসে যায়। সংস্কার আন্দোলনের পর রুশোর শিক্ষাচিন্তা এমন বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টা নিয়ে এল যে একে রুদ্ধ করার আর সুযোগ থাকল না। রুশোর প্রচেষ্টাতেই প্রতিষ্ঠিত হল মনস্তত্ত্বভিত্তিক শিক্ষণ-পদ্ধতি। পরবর্তী অসংখ্য মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত আজ রুশোর নয়াদর্শের কাছে ঋণী। সে আদর্শ হল; "শিশুকে শিক্ষা দিতে গেলে শিশুর মনটিকে জানা চাই এবং তার মনের বিকাশের স্বাভাবিক ধারাকেই সুশিক্ষক অনুসরণ করবেন। এতদিন এই কথাটাই চলছিল—শিক্ষক শিক্ষাদান করবেন। অনিচ্ছুক শিশুকে তাড়ন-পীড়ন করেই শিক্ষার 'অমূল্য ধন' শিক্ষক তাকে পাইয়ে দেবেন। শিক্ষকের পেটে যদি বিদ্যা থাকে, আর হাতে যদি বেত থাকে, তাহলে ভাল ছাত্র তৈরি হয়। তিনি শিক্ষাকে এই প্রাচীন সংস্কারের নিগড় থেকে মুক্তি দিলেন।"[1] রূপ পেল শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা (Child centric education)। শিশুই প্রতিষ্ঠিত হল সামগ্রিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে।

রুশো ও আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি

রুশোর বিপ্লবাত্মক শিক্ষা-সংস্কারের ভাবধারাকে বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর করে দিলেন তাঁর পরবর্তী শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌রা। এঁদের মধ্যে পেস্টালৎসী (*Pestalozzi*), ফ্রোএবেল (*Froebel*), হারবার্ট (*Herbart*) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পেস্টালৎসী রুশোর নেতিবাচক শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করে তোলেন। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের ওপর প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর শিক্ষণ-প্রক্রিয়া।

পদ্ধতির বিবর্তনে শিক্ষাবিদ্‌দের অবদান

1. শিক্ষায় পথিকৃৎ: বিভুরঞ্জন গুহ—পৃঃ ১২।

শিক্ষণ-পদ্ধতি নিয়ে মনস্তত্ত্বভিত্তিক আধুনিক গবেষণার দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন পেস্টালৎসী। হারবার্ট-এর পঞ্চসোপান নীতি পূর্বোক্ত পদ্ধতিগুলিকে অনেকখানি বাস্তবধর্মী করে তুলল। ফ্রোএবেল শিক্ষাকে করলেন সমাজভিত্তিক। তাঁর কাছে বিদ্যালয় হল সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ। মন্টেসরী গুরুত্ব আরোপ করলেন পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার ওপর। ধীরে ধীরে শিক্ষণ-পদ্ধতি আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করল।

সামগ্রিক শিক্ষারীতির আধুনিকতম রূপ দিলেন **জন ডিউই** (*John Dewey*)। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'শিক্ষায় গণতন্ত্র'। গণতন্ত্রের আদর্শে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন। "যে ব্যক্তি শিক্ষালাভ করবে সে সামাজিক জীব; সমাজও বহু ব্যক্তির জীবন্ত সমাবেশের ফল। শিশুর জীবন থেকে সমাজের দানকে অস্বীকার করলে যা থাকে তা একটা বিমূর্তভাব মাত্র (a mere abstraction), আর সমাজজীবন থেকে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে প্রাণহীন বহুর সমষ্টি মাত্র।...... শিক্ষার গোড়াতে তাই থাকবে শিশুর ক্ষমতা, আগ্রহ ও অভ্যাস সম্বন্ধে মনস্তত্ত্বের অন্তর্দৃষ্টি...কিন্তু শিশুর শক্তি, আগ্রহ ও ক্ষমতার তাৎপর্য বোধ করতে হবে তার সামাজিক পরিবেশের পটভূমিকায়...তখনই তাদের সম্পূর্ণতা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের সঙ্গে তখনই তাদের সমন্বয় ঘটবে যখন সমাজের প্রয়োজন ও কল্যাণের সঙ্গে তার সংযোগ হবে।"[1] সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের সংযোজনায় শিক্ষণ-পদ্ধতিতে অতীতের দুটি ধারা যুক্ত হল; (১) চিন্তামূলক অংশ (Thinking part) এবং (২) কর্মমূলক অংশ (Doing part)। এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি যে সুদূর অতীতে শিক্ষাক্ষেত্রে এ দুয়ের সমন্বয় ছিল। পরে এদের মধ্যে বিচ্ছেদ রচিত হয় এবং কর্মমূলক অংশটি আনুষ্ঠানিক ও তত্ত্বগত শিক্ষায় সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়। কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হল কর্মের। প্রবর্তিত হল খেলার ছলে শিক্ষা, প্রকল্প পদ্ধতি, কর্ম সমস্যা-পদ্ধতি প্রভৃতি। শিক্ষা আজ আর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি নয়, 'জীবনই শিক্ষা আর শিক্ষাই হল জীবন'। 'এক কথায় শিক্ষা বর্তমান জীবন-ক্রিয়ারই অঙ্গ'—"Education therefore, is a process of living, not a preparation for future living".

পদ্ধতির আধুনিকতম রূপ

1. *John Dewey*: My Pedagogic Creed, Art. I—as quoted by শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ—শিক্ষায় পথিকৃৎ, পৃঃ ১৫০।

আধুনিক পদ্ধতি এই জীবন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে একাত্ম। শরীর, মন, পরিবেশ বা সমাজ এখানে একত্রে ক্রিয়াশীল।

শিক্ষণ-পদ্ধতির বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত থেকে আমরা নিম্নরূপ কয়েকটি ধারা লক্ষ্য করতে পারি :

(১) শিক্ষক-কেন্দ্রিকতা থেকে শিশু-কেন্দ্রিকতায় বিবর্তন।

(২) বিষয়বস্তু-কেন্দ্রিকতা থেকে জীবন-কেন্দ্রিকতায় বিবর্তন।

(৩) চিন্তা ও কর্ম থেকে কেবলমাত্র চিন্তা এবং পরিণতিতে পুনরায় চিন্তা ও কর্ম-কেন্দ্রিকতায় প্রত্যাবর্তন।

(৪) যুক্তি ও বক্তৃতা থেকে মনস্তত্ত্ব ও সমাজভিত্তিকতায় বিবর্তন।

(৫) পাণ্ডিত্য-কেন্দ্রিকতা থেকে এসেছে প্রগতিশীলতা।

(৬) যেসব ক্ষেত্রে পণ্ডিতীভাব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেনি, অন্যদিকে প্রগতিশীলতা পূর্ণমাত্রায় গৃহীত হয়নি, সেসব ক্ষেত্রে রয়ে গেছে গতানুগতিকতা।

২.১ পাণ্ডিত্যকেন্দ্রিকতা থেকে প্রগতিশীলতা (From Pedagogic to Progressive Methods) :

একসময় শিক্ষণ-ব্যবস্থা ছিল বিষয়কেন্দ্রিক ও পাণ্ডিত্যভিত্তিক। সে ব্যবস্থায় পদ্ধতির ভিত্তি ছিল দুটি। প্রথমটি হল বিষয়বস্তুর উপরকার পাণ্ডিত্য এবং দ্বিতীয়টি হল শিক্ষাদানের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা। শ্রেণীকক্ষের বাস্তব প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করলে সন্ধান পাওয়া যায় তিনটি মূল উপাদান—যথা—

পাণ্ডিত্যভিত্তিকতা ও তার বৈশিষ্ট্য

(১) পাঠের শুরু, (২) পাঠের শেষ এবং (৩) শেষ ও শুরুর মধ্যেকার যোগসূত্র। পূর্বে এই তিনটি মৌলিক বিষয় সামনে রেখে শিক্ষক স্বায় পণ্ডিতসুলভ মনোভাব নিয়ে বিষয় পরিবেশন করতেন। পণ্ডিতী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা যায়, (১) শিক্ষকদের অভিরুচি ও অভিজ্ঞতা ছিল এই পদ্ধতির ভিত্তি। (২) পাঠদানে, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর আনুগত্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা করাই ছিল বড় কথা। (৩) বাঞ্ছিত ফলশ্রুতি অর্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠদান করা হত। (৪) পঠন-পাঠন রীতি ছিল বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে। প্রয়োজনীয় উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তির পর যে কোন ব্যক্তি সহজে শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করে কৃতী হতে পারতেন। কারণ তাঁরা পাঠ্যাবস্থায় স্ব-স্ব শিক্ষকের পাঠদান লক্ষ্য করে এসেছেন।

তাই তাঁদের মনে অতীত রীতি-নীতি অক্ষুণ্ণ রাখার প্রবণতা থাকতো বেশী। পদ্ধতি প্রসঙ্গে নতুন কিছু জানবার, দেখবার ও দেখাবার প্রয়োজন হত না।

সে যুগের শিক্ষা ছিল পণ্ডিতদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত স্বরূপ। তাঁদের কাছে শিক্ষা কোনমতে ছেলেখেলা বা আনন্দ-পরিহাসের বিষয় ছিল না। গুরুগম্ভীর পরিবেশে পণ্ডিতী আদব-কায়দা, প্রভুত্বব্যঞ্জক রক্তচক্ষু, বেত্রাঘাত ছিল শিক্ষাদান ও শৃঙ্খলাবিধানের অঙ্গ। এ শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ভূমিকা ছিল নিতান্ত গৌণ। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষাতত্ত্ব প্রচারের পরও বহুদিন যাবৎ পণ্ডিতী পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ ছিল। তারপর ধীরে ধীরে প্রভুত্বব্যঞ্জক প্রভাব কেটে গেল। নতুন ভাবধারা শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌দের চিন্তাজগতে স্থান পেল। কিন্তু শিক্ষার বাস্তবক্ষেত্রে সে ভাবধারা, সে পদ্ধতি দানা বেঁধে ওঠেনি। অন্যদিকে অতীতের গুরুগম্ভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ শিক্ষণ-পরিবেশের রূপ বদল হয়ে গেল। এ অবস্থায় শিক্ষার বাস্তব ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থাপনা রয়ে গেল তার মধ্যে ঐকান্তিকতা ও দায়িত্ববোধের নিতান্ত অভাব দেখা দিল। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যসূচী অনুসরণ করেন, বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন, বক্তৃতা দেন। শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় শ্রোতা হয়ে শোনে, অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে গৃহে ফেরে, শিক্ষকের নির্দেশ পালন করার কোন চেষ্টা না করে গৃহশিক্ষকের সাহায্যে পরীক্ষা পাশের জন্য কিছু পাঠ তৈরি করে। ক্রমশঃ মূল পুস্তকের সন্ধান আর পাওয়া যায় না। এখন নোট বই, Suggestion, Last Night's Preparation ইত্যাদির সংখ্যা বেড়ে গেছে। শিক্ষার ব্যবস্থাপনা আর নেই বললেও চলে। এখন সকল প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হয়েছে পরীক্ষার দিকে। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মান, মর্যাদা, গুরুত্ব এখন নিঃশেষিত প্রায়। আছে শুধু বোর্ড বা এরূপ কোন সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন পরীক্ষাটুকু। লক্ষ্য করলে জানা যাবে সে পরীক্ষাতেও নাভিশ্বাস উঠেছে। এরূপ দুর্দশার পশ্চাতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি যত কারণই থাকুক, শিক্ষণ-প্রসঙ্গে উদ্ভূত কারণকে অবহেলা করা যায় না। সেটি হল, পাণ্ডিত্যকেন্দ্রিক পদ্ধতির (Pedagogic Method) কদর আর নেই। অন্যদিকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানভিত্তিক, প্রগতিশীল প্রাণবন্ত পদ্ধতি আমাদের চিন্তারাজ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে মাত্র। কিন্তু তাকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ

গতানুগতিক শিক্ষা-দান পদ্ধতি

করতে পারেনি। ফলে, শিক্ষণ-প্রক্রিয়াশূন্য শিক্ষা বর্তমান বিদ্যালয়-গুলিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার জন্য অপেক্ষা করছে। বিদ্যালয়ের বাস্তবক্ষেত্রে প্রচলিত শিক্ষা সত্যিই গতানুগতিক। এর না আছে লক্ষ্য, না আছে ঐকান্তিকর্তা ও দায়িত্ববোধক প্রেরণা। এ শিক্ষা একেবারে বন্ধ্যা। **বন্ধ্যাত্বের কারণগুলি নিম্নরূপ ঃ**

প্রথমতঃ, গতানুগতিক শিক্ষণ-পদ্ধতি জীবন ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন। তাই শিক্ষান্তে এ শিক্ষা সমাজজীবনের কোন কাজে আসে না। **দ্বিতীয়তঃ,** শিক্ষাসহ গতানুগতিক পদ্ধতি সংকীর্ণ। ফলে এ-শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তি-বিকাশের পরিপন্থী। বিদেশী শাসকদের অধস্তন কর্মচারী তৈরির কাজে এ শিক্ষাকে ব্যবহার করা হত। স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে এ শিক্ষা নিতান্ত অকেজো। **তৃতীয়তঃ,** এ পদ্ধতি যান্ত্রিক উপায়ে তথ্য সংগ্রহের অনুকূল। স্বাধীন চিন্তা ও কর্মপ্রেরণা উদ্রেক করতে এ পদ্ধতি অক্ষম। **চতুর্থতঃ,** আজ দিন বদলের পালা শুরু হয়েছে। জীবনের নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি হতে চলেছে। গতানুগতিক পদ্ধতি আধুনিক পরিবর্তন ও প্রগতিকে আংশিক উপায়েও গ্রহণ করতে পারে না। **পঞ্চমতঃ,** আধুনিক যুগে বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সমস্যাসঙ্কুল জটিলতা সৃষ্টি করেছে। গতানুগতিক পদ্ধতি এ সমস্যার সমাধান করতে পারে না। **অবশেষে** বলা যায় লক্ষ্যবিহীন, দায়িত্ব ও আন্তরিকতাশূন্য পাঠদান-পদ্ধতি পরীক্ষাকেন্দ্রিক হওয়ায় শিক্ষা-জগতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

এখন যুগ 'পরিবর্তিত হচ্ছে'—একথা আর বলা বা চিন্তা করা উচিত নয়। কারণ, এর মধ্যে আছে পিছু টান ও সামনে এগিয়ে চলার কিঞ্চিৎ অনিচ্ছা। এখন বলতে হবে যুগ বদলে গেছে, পালা বদলের পালা শেষ হয়েছে। সুতরাং শিক্ষায় গতানুগতিক শিক্ষণ-পদ্ধতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত, প্রাণবন্ত প্রগতিশীল যে শিক্ষণ-পদ্ধতি এতদিন ট্রেনিং কলেজকে কেন্দ্র করে চিন্তা-জগতে আসন প্রতিষ্ঠা করেছে তাকে এবার এবং এখনই বাস্তবায়িত করতে হবে। শিক্ষণ-পদ্ধতির রাজত্বে সৃষ্ট শূন্যতাকে পূর্ণ করতে হবে।

পদ্ধতিতত্ত্বের **বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ** করলে আমরা শেষ পর্যন্ত যে সত্যে উপনীত হতে পারি তা হল: আধুনিক গতিশীল পদ্ধতির ভিত্তি হল যুক্তিবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান। যুক্তিবিজ্ঞানে শিক্ষকের নিজস্ব শিক্ষিত মনের

যুক্তি বিদ্যমান; আর মনোবিজ্ঞানে শিক্ষার্থীর ক্রমবর্ধমান মনের বিজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে। শিক্ষার্থীকে শেখাবার জন্য যখন শিক্ষকের যুক্তি শিশু-মনকে কেন্দ্র করে প্রসারিত হয় তখনই উদ্ভূত হয় আধুনিক প্রগতিশীল সার্থক পদ্ধতি। যুক্তিবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান কিভাবে আধুনিক পদ্ধতির উদ্ভাবনে সাহায্য করল এবং উভয় বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক কি তা আলোচনা করা অত্যাবশ্যক।

৩। যুক্তিবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া (Logical and Psychological approaches*) ঃ

রুশোর পূর্বে শিক্ষকের গুরুগম্ভীর হুমকি, বেত্রাঘাত, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-অভিরুচি ও মেজাজের ওপর শিক্ষণ-ক্রিয়া পরিচালিত হত। বিষয়বস্তুর ভার-বোঝা শিশুর ওপর চাপিয়ে দেওয়াই ছিল তখনকার রীতি। এ শিক্ষায় শিশুর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-অভিরুচি, মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের কোন ভূমিকা ছিল না। শিক্ষকের ধারণায় শিশু ছিল বয়স্ক মানুষের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। বয়স্কদের মতো কি কি কর্তব্য পালন করতে হবে, কি কি বিষয়ে অভ্যস্ত হতে হবে—এটাই ছিল শিক্ষকের মূল বিবেচ্য বিষয়। ভবিষ্যতের নাগরিক ও সমাজের সভ্য হিসেবে শিশুকে অল্প সময়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি বিশ্বের প্রয়োজনীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের অনেক কিছু জানাবার জন্যে শিক্ষক পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন। স্বাধীনভাবে শিক্ষার্থীর তরফ থেকে করণীয় কিছু ছিল না। এককথায় এ শিক্ষায় শিক্ষক ও বিষয়বস্তুর স্থান ছিল মুখ্য আর শিক্ষার্থীর স্থান ছিল গৌণ।

ইতিহাসগত ভূমিকা

উক্ত শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্যে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। 'শিক্ষক রামকে ইতিহাস শেখাচ্ছেন'—এই বাক্যে 'শেখাচ্ছেন' ক্রিয়াটির দুটি কর্ম, যথা—রাম ও ইতিহাস। ব্যাকরণের মতে 'ইতিহাস' মুখ্য কর্ম এবং, 'রাম' গৌণকর্ম। 'শেখাচ্ছেন' ক্রিয়ার দুটি কর্মের মধ্যে 'ইতিহাস' বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত। 'রাম' এখানে গৌণ অর্থাৎ অবহেলিত। যে শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় বিষয়বস্তুর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বা মুখ্য তাকে যুক্তিভিত্তিক প্রক্রিয়া (Logical approach) বলা হয়। এ প্রক্রিয়ার ভিত্তি হল যুক্তিবিজ্ঞান। আর শিক্ষার্থীর

ভূমিকা পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টান্ত

*Approach শব্দটি বাংলা প্রতিশব্দরূপে 'প্রক্রিয়া' কোথাও বা 'প্রণালী' শব্দ রূপে ব্যবহার করা হল।

প্রতিক্রিয়া, মানসিকতা, অভিজ্ঞতা, আগ্রহ ও প্রবণতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাকে বলা হয় মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া (Psychological approach)। এই প্রণালীর ভিত্তি হল মনোবিজ্ঞান।

(১) **যুক্তিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া** (Logical approach): যুক্তি-নির্ভর প্রক্রিয়া হল শিক্ষককেন্দ্রিক ও বিষয়ভিত্তিক। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক বিষয়বস্তুর ওপর গুরুত্ব দিয়ে যুক্তিবিজ্ঞানের ধারায় পাঠদান করেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাক—ইউক্লিড-এর জ্যামিতি শেখানো হবে সপ্তম শ্রেণীতে। ইউক্লিড নিজে বহু পরীক্ষা করে জ্যামিতিক সত্যগুলিকে যুক্তিসঙ্গত উপায়ে স্তর বিন্যাস করেছেন। শিক্ষক নিজে বয়স্ক, তাই তাঁর চিন্তাধারাও যুক্তির দ্বারা সুসংহত। তিনি তাঁর বয়স্ক চিন্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে তল, বিন্দু, রেখা, কোণ, ক্ষেত্র প্রভৃতি বিষয়ের সংজ্ঞা থেকে শুরু করে ক্রমশঃ কঠিন বিষয় শিক্ষার্থীদের শেখান। পূর্ব পাঠ ও কার্যকারণের যুক্তিতে তিনি সম্পাদ্য, উপপাদ্য বিষয়গুলি একটা নির্দিষ্ট নিয়মে শেখাতে পারেন। বিষয়বস্তুর বিচার এরূপ যুক্তিবিজ্ঞানের ধারায় অগ্রসর হওয়ার পশ্চাতে যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কতটুকু আনন্দ সহকারে বিষয়বস্তু অনুধাবন করে জ্ঞানার্জন করতে পারল—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। কারণ, জ্যামিতিক সত্য আবিষ্কারে ইউক্লিড ছিলেন আবিষ্কারক, গবেষক। ইউক্লিডের শ্রমলব্ধ সত্যকে শিক্ষার্থী বিনা চিন্তায়, বিনাশ্রমে শিক্ষকের নির্দেশে বাধ্য হয়ে মনে রাখার চেষ্টা করে চলেছে। চেষ্টা তাকে করতে হবে, কারণ, শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, সামর্থ্যের কোন স্থান এখানে নেই। সপ্তমশ্রেণী বা বিদ্যালয়ের নিম্নমানের শিক্ষার্থীরা জ্ঞানলাভের পথে প্রথম অগ্রসর হচ্ছে। তাদের বুদ্ধি অপরিপক্ব, যুক্তি অপরিণত। পরিণত বয়স্করা যেভাবে তাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধির দ্বারা যুক্তিভিত্তিক বিষয় অনুধাবন করতে পারেন, শিশুমন সেভাবে একই সত্য ও বিমূর্ত বিষয়কে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই যুক্তিনির্ভর-প্রক্রিয়া পরিণতদের উপযোগী; শিশু বা অপরিণত বালক-বালিকার জন্য এ-পদ্ধতি মোটেই কার্যকর নয়।

যুক্তিনির্ভর পদ্ধতি বয়স্ক চিন্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

রুশোর পর থেকে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হল শিশুর দিকে। শিশু কি চায়, শিশু কি পারে—শিশুর ইচ্ছা, অনিচ্ছা, রুচি-অভিরুচি, আগ্রহ, প্রবণতা, সামর্থ্য ইত্যাদি ক্রমে শিক্ষাপ্রসঙ্গে প্রাধান্য পেল। তাই

আধুনিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় জ্যামিতি শিক্ষা দেওয়ার সময় আর শিশুকে মুখস্থ করতে পীড়াপীড়ি করা হয় না। শিশুকে আবিষ্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে দেওয়া হয়। তার হাতে দেওয়া হয় জ্যামিতি শেখার সহায়ক উপকরণ। উপকরণগুলিকে পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ, অঙ্কন, পার্থক্য, সামঞ্জস্য নিরূপণ করে তাকে সত্যের সন্ধান করতে বলা হয় অথবা বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে প্রমাণ করতে বলা হয়। শিক্ষার্থীকে স্বীয় সাধ্য, সামর্থ্য অনুসারে সক্রিয় হয়ে বারে বারে ভুল ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এসবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে ক্রমশঃ যুক্তিধর্মী গুণের বিকাশ হতে থাকে। স্বীয় প্রচেষ্টায় ও যুক্তিতে ক্রমশঃ সে শিক্ষালাভে অগ্রসর হয়। শিক্ষার্থীর এই প্রচেষ্টায় শিক্ষক মাত্র তার সহায়কের ভূমিকা পালন করেন। বস্তুতঃ, যুক্তিভিত্তিক ধারার এটাই হল সার কথা। পরিণত চিন্তা থেকে উদ্ভূত যুক্তির ওপর গুরুত্ব না দিয়ে শিক্ষার্থীর ক্রমবিকাশমান বুদ্ধি ও যুক্তির ওপর প্রাধান্য দেওয়াই হল আধুনিক যুক্তিভিত্তিক প্রক্রিয়ার মর্মবাণী।

শিশু-কেন্দ্রিকতার দিকে যুক্তিভিত্তিক পদ্ধতি

(২) **যৌক্তিক প্রক্রিয়ার দুটি বিশেষ ধারা** (Two Distinct Streams of Logical approach) : যৌক্তিক বা তর্কশাস্ত্রসম্মত ধারায় শিক্ষাদানের দুটি ধারা বিদ্যমান—যথা, **আরোহী** (Inductive) ও **অবরোহী** (Deductive) প্রক্রিয়া। তর্কশাস্ত্রে বিশেষ সত্য থেকে সাধারণ সত্যে পৌঁছানোকেই বলা হয় আরোহ (Induction) এবং সাধারণ সত্য থেকে বিশেষ সত্যে পৌঁছানোকে বলা হয় অবরোহ (Deduction)। অবরোহী ও আরোহী প্রক্রিয়ার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল যথাক্রমে সাধারণ থেকে বিশেষ (From general to particular) এবং বিশেষ থেকে সাধারণে (From particular to general) যাওয়া।

আরোহ ও অবরোহ প্রক্রিয়া

আরোহী প্রণালীতে প্রথমে সংগৃহীত কতকগুলি দৃষ্টান্তকে ভাল করে পরীক্ষা করা হয়; পরে যুক্তির সাহায্যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা সূত্র গঠন করা যায়। পক্ষান্তরে **অবরোহী প্রণালীতে** প্রথমে সাধারণ সূত্রটিকে তুলে ধরা হয়। পরে সেই সূত্রের সত্যতা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ-কর্ম পরিচালনা করা হয় এবং নানা দৃষ্টান্ত সহযোগে ঐ সূত্রের সত্যতা যাচাই করা হয়।

অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত থেকে উক্ত দুটি প্রণালী সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। যেমন, রামের মৃত্যু হয়েছে, রহিমের মৃত্যু হয়েছে, হরির মৃত্যু হয়েছে, টমির মৃত্যু হয়েছে। তাহলে সকলেরই মৃত্যু হয়। সুতরাং 'সকল মানুষ মরণশীল'—এ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। এভাবে বিশেষ থেকে সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে তর্কশাস্ত্রে আরোহী প্রক্রিয়া বলা হয়; আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রথমেই আমরা সত্য (Truth), তত্ত্ব (Theory) বা সিদ্ধান্তটিকে (Conclusion) প্রকাশ করতে পারি। যেমন, 'সকল মানুষ মরণশীল'। রহিম একজন মানুষ, সুতরাং রহিম মরণশীল। এভাবে সূত্র অনুসারে সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সত্যে পৌছানোকে বলা হয় অবরোহী প্রক্রিয়া।

পূর্বোক্ত দুটি প্রক্রিয়ার চলতি দৃষ্টান্ত

শিক্ষণ-প্রসঙ্গে পাঠ্যবিষয় থেকে এরূপ দৃষ্টান্ত রাখা যায়। ধরা যাক, শ্রেণীকক্ষে শেখানো হবে 'বিশেষ্য পদ প্রকরণ'। এক্ষেত্রে শিক্ষক কৌশলে শ্রেণীকক্ষে দৃষ্টিগ্রাহ্য কি কি সামগ্রী এবং ব্যক্তি আছে তা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে—টেবিল, চেয়ার, ব্ল্যাকবোর্ড, বালক-বালিকা, বেয়ারা প্রভৃতি। এবার শিক্ষক প্রশ্নের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করতে পারেন যে কোন কিছুর নাম বুঝালে বিশেষ্য পদ হয়। এটাই হবে বিশেষ্য পদের সংজ্ঞা। এবার শিক্ষক কৌশলে প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে পাওয়া সামগ্রী বা ব্যক্তির নামগুলিকে শ্রেণীবিভাগ করতে পারেন। বিশেষ বিশেষ যুক্তির ওপর নির্ভর করে নিশ্চয়ই শ্রেণীবিভাগ করা হবে। নাম-গুলির কোনটি ব্যক্তি সম্পর্কিত, কোনটিইবা বস্তু সম্পর্কিত নামের তালিকাভুক্ত হবে। যে যে যুক্তিতে শ্রেণীবিভাগ করা হল সেই যুক্তিই হবে শ্রেণীর নাম। যেমন, যার দ্বারা কোন এক ব্যক্তির নাম বুঝায় তাকে ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য বলা হয়, দৃষ্টান্ত—রাম, শ্যাম, যদু ইত্যাদি। এভাবে প্রতিটি বিশেষ্য পদের সাধারণী-করণ বা সংজ্ঞা-প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। একে বলা হয় আরোহী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বুদ্ধি ও চিন্তা প্রয়োগের দিক থেকে অনেকখানি সক্রিয়।

পাঠ্যবিষয় ও আরোহী প্রক্রিয়া

আবার অবরোহী-প্রক্রিয়া প্রয়োগে প্রথমেই শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেওয়া হল বিশেষ্য পদ কাকে বলে। দ্বিতীয় স্তরে জানানো হল বিশেষ্য পদকে কয়টি ও কি কি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রতিটি শ্রেণীর সংজ্ঞা দেওয়ার পর দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করা যায়। এইভাবে শিক্ষক যৌক্তিক বা তর্কশাস্ত্র-

সম্মত উপায়ে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে পারেন। এখানে শিক্ষার্থীর চিন্তা করার বিশেষ কিছু থাকে না। শিক্ষার্থী এখানে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা মাত্র। অন্যের যুক্তিপূর্ণ বিষয়গুলি সে শুধু শোনে ও মনে রাখার চেষ্টা করে। নিজ প্রচেষ্টা প্রয়োগের সুযোগ এখানে নেই বললেও চলে।

জ্যামিতি শাস্ত্র থেকে আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ধরা যাক শিক্ষার্থী ত্রিভুজ অঙ্কন ও বাহুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে জানে। এটি তার পূর্ব অভিজ্ঞতা। শ্রেণীকক্ষে প্রথমে কয়েকটি ত্রিভুজ অঙ্কন করে বাহুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে বলা হল। দ্বিতীয় বারে বাহুর দৈর্ঘ্য-পরিমাণ(পূর্ব-নির্দিষ্ট) দিয়ে ত্রিভুজ অঙ্কন করতে বলা হল। কৌশলে শিক্ষার্থীদের কর্মের ফল হিসেবে তাদেরকেই দেখানো হল প্রতিটি ক্ষেত্রে দুটি বাহুর দৈর্ঘ্যের যোগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর। এরপর শিক্ষার্থীদের বলা হল, এমন একটা ত্রিভুজ অঙ্কন কর যার দুটি বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য অপেক্ষা ছোট। শিক্ষার্থীরা বার বার চেষ্টা করেও তেমন ত্রিভুজ অঙ্কন সম্ভব করে তুলতে পারল না। তখন বিশেষ সত্য (Truth) বা তত্ত্বটিকে (Theory) প্রকাশ করা হল। 'যে কোন ত্রিভুজের দু-বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু থেকে বৃহত্তর'। এভাবে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় প্রচেষ্টার সুযোগ দিয়ে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সত্যকে প্রকাশ করা —বা সিদ্ধান্তে পৌছানোকে আরোহী প্রক্রিয়া বলা হয়।[1]

অন্য একটি দৃষ্টান্ত
(আরোহী প্রক্রিয়া)

অবরোহী প্রক্রিয়ায় সাধারণ সত্যটিকে প্রকাশ করে পরে বিশেষ সত্যে পৌছানো যায়। এখানে যুক্তিবিজ্ঞান অনুসারে ত্রিভুজ অঙ্কন ও প্রমাণাদির দ্বারা পুনরায় সাধারণ সত্যে পৌছাতে হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সক্রিয় প্রচেষ্টার বিশেষ সুযোগ থাকে না।

আপাতদৃষ্টিতে আরোহী ও অবরোহী প্রক্রিয়ার মধ্যে বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এর কোন একটি প্রক্রিয়া দ্বারা চূড়ান্ত সত্য আবিষ্কার করা যায় না। পাঁচটি ত্রিভুজের বাহুর মাপ নিয়ে যে সত্যটুকু জানা গেল শতখানেক ত্রিভুজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে সে সত্যের ব্যতিক্রম ঘটবে কি না—সন্দেহ থেকে যায়। এই সন্দেহ প্রকট হয়ে ওঠে

---

1. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—The inductive method is the best method of Training children to think for themselves. But they must be allowed and encouraged to carry out the process themselves.—*M. W. Ryburn*

সেসব পাঠ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে যেসব পাঠ্যবিষয় মানুষ ও তার সমাজের সঙ্গে বিশেষভাবে অন্বিত; যেমন, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, মানবিক ভূগোল প্রভৃতি। তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে আরোহ ও অবরোহ উভয় প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত। সাধারণ থেকে বিশেষ এবং বিশেষ থেকে সাধারণ উভয় প্রক্রিয়া চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হতে সাহায্য করে। আরোহী ও অবরোহী প্রক্রিয়াকে পৃথক পৃথক সম্পর্কহীন বিবেচনা করা মোটেই উচিত নয়। শিক্ষণ-পদ্ধতি হিসেবে একই পাঠে উভয়ের যুগপৎ ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রসূ।[1] এই প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ্ জন মার্শাল প্রদত্ত উপমাটি প্রণিধানযোগ্য। চলতে গেলে বাম ও ডান পা দুটির কোনটিকে বাদ দেওয়া যায় না; তেমনি শিক্ষার গতিশীলতার জন্য আরোহ ও অবরোহের যুগপৎ প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রসূ।[2]

উভয় প্রক্রিয়া চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হতে সাহায্য করে

অরোহ ও অবরোহ প্রক্রিয়া অথবা এক কথায় তর্কশাস্ত্রসম্মত যৌক্তিক পদ্ধতি মূলতঃ উন্নত মানসিক প্রক্রিয়াপ্রসূত। **শিক্ষার্থীরা যতদিন বিচার-বুদ্ধি বিকাশের বয়সে** (Age of realisation) **উপনীত না হচ্ছে ততদিন যৌক্তিক পদ্ধতি তাদের কাছে মোটেই ফলপ্রসূ নয়।** কারণ, **প্রথমতঃ**, শিক্ষার বিষয়বস্তুর জটিল ও ব্যাপক পরিধির জন্যে আমরা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ভাগ করি; আবার এই পুস্তকাদিকেও গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদিতে শ্রেণীবিভাগ করি। এরূপ শ্রেণীবিভাগ বয়স্ক মনের বুদ্ধি-বিচার ও যুক্তিসম্মত; কিন্তু এগুলি শিশুমনের বোধগম্য নাও হতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ**, যৌক্তিক প্রক্রিয়া কতকগুলি অনুক্রম (Order), ধাপ (Step) এবং মৌলিক নীতি (Fundamental principles) অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়। শিশুমন এগুলিকে অনুধাবন ও অনুসরণ করার সামর্থ্য অর্জন করে না। **তৃতীয়তঃ**, তর্কশাস্ত্রসম্মত উপায়ে পুস্তকাদি ও বিষয়বস্তুর শ্রেণী বিভাজন সামগ্রিক ও অখণ্ড জ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড করে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করে। কিন্তু অপরিণত মানসিক স্তরে এধরনের কোন শ্রেণীবিভাগ নেই।

তর্কশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি শিশুমনের অনুকূল নয়

---

1. Tne Principles of Teaching—*Ryburn*, P. 56.
2. শিক্ষণ-প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান—হালদার, পৃঃ ১২৩।

তাই এরূপ শ্রেণীবিভাজন মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। শিশু-মনস্তত্ত্বের বিচারে, যে শিক্ষাদান-পদ্ধতি শিশুমনের স্বাভাবিক গতিকে অনুসরণ করে না সেখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য।[1] অতএব শিক্ষার্থীর মানসিক স্তরে বিচার-বুদ্ধি বিকাশের (সাধারণত আট-দশ বছর বয়সের) পূর্বে যৌক্তিক ধারা প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নয়। অপরিণত শিক্ষার্থীদের জন্য মনোবিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া বিশেষ ফলপ্রসূ।

(৩) **মনোবিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া** (Psychological approach) : শিশুমনের বৃদ্ধি (growth) ও বিকাশের (development) ওপর ভিত্তি করে মনস্তত্ত্বভিত্তিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত। রুশো কর্তৃক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাতত্ত্ব প্রকাশের পর দুনিয়ার শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিশু। শিশুর দেহ-মন বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্তরে স্তরে বিকশিত ও বর্ধিত হয়। সেপূর্ণ বিকাশ-প্রাপ্ত হয় বয়ঃসন্ধিক্ষণের পর। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, মানবশিশুর মস্তিষ্কের কোষগুলির পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য প্রায় ২৩ বছর প্রয়োজন হয়। তাই শিশুকে কখনও প্রাপ্ত বয়স্কের স্তরে রেখে বিচার করা চলে না। শিশুর দেহ-মনের বিকাশের ক্রম অনুসারে শিক্ষাদান করার প্রণালীকে বলা হয় মনস্তাত্ত্বিক বা মনোবিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থীর মন যখন যুক্তিগ্রহণ করতে পারবে তখনই যুক্তিভিত্তিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা চলে। তার পূর্বাবধি মনোবিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া বিশেষ ফলপ্রসূ।

শিশুমনের বৈশিষ্ট্য মনোবিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার ভিত্তি

প্রসঙ্গতঃ, শিশুমনের বিবর্তন-ক্রমকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি। মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুমন তিনটি স্তরে পরিণতি লাভ করে, যথা—(১) বিস্ময়ের বয়স (Age of wonder), (২) উপযোগ বোধগম্যের বয়স (Age of understanding utility) এবং (৩) যুক্তি-বিচারের বয়স (Age of rationalization)। **প্রথম স্তরে** শিশু-মন বিস্ময়ে ভরপুর থাকে। বিশ্বের সব কিছু তার কাছে বিস্ময়ের বস্তু। এটা কি, ওটা কি--ইত্যাদি বিষয় সে কেবল বুঝতে চায়, জানতে চায়। **দ্বিতীয় স্তরে** 'কেন'—এর বিচার শিশুর কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। কেন লিখবো, কেন পড়বো, কেন যাবো—ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর সে

শিশুমনের স্তর বিন্যাস ও শিক্ষণ প্রক্রিয়া প্রয়োগ

1. শিক্ষাতত্ত্ব—জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায়, পৃঃ ১৪০।

খোঁজে। এই স্তরের প্রথম দিকে বিস্ময়ের ভাব কিছু থাকে, শেষ দিকে শিশু বিস্ময়টিকে প্রায় সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠে। **তৃতীয় স্তরে** শিশুরমন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করতে চায়। কোন কিছুকে অন্ধভাবে অনুকরণ করতে সে চায় না। তাই শিশুমন যখন প্রথমোক্ত দুটি স্তরে অবস্থান করে তখন মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। তৃতীয় স্তরে মনস্তাত্ত্বিক ও যুক্তিভিত্তিক প্রক্রিয়াদ্বয়ের যুগপৎ প্রয়োগ প্রকৃত বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়ারূপে অভিব্যক্ত।

মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে **নিম্নোক্ত বিশেষ বিষয়গুলি স্মরণ করা যেতে পারে :**

(ক) মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া শিশুমনের প্রবণতা বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইন্দ্রিয়গত অবস্থা থেকেই শিশুমন প্রত্যয়ধর্মী বা যুক্তিশীল হয়ে ওঠে। 'ইন্দ্রিয়ানুশীলন ও মূর্ত চিন্তার (Concrete thinking) মাধ্যমে সে বিমূর্ত চিন্তায় (abstract thinking) অভ্যস্ত হয়।

(খ) তাই একে শিশুমনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-অভিরুচি, প্রবণতা ও সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োগ করতে হয়। 'গতানুগতিক শিক্ষায় শিশুকে বিমূর্ত চিন্তার অধিকারী যুক্তিশীল মানব বলে বিবেচনা করা হত। আধুনিক শিক্ষায় শিশুকে শিশু বলেই গণ্য করা হয়—।' তাই আধুনিক মনোবিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি শিশুমনের স্বাভাবিক গতি ও প্রবণতাকে অনুসরণ করে।

(গ) খেলা, কর্মকেন্দ্রিকতা, সক্রিয়তাই হল এ-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষকের ভূমিকা গৌণ, তিনি শিশুর শিক্ষালাভের সহায়ক মাত্র। শিশু নিজেই এ শিক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। শিশুকে ইন্দ্রিয়ানুশীলন ও নানা কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে সক্রিয় করে তোলাই আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য। তাই আধুনিক শিক্ষায় খেলাভিত্তিক শিক্ষা, কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা, প্রত্যক্ষ উপকরণের সহযোগিতায় শিক্ষা প্রভৃতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

(ঘ) মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতানির্ভর। অপরিণত শিশুমন অমূর্ত ধারণা বা নীতিগত কথা সহজে অনুধাবন করতে পারে না। দেশপ্রেম, ভগবৎভক্তি, অধ্যবসায়, আনুগত্য—ইত্যাদি অমূর্ত ধারণা শিশুর কাছে মূল্যহীন। দ্বিতীয়তঃ, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে আছে পুরাতন অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা ও নতুন তথ্য সংগ্রহ। মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি হল পুরাতনের পথ ধরে নতুনের দিকে অগ্রগমন। তাই এই পদ্ধতিতে মূর্ত থেকে

বিমূর্ত (Concrete to abstract), জানা থেকে অজানা (Known to unknown), সহজ থেকে জটিল (Simple to Complex) ইত্যাদি মূলনীতি-গুলি (Maxims) গৃহীত।

(ঙ) শিক্ষার্থীর মানসিক স্তর বিচারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়স্তরের শিক্ষণে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক বা মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া বিজ্ঞানসম্মত উপায়।

(৪) **যুক্তিভিত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সম্পর্ক** (Relation between Logical and Psychological approaches) : যুক্তিভিত্তিক প্রক্রিয়া এবং মনস্তত্ত্বভিত্তিক প্রক্রিয়ার মধ্যে যে সম্পর্কে রয়েছে তাকে উপলব্ধি করা শিক্ষকের প্রাথমিক কর্তব্য। অন্যথায় উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন ও প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর মনে দ্বিধার সৃষ্টি হতে পারে।

প্রথমতঃ, সংজ্ঞার দৃষ্টিকোণ থেকে **উভয়ের মধ্যে পার্থক্য** লক্ষ্য করা যায়। (ক) শিক্ষাদানের সময় পাঠ্যবিষয়বস্তুকে যদি তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী বিন্যস্ত করি ও শ্রেণীবিভাগ করি তবে সে শিক্ষাদান-পদ্ধতিকে যুক্তিভিত্তিক বা তর্কশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি বলা হয়। (খ) পক্ষান্তরে শিশুমনের আগ্রহ, প্রবণতা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও সামর্থ্যকে প্রাধান্য দিয়ে যে শিক্ষণ-পদ্ধতি অনুসরণ করি তাকে বলা হয় মনস্তাত্ত্বিক বা মনো-বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।

সজ্ঞার দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্য

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাবিদ্ রুশো কর্তৃক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষতত্ত্ব ঘোষণার পর শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্রা মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তার পূর্বে যুক্তিভিত্তিক পদ্ধতির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাই সাধারণভাবে বলা হয় যুক্তিভিত্তিক পদ্ধতি প্রাচীন শিক্ষাধারার সঙ্গে এবং মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষাধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

ঐতিহাসিক কাল বিচারে পার্থক্য

তৃতীয়তঃ, যুক্তিভিত্তিক পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর ওপর এবং মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে শিশুমনের ওপর প্রধান্য দেওয়া হয়। যৌক্তিক পদ্ধতিতে আমরা পাঠ্যতালিকার শ্রেণীবিভাগ করি এবং পাঠ্যবিষয়বস্তুকেও বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত অনুক্রমে বিন্যস্ত করি। এই পদ্ধতিতে মূলতঃ লক্ষ্য করা হয় পাঠ্যবস্তু তর্কশাস্ত্রসম্মত উপায়ে সাজানো হল কিনা এবং যুক্তিপূর্ণ উপায়ে শিক্ষার্থীর নিকট পরিবেশন করা হচ্ছে

গুরুত্ব আরোপের দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্য

কিনা। পক্ষান্তরে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর শিক্ষা-প্রবণতা, সামর্থ্য, আগ্রহ, গ্রহণ-ক্ষমতা, ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও পরিবেশন যুক্তিপূর্ণ হোক আর না হোক শিক্ষার্থী তার মানসিকতা অনুসারে শিক্ষালাভ করছে কিনা—এটাই হল লক্ষণীয় বিষয়।

চতুর্থতঃ, যুক্তিধর্মী পদ্ধতিতে শিক্ষকের প্রভুত্বভিত্তিকতা বেশী। এখানে শিক্ষক স্বীয় বয়স্কমনের বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি যুক্তিসঙ্গত উপায়ে বিষয় পরিবেশন করেন। তাই স্বভাবতই এ পদ্ধতি বক্তৃতার মাধ্যমে বিমূর্ত ধারণা-নির্ভর হয়ে প্রতিভাত হয়। পক্ষান্তরে, মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে শিশুমনের স্বাভাবিকতা ও বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিতে হয়। শিশু সর্বদা চঞ্চল। সে আনন্দঘন খেলাধূলা ও আকর্ষণীয় সক্রিয়তাকে পছন্দ করে। শিশুমনের স্বাভাবিকতার ওপর নির্ভর করার অর্থ হল তার বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করা। তাই মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি হল কর্মকেন্দ্রিক, শিশুর সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতানির্ভর। স্বভাবতই এ পদ্ধতি ইন্দ্রিয়নির্ভর ও প্রত্যক্ষধর্মী।

শিক্ষকের প্রভুত্ব ভিত্তিকতা ও শিশুর স্বাভাবিকতার বিচারে পার্থক্য

অবশেষে বলা যায়, শিক্ষার্থীর মন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের বা যুক্তিবিন্যাসের উপযোগী হলে যৌক্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা চলে। তাই এই পদ্ধতি উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত। পক্ষান্তরে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দেহ-মন ক্রমিক বৃদ্ধি ও বিকাশের স্তরে থেকে যায়। এ সময় তাদের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা পরিপক্ক হয় না। তাই বিদ্যালয় স্তরে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-স্তরের বিচারে পার্থক্য

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে যৌক্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াদ্বয়ের উপরিতল-গত বিরোধটুকু সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। **বাস্তবক্ষেত্রে এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই**; বরং এরা পরস্পরের পরিপূরক। কারণ—প্রথমতঃ, পরিণত বয়স্ক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে যুক্তিভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগের কথা বলা হয়। পরিণত শিক্ষার্থীর মন যুক্তি দিয়ে কোন কিছু গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং এই যৌক্তিক পদ্ধতি পরিণত শিক্ষার্থীদের নিকট মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি। আবার শিশুমন যুক্তি বোঝে না। তাকে শিক্ষাদান করতে হলে তার আগ্রহ, প্রবণতা, সামর্থ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে পদ্ধতি প্রয়োগ করতে

পদ্ধতিদ্বয় পরস্পরের পরিপূরক

হয়। আমরা একে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি বলি। মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতিও মূলতঃ যুক্তির ওপর নির্ভরশীল—সে যুক্তি হচ্ছে শিশুমনের যুক্তি। শিক্ষক শিশুমনের ধর্মকে মেনে নিয়ে শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন, অন্যথায় বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিশুমনের সন্নিকর্ষ স্থাপিত হবে না। সুতরাং মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতিও শিশুমনের স্বাভাবিকতা অনুসারে যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর মন বর্তমানে যে অবস্থায় আছে তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে পদ্ধতি প্রয়োগ করলে সেটাকে মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া বলা হয়। আর আগামী দিনে শিক্ষার্থীর মনের অবস্থা কি হবে তার ওপর গুরুত্ব আরোপ কবলে যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। বর্তমান দিনের মন ও আগামী দিনের মনের বিভাজনের জন্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। তাই উভয়ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বসম্মত উপায়ে যুক্তি প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত। এক কথায়, শিক্ষার্থীর প্রেরণা, ইচ্ছা, আগ্রহ, সামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে সেটাই হবে যুক্তিভিত্তিক। সুতরাং উভয়ের মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে বিরোধ লক্ষ্য করা গেলেও যৌক্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি পরস্পরের পরিপূরক এবং পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, আধুনিক কালে যত প্রগতিশীল ও সার্থক পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে সবই যুক্তি ও বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তাই আমরা আধুনিক গতিশীল শিক্ষণ পদ্ধতিগুলিকে যুক্তি ও বিজ্ঞান ভিত্তিক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

———

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের একক

(Units for Application of Teachnig Methods)

অধ্যায় পরিচয়ঃ আলোচ্য বিষয়টি সিলেবাসের বহির্ভূত বলে মনে হবে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই জানা যায়, পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন হয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা এককের। আমরা সাধারণতঃ শ্রেণীকক্ষকে একক ধরি এবং সেখানে শ্রেণীর উপযোগী পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করি। এর দ্বারা ব্যক্তিসত্ত্বা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করা হয়। তাই বড় একটা শ্রেণীকে ছোট ছোট দলে পরিণত করে শিক্ষাদান করি। এছাড়া ব্যক্তির স্বকীয়তাকে পরিপূর্ণমাত্রায় স্বীকার করার জন্য ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষাদানের উপযোগী পদ্ধতি প্রয়োগ করি। তাই ইউনিট বা একককে তিনটি স্তরে ভাগ করেছি, যথা—(১) শ্রেণী শিক্ষণ, (২) দলগত শিক্ষণ এবং (৩) ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণ। প্রতিটি এককের তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অবশেষে একক হিসেবে প্রচলিত ও নবরূপে উদ্ভূত আধুনিক পদ্ধতিগুলিকে শ্রেণী-বিভক্ত করার চেষ্টা করেছি।

শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করেই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণ-পদ্ধতির উদ্ভব। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিকতার অর্থ হল, তার আগ্রহ, প্রবণতা, বুদ্ধির পরিমাপ, দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশকে ভিত্তি করে পদ্ধতি প্রয়োগ করা। কিন্তু মানসিকতার বিচারে সকল শিক্ষার্থী সমান নয়। আবার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ও পরিবেশে শিক্ষার্থীর মানসিকতা ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা চরিত্র পরিগ্রহ করে। পৃথকভাবে অবস্থানরত শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত মানসিকতা এক ধরনের। কিন্তু শ্রেণীকক্ষে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন একত্রে অবস্থানরত একই শিক্ষার্থীর মানসিকতা ভিন্ন ধরনের। শ্রেণীকক্ষে সমষ্টিগত প্রভাব ব্যক্তির স্বকীয়তার ওপর ক্রিয়াশীল। আবার একই শ্রেণীকক্ষে বা কোন নির্দিষ্ট পরিবেশে একাধিক শিক্ষার্থীকে নিয়ে গঠিত দলে কর্মরত অবস্থায় ঐ একই শিক্ষার্থীর ভিন্ন চরিত্রের মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত, দলগত ও সমষ্টিগত মানসিকতার ভিন্নতাকে স্বীকার করে শিক্ষাদান কর্ম সম্পাদন করতে হয়। তাই শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার পূর্বে শিক্ষণের একক (units for application of methods) বা ক্ষেত্র সম্পর্কে সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণী-শিক্ষণের (Class-room Instruction) বহুল প্রচলন দেখা যায়। এটাই হল পদ্ধতি প্রয়োগের

প্রাথমিক একক বা ক্ষেত্র। পরিপূর্ণ একটি শ্রেণীকে ভেঙ্গে আমরা ছোট ছোট গোষ্ঠী বা দল তৈরি করে পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারি। এই দ্বিতীয় স্তরের এককটিকে বলা যেতে পারে যৌথ বা দলগত শিক্ষণ (Group Instruction)।

যৌথ-শিক্ষণের অর্থ হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিকে বা মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণের দিকে শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে অনেকখানি গতিশীল করা। এর দ্বারাও ব্যক্তির পরিপূর্ণ প্রয়োজন মিটতে পারে না। তাই পদ্ধতি প্রয়োগের তৃতীয় এককটি হল ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণ (Individualised Instruction)। এক্ষণে একক-গুলির পূর্ণ আলোচনা পরপর দেওয়া হল :

১। শ্রেণী-শিক্ষণ (Class-room Instruction) :

শ্রেণী-শিক্ষণ কাকে বলে ?

জাতীয় স্তরে শিক্ষার সম্প্রসারণের ফলশ্রুতি স্বরূপ বিদ্যালয় ও প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সমপ্রায় মানসিকতাসম্পন্ন বহু সংখ্যক (প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন) শিক্ষার্থীকে নিয়ে বিদ্যালয়ে একাধিক শ্রেণী (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ইত্যাদি) গঠন করা হয়। ছাত্রসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে এক একটি শ্রেণীকে (যেমন—৯ম শ্রেণী) ভেঙ্গে দুই বা ততোধিক বিভাগ (যেমন—৯ম 'ক', ৯ম 'খ' ইত্যাদি) তৈরি করা হয়। এরূপ যে-কোন শ্রেণীকে একক ধরে শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করাকে শ্রেণী শিক্ষণ বলা হয়।

শ্রেণী-শিক্ষণের ঐতিহাসিক ভিত্তি

মানব সভ্যতার সূত্রপাত ও প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অতি প্রাচীনকালেই শুরু হয়েছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা। আদিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। বৈদিক যুগের প্রথম পর্বে গুরুগৃহে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীদের ওপর নজর রাখা হত। ক্রমশঃ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণ হ্রাস পেল। ফলে গড়ে উঠলো শ্রেণী শিক্ষাব্যবস্থা। নালন্দা ও সমসাময়িক অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণী-শিক্ষণের ব্যবস্থা দেখতে পাই। আধুনিককালে বিদ্যালয় ও ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শ্রেণী-শিক্ষণ একপ্রকার অপরিহার্য ব্যবস্থারূপে পরিগণিত। শিক্ষা আজ জাতীয় স্তরে সম্প্রসারিত। সার্বজনীনতার তত্ত্ব অনুসারে সকলকেই শিক্ষা লাভ করতে হবে। পক্ষান্তরে পূর্বের তুলনায় জনসংখ্যাও দিনে দিনে বৃদ্ধি

পাচ্ছে। ফলে, বিদ্যালয়ের এক একটা শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণও সম্ভব নয়। সুতরাং শ্রেণীগত শিক্ষণ-ব্যবস্থার বহুল প্রচলন ছাড়া গত্যন্তর নেই।

শ্রেণী সংগঠনের প্রাথমিক ভিত্তি হল শিক্ষার্থীর মানসিকতা ও বয়স। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, বুদ্ধি-প্রবণতা ও আগ্রহের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সমপ্রায় মানসিকতা ও সমবয়সের শিক্ষার্থীদের নিয়ে শ্রেণী গঠিত হয়। প্রতিটি শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত হয় প্রয়োজনীয় পাঠক্রম। সমশ্রেণীর শিক্ষার্থীরা একই বিষয়ের পাঠ অনুসরণ করে। সমপ্রায় মানের শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ পাঠক্রম শেষ করে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ও পরবর্তী পাঠক্রম অনুসরণ করে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হেতু একই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফল হয় ভিন্ন ভিন্ন। দেখা গেছে এক-একটা শ্রেণীতে তিন ধরনের মেধাবিশিষ্ট শিক্ষার্থীর সমাবেশ, যথা—উন্নত, সাধারণ ও ক্ষীণ-মেধাবিশিষ্ট। এদের মধ্যে কোন এক স্তরের ওপর বিশেষ লক্ষ্য নিবদ্ধ করলে অন্য দুটি স্তরের শিক্ষার্থীরা অবহেলিত হয়। আবার সাধারণ বা মাঝারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে পাঠক্রমের ওপর গুরুত্ব আরোপ করলে উন্নত ও ক্ষীণ মেধা-বিশিষ্ট শিক্ষার্থীরা অবহেলিত হয়।

শ্রেণী সংগঠনের ভিত্তি

শিক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্য ঘটলে উক্ত তিন স্তরের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক, খ, গ—এই তিনটি বিভাগ স্থাপন করা চলে। এর দ্বারা আবার শিক্ষার্থীদের মানসিক ভাবসাম্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ক বিভাগের শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে উন্নত স্তরের বলে চিন্তা করে, আর খ ও গ বিভাগের শিক্ষার্থীরা হীনমন্যতা রোগে ভোগে। ফলে, শিক্ষার লক্ষ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পাঠ্যসূচীর বিচারে কোন শিক্ষার্থী অঙ্কে ভাল কিন্তু ইতিহাসে কাঁচা। সুতরাং মানসিকতার বিচারে শ্রেণী সংগঠনে অনেক সমস্যা ও ত্রুটি থেকে যায়। অপরিবর্তনীয় (rigid) শ্রেণী-সংগঠন প্রথায় এরূপ ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়।

ডাল্টন প্লানে* শ্রেণী-সংগঠনের মধ্যে অনেক স্বাধীনতা আছে। সেখানে পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীর দক্ষতার মান অনুসারে একজন শিক্ষার্থী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষালাভ করতে পারে। তবে লক্ষ্যণীয় যে, এখানে ডাল্টন প্রথার মূলত্রুটিগুলি বিদ্যমান থাকে। ঐ ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করে আধুনিক যুক্তিপূর্ণ উপায়ে শ্রেণী সংগঠন ও পদ্ধতি ব্যবহার করলে অনেক উন্নত ধরনের ফল পাওয়া যায়।

* পরবর্তী অধ্যায়ের ডাল্টনপ্লান দ্রষ্টব্য।

এছাড়া আমাদের দেশের শ্রেণী-সংগঠন পদ্ধতিকে প্রয়োজনভিত্তিতে মার্জিত করা যায়। যেমন, প্রতিটি শ্রেণীকে কয়েকটি উপশ্রেণী বা টিউটোরিয়্যাল ক্লাশে বিভক্ত করে অতিরিক্ত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করলে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিষয়ে অনগ্রসরতা দূর করা যায়।

শ্রেণী-শিক্ষণের সামগ্রিক সুবিধা (Total Advantages of Class-room Instruction): শ্রেণী-শিক্ষণের মধ্যে নিম্নরূপ সুবিধাগুলি বিদ্যমান থাকায় এরূপ শিক্ষণের বহুল প্রচলন লক্ষ্য করা যায়:

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণে বিদ্যালয় ও ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাংগঠনিক বিচারে **প্রথমতঃ** বলা যায়, অল্পসংখ্যক শিক্ষকের দ্বারা অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা শ্রেণী-শিক্ষণের-দ্বারাই সম্ভব। **দ্বিতীয়তঃ**, আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতিতে বিদ্যালয় গৃহের স্থান, শিক্ষার উপকরণ, আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি অপরিহার্য। এসবের জন্য অর্থব্যয়ও হয় প্রচুর। বিদ্যালয়ের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে। শ্রেণী-শিক্ষণে একত্রে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীকে অল্প পরিসরে সীমিত উপকরণের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যায়। তাই এই প্রথা যথেষ্ট ব্যয় সংক্ষেপকর।

সাংগঠনিক বিচারে সুবিধা

শিক্ষাদান-কর্ম পরিচালনার বিচারে **প্রথমতঃ**, শ্রেণী-শিক্ষণ দ্বারা শিক্ষকের পরিশ্রম কমে। কারণ একত্রে তিনি বহু শিক্ষার্থীকে সামনে রেখে শিক্ষণ-পদ্ধতি পরিচালনা করতে পারেন। **দ্বিতীয়তঃ**, শ্রেণী-শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক ব্যক্তি-বিকাশের দিকেও অংশতঃ নজর দিতে পারেন। একই শ্রেণীতে শিক্ষাদানের জন্য যেমন তিনি সকলকে শিক্ষা-দানের অনুকূল পদ্ধতি (বক্তৃতা, বর্ণনা, আলোচনা ইত্যাদি) প্রয়োগ করতে পারেন, তেমনি ব্যক্তিসত্তা ও যৌথসত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি (যেমন—কর্মভিত্তিক পদ্ধতি, প্রকল্প, সমস্যা, প্রশ্নোত্তর, অবেক্ষণ, পাঠচর্চা প্রভৃতি) গ্রহণ করতে পারেন। **তৃতীয়তঃ**, শ্রেণীতে একত্র উপস্থিত থাকার দরুণ শিক্ষার্থীরা জ্ঞানীগুণী ও দক্ষ শিক্ষকের সান্নিধ্য পায়। পক্ষান্তরে কৌশলী শিক্ষক স্বীয়গুণে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হওয়ার সুযোগ পান।

শিক্ষকের কর্ম পরিচালনার বিচারে সুবিধা

শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রয়োজনেই শিক্ষাব্যবস্থা। শ্রেণী-শিক্ষণে শিক্ষার্থীরা বাঞ্ছনীয় প্রয়োজন মেটাতে অংশত: সমর্থ হয়। আজকের শিক্ষার্থীরাই হবে ভাবী

রাষ্ট্রের সুনাগরিক এবং সমাজের আদর্শ সভ্য। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন হল সমষ্টিগত জীবনধারা। শ্রেণী-শিক্ষণে শিক্ষার্থীরা **প্রথমতঃ**, এই সমষ্টিগত জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার সুযোগ পায়। **দ্বিতীয়তঃ**, সমষ্টিগত জীবনে কতকগুলি গুণের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য; যেমন—সহযোগিতা, স্বার্থহীনতা, পরমসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক বুঝাপড়া, পারস্পরিক সহানুভূতি, দায়িত্ব ও কর্তব্যপালন ইত্যাদি। শ্রেণীগত শিক্ষণে এরূপ বাঞ্ছনীয় গুণের বিকাশ সহজসাধ্য হয়। **তৃতীয়তঃ**, শ্রেণী-শিক্ষণে ধনী-দরিদ্র ও জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলে একত্রে শিক্ষালাভ করতে পারে। ফলে, শিক্ষার্থীরা সহজে সংস্কার মুক্ত হয়ে উঠতে পারে এবং পরস্পরের মধ্যে প্রীতি-মধুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়।

শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন সিদ্ধির বিচারে সুবিধা

শ্রেণী-শিক্ষণের ত্রুটি (Limitation in Class-room Instruction): শ্রেণী-শিক্ষণের নানা সুবিধা থাকা সত্ত্বেও **অনেকগুলি ত্রুটি লক্ষ্য** করা যায়। তবে সব ত্রুটির ভিত্তি হল শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান—ব্যক্তিবৈষম্য নীতির নিষ্ক্রিয়তা। সকল শিক্ষার্থীর অভিরুচি, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আগ্রহ, প্রবণতা, বুদ্ধি ও সামর্থ্য এক নয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, এমনকি যমজ সন্তানদের মধ্যেও বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। অথচ শিক্ষা হবে শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা, আগ্রহ ও প্রয়োজন অনুসারে। শ্রেণী-শিক্ষণে এই ব্যক্তি-বৈষম্যের নীতি অবহেলিত। তাই শিক্ষা এখানে অসম্পূর্ণ। শ্রেণী-শিক্ষণ মূলতঃ পরিচালক, পরিশাসক, শিক্ষক ও অভিভাবকদের চিন্তা, সুযোগ ও প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত।

সকল ত্রুটির ভিত্তি

তাই শিক্ষককে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। **প্রথমতঃ**, তিনি শ্রেণীকক্ষে তিনটি স্তরের মানসিকতার সম্মুখীন হন, যথা—অগ্রসর, সাধারণ ও অনগ্রসর। এদের কোন একটি স্তরের প্রতি গুরুত্ব দিলে শ্রেণীকক্ষের অন্য দুটি স্তরের শিক্ষার্থীরা অবহেলিত হবে। অথচ শিক্ষক নির্দিষ্ট সময়ে সকল স্তরের মানসিকতার শিক্ষার্থীর দিকে সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করতে পারেন না। **দ্বিতীয়তঃ**, একজন শিক্ষকের পক্ষে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর ভুল-ত্রুটি বিচার করা ও সংশোধন করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর সান্নিধ্যে আসতে না পারায়

শিক্ষকের ভূমিকায় বিচারে অসুবিধা

দরুণ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। **তৃতীয়তঃ**, সংখ্যাধিক্যহেতু শ্রেণী-শিক্ষণে শিক্ষার্থীর মানসিকতার মান নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে ওঠে। ফলে, শ্রেণীর শিক্ষাগত মান ক্রমশঃ নিম্নগামী হয়ে পড়ে। শিক্ষকও বাধ্য হয়ে গতানুগতিক শিক্ষাকর্ম সম্পাদনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।

শিক্ষার্থীদের অসুবিধা

শিক্ষকদের ন্যায় শিক্ষার্থীদেরও নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। **প্রথমতঃ**, শ্রেণীশিক্ষণে প্রয়োজন অনুযায়ী স্থান সঙ্কুলান, আলো-বাতাস ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভাব লক্ষ্য করা যায়। **দ্বিতীয়তঃ**, ব্যক্তি ও কর্মমুখীন শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের অসুবিধাবশতঃ শিক্ষার্থীরা শ্রমবিমুখ, লাজুক শ্রোতা হয়ে ভাবী জীবনের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। **তৃতীয়তঃ**, আনন্দমুখর উন্নতিকামী প্রতিযোগিতার পরিবর্তে শিক্ষার্থীরা হিংসা-দ্বেষ, বাদ-বিসংবাদ ও ধ্বংসমুখী প্রতিযোগিতায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। **চতুর্থতঃ**, সমষ্টিগত জীবনের মানসিকতা ও যৌথ বা ব্যক্তিজীবনের মানসিকতা এক নয়। শ্রেণীশিক্ষণে সমষ্টিগত জীবনে অভ্যস্ত হলেও ব্যক্তিগত মানসিকতা অবহেলিত হওয়ায় শিক্ষা মূলতঃ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

২। যৌথ-শিক্ষণ (Group Instruction) ঃ

যৌথ শিক্ষণ কি ?

ব্যক্তিবৈষম্য নীতির কার্যকর প্রয়োগের ত্রুটি রয়েছে শ্রেণীশিক্ষণের ক্ষেত্রে। দলগত শিক্ষণের মাধ্যমে অনেকখানি ব্যক্তিবৈষম্য নীতিকে সার্থক প্রয়োগের অনুকূলে অগ্রসর হওয়া যায়। তাই দলগত শিক্ষণ-প্রক্রিয়া নীতিগত-ভাবে শিক্ষণ-ব্যবস্থায় গৃহীত হয়েছে। চল্লিশ-পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী... [illegible] ...কে চারটি বা পাঁচটি দলে ভাগ করে পদ্ধতি প্রয়োগ করা চলে। এভাবে দলভিত্তিতে পাঠদান পদ্ধতি প্রয়োগ করাকে যৌথ-শিক্ষণ বলা হয়। অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন একজন শিক্ষার্থীর যে মানসিকতা থাকে, দলগত কর্মপ্রচেষ্টায় সেই মানবিকতা ভিন্ন রূপ ধারণ করে। সমষ্টিগত জীবনে ব্যক্তি নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলে অথচ যৌথ জীবনে সেই একই ব্যক্তি নিজেকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই যৌথ-শিক্ষণের অনুকূল নানাবিধ পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বকে সঞ্জীবিত করছে।

যৌথ-শিক্ষণের উল্লেখযোগ্য সুবিধা ঃ যৌথ-শিক্ষণের মূলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন বিকাশের মধ্যবর্তী ধারাটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে

প্রথমতঃ, যৌথ শিক্ষণের ক্ষেত্রে এক একটি দলে ছাত্রসংখ্যা কম থাকার জন্য শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর ওপর লক্ষ্য রাখতে পারেন। **দ্বিতীয়তঃ,** যৌথভাবে সকল শিক্ষার্থীর কাজকর্মের ওপরও তিনি দৃষ্টি দিতে পারেন। **তৃতীয়তঃ,** যৌথ-শিক্ষণে কর্ম-ভিত্তিকতা, প্রকল্প প্রভৃতি পদ্ধতি প্রয়োগের অবকাশ আছে। **চতুর্থতঃ,** যৌথ-শিক্ষণকে সহজেই শ্রেণীগত শিক্ষণ এবং ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণ—এই উভয় শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন করা যায়।

যৌথ শিক্ষণের সুবিধা

যৌথ-শিক্ষণের অসুবিধাঃ প্রথমতঃ, যৌথ প্রক্রিয়ায় বিদ্যালয়ে অধিক কক্ষ, সাজসরঞ্জাম, উপকরণ ইত্যাদি অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয়। তাই এ ব্যবস্থা অধিক ব্যয়সাপেক্ষ। **দ্বিতীয়তঃ,** যেসব ক্ষেত্রে শিক্ষক কর্তৃক বক্তৃতাদানের বা বিবৃতিদানের প্রয়োজন থাকে সেখানে যৌথ ব্যবস্থার পরিবর্তে শ্রেণী-ব্যবস্থা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। **তৃতীয়তঃ,** যৌথ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা সকল শিক্ষকের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পায় না। অনেক যোগ্য গুণী শিক্ষক থাকেন যাঁদের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট আকাঙ্ক্ষা থাকে। যৌথ ব্যবস্থায় অনেক সময় শিক্ষার্থীদের এই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়।

যৌথ শিক্ষণের ত্রুটি

৩। ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণ (Individualised Instruction) ঃ

শ্রেণী-শিক্ষণের উল্লেখযোগ্য ত্রুটির মধ্যে ব্যক্তি বৈষম্যের কার্যকরী প্রয়োগের অসুবিধার কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অথচ আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক। তাই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তি বৈষম্য এবং শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, গ্রহণ ক্ষমতা ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। শ্রেণী শিক্ষণে এটা কোনক্রমে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই শ্রেণী-শিক্ষণে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সার্বিক বিকাশ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। সে কারণে ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণ-প্রবণতা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটা লক্ষ্যণীয় বিষয়। শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত আগ্রহ, সামর্থ্য, অভিরুচি, প্রবণতা, গ্রহণ-ক্ষমতা ইত্যাদি অনুসারে যাতে শিক্ষালাভ করতে পারে, বিদ্যালয়ে এমন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ও অনুকূল পদ্ধতি অবলম্বনে শিক্ষাদান করাকে বলা হয় ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণ।

ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণের উপযোগিতা ঃ প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রেরণা, আগ্রহ, সামর্থ্য ইত্যাদি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়। ফলে, শিক্ষার্থী স্বকীয় ধারায় শিক্ষালাভ করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণে শিক্ষার্থীরা আত্মপ্রচেষ্টার সুযোগ পায়। ফলে, সে আত্মনির্ভর হয়ে দায়িত্বপালন ও কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হয়ে ওঠে। সমাজের আদর্শ সভ্য হিসেবে চলার পথে ও নাগরিক জীবনে শিক্ষার্থীর এ সব ব্যক্তিগত গুণ হবে অমূল্য সম্পদ।

তৃতীয়তঃ, অগ্রসর, সাধারণ ও অনগ্রসর বা ক্ষীণমেধা—ইত্যাদি সকল প্রকার ছাত্র প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষকের সাহায্য পেতে পারে। ফলে, উচ্চ মেধাশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থী পরিপূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত হতে পারে ও সমাজের অশেষ উপকার সাধন করতে পারে। পক্ষান্তরে, পশ্চাৎবর্তী শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নিকট থেকে অধিক যত্ন ও সাহায্য পেয়ে প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

চতুর্থতঃ, ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণে যেসব পদ্ধতি প্রয়োগ (যেমন—আবেক্ষণ, পাঠচর্চা, ডাল্টনপ্ল্যান ইত্যাদি) করা হয়, সেগুলির মধ্যে স্বাধীনতা, নমনীয়তা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য থাকায় ব্যক্তিবিকাশ যথাসম্ভব সার্থক হয়ে ওঠে।

ব্যক্তিশিক্ষণের সুবিধাগুলি যেমন শ্রেণী বা যৌথ শিক্ষণে নেই, তেমনি শ্রেণী বা যৌথ-শিক্ষণের সুবিধাগুলি ব্যক্তিশিক্ষণে শূন্যতার সৃষ্টি করে। যেমন—শ্রেণী বা যৌথ-শিক্ষণে ব্যয় সংক্ষেপ, শিক্ষকের শ্রম ও সময়ের সাশ্রয়, শিক্ষার্থীর সামাজিক ও সমষ্টিগত গুণবিকাশ ইত্যাদি সুবিধাগুলি ব্যক্তিশিক্ষণে বিরল।

তিন-এর মধ্যে সমন্বয় (Co-ordination among the three) ঃ শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার তিনটি এককের প্রতিটিতে যেমন সুবিধা আছে তেমনি আছে বিশেষ বিশেষ অসুবিধা। প্রতিটি এককের অসুবিধা ও ত্রুটিগুলি দূর করে সুবিধা ও উপযোগিতাগুলিকে ফলশ্রুতি হিসেবে প্রাপ্তির প্রচেষ্টাই হল বুদ্ধিমান ও দক্ষ শিক্ষকের কাজ। এখন প্রশ্ন হল, **কিভাবে তিনটি এককের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা যায় ?**

সংখ্যাতত্ত্ব ও ব্যয় সংক্ষেপের বিচারে শ্রেণী-শিক্ষণ আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় অনিবার্য ও অপরিহার্য একক। শ্রেণী-শিক্ষণকে কেন্দ্র করে একজন আদর্শ ও দক্ষ শিক্ষক এমন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন যেন বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা

ব্যক্তিশিক্ষণ ও যৌথ-শিক্ষণের সুযোগ পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, শিক্ষক ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণের প্রয়োজনে শ্রেণীকক্ষে অবেক্ষণ পাঠচর্চা, (Supervised study), পরিশোধিত ডাল্টন প্ল্যান প্রভৃতি প্রয়োগ করতে পারেন। তেমনি যৌথ-শিক্ষণের প্রয়োজনে শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষক দলগঠন করে প্রকল্প-পদ্ধতি, সমস্যা-পদ্ধতি, ওয়ার্কশপ পদ্ধতি প্রভৃতি কর্মের মাধ্যমে শিক্ষালাভের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন। 'যৌথ-শিক্ষণ হল শ্রেণী-শিক্ষণ ও ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণের একটি মাঝামাঝি রূপ (half-way between the individual and class instruction)। সুতরাং যৌথ-শিক্ষণই ব্যক্তি ও শ্রেণী-শিক্ষণের মধ্যে সমন্বয়বিধানের একটি উপযুক্ত একক।'

ব্যক্তি ও যৌথ-শিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেও **কতকগুলি ক্ষেত্রে শ্রেণী-শিক্ষণকে মোটেই অবহেলা করা যায় না।** যেমন—

(১) কোন বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করার শুরুতে (অবতারণা-পর্বে) শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সেই দিকে আকর্ষণ করার প্রয়োজনে শ্রেণী-শিক্ষণ অপরিহার্য।

(২) দলগত বা ব্যক্তিশিক্ষণের পর ফলশ্রুতি ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা প্রসঙ্গে শ্রেণী-শিক্ষণ প্রয়োজন।

(৩) দলগত বা ব্যক্তিশিক্ষণের পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়, অনেক ভুল-ত্রুটি থেকে যায়। সেগুলি সর্ব সমক্ষে আলোচনার মাধ্যমে দূর করার জন্য শ্রেণী-শিক্ষণ প্রয়োজন।

(৪) ব্যক্তি ও দলগত শিক্ষণে অনেক সময় অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন শিক্ষোপকরণ ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে পাঠ্যবিষয়ের ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়। বিশেষ করে কর্মভিত্তিক শিক্ষা-প্রচেষ্টায় স্বাভাবিক কতকগুলি অসামঞ্জস্য ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়। এসব ক্ষেত্রে শ্রেণীগত শিক্ষণের দ্বারা শূন্যতা পূরণ করা ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সংলগ্নতা আনার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

সুতরাং লক্ষ্য করা যায় যে, শ্রেণী-শিক্ষণকে কেন্দ্র করে অন্যান্য এককের উপযোগিতার (utility) মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ব্যক্তিভিত্তিক ও দলীয় কর্মের মধ্যে ভারসাম্য সংরক্ষণের

(balancing individual and group work) ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[1] সুতরাং বিদ্যালয়ের শ্রেণীগত শিক্ষণ-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখেও আমরা অনায়াসে ব্যক্তি ও যৌথশিক্ষণের উপযোগিতাগুলির ফলশ্রুতি সংগ্রহ করতে পারি। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের এই বিজ্ঞানভিত্তিক প্রয়োগসাফল্য শিক্ষকের স্বকীয় দক্ষতা, বুদ্ধি ও কৌশলের ওপর নির্ভর করে।

পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগ (Classification of Methoods):

উপরিউক্ত প্রতিটি পদ্ধতি কোন বিশেষ এককের (যেমন, শ্রেণীশিক্ষণ, ব্যক্তিশিক্ষণ, যৌথ শিক্ষণ) সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকা সত্ত্বেও অন্য এককের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা চলে। তাই পদ্ধতিগুলি পরস্পর পৃথক প্রকোষ্ঠে সংরক্ষিত নয়। এগুলি শিক্ষকের প্রয়োগ-কৌশলের ওপর সর্বদা নির্ভরশীল এবং পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। তবুও একক ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলিকে মোট তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—(১) **শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষণের উপযোগী পদ্ধতি**—শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়বস্তু পরিবেশন করতে হলে সেখানে শিক্ষকের বক্তব্য পেশ করার প্রবণতা থাকে বেশী। তাই এসব পদ্ধতি মুখ্যতঃ বিবরণধর্মী হবে। এখন পদ্ধতি হল, (ক) মৌখিক, (খ) বিতর্ক ও আলোচনা, (গ) পর্যালোচনা (Review), (ঘ) সমাধীকৃত পাঠচর্চা ইত্যাদি।

(২) **দ্বিতীয় স্তরে হল যৌথ শিক্ষণের উপযোগী পদ্ধতি**—এখানে শ্রেণীকক্ষের সব শিক্ষার্থীকে একত্রে গ্রহণ করা হয় না। এদেরকে কয়েকটি দল বা উপদলে ভাগ করে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু শ্রেণীর মূল কাঠামো ঠিক থাকে। এমন পদ্ধতি হল: (ক) প্রকল্প পদ্ধতি, (খ) সমস্যাসূচক পদ্ধতি, (গ) ওয়ার্কশপ-পদ্ধতি এবং (ঘ) অবেক্ষণ বা তদারকী পাঠপ্রক্রিয়া-পদ্ধতি প্রভৃতি।

(৩) **তৃতীয় স্তরে আছে ব্যক্তিশিক্ষণের উপযোগী পদ্ধতি**—(ক) প্রয়োগশালা পদ্ধতি, (খ) উৎস সন্ধানী পদ্ধতি, (গ) ডাল্টন পরিকল্পনা, (ঘ) লাইব্রেরী পদ্ধতি, (ঙ) হিউরিষ্টিক বা আবিষ্কার প্রক্রিয়া ইত্যাদি এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে কোনটিতে শ্রেণীকে সম্পূর্ণ বিলুপ্তি করে ব্যক্তি-শিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেমন—ডাল্টন পরিকল্পনা। আবার

1, Commission Report: Dynamic Method of Teaching. P. 89

কোনটিতে শ্রেণীকে অক্ষুণ্ণ রেখে ব্যক্তিশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, যেমন—প্রয়োগশালা, আবিষ্কার পদ্ধতি ইত্যাদি।

এছাড়া আধুনিক যুগে পূর্বোক্ত **তিনটি এককের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে শিক্ষাদানের কয়েকটি পরিকল্পনা** বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা চলেছে। এমন পরিকল্পনা বা প্রণালীগুলি হল (ক) বাটাভিয়া প্রণালী (Batavia System), (খ) উইনেটকা পরিকল্পনা (Winnetaka Plan), (গ) ডেক্রলী প্রথা (Decroly System) প্রভৃতি।

বহুজন (শ্রেণী), অল্প কয়েকজন (দল), একজনকে (ব্যক্তি) পড়ানোর উপযোগিতা অনুসারে পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগ করা হল। তা বলে পদ্ধতির উক্ত শ্রেণীকে সম্পর্কহীন পৃথক প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করা যায় না। কারণ, প্রতিটি পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। সুতরাং এই শ্রেণী বিভাগ কোনমতেই সুষ্ঠু ও নিখুঁত হতে পারে না। কারণ শিক্ষার্থীর সঙ্গে বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু ও সুস্পষ্ট সন্নিকর্ষ স্থাপনই হল পদ্ধতি। মূলনীতিকে ভিত্তি করলে পদ্ধতিকে (Method) **মোটামুটি দুটি ভাগে** ভাগ করা যায়, যথা—(১) **শিক্ষক-কেন্দ্রিক** এবং (২) **শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক**, প্রথমটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিষয়কেন্দ্রিকতা আর যুক্তিনির্ভরতা। দ্বিতীয়টির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মনস্তাত্ত্বিকতা, কর্মভিত্তিকতা ইত্যাদি। আবার বাংলা ভাষায় আমরা যাকে বলছি পদ্ধতি তা সব সময় প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী Method শব্দের প্রতিশব্দ হয় না। যেমন—আরোহী, অবরোহী, হিউরিষ্টিক, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, একক ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে প্রণালী (Procedure)। তেমনি, ঐতিহাসিক (Historical Method), এককেন্দ্রিক (Concentric), যুক্তিভিত্তিক এবং মনোবিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ধারানুসারে (Order) শিক্ষাকর্ম পরিচালনার অভিব্যক্তি। আবার ডাল্টন, বুনিয়াদ (Basic) বা ওয়ার্ধা প্রকল্প, ডেক্রলী, ইউনেটকা, ইউনিট প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে পরিকল্পনা (Plan) এবং প্রথার (System) প্রাধান্য। তাই শিক্ষাদান পদ্ধতির সুষ্ঠু ও নিখুঁত শ্রেণীবিভাগ করা দুরূহ কর্ম।

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি

(Modern Methods of Teaching)

অধ্যায়-পরিচয়ঃ এই অধ্যায়ে নানা প্রকার শিক্ষাদান পদ্ধতি সবিস্তারে আলোচিত হল। প্রথম স্তরে কতকগুলি পদ্ধতি আছে যেগুলি প্রচলিত বা গতানুগতিক পদ্ধতিরূপে গণ্য, যেমন, মৌখিক পদ্ধতি, বক্তৃতা পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি ইত্যাদি। গতানুগতিক পদ্ধতিরূপে পরিগণিত হলেও এসব পদ্ধতি আজকাল বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। তাই এ-গুলিকেও সবিস্তারে আলোচনা করা হল। আবার আধুনিকযুগে শিশুকেন্দ্রিক ও মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক কতকগুলি পদ্ধতি কর্মকেন্দ্রিকরূপে প্রযোগ করা হচ্ছে। দ্বিতীয় স্তরে এরূপ পদ্ধতিপুঞ্জকে সবিস্তারে আলোচনা করা হল। সবশেষে প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতির প্রগতিমূলক বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরা হল।

বিষয় ভিত্তিক শিক্ষণ-পদ্ধতি (Teaching Methods based on Subject Matter) **ঃ** পদ্ধতি হল, শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্কস্থাপন ও রক্ষা করার প্রক্রিয়া। শ্রেণীকক্ষে বা আনুষ্ঠানিক পরিবেশে শিক্ষক এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন। এক সময় শিক্ষক তাঁর পাণ্ডিত্যসুলভ মনোভাব নিয়ে বিষয়বস্তু শেখাবার পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। শিক্ষার্থীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আবেগ-প্রক্ষোভ, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি তখন অগ্রাহ্য করা হত। এরপর শিক্ষাক্ষেত্রে এল শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রভাব, এই প্রভাব যতদিন প্রয়োগযোগ্য হয়নি—ততদিন যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হত সেগুলি গতানুগতিক পদ্ধতিরূপে খ্যাত। ক্রমে মনস্তত্ত্ব শিক্ষণ-পদ্ধতির ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তখন শিক্ষার্থী শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হল। এই সময় থেকে চিরাচরিত পদ্ধতিরূপে খ্যাত শিক্ষণ-পদ্ধতিগুলিকে শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও প্রবণতার বিচারে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হল। তবে বিষয়বস্তুর প্রতি গুরুত্ব দানের মনোভাব সম্পূর্ণ বিদূরিত হল না। বিষয়বস্তুকে কিভাবে পরিবেশন করলে শিক্ষার্থীরা ঠিক গ্রহণ করতে পারে, কিভাবে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুর প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়, কিভাবে পরিবেশন করলে শিক্ষার্থী ঠিক সমাজজীবনের উপযুক্ত হতে পারে—এই চেষ্টাই প্রবল হল। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর ওপর গুরুত্ব প্রদান

করা হলেও মনস্তত্ত্ব অবহেলিত হয়নি। ফলে প্রচলিত কয়েকটি পদ্ধতিকে উন্নত ও মনোবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে প্রয়োগ করার প্রথা আজও প্রচলিত। নিম্নে আমরা এরূপ কয়েকটি পদ্ধতি আলোচনা করছি :

[১] মৌখিক পদ্ধতি (Oral Methods) ঃ

শিক্ষককেন্দ্রিক ও বিষয়ভিত্তিক পদ্ধতিপুঞ্জের মধ্যে মৌখিক পদ্ধতির কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মৌখিক পদ্ধতির মূল কথাই হল বাচনধর্মিতা। তাই একে গল্প-বলা (Story telling), বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা যায়। শ্রেণীবিশেষে বয়সের তারতম্য অনুসারে বিষয়টিকে শিক্ষার্থীর বোধগম্য করে তোলার জন্য মৌখিক পদ্ধতিকে বিভিন্নরূপে প্রয়োগ করা যায়। বিদ্যালয়ের নিম্নস্তরে 'গল্প-বলা' পদ্ধতিকে উচ্চস্তরে 'বক্তৃতা-পদ্ধতি' হিসেবে গণ্য করা চলে। বক্তৃতা-পদ্ধতি প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, শিক্ষক কোন জনসমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছেন না—তিনি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন ; আর তাদেরকে শিক্ষনীয় বিষয়বস্তুর তাৎপর্য বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

মৌখিক পদ্ধতির সুবিধা (Advantages of Oral Methods) ঃ **প্রথমতঃ**, গল্প-বলা বা বক্তৃতাদানকালে শিক্ষক থাকেন শিক্ষার্থীর নিকট সান্নিধ্যে। সেজন্যে শিক্ষার্থীদের সুবিধা, অসুবিধা ও বোধগম্যতা সম্পর্কে তিনি সহজে জানতে বা বুঝতে পারেন। প্রয়োজনমত তিনি কথা বলার ধারা, ভাষা ও কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে শিক্ষা-সহায়ক উপকরণাদির সহায়তায় ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, পুস্তকের মুদ্রিত ভাষা অপেক্ষা মৌখিক বক্তব্য অনেক বেশী আকর্ষণীয় ও সক্রিয়। কারণ, কথা বলার সময় শিক্ষক শুধু নিজস্ব ভাষা নয়, বিষয়বস্তুর তাৎপর্য ব্যাখ্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার ভাব ও ভঙ্গিমা প্রকাশ এবং দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন। এমনকি গল্প বা বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষক পুঁথিগত বিমূর্ত ও জটিল বিষয়কে সরল, সহজ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে পারেন।[1] বলা বাহুল্য, এই সঙ্গে শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করলে মৌখিক বক্তব্যের বিষয়াদি আরও প্রাঞ্জল ও সজীব হয়ে ওঠে।

---

1. The printed word and the visual symbols are effective only upto a point. It is the living voice of the teacher that touches the chord of understanding and opens the gates of reality.—*R. Vajreswari.*

তৃতীয়তঃ, মৌখিক পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে শ্রবণ-অভিজ্ঞতা লাভেও সাহায্য করে। জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে নিজের বক্তব্য রাখার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের কথা বা বক্তৃতা শুনে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতাও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন। মৌখিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর পক্ষে এই ক্ষমতা অর্জন করা সহজসাধ্য।

চতুর্থতঃ, মৌখিক পদ্ধতি সুস্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হলে শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়টি সহজ, প্রাঞ্জল হয় এবং সীমিত সময়ের মধ্যে সে পাঠ্যবিষয়ের বিভিন্ন ভাব গ্রহণ ও সামঞ্জস্যবিধান করতে সমর্থ হয়।

পঞ্চমতঃ, কোন নতুন বিষয়ের পাঠ শুরু করবার পূর্বে বিষয়বস্তুর পূর্বসূত্র বজায় রাখার জন্যে মৌখিক পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তাছাড়া বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে যুক্তিযুক্ত সম্পর্ক, পারস্পরিকতা রক্ষা ও অনুবন্ধ স্থাপনের জন্য মৌখিক পদ্ধতিই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

মৌখিক পদ্ধতির অসুবিধা (Disadvantages of Oral Methods) **:** অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বক্তৃতা পদ্ধতি ত্রুটিমুক্ত নয়। **প্রথমতঃ,** শ্রেণী শিক্ষকই একমাত্র বক্তা আর শিক্ষার্থীরাই শ্রোতা। সময় উৎত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাদের শুধু শিক্ষকের কথাই ধৈর্য ধরে শুনতে হয়। এতে শিক্ষার্থীদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

দ্বিতীয়তঃ, গল্প-বলা বা বক্তৃতার প্রাচুর্যে ছাত্র-ছাত্রীরা একান্তভাবে শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ও তাদের স্বাধীনভাবে বিষয় অনুশীলনের ক্ষমতা লোপ পায়।

তৃতীয়তঃ, মৌখিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী হয়ে পড়ে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা। সক্রিয় অভিজ্ঞতামুখী শিক্ষা পেলে শিক্ষার্থী বাস্তবজীবন-সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা, দক্ষতা ও কৌশল আয়ত্ত করতে পারে। আলোচ্য পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে।

চতুর্থতঃ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদে ডিগ্রীধারী আবেদন-কারীকেই কর্মে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু সকলেই যে প্রাঞ্জল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী গল্প বলতে বা বক্তৃতা দিতে পারবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় শিক্ষক তাঁর বক্তৃতাদানের দুর্বলতা ঢাকবার জন্যে শ্রুতিলিখন (Dictation) লেখাতে শুরু করেন।

পঞ্চমতঃ, এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিবৈষম্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তুর মধ্যে একাত্মতা সৃষ্টি না হয়ে তথ্যভিত্তিক জ্ঞানের ওপর বেশী গুরুত্বদানের প্রবণতা সৃষ্টি হয়। অযোগ্য শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত পাঠের অপূর্ণতা দূর করার জন্য পাঠ্যপুস্তকের ওপর শিক্ষার্থীরা বেশী নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়।

পরিশেষে বলা যায়, মৌখিক পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর মানসিক ধারণ ক্ষমতা, ব্যক্তিগত গুণাবলী, এমনকি পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে লব্ধ অভিজ্ঞানের কোন প্রকার মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না।

অসুবিধা দূর করবার উপায় (Means to eliminate the defects)ঃ বহুবিধ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও শ্রেণী-শিক্ষণের ক্ষেত্রে মৌখিক পদ্ধতির উপযোগিতাকে অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং ত্রুটিমুক্ত করে এই পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়। এর জন্য কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন—

(i) মৌখিক পদ্ধতিকে হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল করার জন্য শিক্ষকের পূর্ব-প্রস্তুতি অত্যাবশ্যক। কোন নতুন অধ্যায় বা একক পরিবেশনের সময় প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বিষয়বস্তুর উপস্থাপন, সুদীর্ঘ বিষয়কে সংক্ষিপ্তকরণ, সমস্যাপূর্ণ বিষয়ের সমাধান, পরবর্তী পাঠক্রমের জন্য নির্দেশক সূচনা ইত্যাদি কর্মের জন্য শিক্ষক পূর্ব থেকে সময়, সুযোগ ও অবস্থা বুঝে পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হবেন।

(ii) শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কালে শিক্ষককে যথেষ্ট সংযমী ও মনোযোগী হতে হবে। গল্প-বলার সময় আজগুবী গল্প নয়, বক্তৃতা জনসমাবেশের বক্তৃতা নয়—সত্যসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গীকে ঠিক রেখে বিষয়বস্তু পরিবেশন করাই বাঞ্ছনীয়। এর জন্যে ভাব, ভাষা ও ভঙ্গিমার পূর্ণ প্রকাশ অর্থাৎ বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে কণ্ঠস্বরের তারতম্য ও ভাষার কলাকৌশলের পরিপূর্ণ প্রকাশ হওয়া দরকার।

(iii) মৌখিক পদ্ধতিতে শুধু শিক্ষকই কথা বলবেন, এটা ঠিক নয়। শিক্ষক নিজে যেমন কথা বলবেন তেমনি শিক্ষার্থীকে কথা বলার জন্যে আগ্রহী ও কৌতূহলী করে তুলবেন। মৌখিক পদ্ধতিকে সার্থক করে তোলবার জন্য প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি, বিতর্ক, সমালোচনা, নাট্যাভিনয় প্রভৃতির ব্যবস্থা ও শিক্ষ-সহায়ক সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রিয়াধর্মিতার সংযোগস্থাপন করা প্রয়োজন।

আরোহ ও অবরোহ প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে শিক্ষকের আলোচনা যুক্তিপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(iv) মৌখিক পদ্ধতিতে বিষয় পরিবেশনের সময় শিক্ষার্থীর মনোযোগের দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। তাছাড়া সীমিত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিষয়-বস্তুর পরিপূর্ণতা (Doctrine of fullness) বজায় রাখাও যুক্তিযুক্ত। মৌখিক পদ্ধতিকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্য সমধর্মী বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ (correlation) স্থাপন করা প্রয়োজন। শ্রেণীশিক্ষণের পাশাপাশি ব্যক্তি-শিক্ষণের জন্যে মাঝে মাঝে পদ্ধতির পরিবর্তন ও প্রয়োগ করে শিক্ষণকে সার্থক করে তোলা প্রয়োজন।

[২] আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Methods) ঃ

শ্রেণীশিক্ষণ প্রসঙ্গে আলোচনা পদ্ধতির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি সাধারণ মতামত প্রকাশিত হয়। এই সাধারণ মতামত সমস্যা সমাধানের পক্ষে অতি মূল্যবান। আলাপ-আলোচনায় যে কোন মানুষ খোলা মন নিয়ে স্ব-স্ব ইচ্ছা প্রকাশ করে ও সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। শিক্ষাবিজ্ঞানে তাই শিক্ষার্থীর নিঃসংকোচে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা আজ শুধু নীতি হিসেবে গৃহীত নয়, শ্রেণীকক্ষের পঠন-পাঠন প্রসঙ্গে এই নীতির বাস্তব রূপায়ণের চেষ্টাও চলছে। বিদ্যালয় পরিবেশে কোন বিষয় পঠন-পাঠনের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যেকার ব্যবধান ঘুচিয়ে গণতান্ত্রিক আদর্শে ও পারস্পরিক সহযোগিতায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাকর্ম পরিচালনা করা নব ভাবধারার (New Trend in education) সারমর্ম। এরূপ প্রক্রিয়া শ্রেণী-শিক্ষায় আলোচনা-পদ্ধতি নামে অভিহিত। বস্তুতঃ শিক্ষার্থী কোন কিছু শেখে আলাপ-আলোচনায়, কথাবার্তায়, ভাবের আদান-প্রদানে, তর্ক-বিতর্কে, কৌতূহলী জিজ্ঞাসার উত্তরে। বর্তমান কালে আলোচনা, কথাবার্তা অর্থহীন না হয়ে মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালিত হয়। আলোচনা-পদ্ধতি (ক) সমষ্টিগত ঘরোয়া আলোচনা (Informal group discussion), (খ) সমষ্টিগত নিয়মমাফিক আলোচনা (Formal group discussion), (গ) প্যানেল আলোচনা (Panel discussion), (ঘ) বিতর্ক (Debate), (ঙ) সিম্পোজিয়ম (Symposium), (চ) সেমিনার (Seminar), (ছ) গোল-টেবিল বৈঠক (Round Table Conference) প্রভৃতি যে কোন প্রণালীতে

প্রযোজ্য হতে পারে। তবে এ-পদ্ধতি নিশ্চয়ই **শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।** কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে যে বুদ্ধি, কৌশল, শৃঙ্খলা প্রয়োজন, শিশুরা তা যথাযথ পালন করতে পারে না। সুতরাং মাধ্যমিক স্তরের উচ্চতর শ্রেণীতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত।

আলোচনা-পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Discussion Methods) : আলোচনাকে সার্থক করে তুলতে হলে পূর্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সার্থক আলোচনার তিনটি অংশ, যথা—(১) প্রস্তুতি, (২) আলোচনা এবং (৩) মূল্যায়ন।

(১) **প্রস্তুতি পর্ব :** আলোচনা-পদ্ধতিতে প্রস্তুতিপর্ব অতি প্রয়োজনীয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের প্রস্তুতি আবশ্যক হলেও শিক্ষকের প্রস্তুতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কারণ, তিনিই শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য পরিচালিত করবেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে প্রথম প্রয়োজন হল বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষককে আলোচনার জন্য পাঠ-পরিকল্পনা (Lesson plan) এবং শ্রেণী-ব্যবস্থাপনা (class arrangement) করা প্রয়োজন। জ্ঞানাশ্রয়ী বিষয় শিক্ষণপ্রসঙ্গে মূল উপাদান (Sources), সহায়ক পুস্তকাদি (Reference books), পত্র-পত্রিকা, সাময়িক প্রসঙ্গ (current affairs) প্রভৃতি থেকে তথ্য চয়ন করা এবং শিক্ষার্থীদের সেগুলি পড়াশুনা করবার নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন। সত্যসন্ধানী নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে পড়াশুনা করে ও আলোচনার জন্য প্রস্তুত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। সুষ্ঠু ও সার্থক আলোচনা-পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য এরূপ পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

(২) **আলোচনা পর্ব :** পূর্বস্থিরীকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে এবার আলোচনা শুরু হবে। শিক্ষক-মশায়কে লক্ষ্য রাখতে হবে, (১) শ্রেণীকক্ষে উপবিষ্ট শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেন শৃঙ্খলা থাকে এবং প্রয়োজনমত প্রত্যেকেই যেন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। (২) আলোচনা সভায় শিক্ষক তাঁর মন ও মেজাজকে এমন রাখবেন, যেন সকলেই খোলা ও খুশী মনে আলোচনা করতে সাহসী হয়। গণতান্ত্রিক আদর্শই আলোচনার মৌলিক নীতি। আন্তরিকতায় সৃষ্ট পরিবেশ আলোচনা-পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ। (৩) আলোচনার সময় আক্রমণাত্মক প্রবণতার পরিবর্তে পরমতসহিষ্ণুতা, নতুন বিষয় জানবার কৌতূহল, সিদ্ধান্তে

পৌঁছবার আন্তরিক প্রচেষ্টা পরিবেশকে সৌহার্দপূর্ণ করে তুলতে পারে। এসব দিকে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন—এটাই বাঞ্ছনীয় প্রচেষ্টা ও পরিচালনা।

(৩) **মূল্যায়ন পর্ব** ঃ আলাপ-আলোচনার মূল্যায়ন হল এই পদ্ধতির সর্বশেষ অঙ্গ। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল তা থেকে বিচ্যুতি ঘটলো কিনা, আলোচনা কতটুকু সার্থকতার পথে পরিচালিত হল তা বোঝাবার জন্য মূল্যায়ন প্রয়োজন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিষয়বস্তুর ওপর শিক্ষার্থীর জ্ঞান এবং তার ব্যক্তি ও সমাজভিত্তিক বাঞ্ছনীয় গুণ-বিকাশ সম্ভব হল কিনা সে সম্পর্কেও মূল্যায়ন করা যুক্তিযুক্ত।

আলোচনা-পদ্ধতির গুণ (Merits of Discussion Methods) ঃ

(i) আলোচনা-পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষের প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজেকে দায়িত্বশীল সভ্য হিসেবে চিন্তা করতে পারে ও সততার সঙ্গে সত্যানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

(ii) আলোচনায় সক্রিয় হওয়ার তাগিদে শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী হয়। সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে স্বীয় ভুল-ত্রুটিকে সে অনায়াসে সংশোধনও করে নিতে পারে এবং ক্রমশঃ তার আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয়।

(iii) আলোচনার সময় একে অন্যের বক্তব্য ও যুক্তি শুনে বোঝবার চেষ্টা করে। স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি মিলিয়ে নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অপূর্ব সুযোগ থাকে এই পদ্ধতিতে।

(iv) আলোচনা-পদ্ধতিতে পারস্পরিক সাহচর্য, সহানুভূতি, পরমতসহিষ্ণুতা, গণতান্ত্রিক আদর্শ, বিষয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সমন্বয় সমস্যার সমাধান, ব্যাখ্যা প্রদান, ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা প্রভৃতি কতকগুলি বাঞ্ছনীয় গুণের বিকাশ ঘটে। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মানসিক চিন্তাধারাকে বাস্তব কর্মে প্রণোদিত করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশে সাহায্য করে এবং উন্নয়ন ও প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্যক্তির দেহ ও মনকে 'এগিয়ে চলার' দুর্বার প্রেরণা ও শক্তি দান করে।

(v) আলোচনায় সকলেরই খোলামনে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। তাই শিক্ষকের সুদক্ষ পরিচালনায় লাজুক শিক্ষার্থী তার লজ্জা ও সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারে, স্বল্প মেয়াদী আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ত্রুটিমুক্ত হয়।

আলোচনা-পদ্ধতির ত্রুটি (Limitations of Discussion Methods) : একাধিক উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও এই পদ্ধতির নিম্নরূপ ত্রুটিগুলি বিদ্যমান :

(i) আলোচনা-পদ্ধতিতে অত্যধিক সময় ব্যয় হয়। ফলে, নির্দিষ্ট সময়ে কোন বিষয় (Topic) অথবা শিক্ষাবর্ষের মধ্যে অনুমোদিত পাঠ্যসূচী সম্পূর্ণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

(ii) আলোচনা সুষ্ঠুভাবে না হলে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা শিক্ষা-প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে।

(iii) শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শৃঙ্খলাযুক্ত আলোচনা সম্ভব হয় না।

(iv) আমাদের দেশের বিদ্যালয়-সংগঠন ও পরিচালনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলোচনা পদ্ধতির বিশেষ অন্তরায়।

[৩] সমাজীকৃত পাঠচর্চা (Socialised Recitation) :

বিশ শতকের প্রথম থেকে পৃথিবীর সভ্য দেশগুলির শিক্ষাক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিশু ও তরুণদেরকে সমাজের উপযোগী সভ্যরূপে গড়ে তোলার প্রয়োজনে এই পরিবর্তন খুব বেশী গতিশীল। শিক্ষার্থীদের কর্মে ও চিন্তায় সামাজিক প্রেরণা সঞ্চারের দিকে লক্ষ্য রেখে যেমন পাঠক্রম ও পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্তন করা হয়েছে তেমনি শিক্ষণ-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়েছে। কার্যতঃ বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সমষ্টিগত শিক্ষণ-পদ্ধতি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অন্যতম নীতি হিসেবে গৃহীত হতে চলেছে। সমাজীকৃত পাঠচর্চা সমাজচেতনা জাগরণের অনুকূল একটি বিশেষ পদ্ধতি।

সমাজীকৃত পদ্ধতির স্বরূপ (Nature of Socialised Recitation Method) : সমাজীকৃত পদ্ধতি প্রয়োগের বিভিন্ন রীতির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। পুরাতন রীতি অনুসারে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও তাদের কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহ করা হত। এ রীতিকে গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি নামেও অভিহিত করা যায়। অথচ কোন সমস্যামূলক প্রশ্ন থাকলে সরাসরি পুস্তক থেকে উত্তর সংগ্রহ করা যায় না। তখন শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সহযোগিতায় অন্যান্য উপকরণাদি থেকে সঠিক উত্তর সংগ্রহ করতে হয়। গ্রন্থানুসারী প্রথায় প্রধান অসুবিধা হল, শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে বক্তব্য পেশ করার সময় মুখস্থ করা বিষয়বস্তু বলার চেষ্টা করে। ফলে, বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম না করেও

অনেকে মুখস্থ করে উত্তর দিতে পারে। এর দ্বারা মৌলিক চিন্তা বিকাশের কোন সুযোগ থাকে না। অথচ প্রকৃত সমাজীকৃত পদ্ধতিতে সমষ্টিগত চিন্তার বিকাশ হয়—শ্রেণীকক্ষ পরিণত হয় গতিশীল সমষ্টিগত জীবনধারার কেন্দ্ররূপে। ফলে, শিক্ষার্থীরা স্বাধীন চিন্তার অবকাশ পায়, কেউ পশ্চাদপদ বা হতাশ হয় না।

সমাজীকৃত পাঠচর্চার কোন বাঁধাধরা সীমিত রূপ নেই। শ্রেণী-পর্যায়ে সমষ্টিগত যে কোন রূপই সমাজীকৃত পাঠচর্চা পদ্ধতি। এসম্পর্কে কয়েকটি প্রচলিত প্রকার ভেদের কথা উল্লেখ করা যায়। **প্রথমতঃ,** এই পদ্ধতি কোন সভা অনুষ্ঠানের স্বরূপ প্রকাশ করতে পারে। এরূপ সভায় কতকগুলি কার্যসূচী থাকে। সেই সূচী সম্পর্কে সভ্যেরা স্ব-স্ব বক্তব্য পেশ করতে পারে এবং পারস্পরিক মতামতকে যাচাই-বাছাই করে নিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য তারা বহুমুখী সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যেন এরূপ আলোচনায় শ্রেণীর প্রত্যেক সভ্যই অংশ গ্রহণ করে। তবে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করবেন শিক্ষক নিজেই।

প্রথম নীতি

দ্বিতীয়তঃ, বিশুদ্ধ সমাজীকৃত শিক্ষণ-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি নির্বাচন করে নিজেরাই লোকসভার রীতিতে (a perliamentary procedure) সভা পরিচালনা করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষক সভা-কক্ষে না থেকে অন্তরালে থাকতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীরা দ্বিধাহীন চিত্তে আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণে তৎপর হয়। তবে এতে শৃঙ্খলা সম্পর্কিত নানাবিধ গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার পরিবর্তে শ্রেণীকক্ষে দল সৃষ্টি ও পরে সভার উদ্দেশ্য নষ্ট হয়। সুতরাং প্রক্রিয়া যেমনই হোক সমাজীকৃত শিক্ষণ-পদ্ধতিতে শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে অবস্থান করে সভা পরিচালনা ও নির্দেশ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই ব্যবস্থায় প্রথমে স্বতঃস্ফূর্ত ভাব ও ভাষা প্রকাশে অসুবিধা দেখা দিলেও পরে শিক্ষার্থীদের মন সরল, সহজ, মুক্ত অথচ শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়।

দ্বিতীয় রীতি

কোন কোন শিক্ষাবিদ্ এই পদ্ধতির অন্যতমরূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক (Institutionalised) প্রথার কথা উল্লেখ করেছেন।[1] এরূপ ক্ষেত্রে সমগ্র

1. Teaching the Social Studies in Secondary Schools—*Bining & Bining*. P. 131.

প্রতিষ্ঠানটি বয়স্কদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করে। উদাহরণ স্বরূপ : পৌরবিজ্ঞানের কোন শ্রেণীকে একটি পৌর-প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হল। এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা পৌরপিতার কাজ করবে। শ্রেণীকক্ষে আয়োজিত পৌরসভায় শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এই সভায় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা, কর ও শুল্কনীতি এবং পরিশাসন সংক্রান্ত নানা সমস্যার বিষয় আলোচনা করতেও পারে। পৌরসভার জন্য তৈরি কর্মসূচী শিক্ষক কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে সভা পরিচালনার সময় নেতাদের মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করার সুযোগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করাও প্রয়োজন। আলোচনার সময় শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বিবরণ লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ থাকাও অত্যাবশ্যক। কারণ, এই বিবরণ (Report) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন। তবে বলা বাহুল্য, সমাজীকৃত শিক্ষণ-পদ্ধতিতে শিক্ষকের পরিচালন দক্ষতা ও কৌশল সার্থক শিক্ষাদানের একমাত্র উপায়।

সমাজীকৃত পদ্ধতির উপযোগিতা (Utility of Socialised Recitation Method) : সমাজীকৃত শিক্ষণ-পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগে যে-সব ফলশ্রুতি লাভ করা যায় তাহল—

(ক) শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে সমাজের সুসভ্য এবং রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক রূপে গড়ে তোলা। সমাজীকৃত পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীমাত্রই সামাজিক গুণাবলী অর্জন করতে পারে।

(খ) এই পদ্ধতি নেতৃত্বসুলভ গুণাবলী বিকাশে সহায়তা করে।

(গ) শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে পড়াশুনা করে সমষ্টিগত পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। ফলে, বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করার সুযোগ সে পায়।

(ঘ) অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর আলোচনা, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা এবং দক্ষতা বিকশিত হয়।

(ঙ) এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে কাজের প্রতি আগ্রহ, কর্ম-সম্পাদন, সংগঠন, শৃঙ্খলা-রক্ষণ ও সক্রিয় সহযোগিতার প্রবৃত্তি জাগরিত হয়।

(চ) স্ব-স্ব প্রচেষ্টায় পড়াশুনার মাধ্যমে শিক্ষার্থী আত্মপ্রকাশের সুযোগ ও সংযম লাভ করে। ফলে, উন্নত স্তরের শিক্ষার্থীরা প্রগতিশীল চিন্তা ও ভাবরাজির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তাদের সহায়তায় স্বল্পমেধা শিক্ষার্থীরা অন্ততঃ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়।

(ছ) এই পদ্ধতিতে শিক্ষক অগ্রসর-অনগ্রসর সর্বপ্রকার শিক্ষার্থীকে কর্মে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে পারেন এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারেন। ফলে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক সুমধুর হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে সহানুভূতিশীল বন্ধু, যোগ্য পরিচালক ও বিজ্ঞ দার্শনিকরূপে শ্রদ্ধা করতে শেখে।

সমাজীকৃত পদ্ধতির ত্রুটি (Limitations of the Socialised Recitation Method): **প্রথমতঃ** অনেক পদ্ধতিবিদ্ শিক্ষক সমাজীকৃত পদ্ধতিকে শ্রেণী শিক্ষার অনুপযুক্ত বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সীমিত সময়ের অপব্যবহার হয়। অধিক পাঠ্যবিষয়ের চাপে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সাধারণত জর্জরিত। তাদের কর্মসূচীতে সময়ের ভাগাভাগি এমনভাবে করা হয় যে, তারা প্রতিটি বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষালাভের যথেষ্ট সময় পায় না।

দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতিতে মেধাবী ও উৎসাহী কয়েকটি ছাত্র শ্রেণীকক্ষে প্রভাব বিস্তার করে এবং সকল শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশ গ্রহণে বঞ্চিত হয়। ফলে পরস্পরের দ্বেষমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কালক্রমে অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। এর ফলে আলোচনা অবশেষে উদ্দেশ্যহীন বিতর্কে রূপায়িত হয় ও আলোচ্য পদ্ধতি নিজেই শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণ হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ, এই পদ্ধতির বহুল প্রয়োগ সময় সময় যান্ত্রিকতায় রূপান্তরিত হয়। কারণ, শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্ত না হয়ে শিক্ষকের নির্দেশ ও আদেশ-পালনে বাধ্য থাকে। তখন এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় গুণের বিকাশ হয় না।

চতুর্থতঃ, শ্রেণীতে কিছু কিছু ছাত্র-ছাত্রী থাকে যারা নিজেকে জাহির বা প্রচার করার জন্য উৎসুক থাকে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার প্রকাশ সর্বজনকাম্য। কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করার প্রবণতা যখন প্রচারে বা জাহিরে

পরিণত হয় তখন পদ্ধতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। ফলে শ্রেণীকক্ষে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়; অনগ্রসর ছাত্ররা হয় বঞ্চিত, সমাজীকরণের প্রচেষ্টা হয় ব্যর্থ।

অবশেষে বলা যায় সমাজীকৃত পাঠচর্চার পদ্ধতি মাধ্যমিক স্তরের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ যোগ্য। কারণ, তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা অনেকখানি পরিপক্ক। শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে এ-পদ্ধতি সার্থক পদ্ধতিরূপে গণ্য নয়।

ত্রুটি দূর করার কয়েকটি উপায় (Means to Eliminate the Defects) : সমাজীকৃত পদ্ধতির উপযোগিতার কথা স্মরণ রেখে এর ত্রুটি দূর করার জন্য কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। যথা—

(ক) বিষয় নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীদের মতামতের মূল্য দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

(খ) আলোচনা-কক্ষে বসবার ব্যবস্থা এমন হওয়া প্রয়োজন যেন সকল স্তরের শিক্ষার্থী সক্রিয় ও সচেতন হয়ে উঠতে পারে।

(গ) শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা যাতে শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করতে না পারে সেদিকে নজর রাখা শিক্ষকের কর্তব্য। শিক্ষার্থীর ওপর শিক্ষকের প্রভাব থাকবে যথেষ্ট, যেন শিক্ষার্থীরা সংযত হয়ে শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। শিক্ষার্থীর বয়স, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের ওপর শিক্ষকের শাসন নির্ভর করে। অল্পবয়স্ক ছাত্র, বিশেষ করে যাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ তেমন জাগ্রত হয়নি তাদের প্রতি শিক্ষককে অধিক সাবধান হতে হবে।

(ঘ) পাঠ-পরিচালনা এমন হবে যেন প্রতিটি শিক্ষার্থী সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রতিটি দলের দলপতি নির্বাচন করে একদিকে যেমন শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি সকল দলকেই এক একটা বিষয়ে আলোচনায় নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে।

(ঙ) আলোচনা পরিচালন ব্যাপারে শিক্ষককে আরও কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সেগুলি হল—

(১) বিষয়বস্তুর আলোচনা যেন গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হয়।

(২) আলোচনা যেন উদ্দেশ্যমূলক হয়।

(৩) পারস্পরিক কথাবার্তা যেন ব্যক্তিকে আঘাত না করে প্রত্যেককে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

(৪) আলোচনাকে সুস্পষ্ট ও জীবন্ত করার জন্য শিক্ষার্থীরা যেন প্রয়োজনীয় উপকরণ, পত্র-পত্রিকা, রেফারেন্স পুস্তক ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ পায়।

(৫) সিদ্ধান্তে পৌছানোর প্রাক্কালে শিক্ষার্থীরা যেন বিষয়গত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে মনোনিবেশ করতে পারে। এক কথায়, প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন পদ্ধতির উপযোগিতা দ্বারা লাভবান হয়।

[৪] একক পদ্ধতি (Unit Method) :

উদ্ভব ও বৃদ্ধি (Origin and development) : শ্রেণী শিক্ষণ প্রসঙ্গে আবিষ্কৃত বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে একক পদ্ধতি সর্বাধুনিক। বহুকাল যাবৎ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু মুখস্থ করানোর প্রবণতা নিয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হত। পাঠ্যপুস্তকই তখন একমাত্র সম্বলরূপে পরিগণিত হত। শিক্ষার্থীদের একমাত্র কর্ম ছিল পুঁথিগত বিষয়বস্তু মুখস্থ করা। এরূপ শিক্ষা বাস্তবে শিক্ষা নামধেয় নয়। বর্তমানে বিষয় শিক্ষণ-প্রসঙ্গে বিষয়বস্তু, ঘটনা ও তার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে অনুধাবনের উদ্দেশ্য নিয়ে পঠন পাঠনকার্য পরিচালিত হয়। অবশ্য আজকাল কোন কোন শিক্ষক শুধু মুখস্থ করানোর উদ্দেশ্য নিয়েও শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন। আবার আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ শিক্ষক অনেক সময় বর্তমানে প্রয়োজনীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত করে এমন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, যার দ্বারা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সার্থক হয় না। কি করে বিষয় সংগঠন করতে হবে (How to arrange Course of study) সেই সমস্যাই এরূপ ব্যর্থতার মূল কারণ। বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞানার্জন করতে হলে বিষয়-সংগঠন এমন হওয়া প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থীরা মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে অন্যান্য সম্পর্কিত উপবিষয়াদি সুষ্ঠুভাবে অনুধাবন করতে পারে।

পাঠ্যবিষয়ের সাংগঠনিক গতি

দেখা গেছে, দুটি ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক বিচার করে পঠন-পাঠনের দ্বারা বিষয় অনুধাবন সুস্পষ্ট হয়। কোন মূল বিষয়ের সঙ্গে অন্বিত অন্যান্য দুই বা ততোধিক বিষয়ের মধ্যে সঙ্গতি রেখে পঠন-পাঠন করলে মূল বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতএব সুস্পষ্ট অনুধাবনের জন্য প্রথম প্রয়োজন হল অনুবন্ধ (Correlation) পদ্ধতিতে পাঠদান করা। দ্বিতীয় প্রয়োজন হল মূল বিষয়টিকে কয়েকটি একক (unit) এবং এককে কয়েকটি উপ-এককে (sub-unit) বিভক্ত করে বিষয়-সংগঠন করা। এককেন্দ্রিক

এককেন্দ্রিক প্রথায় বিষয় সংগঠন

প্রথায় (Unitary System) বিষয়-সংগঠন করতে পারলে শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীর নিকট অনেক বেশী সুস্পষ্ট ও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

এককেন্দ্রিক প্রথায় বিষয়-সংগঠনের পশ্চাতে জার্মানী গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানী-দের সমগ্রতাবাদের প্রভাব বিদ্যমান। গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে শারীরিক, মানসিক এবং দৈহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সামগ্রিকতা অথবা সংহত এককগুলির দ্বারা একটা পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ পায়। এই মতবাদ এককেন্দ্রিক পরিকল্পনা রচনার (Unitary Plan of Organisation) ক্ষেত্রে বিশেষ অনুকূল। এই হিসেবে আমরা কোন মূল বিষয় বা কর্মকে কতকগুলি এককে বিভক্ত করতে পারি। প্রতিটি একক যেন মূল বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করে। এসব এককের সঙ্গে যখন শিক্ষার্থীর কৌশল, অভ্যাস, অভিরুচি, প্রবণতা প্রভৃতি মিলেমিশে তার চিন্তা ও আচার-আচরণকে নতুনরূপে পরিচালিত করবে তখন তৈরি হবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব। সমগ্রের একটা সম্পূর্ণরূপ আছে। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে এই রূপটি প্রকাশিত হয় না। এই সমগ্রতা তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে একক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মূল বিষয়টি স্থিরীকৃত করে সেই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সমস্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হয়।

গেস্টাল্ট মতবাদ ও সামগ্রিকতা

শিক্ষাক্ষেত্রে একক শব্দটির বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষণ-পদ্ধতির ব্যাখ্যাকর্তারা স্ব-স্ব মতানুযায়ী এই একক শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। একক প্রসঙ্গে মাইকেলীজ (*Michaelis*) বলেছেন,[1] ইউনিট হল কতকগুলি সহজ, সরল অভিজ্ঞতার সযত্ন-বর্ধিত রূপমাত্র। বিশেষ বিষয়বস্তুর সঙ্গে এরা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং সমাজবিদ্যাপাঠের উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক। পক্ষান্তরে, কুক (*Kook*), বেক (*Beck*), এবং কেয়ার্নি (*Kearney*) বলেন,[2] অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক একক হল ছাত্র-শিক্ষক কর্তৃক পরিকল্পিত শিক্ষামূলক

---

1. "A unit is the social studies may be defined as a carefully developed series of childlike experiences, related to a particular topic and designed to contribute to the achievement of the purposes of the social studies."—*Michaelis.*

2. শিক্ষণ-প্রসঙ্গে ইতিহাস—হালদার, পৃঃ ১৯৬।

অভিজ্ঞতাবলী এবং ইহা শিশুর সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রয়োজন সিদ্ধির অনুকূলে রূপায়িত। এই পরিকল্পনার রূপায়ণ প্রসঙ্গে বস্তুভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে এমনভাবে কাজে লাগানো হয়, যেন বিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক ধারার উদ্দেশ্যাবলীর প্রয়োগ সার্থক হয়। একক সম্পর্কে জেরোলিমেক (*Jarolimek*) বলেন, একক হল শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিষয়বস্তু সংযোজনার উপায় মাত্র। এর দ্বারা শিক্ষার্থী শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সক্রিয়ভাবে শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মে অংশ গ্রহণ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যবিষয়বস্তুকে (Subject matter Content) বাস্তবে প্রয়োগ করে। এরূপ শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা তাদের আচার-আচরণ ও কৌশলকে এমনভাবে গোড়ে তোলে যেন, তারা নতুন পরিবেশে নতুন সমস্যার সঙ্গে আরও সার্থকভাবে সঙ্গতিস্থাপন করতে পারে। একক পদ্ধতির সংজ্ঞা নির্দেশ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ বসিং (*Bossing*) বলেছেন,—একক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে এমন কতকগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত সার্থক কর্মধারা অনুশীলন করতে হয় যার ফলে কর্মের মূল উদ্দেশ্যটি ভালভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়, শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর আচরণেও যথোপযুক্ত পরিবর্তন ঘটে। বস্তুতঃ যে কোন ব্যাপক বিষয়ের আলোচনার সময় বিষয়টিকে কয়েকটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা হয়। এই অংশগুলি মূল বিষয়ের এক-একটি একক। এককগুলি সামগ্রিকভাবে মূল বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করে এবং অখণ্ড ও অবিভাজ্য জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে।

একক পদ্ধতির স্বরূপ ও সংজ্ঞা

একক পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Unit Method) : একক পদ্ধতিতে পাঠ-পরিচালনা শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে করা হয়। পাঠ্যবিষয় অপেক্ষা অভিজ্ঞতার গুরুত্ব এখানে অনেক বেশী। এর ফলে শিক্ষার ফলশ্রুতি হল—প্রথমতঃ, শিক্ষার্থী বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা (Concept) ও রসানুভূতি (Appreciation) লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থী শিক্ষালাভের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক নৈপুণ্য (Skill) অর্জন করতে পারে। অবশেষে বিষয়বস্তুর সামগ্রিকতার ওপর বিশেষ উপলব্ধি (Understanding) এবং জ্ঞান (Knowledge) অর্জন করে শিক্ষার্থী পরম আনন্দলাভ করে।

অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া

একক পদ্ধতির প্রয়োগপ্রসঙ্গে পাঠ-পরিকল্পনার পূর্বে এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি জানা প্রয়োজন। একক পদ্ধতির **প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য** হল—(১) পাঠক্রমের সামগ্রিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠদানের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যটি বেশ সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করা হয়। বলা বাহুল্য, উদ্দেশ্যটি পুঁথিগত ও অবাস্তব না হয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে। (২) প্রশ্নের উত্তরদান, অনুলিখন, সংক্ষিপ্তকরণ, আলোচনা ও বিতর্কে যোগদান, পাঠাগারের ব্যবহার, কর্মস্থল পরিদর্শন প্রভৃতি শিক্ষার্থীর যাবতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টা ও আচরণ এই উদ্দেশ্যপূরণের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচালিত হবে। (৩) একক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় নানা প্রকার শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করা প্রয়োজন। (৪) মনে রাখা দরকার, একক পদ্ধতি একান্তই ছাত্রকেন্দ্রিক ও তার অভিজ্ঞতাভিত্তিক। তাই এই পদ্ধতি শুধু পঠন-পাঠনমূলক নয়, আচরণ ভিত্তিকও বটে। (৫) একক পদ্ধতিতে পাঠ-পরিচালনার সময় শিক্ষার্থীর বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন কতখানি হল, কতখানি স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হল—এর মূল্যায়ন সঙ্গে সঙ্গে করা হয়।

এই পদ্ধতির প্রয়োগ-মূলক বৈশিষ্ট্যগুলি

একক পদ্ধতিপ্রসঙ্গে পাঠ পরিকল্পনায় সাধারণতঃ **হার্বার্টের পঞ্চ-সোপান** অথবা তাঁর শিষ্যগণের ত্রিসোপান নীতি গৃহীত হয়। প্রতিটি পাঠ পরিকল্পনায় জ্ঞানের অখণ্ডতার ওপর জোর দেওয়া হয়। জন ডিউইও তাঁর সমস্যা-পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্দেশ্যভিত্তিক জ্ঞানানুশীলনের ওপরই গুরুত্ব দিয়েছেন। এরূপ বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ স্ব-স্ব চিন্তাধারায় জ্ঞানের সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তোলার দিকে বিশেষ জোর দেন। একক পদ্ধতির প্রয়োগপ্রসঙ্গে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে **ডক্টর হেনরী সি. মরিসন** (*Morrison*) বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর The Practice of Teaching in Secondary Schools গ্রন্থটির মাধ্যমে তিনিই প্রথম এই নতুন পদ্ধতিকে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের উপযোগী করে ব্যবহারিক বিধি প্রকাশ করেন। ডক্টর মরিশনের মতে পাঠ-পরিকল্পনায়—(১) আবিষ্কার (Exploration), (২) উপস্থাপন (Presentation), (৩) উপলব্ধি (Assimilation), (৪) সংগঠন (Organisation) এবং (৫) আবৃত্তি (Recitation)—এ পাঁচটি স্তর থাকবে।

পাঠ-পরিকল্পনা

কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা (Learning by doing) :

আধুনিক মনস্তত্ত্বভিত্তিক শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির অন্যতম ও অপরিহার্য লক্ষণ হল সক্রিয়তা (Activity) বা কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা। কিন্তু শিক্ষায় সক্রিয়তার প্রশ্ন কেন ?

কারণ সক্রিয়তা হল শিশুর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। শিশু স্বাভাবিকভাবে সদা চঞ্চল ও কর্মব্যস্ত। সে কিছুতেই দু-দণ্ড চুপটি করে বসে থাকতে পারে না। সে হাসে, কাঁদে, জিনিষ নিয়ে ভাঙ্গে-গড়ে, এক জায়গার জিনিষ অন্যত্র সরায়, বড়দের অনুকরণ করে নানা খেলা খেলে—ইত্যাদি। চিরচঞ্চলতা ও ব্যস্ততাই যেন তার জীবন। তাই সক্রিয়তাই (Activity) হল তার জীবনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। অফুরন্ত শক্তি যেন শিশুর দেহ-মনে বিরাজ করে। তাই সে বিশ্রাম বলতে কিছু বোঝে না। কর্ম-চঞ্চলতা ও ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে তার জীবন এগিয়ে চলে। কর্মের ভিতর দিয়েই তার দেহ-মনের বিকাশ সাধিত হয়। শিশুর এই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যকে অবহেলা করলে তার দেহ-মনের বিকাশ স্বাভাবিক হয় না। শিক্ষা হল শিশুর দেহ-মনের স্বাভাবিক বিকাশ ও বৃদ্ধি। তাই শিশুর শিক্ষার প্রয়োজনে তার স্বাভাবিক সক্রিয়তার পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করা চলে না।

গতানুগতিক শিক্ষায় শিশু ছিল অবহেলিত। সেখানে শিশুর কোন ভূমিকা ছিল না। শিক্ষকের পাণ্ডিত্য এবং বিষয়বস্তুর ভার-বোঝা ছিল শিক্ষাদানের উপায়। শিক্ষক তখন যা শেখাতে ইচ্ছা করতেন শিশুকে বাধ্য হয়ে তাই শিখতে হত। শিশুর স্বাভাবিক খেলাধূলা, চঞ্চলতা ও কর্মব্যস্ততাকে তখন আমল দেওয়া হত না। শিক্ষায় শিশুর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-অভিরুচি, আগ্রহ-প্রবণতার কোন স্থান ছিল না। শিশুর সক্রিয় প্রচেষ্টার দ্বারা তার সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশসাধন, তার স্বাভাবিক বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিয়ে কর্মশক্তি বিকাশের প্রচেষ্টা ইত্যাদি তখন শিক্ষকদের শিক্ষণ-প্রচেষ্টার বিষয়রূপে পরিগণিত হত না। তাই গতানুগতিক শিক্ষায় আরোপিত কর্ম শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক সক্রিয়তার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করত। গতানুগতিক শিক্ষা ছিল শিশুর স্বাভাবিক শিক্ষার প্রতিবন্ধক।

নব্য শিক্ষাতত্ত্বে শিশু আর অবহেলিত নয়। যে শিখবে সে কিছুই জানে না, তাই সে শিখবে। শিক্ষার্থীর দেহ-মনই হল শিক্ষালাভের পটভূমি।

পটভূমির অনুকূল বিষয় পরিবেশন করা বা কর্মের ব্যবস্থা করাই শিক্ষাদানের মূলকথা। তাই শিশু আজ শিক্ষণ প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় বিষয়। পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে গতানুগতিক শিক্ষা-চিন্তার আমূল পরিবর্তন এসেছে। এখন আর শিক্ষার্থীর নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা মাত্র নয়, তাকেও সক্রিয়ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষক শিশুকে বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদান না করে তিনি আজ সকল প্রকার কর্মমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করেন। নব্য শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষা আর জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে যদি বাস্তব জীবনের যোগসূত্র বজায় রাখতে হয় তবে শিক্ষার্থীকে সক্রিয়ভাবে অভিজ্ঞতা আহরণ করতে হবে। এই সক্রিয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়েই প্রবর্তিত হয়েছে খেলাভিত্তিক শিক্ষা। আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর খেলাসহ সকল কর্মমূলক প্রচেষ্টাকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, গতানুগতিক শিক্ষায় ব্যক্তি-বৈষম্যের নীতি অনুসৃত হত না। ফলে, শিশু-জনতার সামনে এক নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী উপস্থাপিত করে শিক্ষক শিক্ষাদান কার্য সমাপ্ত করতেন। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার ফলে আমরা জানতে পেরেছি যে, বিভিন্ন শিশুর মধ্যে সামর্থ্য ও গ্রহণ ক্ষমতার পার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং সমষ্টিগত বৈচিত্র্যহীন শিক্ষাসূচী শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে, কারণ এরূপ শিক্ষাসূচী ব্যক্তি-বিকাশের সহায়ক নয়। শিক্ষণের প্রকৃষ্ট নীতি হবে ব্যক্তির সামর্থ্য, গ্রহণ ক্ষমতা, চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করা। এক কথায় শিক্ষার নীতি হবে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যভিত্তিক।

ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যই হল আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের ভিত্তি। ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য কি? সক্রিয়তা বা স্বাভাবিক কর্মচঞ্চলতাই হল ব্যক্তি বা শিশুর বৈশিষ্ট্য। কর্মচঞ্চলতা বা সক্রিয়তা লক্ষ্য করে শিশুর মানসিক প্রবণতা ও আগ্রহ বিচার করা যায়। মনোবিজ্ঞানীরা শিশুর এই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি ক'রে অনুকূল শিক্ষার আয়োজন করতে বলেছেন। তাই নব্য শিক্ষাতত্ত্বে সক্রিয়তা-ভিত্তিক শিক্ষণ-পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। কারণ সক্রিয়তাই (Activity) হল শিশুর বৈশিষ্ট্য। শিশু নিজে কাজ করতে ভালবাসে। শিশুকে দিয়ে কাজ করানো অতি সহজ। শিশুর নিকট কর্মচঞ্চলতা হল সহজাত বিষয়। তবে তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করাই হল সমস্যা।

শিশুর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য শিক্ষাবিদরা বহুকাল ধরে গবেষণা করে আসছেন। **ফলে উদ্ভূত হয়েছে বিচিত্র শিক্ষণ পদ্ধতি**। আধুনিক এসব পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে সক্রিয়তার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক প্রগতিশীল পদ্ধতিগুলোতে সক্রিয়তার প্রভাব বিদ্যমান। শিক্ষার ইতিহাসে **রুশো** (*Rousseau*; 1712—1778) শিশুর স্বাভাবিক সক্রিয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে এক নতুন যুগের সূচনা করে গেছেন। গতানুগতিক, প্রাচীন ও অন্ধ বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে তিনিই প্রথম প্রচার করলেন শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার বৈপ্লবিক বাণী। তিনি তাঁর মানস পুত্র এমিলের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তিনটি সর্বজনগ্রাহ্য মৌলিক নীতির সন্ধান দিয়ে গেছেন : (ক) জন্মমুহূর্ত থেকে শিশুকে তার আচরণের স্বাধীনতা দিতে হবে। (খ) শিশুরা সক্রিয়ভাবে তাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং পুস্তকে বর্ণিত বিষয়বস্তুর মধ্যে তাদের শিক্ষা সীমিত থাকবে না। (গ) তারা প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনে হাতের কাজ শিখবে। রুশোর কথায় বলা যায়, 'প্রতিটি শিশুই থাকবে তার নিজস্ব শিক্ষক'। তাঁর বৈপ্লবিক শিক্ষাতত্ত্বে সক্রিয়তা (Activity) এবং স্বয়ং-ক্রিয়তার (Auto-education) ভাবধারা সুস্পষ্ট।

রুশো কেবল বৈপ্লবিক বাণী প্রচার করে গেছেন কিন্তু নীতিগুলির অনুশীলন করার চেষ্টা করেননি। পরবর্তীকালে তাঁর বিপ্লবী পথ ধরে এগিয়ে এলেন কয়েকজন শিষ্য। তাদের মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডের **জোহান হিনরিক পেষ্টালৎসীর** (*Johann Heinrich Pestalozzi*. 1764—1827) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি রুশোর শিষ্যসুলভ শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁর তত্ত্বগুলোকে পরিমার্জনা করে বাস্তবায়িত করেন। রুশো শিক্ষাকে শিশুর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ও সহজাত প্রবৃত্তির ওপর স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। আর পেষ্টালৎসী শিশুর সহজাত প্রবণতাকে যথাযথভাবে বিকাশসাধনের উপায়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাহলে শিক্ষককে শিশুমনস্তত্ত্ব জানতে হবে। শিশুমনের প্রয়োজন অনুসারে কর্মের যোগান দিতে হবে। এ ব্যাপারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই শিশুকে উৎসাহিত ও কর্মচঞ্চল করতে পারে।

এই সক্রিয়তা তত্ত্বের (Theory of Activity) ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী শিক্ষাবিদরা শিশু-শিক্ষার উপযোগী নানা পদ্ধতি আবিষ্কার ও প্রবর্তন করেছেন। আমরা এখানে কয়েকটি শিক্ষা-পদ্ধতি একে একে আলোচনা করব :

[১] **কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতি (Kindergarten System) ঃ**

জার্মান **শিক্ষাবিদ্ ফ্রয়েবেল** (1782—1852) ছিলেন এই পদ্ধতির উদ্ভাবক। কিণ্ডারগার্টেন পরিকল্পনা একটি দার্শনিক সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। শিশুর আত্মোপলব্ধি আসে তার অন্তর্নিহিত ক্রমবিকাশের মাধ্যমে। আর এই ক্রমবিকাশ সম্ভব হয় সক্রিয়তার মাধ্যমে। ফ্রয়েবেল তাকে বলেছেন 'আত্ম-সক্রিয়তা' (Self-activity)। এই সক্রিয়তা শিশুমনের ধর্ম। শিশুকে সক্রিয় করে তুলতে বাহ্যিক কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। স্বাভাবিকভাবে শিশুর জীবনে এই সক্রিয়তা বিদ্যমান। শিশুর সক্রিয়তা তার খেলাধূলা এবং অন্যান্য স্বতঃপ্রণোদিত কাজের মধ্যেই প্রকাশিত হয়; যেমন—নাচগান, আমোদ-প্রমোদ, চলাফেরা, কথাবার্তা, ছবি আঁকা, গল্প বলা প্রভৃতি কাজের মধ্যে। ফ্রয়েবেল বলেন : প্রতিটি শিশুর মধ্যে যে সৃজনশীলতা রয়েছে কাজের মধ্যে তার প্রকাশ ও পরিতৃপ্তি ঘটে। তাই তাঁর কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির একটা বৈশিষ্ট্য হল—ইন্দ্রিয়ানুভূতির অনুশীলন। নানা ধরনের কাজ ও বস্তুভিত্তিক পাঠের (objective lesson) দ্বারা শিশুর ইন্দ্রিয়চর্চা হয় এবং এটাই হল শিশু-শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি। পুস্তক পাঠের ওপর এ পদ্ধতি মোটেই গুরুত্ব প্রদান করে না। সকল প্রকার ঐক্যমূলক এবং সম্মিলিত কর্ম-প্রচেষ্টার ওপর কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাদান পদ্ধতি গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ইন্দ্রিয়ানুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করে তোলার জন্য ফ্রয়েবেল কয়েকটি নির্দিষ্ট বস্তুর উদ্ভাবন করেন এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিরূপে প্রয়োগ করেন। এগুলিকে তিনি **উপহার** (Gift) এবং **কাজ** (Occupation) বলে অভিহিত করেছেন। একটি গোলাকার বস্তু (Sphere), একটি ঘনক্ষেত্র (Cube) এবং একটি নলাকৃতি (Cylinder) বস্তু ছিল শিক্ষণ-প্রসঙ্গে প্রধান 'উপহার। এছাড়া অন্যান্য উপহারও ছিল। বিভিন্ন রঙ, আকৃতি, পরিমাণ ইত্যাদি শেখানোর জন্য এই উপহারগুলি খেলনারূপে ব্যবহার করা হত। কাজের সামগ্রীরূপে মাটি, বলি, কার্ডবোর্ড ইত্যাদি শিশুদের দেওয়া হত। এসব 'উপহার ও

কাজের' দ্বারা শিশুর সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিটি শিশু সক্রিয়ভাবে শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করে।

[২] **মণ্টেসরী** (Montessori Method):

ফ্রয়েবেলের মতো ইটালীয় **শিক্ষাবিদ্ মারিয়া মণ্টেসরী** (*Maria Mantessore*, 1870—1952) শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিয়ে নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তন করেছেন। আমরা তাকে **মণ্টেসরী পদ্ধতি** (Montessori Method) বলি। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের মূলকথা 'স্বাধীনতা প্রথম, স্বাধীনতা দ্বিতীয়, স্বাধীনতা শেষ'। রুশো, পেষ্টালৎসী, ফ্রয়েবেল প্রমুখ সকলেই শিক্ষায় শিশুর স্বাধীনতার কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু মণ্টেসরীর ন্যায় কেউই 'স্বাধীনতা' বিষয়টির বাস্তবধর্মী ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। তিনি বলেন সক্রিয়তা ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন। স্বাধীনতা বলতে সক্রিয়তাকেই বোঝায় আর এই সক্রিয়তা শিশুমনের স্বাভাবিক ধর্ম। শিশুর সক্রিয়তা স্বতঃপ্রণোদিত। তাই সক্রিরতাই স্বাধীনতার নামান্তর। মণ্টেসরীর এ ধরনের ব্যাখ্যাকে বলা হয় স্বয়ংশিক্ষা বা স্বয়ংক্রিয় শিক্ষাপদ্ধতি (Auto-Education)। শিশু তার বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিজেই শিক্ষা লাভ করবে। সক্রিয়তাই শিশুশিক্ষার মর্মবাণী।

মণ্টেসরী পরিকল্পনায় শিক্ষিকাকে বলা হয় পরিচালিকা (Directoress)। তিনি সহানুভূতিশীল, সদাহাস্যময়ী, তিনি দরদী মন নিয়ে শিশুর সহজাত বৃত্তি-গুলো কিভাবে বিকাশলাভ করে তা দেখবেন। তিনি নীরব দর্শকমাত্র। মণ্টেসরী ইন্দ্রিয়ানুভূতির অনুশীলন (Training of Senses) ও উৎকর্ষের জন্য বিজ্ঞান-সম্মত কতকগুলো যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন করেন। এগুলোকে বলা হয় শিক্ষামূলক সরঞ্জাম (Didactic Apparatus)। সাজসরঞ্জামগুলো দুভাগে বিভক্ত, যথা—ইন্দ্রিয়চর্চামূলক ও বুদ্ধিচর্চামূলক। প্রথম শ্রেণীর সাজসরঞ্জামগুলো দ্বারা সঠিক ও নিখুঁত প্রত্যক্ষণে ও ধারণা গঠনে সহায়তা করা হয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর সাজসরঞ্জাম লিখন, পঠন ও বুদ্ধির অনুশীলন মূলক কর্মে শিশুকে সাহায্য করে। শিক্ষায় উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই এই মণ্টেসরী পদ্ধতির মর্মবাণীকে মর্যাদা দেওয়া হয়। তবে দেশ ও কালের প্রয়োজন ও সুযোগ অনুসারে পদ্ধতি-প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক সাজ সরঞ্জামগুলির পরিবর্তন করা হয়।

[৩] সেবাগ্রাম পদ্ধতি (Sevagram Method) :

ব্রিটিশ শাসিত ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্দশা লক্ষ্য করে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রিকায় সর্ব প্রথম বুনিয়াদী শিক্ষার (Basic Education) পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। ঐ বছর ওয়ার্ধায় এক শিক্ষা সম্মেলনে গান্ধীজীর এই পরিকল্পনা সর্বসম্মত অনুমোদন লাভ করে। তাই বুনিয়াদী পরিকল্পনার অন্য নাম ওয়ার্ধা পরিকল্পনা (Wordha Plan)। ওয়ার্ধার সেবাগ্রাম ছিল এই নব পরিকল্পনার বাস্তবায়ণের কেন্দ্র। বুনিয়াদী শিক্ষাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ওই কেন্দ্রেই উদ্ভূত হল নতুন শিক্ষণ-পদ্ধতি। এই পদ্ধতি তাই সেবাগ্রাম পদ্ধতি নামে খ্যাত।

সেবাগ্রাম পদ্ধতিতে নিছক বক্তৃতা (Lecture) বা পুস্তক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি বর্জিত হয়। সেবাগ্রাম পদ্ধতির ভিত্তি হল শিল্পকেন্দ্রিক (Craft-Centred) শিক্ষা পদ্ধতি। একটি মৌলিক শিল্প সংক্রান্ত জ্ঞান থেকে শিক্ষার্থীরা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করবে। এই নতুন পদ্ধতিতে মূলতঃ অনুবন্ধ নীতি (Principle of Correlation) অনুসরণ করা হয়। এই নীতির পেছনে মনস্তাত্বিক সমর্থন রয়েছে। কারণ, লক্ষ্য করা যায় আমরা জ্ঞান অর্জনের জন্য ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি নানা শাস্ত্র পৃথক পৃথক ভাবে অধ্যয়ন করি, অথচ বিশ্বের জ্ঞান এক ও অখণ্ড। তাই উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। এই সম্পর্ক বজায় রেখে এক ও অখণ্ড জ্ঞান লাভের উপায় হল অনুবন্ধ নীতিতে পাঠচর্চা। তাই সেবাগ্রাম পদ্ধতির মূলসূত্র হিসেবে এই নীতি গৃহীত হয়েছে।

শিক্ষাকে শিল্পকেন্দ্রিক করার পেছনে দুটি কারণ প্রধানতঃ গান্ধীজীর মনে কাজ করেছিল : একটি হল (১) শিক্ষা হবে কর্ম-কেন্দ্রিক। শিশু স্বাভাবিক ও সক্রিয়ভাবে কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে, শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হবে। অন্যটি হল, (২) শিক্ষার দ্বারা শিশু শিল্পে দক্ষতা লাভ করবে। ভবিষ্যতে এ-শিল্পই হবে শিক্ষার্থীর বৃত্তি। সে হবে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল। এক কথায় এ-শিক্ষা হবে কর্মাংশ (Doing Part) ও চিন্তাংশ (thinking Part) সহযোগে বাস্তব ও জীবনমুখী। তাই সক্রিয়তা তত্ত্বের (Principles of Activity) ওপর ভিত্তি করে সেবাগ্রাম পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত।

সুতরাং কর্মের মাধ্যমে শিক্ষালাভের (Learining by doing) নীতি এই পদ্ধতিতে স্বীকৃত।

অবশেষে বলা যায়, গান্ধীজী পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ জনিত এই পদ্ধতির বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে। তাই নানা দিক থেকে সংশোধন ও আঞ্চলিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়; প্রথমতঃ, একটিমাত্র শিল্পের পরিবর্তে প্রয়োজনীয় একাধিক শিল্প শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, নির্দিষ্ট বৃত্তিতে অভ্যস্ত করার পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও বিকাশের চেষ্টা করা হচ্ছে। তৃতীয়তঃ, শিল্পকর্ম ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক বাঞ্ছনীয় কর্মের আয়োজন করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এক কথায় সংশোধিত সেবাগ্রাম পদ্ধতিতে কর্মভিত্তিকতা অক্ষুন্ন রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত। আজকাল প্রাথমিক স্তর ছাড়াও মাধ্যমিক স্তরেও কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা চলছে। উপরন্তু কর্মশিক্ষাকে (Work Education) সর্বাধুনিক পাঠ্যসূচীতে অবশ্য পাঠ্যবিষয়রূপে—মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

[৪] প্রকল্প-পদ্ধতি (Project Method) ঃ

প্রকল্প-পদ্ধতি কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তি প্রয়োগ করে বাস্তব পরিবেশে কর্ম সম্পাদনা দ্বারা মূর্ত ফলশ্রুতি লাভ করে। বাস্তব পরিবেশে কর্মরত মানুষকে দেখলে মনে হয় মানুষটির হস্তপদাদি বা অন্য কোন অঙ্গ কর্ম করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনই কাজ করায়। মানসিক প্রেরণা অনুসারে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রয়োজন মত বাস্তব দৃষ্টিতে কর্ম-সম্পাদনা করে। মন থাকে পঞ্চইন্দ্রিয়ের অন্তর্বিভাগে, তাকে দেখা যায় না। কিন্তু বাস্তবে এই অদৃশ্য মনই কাজ করায়, আর দেহ কাজ করে যায়। প্রকল্প পদ্ধতিতে মন ও দেহ—এ দুইয়ের পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব। তাই শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বাস্তব জীবন-প্রক্রিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

প্রকল্প পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা

ইংরেজী প্রোজেক্ট (Project) শব্দটি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হত ইঞ্জিনীয়ার বা সার্ভেয়ারদের কার্যাবলীর পরিকল্পনা প্রসঙ্গে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার

দিকে প্রোজেক্ট শব্দটি শিক্ষাচিন্তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মূলতঃ জন ডিউইর (*John Dewey*) প্রয়োগবাদকে (Pragmatism) ভিত্তি করেই এই প্রকল্প বা প্রোজেক্ট পদ্ধতির উদ্ভব। তিনি তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেন তাকে বলা হয় সমস্যা-পদ্ধতি (Problem Method)। শিক্ষার্থীরা স্বকীয় প্রচেষ্টায় ও পরিকল্পনায় সক্রিয়ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করবে—এটাই ছিল জন ডিউইর অভিপ্রায়। সাংগঠনিক জটিলতার জন্যই জন ডিউইর সমস্যা-পদ্ধতি সে যুগে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার জনক সেই জন ডিউইর সমস্যা-পদ্ধতি রূপান্তরিত হল প্রোজেক্ট-পদ্ধতি নামে। প্রোজেক্ট শব্দটির সংক্ষিপ্ত অর্থ হল কর্ম-সম্পাদন ও সমস্যার সমাধান। ডিউইর শিষ্য ও অনুগামী উইলিয়াম হার্ড কিলপ্যাট্রিক (*William Heard Kilpatric*) এই নতুন পদ্ধতির বাস্তবরূপ দিলেন। ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা কোন বিষয়ের সত্যতা নির্ণয় করাই হল এই পদ্ধতির মূল সূত্র।

প্রকল্প পদ্ধতির উদ্ভব

উইলিয়াম কিলপ্যাট্রিক ডিউই-প্রদত্ত প্রয়োগবাদের বাস্তব রূপ দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাঁর মতে, বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে সামাজিক পরিবেশে কর্ম-সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষাকর্মে (শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান) অগ্রসর হওয়ার প্রণালীকে প্রকল্প-পদ্ধতি বলা হয়।[1] ডক্টর ষ্টিভেনসন (*Dr. Stevenson*) আবার সমস্যা ও পটভূমির ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, প্রকল্প হল একটি সমস্যামূলক কর্ম, যাকে স্বাভাবিক পরিবেশে সম্পন্ন করা হয়।[2] কিলপ্যাট্রিকের উদ্দেশ্যমূলক কর্ম আর ষ্টিভেনসনের সমস্যামূলক কর্ম সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটি সম্পাদিত হবে সামাজিক পরিবেশে আর দ্বিতীয়টি সম্পাদিত হবে স্বাভাবিক পরিবেশে। স্বাভাবিক পরিবেশেই সমাজ পরিবেশ গড়ে ওঠে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে পরিবেশিক ভিত্তি সমান। এই সংজ্ঞা দুটির পরিপূরক-হিসেবে বসিং (*Bossing*) কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাটিও প্রণিধানযোগ্য।

প্রকল্পের সংজ্ঞা

1r "Whole-hearted purposeful activity proceeding in a social environment."—*Dr. Kilpatric.*

2 "A project is a problematic act, carried to completion in its natural setting."—*Dr. Stevenson.*

তিনি বলেন, প্রকল্প হল তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যামূচক কর্মের ব্যবহারিক বিষয়। শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে স্বকীয় পরিকল্পনা ও পরিচালনা দ্বারা প্রকল্পিত কর্ম সম্পাদন করে। তাদের অভিজ্ঞতার পরিপূর্তির জন্য বাস্তব সামগ্রী ব্যবহারেরও প্রয়োজন হয়।[1] পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলির ভেতর দিয়ে গতানুগতিক শিক্ষণ-পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। শিক্ষক-নির্দিষ্ট শিক্ষালাভের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যমূলক সমস্যামূচক কর্ম-সম্পাদনের জন্য স্বকীয় প্রচেষ্টায়, পরিকল্পনা ও পরিচালনায় শিক্ষালাভের পদ্ধতিটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রকল্পভুক্ত কর্ম হবে আনন্দবর্ধক ও উদ্দেশ্যসাধক। তাই এলোমেলো যে-কোন কর্মকে প্রকল্প বলা যায় না। প্রকল্প হল সেই জাতীয় কর্ম যা শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যসাধক সুপরিকল্পিত কর্ম-সম্পাদনার মাধ্যমে সূত্র-নির্ধারণ এবং জ্ঞান ও দক্ষতা লাভে সাহায্য করে।

প্রকল্প-পদ্ধতির সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে তিনটি মৌলিক নীতির (basic principles) সন্ধান পাওয়া যায়। **প্রথমতঃ**, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সৃষ্টিমূলক কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাস্তব পরিবেশে কর্মের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। **দ্বিতীয়তঃ**, প্রকল্প পদ্ধতি জীবন, সমাজ ও কর্মমুখী প্রচেষ্টায় অভিব্যক্ত। **তৃতীয়তঃ**, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বাহ্যিক প্রভাব (যেমন, শিক্ষকের প্রভাব) থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে স্বীয় কর্তব্যসাধনে অগ্রসর হতে পারে।

প্রকল্পের মৌলিক নীতি

প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Project)**ঃ** যে কোন একটি প্রকল্পকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে যে-সব বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় তা হল—

(ক) প্রকল্প-পদ্ধতির প্রথম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী। আধুনিক শিক্ষাদর্শনে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতা ও সক্রিয়তাই হবে শিক্ষার প্রধান বিবেচ্য বিষয়। প্রকল্প-পদ্ধতি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেই শিক্ষার্থী কি এবং কতটুকু শিখবে, নিজেই স্বাধীন

1. "The project is a significant, practical unit of activity of a problematic nature, planned and carried to completion by the students in a natural manner and involving the use of physical materials to complete the unit of experience."—*Bossing.*

ভাবে তা নির্ধারণ করে। তাই প্রকল্পে থাকে সমস্যা, আর সমস্যা সমাধানের পটভূমিতে থাকে বিশেষ উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিবিকাশের পরম সহায়ক। কিন্তু সমস্যার সমাধান সক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীকেই করতে হয়।

(খ) প্রকল্প-পদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল তার মনোবিজ্ঞানভিত্তিকতা। থর্নডাইক (*Thorndike*) প্রবর্তিত প্রচেষ্টা ও ভ্রান্তি মতবাদের (Trial and Error Theory) দ্বারা কিলপ্যাট্রিক বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং উহার মূল সূত্রগুলি তাঁর প্রকল্প-পদ্ধতিতে প্রয়োগ করেন। প্রচেষ্টা ও ভ্রান্তি মতবাদের প্রধান সূত্র হল তিনটি, যথা—প্রস্তুতি সম্বন্ধীয় নীতি (Law of Readiness), অনুশীলন সম্বন্ধীয় নীতি (Law of Exercise) এবং ফলশ্রুতি সম্পর্কিত নীতি (Law of Effect)। **প্রথম সূত্র অনুসারে** কোন কার্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তুতি থাকা চাই। যে কাজের জন্য শিক্ষার্থী প্রস্তুত নয় তাকে ঐ কাজে নিয়োগ করলে তার বিরক্তির উদ্রেক হয়। ফলে, শিক্ষণকর্ম সার্থক হয় না। প্রস্তুতির মূলে থাকে আগ্রহ। শিক্ষায় শিক্ষার্থীর কর্ম-সম্পাদনের জন্য আগ্রহ ও চাহিদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যের ওপর প্রকল্প-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। **দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে** যে কার্য স্বকীয় চেষ্টায় পুনঃ পুনঃ করা যায় তা সহজভাবে শেখা যায়। আলোচ্য প্রকল্পে বার বার প্রচেষ্টা-প্রয়োগের নির্দেশ থাকে। **তৃতীয় সূত্র অনুসারে** বার বার চেষ্টা করে যখন কোন সমস্যার সমাধানে কৃতকার্য হওয়া যায় তখনই আসে পরম তৃপ্তি। প্রকল্প পদ্ধতিতে এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যটিকে লক্ষ্য করা যায়।

(গ) প্রকল্পের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী। শিক্ষা হল ব্যক্তিসত্তা আর সমাজসত্তার মধ্যে সমন্বয়সাধন। এটাই হল জন ডিউইর শিক্ষাচিন্তার মূলকথা। এর ওপর ভিত্তি করে কিলপ্যাট্রিক ও ষ্টিভেনসন প্রকল্প প্রসঙ্গে যথাক্রমে সমাজ-পরিবেশ ও স্বাভাবিক পরিবেশের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বাভাবিক পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে সমাজ পরিবেশ গড়ে ওঠে। সামাজিক পরিবেশেই প্রকল্প রচিত ও পরিচালিত হয়। কোনরূপ কৃত্রিম বা অবাস্তব পরিবেশে প্রকল্প রচিত হলে শিক্ষাও হবে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন ও অবাস্তব। প্রকৃত শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে প্রকল্প হবে সর্বদা কর্মমুখী ও জীবনধর্মী।

প্রকল্পের বিভিন্ন স্তর (Steps in a Project) ঃ প্রকল্প-পদ্ধতি মূলতঃ চারটি স্তরে বিন্যস্ত। স্তরগুলি হল—(i) উদ্দেশ্য নির্ধারণ (purposing), (ii) পরিকল্পনা (Planning), (iii) কর্ম-সম্পাদনা (Executing) এবং (iv) সূত্র-নির্ধারণ ও ফলশ্রুতি বিচার (Judging)।

বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে বা কোন শিক্ষা-পরিবেশে পড়াশুনা, আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের প্রয়াস আসে শিক্ষার্থীর মনে। যেখানে কোন সমস্যা নেই সেখানে কোন প্রকল্প হয় না। সমস্যার পেছনে থাকে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ বা প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। আগ্রহ বা প্রেরণা না থাকলে উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক এমনভাবে কোন বিষয় আলোচনা করবেন যেন কোন সমস্যা এবং তার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হয়। তারা যেন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। তাই এই স্তরে উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত করাই যুক্তিযুক্ত।

উদ্দেশ্য নির্ধারণ

দ্বিতীয় স্তর হল উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কর্ম-সম্পাদনার উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন (Planning of the Project)। আগ্রহী শিক্ষার্থীরাই পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে কে কি করবে, কার দায়িত্ব কতটুকু সে সম্পর্কে নিজেরাই একটা খসড়া তৈরি করবে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কর্ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা থাকা চাই। তবে প্রয়োজন হলে তারা শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। তাই শিক্ষক সর্বদা তাদের সাহায্যের জন্য অন্তরালে অবস্থান করবেন। অযাচিত সাহায্য দানের প্রচেষ্টা প্রকল্পের বিশেষ উদ্দেশ্যকে ক্ষুন্ন করতে পারে। প্রকল্প-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল—এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর আগ্রহে গৃহীত ও পরিকল্পিত (pupil-planning)। উদ্দেশ্যমূলক কর্ম-সম্পাদনা নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে গৃহীত কোন পরিকল্পনার ওপর। সুতরাং এটি হল প্রকল্প পদ্ধতির দ্বিতীয় ধাপ।

পরিকল্পনা প্রণয়ন

প্রকল্প-পদ্ধতির তৃতীয় স্তর হবে কর্ম-সম্পাদনা। পূর্ব পরিকল্পিত বিষয়গুলিকে বাস্তবায়নের জন্য এই স্তরে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনমত হাতে-কলমে সুষ্ঠুভাবে কর্ম সম্পন্ন করবে। পূর্ব নির্ধারিত দল বা উপদল স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন

করার জন্য প্রয়োজন হলে একদিকে যেমন শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে, তেমনি, একদল অন্যদলের মতামত ও সক্রিয় সহযোগিতাও গ্রহণ করতে পারে। কর্ম-সম্পাদনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যেন শিক্ষার্থীরা দল ও উপদল নির্বিশেষে কাজটিকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এক ও অভিন্নরূপে কল্পনা করতে পারে এবং তারা যেন সামগ্রিক ঐক্য-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। কর্মের একাংশ শেষ করে কর্মীরা এগিয়ে যাবে পিছিয়ে পড়া দলকে সক্রিয় সহযোগিতার জন্য। সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনাকে রূপায়িত করাই হবে সকলের একান্ত প্রচেষ্টা।

কর্ম-সম্পাদনা

প্রকল্প-পদ্ধতির শেষ অঙ্কে থাকবে ফলশ্রুতি-বিচার বা সূত্র-নির্ধারণ। প্রকল্পের এই স্তরকে আমরা মূল্যায়ন নামেও অভিহিত করতে পারি। শিক্ষার্থীরা কি উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা রচনা করেছিল, পরিকল্পনা রূপায়ণে কি কি কর্ম সম্পাদন করতে হল, কর্ম-সম্পাদনে কি কি বাধা তাদের বিভ্রান্ত করেছে, কি উপায় অবলম্বন করলে সহজে কার্যসিদ্ধি সম্ভব হত, কর্মের ফলশ্রুতি কি হল ইত্যাদি বিষয় বিচার ও বিশ্লেষণ করা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই বিশেষ প্রয়োজন।

শেষ অঙ্কে ফলশ্রুতিবিচার

প্রকল্প-পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Project Method)ঃ প্রকল্প-পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের জন্য কয়েকটি স্তর অতিক্রম করা প্রয়োজন। **প্রথম স্তর** হল উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি। শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠন ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষক এমন পরিবেশ (Relevant Environment) গড়ে তুলবেন যেন কোন কাজ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে স্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হয়। পাঠ্যবিষয়ের কোন অংশ বা সমগ্র পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে যেন আগ্রহ জেগে ওঠে

এরূপ পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধতির **দ্বিতীয় স্তর** অর্থাৎ প্রকল্প নির্বাচন (Selection of Project) আপনা থেকে এসে পড়ে। নির্বাচিত প্রকল্প বা কর্মের সঙ্গে পাঠ্যবিষয়ের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় মূল পাঠ্যবিষয়ের পঠন-পাঠন-প্রক্রিয়া অগ্রসর হতে পারে না। এর ফলে শিক্ষাবর্ষের মধ্যে নির্দিষ্ট পাঠ শেষ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এরপর প্রকল্পের মৌলিক চারিটি স্তর (পূর্ব অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে আলোচিত) অতিক্রম করা সহজ হয়ে পড়ে।*

সবশেষে বলা যায়, প্রকল্প বা কর্ম-সম্পাদনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ (Recording) করা যুক্তিযুক্ত। বিবরণটি একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-প্রচেষ্টার অবদান, অন্যদিকে তেমনি এর দ্বারা মূল্যায়ন সূচক কার্যাদি যথাযথ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এইভাবে কয়েক বছরের সংগৃহীত বিবরণ পরবর্তী শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভে উৎসাহ-বৃদ্ধির পরম সহায়ক হবে—সন্দেহ নেই।

প্রকল্পের প্রকার ভেদ (Types of Project): প্রয়োগ-পদ্ধতির দিক থেকে বিচার করে কিলপ্যাট্রিক বিভিন্ন প্রকল্পকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। শ্রেণীগুলি হ'ল:

(১) **উৎপাদকের প্রকল্প** (Producer's Project): এই প্রকল্পে উৎপাদনমূলক কর্মের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর দ্বারা বস্তু ও চিন্তা উভয়বিধ উৎপাদন হতে পারে। যেমন, কুটির নির্মাণ, রাস্তা বা পুল নির্মাণ, কোন অভিনয়ের ব্যবস্থাপনা, উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি এ ধরনের প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। একে আমরা সংগঠন বা সৃষ্টিমূলক প্রকল্পও বলতে পারি।

(২) **ভোগকারীর প্রকল্প** (Consumer's Project): উৎপাদিত সামগ্রী যেমন ভোগপণ্য বলে গণ্য তেমনি ক্রেতারা ভোগকারী হিসেবে গণ্য হয়। এ ধরনের প্রকল্পে মূলতঃ শিক্ষার্থীরা ভোগকারীর ভূমিকা পালন করে। তাই এদেরকে উপভোগমূলক প্রকল্পও বলা যায়। যেমন, থিয়েটার দেখা ও শোনা, সঙ্গীতের রসস্বাদ উপভোগ করা, চলচ্চিত্রের সৌন্দর্য বিচার করা, গল্প শোনা ইত্যাদি এই প্রকল্পের শ্রেণীভুক্ত।

(৩) **সমস্যাসূচক প্রকল্প** (Problem Project): চিন্তা ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। শিক্ষার্থী এখানে স্বকীয় প্রচেষ্টায় সে-সব সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়। যেমন, দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি, জোয়ার-ভাঁটা, শীত-গ্রীষ্ম ইত্যাদি কেন হয়, ফল পড়লে মাটিতেই পড়ে, টাকা কোথা থেকে আসে, আইন কিভাবে ও কারা তৈরি করে ইত্যাদি সমস্যাসূচক প্রকল্পের শ্রেণীভুক্ত।

* প্রয়োগ প্রসঙ্গে উত্তর দানের সময় প্রকল্পের স্তরগুলি এখানে উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত।

(৪) **নৈপুণ্য অর্জনমূলক প্রকল্প** (Skill Project) : এ ধরনের প্রকল্পে মূলতঃ শিক্ষার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিকাশপ্রাপ্ত হয়। যেমন—সাইকেল, মোটর গাড়ি ইত্যাদি চালনা শিক্ষণ, মনে রাখার কৌশল শিক্ষণ, অঙ্কের অনুশীলন প্রভৃতি এই শ্রেণীর প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।

কোলিংস (*Collings*) প্রকল্পকে **পাঁচ ভাগে** ভাগ করেছেন। যথা—(১) আবিষ্কারের জন্য ভ্রমণ (Exploration), (২) সৃজন বা গঠন (Construction), (৩) সমাযোজন (Communication), (৪) ক্রীড়া (play) এবং (৫) নৈপুণ্য (Skill)।

তবে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কর্মের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকল্পকে মোট দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—(১) বুদ্ধিমূলক (Intellectual) এবং (২) কর্মমূলক (Executive)। প্রথমটি মানসিক চিন্তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, আর দ্বিতীয়টি শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কর্ম-সম্পাদনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

প্রকল্প-পদ্ধতির উপযোগিতা (Utility of Project Methods) : প্রকল্প-পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ও শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। পুঁথিগত বিদ্যার কর্মহীন পরিবেশে এনেছে ক্রিয়াশীল, সজীব প্রচেষ্টা। প্রকল্প-পদ্ধতির উপযোগিতা বিচারে নিম্নরূপ বিষয়গুলি সর্বথা উল্লেখযোগ্য :

প্রথমতঃ, প্রকল্প-পদ্ধতি নিজেই শিক্ষালাভের সূত্রের (Laws of Learning) ওপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার জন্য আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য শিক্ষক এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এরূপ পদ্ধতি শিক্ষালাভের মূল সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাই এর উপযোগিতা অনস্বীকার্য। প্রকল্পের মধ্যে আছে প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness), অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise) এবং ফলভোগের সূত্র (Law of Effect)। তাই শিক্ষার্থীরা প্রকল্প-পদ্ধতি দ্বারা আগ্রহ সহকারে কর্মে প্রবৃত্ত হয়, বার বার চেষ্টার মাধ্যমে কর্ম-সম্পাদন করে এবং সাফল্য থেকে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকল্পের তিনটি ধাপে শিক্ষার্থীদের মনন, চিন্তন, কর্ম-সম্পাদন ও অনুধাবন শক্তির বিকাশ সাধিত হয়। প্রকল্প-নির্বাচন, উদ্দেশ্য-নির্ধারণ,

কর্ম-সম্পাদন, সিদ্ধান্তে পৌছানো প্রভৃতি প্রতিটি স্তরের জন্ত শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট চিন্তাশীল হতে হয়। আবার প্রকল্পকে সার্থক করে তোলার জন্ত ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। এর দ্বারাই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়।

তৃতীয়তঃ, প্রকল্প-পদ্ধতিতে একটি সাধারণ (Common) উদ্দেশ্যসাধনের জন্ত গণতান্ত্রিক উপায়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষামূলক কর্ম-সম্পাদনার জন্ত দল ও উপদল নির্বিশেষে সকলের পারস্পরিক সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। প্রকল্পের কর্মে আছে শিক্ষার্থীর পূর্ণ স্বাধীনতা। স্বাধীনভাবে শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। ফলে, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সামাজিক ও নাগরিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে স্বনির্ভরতা ও দায়িত্বশীলতা গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে আদর্শ নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীরা অনেকগুলি বাঞ্ছনীয় গুণ অর্জন করে; যেমন, পরমত-সহিষ্ণুতা, সক্রিয় সহযোগিতা, সমবায়মূলক মনোভাব, নেতৃত্ববোধ, আত্ম-মর্যাদাবোধ ইত্যাদি। অনেকেই পরিকল্পনা রচনা করতে পারেন কিন্তু তার বাস্তব রূপায়ণ অতি কঠিন কাজ। প্রকল্প-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা পরিকল্পনা রচনা ও তাকে বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়ণের দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পায়। এককথায়, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও নাগরিক সত্তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়।

চতুর্থতঃ, এই পদ্ধতিতে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীরা শ্রেণী-পাঠের একঘেয়েমী থেকে রেহাই পায়, তেমনি গ্রন্থভুক্ত নির্জীব বিষয়ের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারে। তাই পাঠ্যবিষয় সহজে জীবন ও কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। ফলে, শিক্ষার্থী স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার পূর্ণ প্রয়োগের সুযোগ পায় এবং বিষয়-শিক্ষার জন্ত অধিক আগ্রহী হয়ে ওঠে। গতানুগতিক মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে যুক্তি ও নৈপুণ্য দ্বারা শিক্ষার্থীরা যেমন পাঠ্যবিষয়ের সমস্যা সমাধান করতে শেখে তেমনি বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধানেও দক্ষতা অর্জন করে। এভাবে প্রকল্পের কর্মধারা বাস্তব জীবনের সঙ্গে অন্বিত হওয়ায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর মনে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের অনুকূল প্রবণতা গড়ে ওঠে। তাই এর ফলে শিক্ষা হয় ক্রিয়াশীল, জীবন্ত ও সার্থক।

প্রকল্পের প্রয়োগ-সমস্যা ও ত্রুটি (Problems and Limitations in application of the Project Method) : প্রকল্প-পদ্ধতির স্বীকীয় উপযোগিতা ও গুণাবলী যথেষ্ট থাকলেও এর প্রয়োগ-সমস্যা শিক্ষাক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি করে। এই সমস্যাজনিত ত্রুটির ফলে প্রকল্প-পদ্ধতি শিক্ষাবিদদের চিন্তাজগতে স্থান পেলেও আজও বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। এর মূলে যেসব **গুরুত্বপূর্ণ অসম্পূর্ণতা** আছে তাহল :

প্রথমতঃ, প্রকল্প-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা উদ্দেশ্যের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে প্রকল্পের উপায় অর্থাৎ কর্ম-সম্পাদনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রকল্পের মূলে থাকে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য। তাই কর্ম-সম্পাদনা দ্বারা স্বভাবতই অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীরা আকৃষ্ট হওয়ায় শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যটি হয় অবহেলিত।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকল্প 'প্রচেষ্টা ও ভ্রান্তি' নীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। একটি পূর্ণ প্রকল্পকে বিভাজন করে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় প্রচেষ্টায় কর্ম সমাধা করে। এই অংশগত ও বিচ্ছিন্ন কর্ম-প্রচেষ্টার সমালোচনা করেছেন গেস্টাল্টবাদী (*Gestalt*) মনস্তাত্ত্বিকরা। তাঁরা বলেন, বারবার চেষ্টার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করা হয় তা বিচ্ছিন্ন এবং আংশিক। শিক্ষণের মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক পরিজ্ঞান (total insight)। এই সামগ্রিক পরিজ্ঞানই হল শিক্ষা। গেস্টাল্ট-মতবাদীদের যুক্তিতে অংশগত শিক্ষায় প্রকল্প-পদ্ধতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।

তৃতীয়তঃ, প্রকল্প-পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের প্রচুর শ্রম, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ও প্রতিভা। এ ধরনের দক্ষ শিক্ষক সহজলভ্য নয়। প্রকল্প সম্পর্কে ভুল ধারণা অনেক সময় শিক্ষককে ব্যর্থতার পথে চালিত করে। প্রকল্প ও সাধারণ কর্মের মধ্যে যে ব্যবধান আছে সেটাকে কোন কোন শিক্ষক অনুধাবন করতে পারেন না। তাঁরা মনে করেন কিছু হাতে কলমে করার মতো কাজ হলেই তাকে প্রকল্প নামে চালানো যায়। তাই অনভিজ্ঞ শিক্ষকের হাতে প্রকল্প শিক্ষামূলক না হয়ে প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

চতুর্থতঃ, প্রকল্প-পদ্ধতি অনুসরণ করা ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। এর জন্যে যে আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম, পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ এবং পর্যটন ইত্যাদির জন্য যে ব্যয় হয় তা বহন করা আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলির পক্ষে সম্ভব নয়।

পঞ্চমতঃ, বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত সকল প্রকার বিষয় প্রকল্প-পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়। আর যে-সব বিষয় শিক্ষার জন্য ধারাবাহিক-

অভ্যাসের প্রয়োজন সে-সব বিষয় শিক্ষার জন্য প্রকল্প-পদ্ধতি প্রয়োগ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তদুপরি উচ্চশ্রেণীর পাঠক্রমের অধিকাংশ বিষয়বস্তুকে প্রকল্প-পদ্ধতির সাহায্যে শেখানো সম্ভব নয়।

অবশেষে বলা যায়, বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট-বর্ষে পাঠক্রম শেষ করার জন্য যে সময়-তালিকা ব্যবহার করা হয় তা প্রকল্প-পদ্ধতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে মোটেই অনুকূল নয়। ফলে, বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যবস্থাপনা দ্বারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।

মন্তব্য: প্রকল্প-পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধার দুটি দিক আছে। একদিকে যেমন এই পদ্ধতির কতকগুলি উপযোগিতা বিদ্যমান, অন্যদিকে তেমনি এর প্রয়োগ-সমস্যা বিদ্যালয়ে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তবে উপযোগিতার বিচারে প্রকল্প-পদ্ধতিকে একেবারে বর্জন করা উচিত নয়। পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষ বিষয়গুলিকে এই পদ্ধতির মাধ্যমে অনুশীলনের ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, প্রকল্প-পদ্ধতি মূলতঃ যৌথ শিক্ষণ-প্রক্রিয়া। যৌথ শিক্ষণের ত্রুটিগুলিকেও ব্যক্তিশিক্ষণের প্রক্রিয়া দ্বারা দূর করা যায়। প্রকল্প পরিচালনার সময় শিক্ষার্থীদের সীমিত অভিজ্ঞতার ত্রুটি থাকলে শিক্ষকের সদা সতর্ক চেষ্টার দ্বারা এই পদ্ধতিতে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যেতে পারে।

বিদ্যালয় প্রকল্পের দৃষ্টান্ত: বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর শ্রেণীপাঠের মাধ্যমে স্বদেশ ও বিদেশের মানুষ ও সমাজ সম্পর্কিত বহুবিষয় অবগত হয়। অথচ তারা স্ব-স্ব অঞ্চল, গ্রাম বা শহরের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণাটুকু অর্জন করার সুযোগ পায় না। কিন্তু প্রতিটি শিক্ষার্থীকে নিজ-নিজ গ্রাম, শহর বা অঞ্চল সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করা সার্থক শিক্ষালাভের অপরিহার্য অঙ্গ। সুতরাং আমরা ইতিহাস শিক্ষণ-প্রসঙ্গে 'তোমাদের স্থানীয় ইতিহাস জানো' (Know your local History) বিষয়টির ওপর প্রকল্প গ্রহণ করতে পারি।

দৃষ্টান্ত: তমলুক হ্যামিলটন হায়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়—দশম শ্রেণী—সময় সরস্বতী পূজার ঠিক পরে—ইতিহাসের ক্লাস। শ্রেণীকক্ষে প্রকল্পের **উদ্দেশ্য নির্ধারণ** করা হল। [ইতিহাস পাঠ করে আমরা অনেক কিছু জেনেছি।

আমরা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নতুন সিলেবাসের ইতিহাস পড়ে আসছি। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছিল 'বঙ্গের ইতিহাস'। সপ্তম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আছে সমগ্র ভারত ও ভারতবাসীর ইতিহাস। মাঝে অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাসের শেষ অধ্যায় থেকে জেনেছি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রভাব। কিন্তু আমাদের বিদ্যালয় যে অঞ্চলে অবস্থিত তার ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থা, লোকসংখ্যা, স্কুল, কলেজ ইত্যাদির বিষয় সঠিক কিছুই জানি না। এযাবৎকাল আমরা সমগ্র দেশ ও দেশবাসীর কথা অথবা পরকেই জেনেছি, নিজেদেরকে জানতে পারিনি। তোমরা তমলুকের ছাত্র, তমলুককে জানবার উপায় নির্ধারণে তোমাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে।]

শিক্ষকের বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা 'তোমাদের স্থানীয় ইতিহাস জানো' প্রকল্পটির (project) সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করল। **এবার উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের** (Planning of the project) **পালা।**

দশম শ্রেণীর কুড়িজন ছাত্র। প্রতি চারজনকে নিয়ে পাঁচটি ইউনিট গঠন করা হল। তিন মাস সময়ের ভিত্তিতে কর্ম বণ্টনও করা হল। সপ্তাহের শেষ দুদিন শেষ দুটি পিরিয়ড তারা তথ্য সংগ্রহ করবে। শনিবার অতিরিক্ত একঘণ্টা কর্ম করার অনুমতিও দেওয়া হল। **কার্যাবলী :** (১) তমলুক বা তাম্রলিপ্তের নামের ইতিহাস ও তাৎপর্য, (২) স্থানটির পূর্ব ইতিহাস ও পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার, (৩) স্মৃতিস্তম্ভ, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, (৪) স্থানটি সম্পর্কে লৌকিক কাহিনী, (৫) বর্তমান লোকসংখ্যা, তাদের জীবিকা ও অর্থনৈতিক অবস্থা, (৬) যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা, (৭) স্কুল, কলেজ, সরকারী অফিস-আদালত, (৮) নতুন নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা, (৯) হলদিয়ার প্রভাব, (১০) শহরের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিবরণ লিখন।

দায়িত্ব বণ্টন : উপরোক্ত কার্যাবলীর দায়িত্ব পাঁচটি ইউনিটের ওপর অর্পিত হল। কিন্তু দায়িত্বের ভাগাভাগি হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিক কর্মের জন্য শ্রেণীকক্ষের সকল শিক্ষার্থীই দায়ী রইল।

পরিকল্পনা প্রণীত হল শিক্ষার্থীদের দ্বারা। শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনের প্রয়োজনে সংগৃহীত রেফারেন্স বইগুলি হল : (১) হুয়েন সাঙের বিবরণ (বিশ্বভারতী), (২) বৃহৎ তাম্রলিপ্তের ইতিহাস (যুধিষ্ঠির জানা), (৩) বাংলা

দেশের ইতিহাস (রমেশচন্দ্র মজুমদার), (৪) তমলুকের ইতিহাস (সেবানন্দ ভারতী), (৫) মাতঙ্গিনী হাজরা (নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়), (৬) বিপ্লবী মেদিনীপুর (বিনয়জীবন ঘোষ), (৭) মেদিনীপুর কাহিনী (প্রবোধ ভৌমিক)।

পরিকল্পনা প্রণয়নের পর এল **কর্ম-সম্পাদনার পালা**। প্রতিটি দলে একজন করে দলপতি নির্বাচন করা হল। প্রায় দুমাসের মধ্যে দলপতির নেতৃত্বে শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব দলীয় দায়িত্ব যেমন পালন করেছে, তেমনি পিছিয়ে পড়া দলকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সক্রিয় সাহায্য করেছে। শিক্ষার্থীরা এস ডি. ও., বি. ডি. ও., মিউনিসিপ্যালিটী, কলেজ, স্কুল, জনসংযোগ ও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। স্থানীয় শিক্ষিত প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছে তারা জিজ্ঞাসবাদ করে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ব-স্ব দলের বিবরণী তৈরি করেছে।

দুমাস পর এল **ফলশ্রুতি বিচারের পালা**। এবার পূর্ব নির্ধারিত দিনের শেষ দু' পিরিয়ড শিক্ষার্থীরা দলগত রিপোর্ট ও তাদের অভিজ্ঞতা পাঠ করতে শুরু করল। সব দলের রিপোর্টগুলো মিলিয়ে শিক্ষার্থীরাই রচনা করল একটি সামগ্রিক রিপোর্ট। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর সামনে মূল রিপোর্টটি পাঠ করা হল। সকলের অনুরোধক্রমে প্রধান শিক্ষক রিপোর্টটি পুস্তকাকারে ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। শিক্ষার্থীরা স্থানীয় অধিবাসী ও শিক্ষানুরাগীদের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করে প্রধান শিক্ষককে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল।

[৫] সমস্যা-পদ্ধতি (Problem Method) :

প্রকল্প-পদ্ধতির ন্যায় সমস্যা-পদ্ধতি বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের অন্যতম উপায়। এ-পদ্ধতি একমাত্র বা অনিবার্য না হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শিক্ষাদানকালে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে আলাপ-আলোচনা, কথাবার্তা বা বক্তৃতার মাধ্যমে অনুকূল শিক্ষা-পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এই পরিবেশে সবার অলক্ষে তিনি প্রশ্নের ছলনায় কোন একটা সমস্যাকে সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদের সম্মুখে তুলে ধরেন। পরিবেশ অনুকূল হলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে এবং সমস্যা অনুধাবন ও সমাধান করার চেষ্টা করে। শিক্ষক মহাশয়ের বুদ্ধি, যুক্তি ও পরিচালন ক্ষমতার ওপর সমস্যার গুরুত্ব ও তার সার্থক সমাধান নির্ভর করে। যদি তিনি সুস্পষ্ট ভাবায়

শৃঙ্খলার সঙ্গে সমস্যাটিকে শিক্ষার্থীদের নিকট পরিবেশন করতে পারেন তবেই এই পদ্ধতি-প্রয়োগে শিক্ষাদান-কার্য আকর্ষণীয় ও ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে পারে।

প্রকল্প ও সমস্যা-পদ্ধতির পার্থক্য (Problem and Project Methods differentiated) : উদ্দেশ্যপূর্ণ সমস্যা থেকে প্রকল্পের উদ্ভব। সমস্যা-পদ্ধতি আর প্রকল্প-পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকলেও এ দুটির প্রয়োগ পার্থক্য নিতান্ত কম নয়। হাতে-কলমে কর্ম-সম্পাদনা প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য। মানসিক চিন্তা, ধারণা এবং প্রেরণা দ্বারা শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি কর্মে প্রবৃত্ত হয়। মানুষের মনই হল শারীরিক সক্রিয়তার উৎস। মনের ক্রিয়াশীলতার অভাবে দেহও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে; কিন্তু দেহ অচল হলেও মন সচল থাকতে পারে। প্রকল্প ও সমস্যাসূচক পদ্ধতির ক্ষেত্রে শরীর ও মনের ক্রিয়াশীলতার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটির ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক শক্তি কর্ম-সম্পাদনে তৎপর হয় বটে, কিন্তু শারীরিক শক্তির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ প্রকল্পে কর্মই বড় কথা। দ্বিতীয়টির জন্য মানসিক চিন্তা, ধারণা, প্রেরণা প্রভৃতি বিমূর্ত শক্তির ক্রিয়াশীলতা পরিলক্ষিত হয়। সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন, মৌলিক উপকরণাদি সংগ্রহ, বিষয়বস্তুর সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্তে পৌছানো এবং তার পুনর্বিবেচনা নিছক মানসিক প্রক্রিয়া। এই দুটি পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রকল্প হল ব্যবহারিক সমাধান আর সমস্যাসূচক পদ্ধতি হল মানসিক সমাধান। প্রকল্প বাস্তব পরিবেশে ব্যবহারিক কর্ম সমাধানের পক্ষপাতী, আর সমস্যাসূচক পদ্ধতি পাঠানুশীলন ও গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অনুকূলে শিক্ষার্থীকে ব্যাপৃত করে।[1]

সমস্যা-পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Problem Method) : প্রকল্পের ন্যায় সমস্যা-পদ্ধতিতে শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তোলার জন্য —প্রথম, প্রয়োজন অনুকূল শিক্ষা-পরিবেশ সৃষ্টি করা। **দ্বিতীয়তঃ**, অনুকূল

---

1 "The problem methods differs from the project in that the emphasis in it is on the mental slution reached rather than on a practical accomplishment. Project method demands a practical accomplishment in a real situation and the problem method emphasises the mental conclusion that is drawn."—*Bining and Bining.*

পরিবেশে শিক্ষার্থীদের সামনে সমস্যাটিকে এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে, সমস্যাটির সমাধানের জন্যই তাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। বলা বাহুল্য, সমস্যাটিকে যাতে সুস্পষ্টভাবে শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখাই হচ্ছে শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব। সুস্পষ্টভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রেরণার স্বাভাবিক জাগরণ প্রয়োজন। মনে রাখা উচিত, জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কাজের দ্বারা শিক্ষাকর্ম সার্থক হতে পারে না। **তৃতীয়তঃ**, সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত করা একান্ত কর্তব্য। উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে সমস্যা-সমাধানে অগ্রসর হলে শিক্ষাদান কর্ম যথাসম্ভব সাফল্যের দিকে ধাবিত হয়। **চতুর্থতঃ**, সমস্যা-সমাধানের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীর নিজ চেষ্টায় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। প্রকল্প-পদ্ধতির ন্যায় সমস্যা-সমাধানের সুবিধার জন্য শিক্ষার্থীরা কয়েটি দল ও উপদলে বিভক্ত হয়। সংবাদ বা তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত বিষয়াদিকে সুসজ্জিত করা প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মসূচীর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় ভিন্ন ভিন্ন দলের ওপব। **পঞ্চমতঃ**, শিক্ষার্থীরা সমস্যা-সমাধানের কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা করে। **ষষ্ঠতঃ**, তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় ও সিদ্ধান্তগুলিকে সমবেতভাবে শ্রেণীকক্ষে পুনর্বিবেচনা, পর্যালোচনা ও পুনঃ পরীক্ষা করে কর্ম-সম্পাদন করে। সমস্যাসূচক পদ্ধতির **সর্বশেষ স্তরে** সমস্যা-সমাধানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টাকে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এই লিপিবদ্ধ বিবরণ বর্তমান শিক্ষার্থীদের কর্মের মূল্যায়ন ও পরবর্তী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী হিসেবে গণ্য হতে পারে।

প্রকল্পের ন্যায় সমস্যাসূচক পদ্ধতিতেও শিক্ষককে নীরব থাকতে হয়। শিক্ষক অযাচিতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজে বাধা সৃষ্টি বা মাঝপথে মন্তব্য করে কর্মের স্বচ্ছন্দ গতিকে নষ্ট করবেন না। এই পদ্ধতি পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয় বিষয়গুলি হল—**প্রথমতঃ**, তিনি সমস্যাটিকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। **দ্বিতীয়তঃ**, সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করে শিক্ষার্থীদের উপদেশ প্রদান ও পরিচালনার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবেন। **তৃতীয়তঃ**, সিদ্ধান্ত সংবলিত বিবরণ ও শিক্ষার্থীদের মানসিক কর্ম-প্রচেষ্টার মূল্যায়নের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য।

প্রকল্প, আবেক্ষণ পাঠচর্চা প্রভৃতি পদ্ধতির দোষগুণগুলি সমস্যাসূচক পদ্ধতিতেও বিদ্যমান।

[৬] ওয়ার্কশপ পদ্ধতি (Workshop Method):

ওয়ার্কশপ পদ্ধতি কর্মভিত্তিক পদ্ধতির একটি অন্যতম রূপ এবং সমস্যা ও প্রকল্প-পদ্ধতির সমগোত্রীয়। মূলতঃ, ওয়ার্কশপ পদ্ধতি আধুনিক শিল্প-সভ্যতার অবদান। সূক্ষ্ম শ্রমবিভাজন নীতিতে আধুনিক শিল্প পরিচালিত হয়। বৃহৎ শিল্প-কারখানায় দেখা যায় কোন পূর্ণাঙ্গ সামগ্রী তৈরির উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিককে ভিন্ন ভিন্ন অংশ তৈরির কাজে নিয়োগ করতে হয়। তাদের তৈরি অংশগুলি সংযোজন করেই পূর্ণাঙ্গ সামগ্রী উৎপাদিত হয়। শিক্ষণক্ষেত্রেও এই শ্রমবিভাজনের নীতি প্রয়োগ করাকে ওয়ার্কশপ পদ্ধতি বলা হয়। এর মধ্যে আছে ব্যক্তিগত ও যৌথ ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, ভাববিনিময়, শিক্ষাভিত্তিক সমস্যার অনুসন্ধান এবং যৌথভাবে শিক্ষাসূচক অভিজ্ঞতা অর্জন করার প্রচেষ্টায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করা।

ওয়ার্কশপ পরিচালনা (Workshop Procedure): ওয়ার্কশপ পরিচালনার জন্য প্রথম প্রয়োজন বিষয় (Topic) নির্বাচন। বিষয়টি নিশ্চয়ই পাঠ্যসূচীর বিষয়ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। নির্বাচনের প্রথম পর্বে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে কোন বিষয়কে সমস্যার আকারে প্রস্তাব করতে পারেন। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের মতামত গ্রহণ করা পদ্ধতির মৌলিক প্রক্রিয়া। শ্রেণীকক্ষের সকল শিক্ষার্থীর অভিমত গ্রহণে অসুবিধা থাকলে উপসমিতি সংগঠনের দ্বারা বিষয় নির্বাচন করা যেতে পারে। মূল বিষয় নির্বাচনের পর সেটিকে সমস্যার আকারে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করা যুক্তিযুক্ত। সমস্যার সংখ্যা অনুসারে দ্বিতীয় প্রয়োজন হল শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীকে সমসংখ্যক কার্যনির্বাহক দলে (Working Groups) বিভক্ত করা এবং এক একটি দলের ওপর এক একটি সমস্যা-সমাধানের ভার অর্পণ করা।

বিষয় নির্বাচন ও সমস্যা বিভক্তকরণ

কর্ম-সম্পাদন পর্বের প্রথম প্রতিপাদ্য বিষয় হল ওয়ার্কশপ পরিচালনার অনুকূল সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, শিক্ষোপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, রেফারেন্স পুস্তক, সহায়ক পত্রপত্রিকাদি সংগ্রহ এবং ঐগুলি ব্যবহারের অনুকূল ব্যবস্থাপনা। দ্বিতীয়তঃ, কর্ম-সম্পাদনের সময় শিক্ষক থাকবেন সমগ্র কর্মের পরিচালক (Director)। তাছাড়া, সমস্যা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞকে (Resource person) আমন্ত্রণ করা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞ বিষয়টি পর্যালোচনা করে শিক্ষার্থীদের কর্মে উৎসাহ

কর্ম-সম্পাদন

বৃদ্ধি করতে পারেন। তৃতীয়তঃ, প্রতিটি কার্যনির্বাহক সমিতিতে থাকবেন একজন ছাত্র-সভাপতি এবং একজন ছাত্র-রিপোর্টার। সভাপতি মাঝে মাঝে সমিতির সভা আহ্বান করে স্বীয় দলের সম্পাদিত কর্মের পর্যালোচনা করবেন এবং সামগ্রিক সমস্যার রিপোর্ট তৈরির কাজে সাহায্য করবেন। রিপোর্টার প্রদত্ত সমস্যার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করবেন। চতুর্থতঃ, খণ্ডিত সমস্যাগুলির সমাহারে সামগ্রিক বিষয়টি (topic) পর্যালোচনার জন্য শ্রেণীকক্ষে সাধারণ অধিবেশন বসবে। এখানে দলের ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্ট আলোচনান্তে তৈরি হবে সামগ্রিক বিষয়ের মূল রিপোর্ট। সবশেষে হবে ওয়ার্কশপ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কাজকর্মের মূল্যায়ন ও অর্জিত অভিজ্ঞতার পরীক্ষা। লিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এরূপ পরীক্ষা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

আবেক্ষণ পাঠচর্চা প্রথায় ওয়ার্কশপ পদ্ধতি পরিচালনা করা যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষক নির্দেশক, পরিচালক ও সংযোজকের ভূমিকা পালন করেন। প্রকল্প কিংবা সমস্যা পদ্ধতির দোষ-গুণগুলি এই ওয়ার্কশপ পদ্ধতিতেও বিদ্যমান।*

[৭] আবেক্ষণ পাঠচর্চা (Supervised Study):

আবেক্ষণ পাঠচর্চা ব্যক্তিশিক্ষণ নীতির অনুকূলে প্রয়োগশালা পদ্ধতির অন্য একটি রূপ। প্রয়োগশালায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট বিষয়ে বিদ্যাভ্যাস করতে পারে। এরূপ পাঠ-পরিচালনাকে আবেক্ষণ বা তদারকী বিদ্যাভ্যাস বলা হয়। ব্যক্তিগত পাঠনার প্রকৃষ্ট উপায় হল এই তদারকী পাঠচর্চা। আর্থার বাইনিং (*Arther C. Bintig*) এবং ডেভিড বাইনিং (*David H. Bining*) বলেন, তদারকী বিদ্যাভ্যাস দ্বারা আমরা বুঝি যে, শিক্ষার্থীরা তাদের টেবিল বা ডেস্কে শিক্ষাকর্মে রত থাকলে শিক্ষক উক্ত কাজের তদারক করবেন। এরূপ পাঠ-পরিচালনায় শিক্ষক পূর্বেই শিক্ষার্থীদের কর্মসূচী তৈরি করে দেন। সেই অনুসারে শিক্ষার্থীরা বিদ্যাভ্যাস করতে থাকে। কোন জটিল বা কঠিন সমস্যায় শিক্ষক তাদেরকে সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। প্রয়োজনে কর্মরত শিক্ষার্থীদের সাথে থেকে শিক্ষককে ঘুরে ঘুরে তাদের কর্মের তত্ত্বাবধান করতে হয়। তাদের পাঠচর্চা বা কর্ম ঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখতে হয়। সঠিক উপায়ে পাঠ-পরিচালনার জন্য শিক্ষককে

স্বরূপ

সংজ্ঞা

* প্রকল্প-পদ্ধতির দোষগুণ দ্রষ্টব্য।

সদা সজাগ থাকতে হয়। ম্যাক্সওয়েল (*Maxwell*) এবং কিলজার (*Kilzer*) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে আবেক্ষণ পাঠ-পরিচালনা হল শিক্ষার্থীর নীরব পাঠ আর বীক্ষণাগারে অনুশীলনের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ও ফলপ্রসূ নির্দেশ।[1]

উপযোগিতা (Utility) : তদারকী পাঠচর্চার সুফল বহুবিধ। **প্রথমতঃ**, এর ফলে শিক্ষার্থীরা বর্ণনাধর্মী পাঠ-পরিচালনার একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পায়। শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও কর্মপ্রবণতার সাথে শিক্ষকের তদারকী কর্ম যুক্ত হওয়ায় বিশুদ্ধ পাঠচর্চার পথ সুগম হয়। **দ্বিতীয়তঃ**, এই পদ্ধতিতে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর নিকট সান্নিধ্যে আসতে হয়। ফলে, ব্যক্তিবৈষম্য নীতি অনুসারে পাঠ-নির্দেশ-দানের অপূর্ব সুযোগ থাকে ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক মধুর হয়ে ওঠে। আদর্শ শিক্ষকের প্রভাব শিক্ষার্থীর জীবনধারায় যথেষ্ট ক্রিয়াশীল হয়। **তৃতীয়তঃ**, প্রয়োগশালায় কর্মরত শিক্ষার্থী অসুবিধার সম্মুখীন হলে শিক্ষক নিজেই সাহায্য করতে পারেন ; অথবা, তিনি কোন অগ্রসর শিক্ষার্থীকে অনগ্রসর বন্ধুর সাহায্যার্থে নির্দেশ দিতে পারেন। ফলে, শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পারস্পরিক সাহায্যে পাঠ-পরিচালনা করতে পারে। **চতুর্থতঃ**, তদারকী পাঠচর্চায় শিক্ষার্থী সহজে গবেষণামূলক কর্মে তৎপর হয়ে ওঠে। এতে ভবিষ্যতে তাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথ সুগম হয়।

অন্তরায় ও সংশোধন (Limitation and Remedy) : তদারকী পাঠচর্চার যথেষ্ট উপযোগিতা থাকলেও এই পদ্ধতির কয়েকটি ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। **প্রথমতঃ**, এই প্রণালী স্বল্পমেধা ও অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী। কিন্তু অগ্রসর শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি কর্মরত থাকলে অনেক সময় অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের মধ্যে হীনমন্য মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। **দ্বিতীয়তঃ**, এই কৌশল প্রয়োগ যথেষ্ট ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ। আমাদের দেশের অর্থ-সংকট শিক্ষা-সংস্কার ও পুনর্গঠনের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক। জনসাধারণ ও সরকারের যুগ্ম চেষ্টা ব্যতীত এ বাধা দূর হতে পারে না। কিন্তু এ বাধা তদারকী প্রথা বা কৌশলের নিজস্ব ত্রুটি নয়। তবে এ প্রণালী প্রয়োগে সময় যথেষ্ট লাগলেও উপযোগিতা যখন আছে তখন শ্রেণী-পাঠনার পরিপূরক হিসেবে পাঠ্যসূচীর কিছু কিছু অংশের জন্য আবেক্ষণ পাঠন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

1. "Supervised study is the effective direction and oversight of the silent study and laboratory activities of pupils"—*Maxwell*

[৮] আবিষ্কার পদ্ধতি (Heuristic Method) :

আবিষ্কার পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের তাৎপর্য হল শিক্ষক শিক্ষার্থীকে আবিষ্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করিয়ে দেবেন। শিক্ষকের নির্দেশমত শিক্ষার্থী নিজেই পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। তাই শিক্ষাদানের এই প্রণালীকে আবিষ্কার পদ্ধতি বলা হয়।

আবিষ্কার পদ্ধতি কাকে বলে ?

ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয় শিক্ষণের ক্ষেত্রে আবিষ্কার পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। পুস্তকে লিখিত বিষয়কে নির্বিচারে গ্রহণ করার অর্থ হল সন্দেহমূলক বিষয়কে প্রশ্রয় দেওয়া ও পরনির্ভর হওয়া। সুতরাং পাঠ্যবিষয়ের ঘটনাগুলি সত্য-মিথ্যা, সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দেহ মুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিচার-বিশ্লেষণের দক্ষতা অর্জন করা শিক্ষার্থীর নিকট অপরিহার্য কাজ। আবিষ্কার পদ্ধতি শিক্ষার্থীর এই কৌশল ও দক্ষতা অর্জনের সাহায্য করে। অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থী পাঠ্য বিষয় বিচার করে অজানাকে জানতে পারে ও বৈজ্ঞানিকের ন্যায় নতুন আবিষ্কারের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গতঃ শিক্ষাবিদ রাইবার্নের (*Ryburn*) কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, আবিষ্কার পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব প্রচেষ্টায় নতুন পথের সন্ধান করে এবং সব ব্যাপারে অগ্রণী হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রচেষ্টাই হল জ্ঞানার্জনের মৌল ভিত্তি। তাই জ্ঞানার্জনে উৎসুক অনগ্রসর শিক্ষার্থীরাও কর্মচঞ্চল, স্বাধীন ও শ্রমশীল হয়ে ওঠে। অধ্যাপক জন ডিউই (*John Dewey*) বলেন, চিন্তার বিপরীত দিক হল জড়তা। এই জড়তা শুধু অকৃতকার্যতার লক্ষণ নয়—বিচার-শক্তি ও অনুধাবনের ক্ষমতাকে পঙ্গু করে, ঔৎসুক্যকে খর্ব করে, মনকে নির্বিকার ও জ্ঞানলাভের কর্মকে নিরানন্দময় করে তোলে। বলা বাহুল্য, আবিষ্কার পদ্ধতির মৌলিক শক্তি হল এই চিন্তা, বিচার, অনুসন্ধিৎসা ও আনন্দ।

আবিষ্কার পদ্ধতির প্রয়োগ সার্থকতা

আবিষ্কার পদ্ধতি সকল প্রকার (প্রয়োগশালা, উৎস, ডাল্টন প্লান, আবেক্ষণ পাঠচর্চা প্রভৃতি) পদ্ধতির সারমর্ম (Essence of all methods) হিসেবে গৃহীত। বস্তুতঃ, আবিষ্কার পদ্ধতি পৃথক কোন পদ্ধতি নয়। শিক্ষার্থীকে আবিষ্কারকের ভূমিকা পালন করাবার জন্য যেসব প্রক্রিয়াকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় সে-সবের সমষ্টি হল এই আবিষ্কার পদ্ধতি। সুতরাং একে পদ্ধতি না বলে নীতি বা প্রণালী বলাই যুক্তিযুক্ত।

[৯] ডাল্টন পরিকল্পনা (Dalton Plan) ঃ

ডাল্টন পরিকল্পনা প্রয়োগশালা (Laboratory) পদ্ধতির অন্যতম রূপ। মিস হেলেন পার্কহাষ্ট (*Miss Helen Parkhust*) এই পদ্ধতির উদ্ভাবক। তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ম্যাসাচুসেট রাজ্যের ডাল্টন শহরে এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়ণের চেষ্টা করেন। স্থানটির নাম অনুসারে এই নতুন পদ্ধতিটি ডাল্টন পরিকল্পনা নামে খ্যাত। প্রকৃতপক্ষে পদ্ধতিটির বৈশিষ্ট্য অনুসারে একে প্রয়োগশালা পদ্ধতি (Laboratory Method) নামেও অভিহিত করা যায়।

নামকরণ

এই পরিকল্পনার প্রধান প্রধান বিষয় হল : (১) শিক্ষক এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থীগণকে এক বা একাধিক মাসের কাজ (assignment) নির্দিষ্ট করে দেন এবং স্বাধীনভাবে স্বচেষ্টায় তাদেরকে তা শিখতে বলা হয়। (২) এর জন্য সমগ্র বিদ্যালয়টিকে প্রয়োগশালায় রূপান্তরিত করা হয়। প্রয়োগশালার প্রয়োজন অনুসারে শ্রেণীকক্ষে বিষয়-শিক্ষার উপযোগী পুস্তক-পুস্তিকা ও শিক্ষা-সহায়ক উপকরণাদি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। (৩) পাঠ-পরিচালনার জন্য কোন সময়-তালিকা থাকে না। শিক্ষার্থী নিজস্ব চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে যতক্ষণ ইচ্ছা এই শ্রেণীকক্ষে (প্রয়োগশালায়) পড়াশুনা ও আনুষঙ্গিক কাজকর্ম করতে পারে। (৪) শিক্ষক থাকেন কক্ষান্তরে। তবে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা পরামর্শ দিতে পারেন। তাই শিক্ষার্থীর সাহায্যার্থে তাঁকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়। (৫) এই পদ্ধতিতে পৃথক কোন মূল্যায়ন বা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার্থীর কাজকর্ম ও পাঠোন্নতি (Progress) অনুসারে শিক্ষক লেখচিত্র (Graph) প্রস্তুত করেন। তিন ধরনের লেখচিত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ কাজের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করার জন্য দু-ধরনের লেখচিত্র ব্যবহার করে। এর দ্বারা তারা জানতে পারে যে চুক্তিবদ্ধ কাজে তারা কতদূর অগ্রসর হল। আর শিক্ষক রাখেন এক ধরনের লেখচিত্র। এর দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকর্মের ক্রমন্নতির বিষয়টি লক্ষ্য রাখেন। তবে চুক্তিবদ্ধ কর্ম সম্পাদিত না হলে শিক্ষার্থীরা নতুন কোন বিষয় শিক্ষার চুক্তিতে যেতে পারে না।

স্বরূপ

ডাল্টন পরিকল্পনার **প্রধান বৈশিষ্ট্য** হল, পদ্ধতিটি সরাসরি ব্যক্তিবৈষম্য (Individual difference) নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ নিজস্ব রুচি, গ্রহণ-ক্ষমতা, চাহিদা অনুসারে বিষয় বেছে নেবে এবং কর্মসম্পাদনার জন্য পরিকল্পনা রচনা করবে।

পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যাবলী

দ্বিতীয়তঃ, ডাল্টন পরিকল্পনায় শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীগত শিক্ষণের কোন স্থান নেই। এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ বর্তমান। এগুলি গবেষণাগারে রূপান্তরিত হয়। এখানে শিক্ষার্থী নিজেই নিজ কর্মের গবেষক। শিক্ষক এখানে সহায়ক মাত্র। **তৃতীয়তঃ**, ডাল্টন পরিকল্পনায় রয়েছে অবাধ স্বাধীনতা। এখানে শিক্ষার্থী নিজেই তার শিক্ষার নিয়ন্ত্রক এবং পরিচালক। কর্মসম্পাদনের দায়িত্ব শিক্ষার্থীর। তাই শৃঙ্খলাভঙ্গের অবকাশ এখানে নেই। **অবশেষে** বলা যায়, সহযোগিতা এই পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার্থীরা যেমন শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করতে পারে তেমনি শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সাহায্যও এক্ষেত্রে সর্বদা কাম্য।

ডাল্টন পরিকল্পনার দোষ-গুণ (Merits and demerits of Dalton Plan)ঃ ডাল্টন পরিকল্পনার **গুণগুলি** (Merits) হল :

(ক) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী স্বকীয় গতিতে স্বচেষ্টায় স্বাধীনভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়।

(খ) প্রয়োগশালায় রূপান্তরিত শ্রেণীকক্ষগুলি বিষয়-শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে ও শিক্ষার্থীকে কর্মে আগ্রহী করে তোলে।

(গ) শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত প্রবণতা ও প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষকের সাহায্য পেতে পারে। শিক্ষকও স্ব-স্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ায় তাঁর নিকট থেকে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপর গভীর জ্ঞানার্জনের সুযোগ পায়।

(ঘ) শিক্ষাকর্ম গ্রহণের পূর্বে প্রতিটি শিক্ষার্থী বিষয়শিক্ষকের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার অঙ্গীকারে কাজ আরম্ভ করে ও শেষ করতে চেষ্টা করে। এরূপ কাজের দ্বারা শিক্ষার্থী দায়িত্বশীল, আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মবিশ্বাসী হওয়ার সুযোগ পায়।

(ঙ) পাঠোন্নতির লেখচিত্র (Graph) লক্ষ্য করে শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় উৎসাহী হয় এবং স্ব-স্ব কর্মের প্রগতি সহজে বুঝতে পারে।

(চ) অবশেষে বলা যায়, স্ব-স্ব কর্ম-সম্পাদনার দ্বারা শিক্ষার্থীরা যে আত্মতৃপ্তি লাভ করে তার তুলনা হয় না।

দোষ (Demerits) : সুবিধা অনেকগুলি থাকলেও ডাল্টন পরিকল্পনায় শিক্ষার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়। শিক্ষার মৌল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে সমাজের আদর্শ সভ্য ও রাষ্ট্রের সুনাগরিক রূপে গড়ে তোলা। এই পদ্ধতিতে এই উদ্দেশ্য পরিপূর্ণতা লাভ করে না।

দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতি মেধাবী শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযুক্ত হলেও অনগ্রসর ও সাধারণ শিক্ষার্থীর নিকট ততটুকু উপযোগী নয়।

তৃতীয়তঃ, এই পরিকল্পনায় সময়-তালিকার অভাব থাকায় বিদ্যালয়ে সহজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।

চতুর্থতঃ, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা কেবল পড়তে, বুঝতে ও লিখতে শেখে। কিন্তু শুনে অনুধাবন করা এবং মুখে ব্যক্ত করার অভ্যাস থেকে তারা বঞ্চিত হয়।

পঞ্চমতঃ, এই পদ্ধতি বৈচিত্র্যহীন, নিতান্ত একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর। অল্পবুদ্ধি শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতিতে আশানুরূপ শিক্ষালাভে অগ্রসর হতে পারে না।

অবশেষে বলা যায়, ডাল্টন পরিকল্পনা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। তাই আমাদের দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্যে এরূপ পদ্ধতি প্রচলন করার চিন্তা স্বপ্ন মাত্র।

সংশোধিত ডাল্টন পরিকল্পনা (Modified Dalton Plan) **:** মূল ডাল্টন পরিকল্পনার ত্রুটিগুলি সংশোধন ক'রে তাকে স্থানীয় প্রয়োজনের অনুকূলে প্রয়োগ করা চলতে পারে। শ্রেণী-শিক্ষণের পরিপূরক হিসেবে এই পরিকল্পনার প্রয়োগ যথেষ্ট উপযোগী। শিক্ষাবর্ষের কিছুকাল শ্রেণী-পাঠনা ও বাকি সময়টুকু ব্যক্তিগত পাঠনার জন্য ডাল্টন পরিকল্পনাকে সংশোধিত করে ব্যবহার করা চলে। সংশোধিত পরিকল্পনায়—(১) সময়-তালিকা থাকবে এবং সেই অনুসারে বিদ্যালয়ে যথারীতি ঘণ্টাও বাজবে। (২) নীরব দর্শক না হয়ে শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় সহযোগী, বন্ধু ও দায়িত্বশীল পরিচালক হতে হবে। (৩) শিক্ষার্থীর শিক্ষায় অগ্রগতির পরিমাপের জন্য লেখচিত্র ছাড়াও পৃথক মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্যে মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষায়

সমন্বয় সৃষ্টি করা যেতে পারে। এইভাবে মূল ডাল্টন পরিকল্পাকে সংশোধন করে আঞ্চলিক প্রয়োজনের অনুকূলে প্রয়োগ করলে শিক্ষাদান-প্রক্রিয়া সার্থক হবে—এতে কোন সন্দেহ নেই।

[১০] বাটাভিয়া প্রণালী (Batavia System) ঃ

শ্রেণী-শিক্ষণ ও ব্যক্তি-শিক্ষণ উভয় এককের মধ্যে যেমন ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় তেমনি উভয়ের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। আবার উভয় এককের উপযোগিতাগুলিকে সন্নিবেশ করতে পারলে নতুন একটি ত্রুটিহীন শিক্ষণ-প্রণালী গড়ে উঠতে পারে। এই চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে (১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে) নিউইয়র্কের বাটাভিয়া স্কুলসমূহের সুপারিণ্টেনডেণ্ট জন কেনেডি (*John Kenedy*) একটি নতুন প্রণালী প্রবর্তন করেন। আঞ্চলিক নামানুসারে প্রণালীটির নাম হয় বাটাভিয়া প্রণালী। তিনি ব্যক্তি-শিক্ষণের সাথে শ্রেণী-শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেছিলেন। তাই উভয় এককের বৈশিষ্ট্যাবলী বাটাভিয়া প্রণালীতে বিদ্যমান।

এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলী হল ঃ (ক) এই প্রণালীতে দৈনন্দিন পঠন-পাঠন ব্যবস্থা বিদ্যমান। এখানে শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত শিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

(খ) শিক্ষক এই প্রণালীতে শিক্ষার্থীর সকল দুর্বলতার কারণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা স্থির করেন। তারপর দৈনন্দিন কর্মসূচী নির্ধারণ করে শিক্ষার্থীকে কাজে যোগদান করতে বলা হয়।

(গ) পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষকরা এমনভাবে সাহায্য করেন যেন তারা অগ্রসর শিক্ষার্থীদের সমমানসম্পন্ন হতে পারে। প্রয়োজন হলে শিক্ষকরাও হাতে-কলমে কাজ করে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করেন। এই প্রণালীতে শিক্ষার মান-নির্ণয়ের জন্য নির্ধারিত পরীক্ষা-ব্যবস্থা যথেষ্ট কঠিন।

[১১] উইনেটকা পরিকল্পনা (Winnetka Plan) ঃ

ডাল্টন পরিকল্পনার প্রবর্তক হেলেন পার্কহাষ্ট-এর ন্যায় কার্ল ওয়াসবার্ন (*Carl Washburne*) ছিলেন শ্রেণীগত শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার বিরোধী। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যক্তি-শিক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে উইনেটকা শহরের একটি বিদ্যালয়ে যে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন তার নাম উইনেটকা পরিকল্পনা।

নামকরণ

পাঠক্রম ঃ এই পরিকল্পনায় পাঠ্যসূচীকে মূলতঃ দুভাগে ভাগে ভাগ করা হয়েছে। **প্রথমটি হল সাধারণ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়** (common essentials)। এই অংশটি সকল শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সমানভাবে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

সাধারণ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়

এই অংশের জন্য ডাল্টন পরিকল্পনার মত একক বিভাজন (Unit division) এবং কর্মবণ্টন (assignment) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। পাঠ্যতালিকার এই অংশটিকে প্রথমতঃ কতকগুলি এককে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি এককের জন্য শিক্ষার্থীর হাতে দেওয়া হয় কর্ম-তালিকা (assignment sheet)। তালিকাভুক্ত কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব কর্মের ফলাফলের (উত্তরের) সঙ্গে শিক্ষকের প্রদত্ত উত্তরটিকে মিলিয়ে নেয়। ভুল থাকলে পুনরায় শিক্ষার্থী তা সংশোধন করে। এভাবে শিক্ষার্থী তালিকাভুক্ত কর্মগুলি সম্পাদন করে ও শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করে। পরীক্ষায় কৃতকার্য শিক্ষার্থীকে নিজের আগ্রহ ও অভিরুচি অনুসারে নতুন একক ও কর্মতালিকা বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

সময়-তালিকার সাধারণ অত্যাবশ্যকীয় কর্ম-সম্পাদনের নির্দেশ থাকে দিনের প্রথম অংশে। ব্যক্তিগত-শিক্ষণ পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যতালিকার এই অংশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য।

পাঠ্যতালিকার **দ্বিতীয় অংশটি হল দলগত কার্যানুষ্ঠান** (Gruop Activities)। এখানে সমাজধর্মী ও সৃষ্টিমূলক কার্যাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে থাকে নাচ-গান, অভিনয়, খেলাধূলা, চিত্রাঙ্কন, দেওয়াল পত্রিকার কাজ, সভা-সমিতি, বক্তৃতা, ভ্রমণ প্রভৃতি। দিনের শেষ অংশে শিক্ষার্থীরা সমাজ ও কর্মমূলক এইসব বিষয়গুলি সমবেত বা দলগত ভাবে সম্পাদন করে। এই অংশের জন্য পরীক্ষার কড়াকড়ি থাকে না। পাঠ্যতালিকার এই অংশের শিক্ষণীয় বিষয়ের লক্ষ্য থাকে শিক্ষার্থীর সামাজিক সত্তার পূর্ণ বিকাশ।

দলগত কার্যানুষ্ঠান

উইনেটকা পরিকল্পনার উপযোগিতা ও মূল্যায়ন ঃ (ক) উইনেটকা পরিকল্পনায় গতানুগতিক শ্রেণীশিক্ষণ প্রণালী পরিত্যক্ত হলেও স্বাধীন শ্রেণীশিক্ষণ প্রথা (free system of class instruction) সমাদরে গৃহীত হয়েছে। এই প্রথায় একজন শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট ঘণ্টায় বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ শ্রেণীপ্রথা

এখানে নির্দিষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ: উইনেটা পরিকল্পনায় একটি শিক্ষার্থী ভূগোলে যে শ্রেণীতে পড়ে, অঙ্কে হয়ত উচ্চতর শ্রেণীতে পড়াশুনা করতে পারে আবার ইতিহাসে বিষয়টিতে সে নিম্ন মানের শ্রেণীতে পড়তে পারে।

(খ) এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থী তার নিজস্ব ক্ষমতা ও আগ্রহ অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট এককের ওপর কাজ করে। এতে তার যেমন আছে স্বাধীনতা তেমনি আছে ভুল সংশোধনের সুযোগ।

(গ) উইনেটকা পরিকল্পনায় শ্রেণীশিক্ষণের সাথে ব্যক্তিশিক্ষণের যোগসূত্র রচিত হওয়ায় শিক্ষণ-এককের ত্রুটি দূর করা সহজসাধ্য। আবশ্যকীয় বিষয়-শিক্ষণের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করার এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি-বিকাশ সম্ভব হয়। তেমনি আবার যৌথ শিক্ষণের ওপর লক্ষ্য রাখায় ব্যক্তির সমাজসত্তার বিকাশও সম্ভব হয়। এর দ্বারা শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে নানা সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও বাঞ্ছনীয় গুণ অর্জন করতে পারে।

তবে উইনেটকা পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের দক্ষতা ও সাংগঠনিক নৈপুণ্যের ওপর। ব্যক্তি ও সমাজ—এই উভয় সত্তার বিকাশের ক্ষেত্রে উইনেটকা পদ্ধতি যথেষ্ট সম্ভাবনাময়।

[১২] ডেক্রলী প্রথা (Decroly System):

অভাইড ডেক্রলী (*Ovide Decroly*) প্রথম জীবনে ছিলেন মণ্টেসরীর মত একজন মানসিক ব্যাধিচিকিৎসক। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মানসিক বিকারগ্রস্তদের জন্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে সুস্থ ছেলে-মেয়েদের জন্যেও তিনি তাঁর নিজস্ব নীতি অনুসারে শিক্ষাদান ব্যবস্থা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকায় তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি 'ডেক্রলী প্রথা' নামে খ্যাত।

ডেক্রলী পদ্ধতির মর্মবাণী ও মূলনীতি: শিক্ষাসম্পর্কে ডেক্রেলী প্রথার মূল বক্তব্য হল, শিক্ষার ভিত্তি হবে জীবন-অভিজ্ঞতা। বাস্তব জীবনের সঙ্গে থাকবে শিক্ষার নিবিড় সম্পর্ক। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের মর্মবাণী হল: জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে জীবনের জন্য শিক্ষা (Education for life by living অথবা Learning through living)। তাই স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। সময় সময় শিক্ষার্থীকে শ্রেণীকক্ষের বাইরে সমাজ-পরিবেশে শিক্ষামূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করতে

হবে। পরিবার ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে অতি ঘনিষ্ঠ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক। শিক্ষার্থীর মাতাপিতা বা অভিভাবক বিদ্যালয় পরিকল্পনা ও পরিচালনায় শুধু পরামর্শ দেবেন তা নয়, তাদেরকেও সক্রিয়ভাবে বিদ্যালয়-কর্মে অংশ গ্রহণ করতে হবে। এমনি করে একই সাথে চলবে ব্যক্তিগত ও সমাজগত শিক্ষণ-প্রক্রিয়া।

শিক্ষাবিদ ডেক্রলী শিক্ষার্থীর আগ্রহ অনুযায়ী জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে জীবনের জন্য শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে **পাঁচটি মূল নীতি প্রবর্তন করেন। নীতিগুলি হল ঃ**

(১) শিশু একটি জীবন্ত প্রাণ, তাকে সামাজিক জীবনের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা চাই।

(২) শিশুর জীবন ক্রমবিকাশমান ও ক্রমবর্ধিষ্ণু। তার জীবনে প্রতিটি স্তরে সে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

(৩) একই বয়সের বালক-বালিকাদের মধ্যে আগ্রহ, রুচি, ক্ষমতা, চাহিদা এবং অন্যান্য দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীর বৈষম্য বিদ্যমান।

(৪) শিক্ষার্থীর জীবনে বিভিন্ন বয়সে নানা ধরনের আগ্রহ ও প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এই আগ্রহ ও প্রবণতা তার মানসিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে।

(৫) শিশু সদা সঞ্চারণশীল, সে কর্মমুখর। যদি বুদ্ধি বিচারের দ্বারা শিশুকে সঠিকপথে পরিচালিত করা যায় তবে তার এই সঞ্চারণমূলক আচরণ স্বীয় জীবনের সব কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

ডেক্রলী প্রথায় বিদ্যালয়-পরিচালনা ও শিক্ষণ প্রক্রিয়া ঃ

(১) ডেক্রলী প্রথায় পরিচালিত বিদ্যালয়টি স্থাপিত হবে স্বাভাবিক পরিবেশে। সেখানকার শ্রেণীকক্ষ হবে এক একটি কর্মশালা (work shop) অথবা প্রয়োগশালা (Laboratory), কিন্তু বক্তৃতার স্থান এখানে নেই।

(২) প্রতি ১০ থেকে ১৫ জন শিক্ষার্থী একটি দল (Gruop) গঠন করবে। প্রতিটি দল সমমানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত হবে। প্রতিটি দল স্বকীয় আগ্রহ, চাহিদা ও প্রবণতা অনুযায়ী গবেষণাগারের কাজে যোগদান করবে।

(৩) শ্রেণীভুক্ত দল উপদলগুলি স্ব-স্ব প্রচেষ্টায় শিক্ষামূলক বিষয় নিয়ে সমস্যার সমাধান করবে ও শ্রেণী কক্ষে স্ব-স্ব রিপোর্ট পেশ করবে। সেখানে অন্যান্য দল ও শিক্ষকদের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। এইসব রিপোর্ট যথাসম্ভব তথ্য

সম্বলিত হওয়া চাই। উপযুক্ত রিপোর্ট সকলের অবগতির জন্ত শ্রেণীকক্ষে পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে।

(৪) ডেক্রলী প্রথায় পরীক্ষায় নম্বর দেওয়া হয় না। অধিকন্তু এখানে কাউকে ভাল এবং কাউকে মন্দ বলে চিহ্নিত করা হয় না। কারণ সমমানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত দল স্ব-স্ব আগ্রহ অনুযায়ী বিদ্যানুশীলন করতে পারে। সহশিক্ষা প্রথায় ইহা পরিচালিত হতে পারে। গৃহ পরিবেশ এবং বিদ্যালয় পরিবেশের মধ্যেকার সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর করে তোলা ডেক্রলী প্রথার একটা বিশেষ লক্ষ্য।

[১৩] প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতি ও প্রগতিমূলক বৈশিষ্ট্য (Progressive Methods of teaching and Progressive features):

মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক সর্বাধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতিগুলি নানা বিশেষণে অভিব্যক্ত। এই পদ্ধতিগুলি কখনও সন্তোষজনক (Satisfactory), কখনও গতিশীল (Dynamic), কখনও বা প্রাণবন্ত ও গতিশীল (Elastic and Dynamic) অথবা সার্থক (Effcetive) বিশেষণে বিশেষিত। শব্দের হেরফের যাই থাকুক না কেন প্রকৃত শিক্ষালাভের বা শিক্ষাদানের অনুকূল আধুনিক মনস্তত্ত্ব, সমাজ ও জীবনভিত্তিক যে-কোন পদ্ধতিকে আমরা প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতি-রূপে অভিহিত করতে পারি।* আধুনিক যুগে বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-প্রসঙ্গে প্রয়োগ যোগ্য যেসব পদ্ধতিকে আমরা প্রগতিশীল নামে অভিহিত করি তাদের মধ্যে সমস্যা, প্রকল্প, ওয়ার্কশপ, আবেক্ষা পাঠচর্চা, কিণ্ডারগার্টেন, মন্তেসরী, ডাল্টন প্লান, উইনেটকা, বাটাভিয়া, ডেক্রলি প্রভৃতি পদ্ধতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলোকে কেন প্রগতিশীল আখ্যা দেওয়া হয় তা জানতে হলে **প্রগতিমূলক বৈশিষ্ট্যগুলোকে** (Progressive features) উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রাচীন ও নব্য পদ্ধতির পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে।

শিশুকেন্দ্রিকতাঃ প্রাচীন বা গতানুগতিক পদ্ধতি ছিল শিক্ষকের পাণ্ডিত্যভিত্তিক এবং বিষয়কেন্দ্রিক। এখানে শিশুর কোন ভূমিকা ছিল না। আধুনিক প্রগতিশীল পদ্ধতিতে শিক্ষণ-শিখণ প্রক্রিয়ার (Teaching-learning

* আলোচ্য গ্রন্থের সপ্তম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

Process) কেন্দ্রে আছে শিশু। শিশুর আগ্রহ, প্রবণতা ও শারীরিক-মানসিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে শিক্ষাদান করা হয়। শিশুকে কেন্দ্র করেই আধুনিক শিক্ষা-সংগঠিত ও পরিচালিত।

প্রেষণা (Motivation)ঃ নতুন শিক্ষণ-পদ্ধতিতে পাঠ-পরিকল্পনা ও পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সঞ্চার করা হয়। শিক্ষার্থী সহজে পাঠ-অনুশীলনে আগ্রহ প্রকাশ করে। শিক্ষার্থীর মনে আভ্যন্তরীণ প্রেষণার অভাব থাকলে বা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের অভাব থাকলে প্রগতিশীল পদ্ধতিতে বাহ্য-প্রেষণার (external motivation) সহায়তায় শিক্ষণ-প্রক্রিয়া পরিচালন করা হয়। গতানুগতিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় মনে করা হত যে শিক্ষার্থীর মন একটা শূন্যপাত্র। সেখানে কিছু জ্ঞানের বিষয় দিয়ে পাত্র পূর্ণ করাই শিক্ষকের কাজ। শিক্ষাদান প্রসঙ্গে প্রেষণা হল শিক্ষণের অপরিহার্য অঙ্গ এবং আধুনিক পদ্ধতিতে তা বিদ্যমান।

সক্রিয়তার নীতি ঃ নব্য শিক্ষণ পদ্ধতিতে নিষ্ক্রিয়তার কোন স্থান নেই। শিক্ষার্থীরা যাতে কর্মের মাধ্যমে শিখতে (learning by doing) পারে সেটাই হল প্রগতিশীল নব্য পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। এখানে নানা কর্মের আয়োজন ও ক্রীড়া-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষণের কর্মে আনন্দ অনুভব করে এবং আগ্রহ সহকারে পড়শুনা করতে চায়। গতানুগতিক পদ্ধতির ন্যায় এখানে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রেরণাকে অবহেলা করে কতকগুলি বিষয় শিক্ষার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয় না।

জীবনধর্মী শিক্ষণ ঃ আধুনিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়া জীবনধারার সঙ্গে অন্বিত। তাই এ পদ্ধতি উদ্দেশ্যমূলক ও অর্থপূর্ণ। শিক্ষণ-প্রসঙ্গে গৃহীত পদ্ধতিগুলি যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কর্মময় জীবন গঠনের সহায়ক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

ব্যক্তিবৈষম্য নীতি ঃ প্রগতিশীল পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিবৈষম্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। গতানুগতিক শিক্ষায় শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার ব্যবস্থা থাকে। সেখানে অগ্রসর শিক্ষার্থী হতাশ এবং অনগ্রসর শিক্ষার্থী অধিক অনগ্রসর হতে থাকে। প্রগতিশীল পদ্ধতিগুলোতে ব্যক্তিভিত্তিক, যৌথ ও শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষণের সমন্বয় থাকায় সকল শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত বৈষম্য অনুসারে উপকৃত হয়।

গণতন্ত্রভিত্তিকতা : নব্য শিক্ষণ-পদ্ধতি গণতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োগ করা হয়। আজকের শিক্ষার্থীরা আগামী দিনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক হবে। তাই গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর বাস্তবায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রগতিশীল পদ্ধতিগুলো সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। এখানে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই সমানভাবে জীবন বিকাশের সুযোগ লাভ করে।

স্ব শাসনের উদ্বোধক : আধুনিক প্রগতিশীল পদ্ধতি শিক্ষার্থীর স্ব-শাসনের উদ্বোধক। প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ছিল নেতিবাচক (negative)। সেখানে বাহ্যিক শাসনই ছিল শৃঙ্খলা বিধানের অস্ত্র। নব্য পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মনে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তোলে। ফলে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাবোধ (Internal discipline) তাদের মনে জাগরিত হয়।

সমাজ চেতনার উদ্বোধক : নব্য শিক্ষণ-পদ্ধতি শুধু ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও বৃদ্ধির সহায়ক নয় ; এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সমাজসত্তার বিকাশ ও বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

তত্ত্বগত শিক্ষার সাথে ব্যবহারিক শিক্ষার সংযোগ : নব্য শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের সীমা শিক্ষার্থীর অনুরাগভিত্তিক বহু কর্মের মধ্যে বিস্তৃত। প্রাচীন পদ্ধতির ন্যায় নব্য পদ্ধতি শুধু পুঁথিগত বিদ্যার ক্ষেত্রে সীমিত নয়।

বাঞ্ছনীয় গুণ, মূল্য, দক্ষতা গঠনের সহায়ক : শুধু কর্ম নয়, কর্মপ্রীতি এবং সততা ও দক্ষতার সাথে কর্মসম্পাদনই হল নতুন প্রগতিশীল পদ্ধতির তাৎপর্য। কর্মাভ্যাস যখন শিক্ষার্থীর স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে মিলেমিশে যায় তখনই এই পদ্ধতিপ্রয়োগ সার্থক হয়ে ওঠে। তাই সক্রিয়তাভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বনে শিক্ষার্থী বাঞ্ছনীয় গুণ ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

মনস্তত্ত্বভিত্তিকতা : আধুনিক প্রগতিশীল পদ্ধতি মাত্রই মনস্তত্ত্বভিত্তিক। শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, ইচ্ছা, অভিরুচি, বুদ্ধি, প্রক্ষোভ, দেহগত সামর্থ্য ইত্যাদি হল পদ্ধতি প্রয়োগের ভিত্তি। কিভাবে শিক্ষার্থীরা শিখবে, মনে রাখবে, স্মরণ রাখবে ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠ-পরিকল্পনা ও পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রগতিশীল পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা : প্রাচীন ও গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক স্বীয় পাণ্ডিত্যের বোঝা ও পাঠ্য বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর ওপর চাপিয়ে দিতেন। শিক্ষার্থী বাধ্য হয়ে সেগুলো শিখবার চেষ্টা

করত। এ শিক্ষার সঙ্গে জীবনের কোন যোগ ছিল না। আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষক হলেন পর্যবেক্ষক, সহায়ক ও পরিচালক। শিক্ষার্থীর দেহ-মনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষক তাদের দেহ-মনের সার্বিক বিকাশে সাহায্য করেন। তিনি জানেন, শিক্ষার্থীর বিকাশ ও বৃদ্ধি হবে তার অভ্যন্তরীণ শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ অনুসারে। কর্মই হল এরূপ বিকাশ ও বৃদ্ধির অবলম্বন। তাই তাঁকে সক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ ও বৃদ্ধির কর্মে সাহায্য করতে হয়। তিনি এখানে নিষ্ক্রিয় দর্শক বা পাণ্ডিত্যের গর্বে গর্বিত স্বেচ্ছাচারী শাসক নন। তিনি হলেন পরিচালক, সহায়ক ও সক্রিয় তত্ত্বাবধায়ক।

আধুনিক প্রগতিশীল পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা: গতানুগতিক প্রাচীন শিক্ষণ-পদ্ধতির ত্রুটি দূর করার প্রয়োজনে প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতির উদ্ভব। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শিক্ষাবিদ স্ব-স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এসব নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রচলনের চেষ্টা করেছেন। দেশ-কাল অনুসারে এসব পদ্ধতির যথেষ্ট প্রগতিসূচক বৈশিষ্ট্য থাকলেও প্রয়োগক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রগতিশীল পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করলে এই সীমাবদ্ধতাগুলো আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।* তবে প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা দূর করে জাতীয় স্তরে শিক্ষাকে সার্থক করে তোলাই হল শিক্ষক, অভিভাবক ও সরকারের অপরিহার্য কর্তব্য। প্রচলিত শিক্ষার বন্ধ্যাত্ব দূর করার এটাই হল আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

---

* প্রকল্প পদ্ধতি ও তার সীমাবদ্ধতা এবং ডাল্টন পদ্ধতি ও তার সীমাবদ্ধতা দ্রষ্টব্য

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষাদান রীতি ও পাঠ-পরিকল্পনা

[Technique of Instruction and Lesson Plan]

[**অধ্যায় পরিচয় :** পূর্ব অধ্যায়ে শিক্ষণ-পদ্ধতিগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এসব পদ্ধতির (Methods) প্রয়োগ করতে কতকগুলি কৌশলের প্রয়োজন আছে। কৌশল প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শিক্ষাদানের সাধারণ নীতিগুলি। প্রথম অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে সেই নীতিগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজন হল ঐ নীতিগুলির প্রয়োগ। নীতির প্রয়োগ-পরিপ্রেক্ষিতে জানা দরকার পাঠদান বা পাঠকে (Lesson) কটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তাই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে পাঠদানের প্রকারভেদ। প্রত্যেক প্রকার পাঠদানের জন্য প্রয়োজন হয় পাঠ-পরিকল্পনার (Lesson Plan)। তৃতীয় অনুচ্ছেদে পাঠ-পরিকল্পনা আর তার আনুষঙ্গিক শর্তাদি উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ অনুচ্ছেদে দেওয়া হল পাঠ-পরিকল্পনার উপাদান ও সোপান সমূহ। এই অনুচ্ছেদেই হারবার্টের সোপানও পর্যালোচিত হয়েছে। পঞ্চম অনুচ্ছেদে দেওয়া হল আধুনিক পাঠ-পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ রূপ। এরপর ক্রমে ক্রমে প্রশ্নোত্তর রীতি এবং অনুবন্ধ, সহযোজন ও সমন্বয় রীতির বিস্তৃত আলোচনা করা হল।]

১। শিক্ষাদানের সাধারণ নীতি (General Principles of Instiuctión) ঃ

শিক্ষণ (Teaching) হল শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের সাহায্যার্থে একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। শিক্ষণ-প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা **তিনটি মূল উপদানের** সন্ধান পাই, যথা—(১) শিক্ষক, যিনি শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনে সাহায্য করেন; (২) শিক্ষার্থী, যারা জ্ঞানার্জনের জন্য বিদ্যালয়ে আসে এবং (৩) পাঠ্য বিষয়বস্তু, যে সব বিষয় সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে জ্ঞানলাভে সাহায্য করেন। শিক্ষণ-প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট সমস্যাব্যঞ্জক ও জটিল হলেও সুসংহত। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যেকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলাফল হল শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন ও তার বাস্তবায়ন। শিক্ষকতা বা জ্ঞানের আদান-প্রদানমূলক প্রক্রিয়াটি এক এক শিক্ষকের নিকট এক এক প্রকার। শিক্ষণ-প্রক্রিয়া মূলতঃ শিক্ষকের শিক্ষাদান-সাপেক্ষ বিষয়। বৈচিত্র্য যতই থাকুক, শিক্ষণ-প্রক্রিয়া মূলতঃ দুটি ধারায় রূপায়িত হয়। **প্রথমতঃ,** প্রভুত্বব্যঞ্জক ধারার (Dominative pattren) কথা উল্লেখ করা যায়। এ ধারায় শিক্ষক স্বীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বিষয় বিবৃত করেন। তিনি স্বীয় চিন্তাধারা অনুসারে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়

উপদেশ, নির্দেশ বা আদেশ প্রদান করেন। শিক্ষার্থীদের কাজকর্মের সমালোচনা করে ও তিনি স্বীয় কর্মের গুরুত্ব প্রচার করেন। দ্বিতীয়টি হল সমন্বয়মূলক ধারা (Integrated pattern)। এটিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর কর্ম, চিন্তা ও ধারণাকে মর্যাদা দেন, তাদের কর্মে উৎসাহ প্রদান করেন এবং নানা প্রশ্ন ও সমস্যার অবতারণার মাধ্যমে তাদের সক্রিয় করে তোলেন। এখানে শিক্ষার্থীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-অভিরুচি, কর্ম ও চিন্তা, আগ্রহ ও প্রবণতা শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়া দ্বিতীয় ধারার স্বপক্ষে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান-ভিত্তিকতা। আধুনিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে সাধারণ নীতিগুলির কথা সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। সেগুলি হল—

(১) **শিক্ষার্থীর সক্রিয় সহযোগিতার নীতিঃ** শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক যখন পাঠদান করবেন তখন শিক্ষার্থী তাঁর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করবে। এর জন্যে **প্রথম প্রয়োজন** শিক্ষকের মনের উদারতা, স্নেহ ও সহানুভূতি। শিক্ষকোচিত গুণসম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনে সহজে প্রেরণা সঞ্চার করে তাকে যেমন আকর্ষণ করতে পারেন তেমনি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতেও পারেন। **দ্বিতীয় প্রয়োজন** হল শিক্ষার্থীর নিজের প্রচেষ্টার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা। শিক্ষক নিজে যা কিছু করবেন তা তখনই সার্থক হবে যখন শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে শিক্ষককে সাহায্য করবে। এর জন্যে শিক্ষার্থীকে স্বচেষ্টায় ও স্বকর্মে অনুপ্রাণিত করতে হয়।

(২) **জীবনভিত্তিক কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষার নীতিঃ** শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য হল জীবনের বাস্তবক্ষেত্রের জন্য শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে গড়ে তোলা। এর জন্য **প্রথম প্রয়োজন** কর্মচঞ্চল শিক্ষার্থীদের জন্য কর্মমুখীন পাঠদানের ব্যবস্থাপনা। সক্রিয়তা হল অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীদের প্রায় সহজাত এক প্রবৃত্তি। সুতরাং, পাঠদানের সময় সক্রিয়তার নীতি প্রয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য। **দ্বিতীয় প্রয়োজন** হল আবেগজনিত শক্তির নিয়ন্ত্রণ। পরিবেশ ও বংশগত বৈশিষ্ট্যের জন্য শিশুদের মধ্যে অনেক অবাঞ্ছনীয় শক্তি আত্মপ্রকাশ করে ও পরিণতিতে চরম আকার ধারণ করে। এসব অবাঞ্ছনীয় প্রেরণা ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা হল সার্থক পাঠদানের নীতি। **তৃতীয় প্রয়োজন** হল বাস্তব

জীবনের উপযোগী পাঠদান। আগামী দিনে আজকের শিক্ষার্থীরা হবে রাষ্ট্রের সুনাগরিক ও সমাজের আদর্শ সভ্য। গণতন্ত্রের আদর্শে গড়ে উঠেছে আমাদের সমাজব্যবস্থা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই প্রয়োগ করা প্রয়োজন। **চতুর্থ প্রয়োজন** হল শিক্ষার্থীর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের প্রচেষ্টা। পাঠদানের সময় পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে জীবনের বাস্তবক্ষেত্রের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকও পাঠদান প্রসঙ্গে বিদ্যালয় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঠ-পরিচালনা করবে।

(৩) **পাঠ-প্রাসঙ্গিক নীতি ঃ** শিক্ষণ-প্রসঙ্গে কতকগুলি মূলনীতি সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন। **প্রথমতঃ**, যে পাঠ (Lesson) দেওয়া হচ্ছে তার বিষয়বস্তুর মর্ম অনুসারে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা কর্তব্য। **দ্বিতীয়তঃ**, নির্বাচিত বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে পাঠদান করা বা বিষয় পরিবেশন করা যুক্তিযুক্ত। **তৃতীয়তঃ**, পাঠ্যবিষয়ের অবতারণার জন্য অনুবন্ধরীতি (Principles of Correlation) অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। **চতুর্থতঃ**, পাঠ-পরিচালনার এবং বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট করার জন্য ব্যাখ্যা, বর্ণনা, উপকরণ ব্যবহার করা উচিত। **পঞ্চমতঃ**, পাঠের পর্যালোচনা ও পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন।

অবশেষে বলা যায়, সার্থক পাঠদানের নীতি হিসেবে লিখিত পাঠ-পরিকল্পনা (Lesson Plan) প্রণয়ন করা শিক্ষকের অপরিহার্য কর্তব্য।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, **পূর্বোক্ত নীতিগুলির বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠের (Lesson) প্রকার ভেদ ও তার স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।**

২। পাঠ-প্রকরণ (Different Types of Lesson) ঃ

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের গবেষণা পাঠদান-প্রক্রিয়াকে আধুনিক ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক করে তুলেছে। পাঠদান করা হয় শিক্ষার্থীকে শিক্ষালাভে সহায়তা করার জন্যে। শিক্ষার্থীর মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিষয়ের প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপিত না হলে তার শিক্ষালাভ যথাযথ হয় না। শিক্ষণ-পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক প্রক্রিয়ার **তিনটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য** বিদ্যমান। প্রথম স্তরে আমরা কিছু তথ্য অবগত হই, দ্বিতীয় স্তরে সেই সম্পর্কে আমরা কিছু অনুভব করি, অবশেষে

তথ্য-পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিছু কর্ম-সম্পাদনের ইচ্ছা করি। মনের এই সাধারণ তিনটি প্রক্রিয়াকে আমরা অবগতি (cognition), অনুভূতি (affection) এবং ইচ্ছা (conation) রূপে অভিহিত করি। এই তিনটি মানসিক ক্রিয়া পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং যে কোন মানসিক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করলে এই তিনটি মানসিক ক্রিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। চিন্তা থাকলে অনুভূতি ও ইচ্ছা থাকবেই।[1] তাই এই তিনটি প্রক্রিয়ার একটা সংহত রূপ মানসিক প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান। আবার সময়বিশেষে এক একটি প্রক্রিয়া যেন প্রবল হয়ে ওঠে। যেমন, কোন কোন সময় আমাদের শেখার বা কাজ করার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। কখনও বা আমরা প্রাক্ষোভিক স্তরে অবস্থান করি, কোন কাজ করার ইচ্ছা থাকে না। আবার কখনও বা কাজের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করতে চাই।

মানসিক স্তরের এই তিনটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাঠদানকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা—(১) জ্ঞানমূলক পাঠ (Knowledge lessons), (২) অনুভূতি বা রসবোধমূলক পাঠ (Appreciation lessons) এবং (৩) নৈপুণ্যমূলক পাঠ (Skill lessons)।

(১) জ্ঞানমূলক পাঠ (Knowledge Lessons)ঃ জ্ঞানমূলক পাঠের উদ্দেশ্য হল শুধু জ্ঞান বা তথ্য সংগ্রহে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা। সুতরাং জ্ঞানাশ্রয়ী ও তথ্যমূলক বিষয়গুলি এই পাঠের অন্তর্ভুক্ত। ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা, সাহিত্যের তথ্যভিত্তিক অংশ, অঙ্কশাস্ত্রের তত্ত্বগত অংশ ইত্যাদি জ্ঞানমূলক পাঠের অন্তর্গত।

(২) রসবোধমূলক পাঠ (Appreciation Lessons)ঃ এই পাঠ শিক্ষার্থীর সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশসাধনে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীরা এরূপ পাঠ্যাংশের ভাবরস সংগ্রহ করে, সৌন্দর্য উপভোগ করে এবং প্রাক্ষোভিক তৃপ্তি (Emotional Satisfaction) লাভ করে। রসবোধমূলক পাঠ শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক সুসমঞ্জস বিকাশের পরম সহায়ক। কবিতা, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ের পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীর এই প্রয়োজন মেটানো যায়। কবিতাকে জ্ঞানমূলক এবং ভাবমূলক উভয় বিষয় থাকতে পারে। তাই কবিতার

---

1 মনোবিদ্যা—সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৩

ক্ষেত্রে ভাবমূলক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে রসবোধমূলক পাঠদান করা যুক্তিসিদ্ধ। কবিতার ভাবার্থ এবং ব্যাকরণগত অংশটি যে জ্ঞানমূলক তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

(৩) **নৈপুণ্যমূলক পাঠ** (Skill Lesson)**:** নৈপুণ্যমূলক পাঠের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে বিশেষ বিশেষ কর্মে দক্ষ করে তোলা। লিখন, শিল্পকর্ম, অঙ্কন, মডেল তৈরি, টাইপ শিক্ষণ, গণিত ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক অংশ ইত্যাদি নৈপুণ্যমূলক পাঠের অন্তর্গত। দ্রুত লিখন ও পঠনও এক ধরনের নৈপুণ্য। বুনিয়াদী শিক্ষায় এরূপ নৈপুণ্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাঠদানকে (Lesson) পূর্বোক্ত তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হলেও **এদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক** বিদ্যমান। অংশগুলিকে সম্পর্কহীন পৃথক প্রকোষ্ঠে রাখা চলে না। জ্ঞানমূলক পাঠে যেমন তথ্য সংগ্রহ করা যায় তেমনি নৈপুণ্য অর্জন এবং ভাবরস অনুভব করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বুনিয়াদী পদ্ধতির উল্লেখ করা চলে। শিক্ষার্থীর সুসমঞ্জস বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত। শিল্পভিত্তিক কর্মকেন্দ্রিকতা হল এর মূল বিষয়। এর দ্বারা শিক্ষার্থী যেমন নৈপুণ্য অর্জন করে, তেমনি একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে বিচিত্র তথ্য বা জ্ঞানার্জন করে—তেমনি আবার কর্মের সাফল্য দ্বারা সে মানসিক তৃপ্তি লাভ করে। সুতরাং পাঠদানের প্রকার ভেদ সত্ত্বেও অংশগুলি সম্পর্কহীন নয়। পাঠদানের সময় মানসিক প্রক্রিয়ার তিনটি স্তর জ্ঞানার্জন, চিন্তন ও কর্মদ্যোগ—এর একটির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় মাত্র। কিন্তু অন্য দুটি প্রক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। কারণ, শিক্ষা তখনই সার্থক হয় যখনই শিক্ষার্থী নতুন তথ্য বা জ্ঞান লাভ করে মানসিক তৃপ্তি পায় এবং অবশেষে বাস্তব কর্মে উদ্যোগী হয়। বুনিয়াদী পদ্ধতির ক্ষেত্রে এই বিষয়টা প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

৩। পাঠ-পরিকল্পনা এবং আনুষঙ্গিক শর্তাদি (Lesson Plan and Relevant Factors)**:**

শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় বাহ্যতঃ দুটি কর্ম মূর্ত হয়ে ওঠে—একটা হল **শিক্ষকের কাজ** এবং অন্যটি **শিক্ষার্থীর কাজ**। শিক্ষক পাঠ্যবিষয়টিকে

শিক্ষার্থীর কাছে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেন ; আর শিক্ষার্থীরা বিষয়গুলিকে শ্রবণ, মনন, চিন্তন, স্মরণ ও গ্রহণের জন্য সক্রিয় ও সচেষ্ট হয়। এই দ্বিমুখী কর্ম চলতে থাকে শ্রেণীকক্ষের পাঠ-পরিচালনায়। একে সার্থক ও ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা হল প্রয়োজনীয় পূর্ব শর্ত। কারণ, অপরিকল্পিত কর্ম অপেক্ষা পরিকল্পিত কর্ম অনেক বেশী ফলদায়ী।

পাঠ পরিকল্পনা কি ?

শিক্ষণ প্রসঙ্গে পরিকল্পিত কর্মের নিদর্শন হল সুচিন্তিত পাঠ-পরিকল্পনা (Lesson Plan)। সার্থক উপায়ে কর্ম-সম্পাদনের জন্য সুচিন্তিত ও সুলিখিত উপায়ের নাম হল পরিকল্পনা। বস্তুতঃ পরিকল্পনা একটি বাস্তব কর্মের মানসিক অনুশীলন।[1] সুতরাং পাঠ পরিল্পনা হল শ্রেণীকক্ষে সুষ্ঠু কর্ম-সম্পাদনার জন্য শিক্ষকের মানসিক প্রস্তুতি। শিক্ষকের পাঠ-পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রেরণা, তার অধীত বিদ্যার মানদণ্ড (বা স্তর), পাঠ্য-বিষয়বস্তুর বিন্যাস, পরিবেশনের পদ্ধতি প্রভৃতি অগ্রাধিকার পায়। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক যা করবেন তার অগ্রিম কর্মসূচী হিসেবে পাঠটীকার স্বীকৃতি সর্বজনগ্রাহ্য।[2]

সুষ্ঠু পাঠদান পরিকল্পনার গুরুত্ব (Importance of Planning a Lesson) **:** শিক্ষানীতি, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, বিদ্যালয় সংগঠন, শিক্ষা ও সমস্যার ইতিবৃত্ত ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক যদি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকে সাহায্যদানে অকৃতকার্য হন তাহলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সবটুকুই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই পাঠদানে কৃতকার্যতার জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুষ্ঠু পাঠ-পরিকল্পনা। প্রসঙ্গতঃ, **সুষ্ঠু পাঠদান-পরিকল্পনার গুরুত্বগুলি** প্রণিধানযোগ্য :

(১) **প্রস্তুতির সুযোগ :** পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষককে পাঠ-প্রস্তুতির সুযোগ দান করে। যে বিষয়টি শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পরিবেশন করতে চান সেটি

---

1. তুলনীয় : "A plan is, in fact, a mental rehearsal of all the phases of the activity."

2. The best part of a Student's Training in the art of teaching consists not in listening to eloquent lectures, but in preparing lessons, and in giving them, under the guidance and oversight of a skilled tutor—Any Wise Lesson At Any Time.

সম্পর্কে তাঁর গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পাঠটীকা পরিকল্পনার সময় শিক্ষক সহজে ও স্বাভাবিকভাবে পাঠ্যবিষয়টি সুসংবদ্ধ করতে পারেন।

(২) **সময়সূচী অনুসরণের সুযোগ ঃ** প্রতিদিন শিক্ষককে অনেকগুলি শ্রেণীতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পাঠদান করতে হয়। পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষককে সময়সূচী অনুযায়ী কর্ম-সম্পাদনের উপায় নির্দেশ করে। এছাড়া দায়িত্বশীল শিক্ষক সারা বছরের জন্য নির্দিষ্ট পাঠকে কিভাবে সমাপ্ত করতে হবে সে সম্পর্কেও পরিকল্পনা রচনা করে স্বীয় কর্মকে নির্দিষ্ট ছকের মাধ্যমে পরিচালনা করতে পারেন।

(৩) **কর্ম-পরিচালনার সুযোগ ঃ** শ্রেণীকক্ষে পাঠ-পরিবেশনের সময় কখন, কিভাবে, কি কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে, পাঠের কোন্ অংশে কি কি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে, কিভাবে পাঠের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে, কোন্ অংশে কি কি বিষয়ের সঙ্গে অনুবন্ধসাধন করতে হবে, গৃহে অনুশীলনের জন্য কি কি পাঠ-নির্দেশ দিতে হবে ইত্যাদি বিষয়-পরিকল্পনায় লিপিবদ্ধ থাকে। তাই লিখিত পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষককে সুষ্ঠুভাবে কর্ম-পরিচালনার সুযোগ দেয়।

(৪) **পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির সুযোগ ঃ** পাঠ-পরিকল্পনার সময় শিক্ষার্থীকে যেমন বিভিন্ন পুস্তক পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয় তেমনি শিক্ষককে শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। সুতরাং বাধ্য হয়ে শিক্ষককে বহু বিষয় গভীর ও ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করতে হয়। ফলে, শিক্ষকের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

(৫) **সম্ভাব্য ত্রুটি দূরীকরণের সুযোগ ঃ** শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় শিক্ষককে বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি সম্পর্কে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। পরিকল্পনার সময় স্বাভাবিকভাবে সেসব অসুবিধার কথা মনে আসে এবং কিভাবে সে অসুবিধা দূর করা যায় সে সম্পর্কে শিক্ষক পূর্ব থেকে চিন্তা করতে পারেন।

(৬) **আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ়করণের সুযোগ ঃ** পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষককে আত্মবিশ্বাস সহকারে পাঠদানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এর দ্বারা শুধু শিক্ষকই কর্মে সাফল্য অর্জন করেন তা নয়, শিক্ষার্থীরাও আত্মবিশ্বাস সহকারে

প্রদত্ত স্বতঃস্ফূর্ত পাঠ দ্বারা সহজে আকৃষ্ট হয় ও বিষয়বস্তু সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

৪। পাঠ-পরিকল্পনার উপাদান ও সোপানসমূহ (Factors and Steps of Planning Lessons) :

শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও গ্রহণ-ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষককেই পাঠ-পরিকল্পনা (Lesson Plan) করতে হয়। এই লক্ষ্যের ওপর যত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা যাবে ততই পরিকল্পনাটি সার্থক হয়ে উঠবে। সার্থক পাঠ-পরিকল্পনার জন্য যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয় তাহল—

(১) শর্তসাপেক্ষ উপাদানসমূহ (Conditioning Factors),

(২) আনুষ্ঠানিক ও প্রাথমিক ব্যবস্থা (Formal & Preliminary Procedures)

(৩) হারবার্টের সোপান (Herbart's Steps)

(১) শর্তসাপেক্ষ উপাদানসমূহ (Conditioning Factors) : সার্থক পাঠ-পরিকল্পনা ও পাঠদান কতকগুলি শর্তের ওপর নির্ভর করে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শর্ত হল শিক্ষকের বিষয়সম্পর্কিত জ্ঞানের ব্যাপকতা ও গভীরতা। যে বিষয়টি শিক্ষক পড়াবেন তার বিষয়বস্তুর ওপর শিক্ষকের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। শ্রেণীকক্ষে অকৃতকার্যতার বহুবিধ কারণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ হল, বিষয়ের ওপর শিক্ষকের গভীর জ্ঞানের অভাব। সুতরাং, সার্থক পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পাঠদানের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে শিক্ষককে পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন সহায়ক-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা পাঠ করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান, যেমন—ইতিহাস, ভূগোল, সংখ্যাতত্ত্ব, পরিসংখ্যান, সমাজতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, যুক্তিবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে অনুবন্ধ সাধন, পদ্ধতি প্রয়োগ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন মোটেই সম্ভব নয়।

জ্ঞানের ব্যাপকতা ও গভীরতা

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানে সাফল্যের দ্বিতীয় শর্ত হল—বিদ্যালয়ে ও শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহ ও ব্যবহার। এসব সামগ্রীর অভাবে শিক্ষক

ও শিক্ষার্থী উভয়েই শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। ফলে, বিষয়টির প্রতি নিরুৎসাহ শিক্ষার্থীর অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া অতি ভয়ঙ্কর। তাই যেভাবেই হোক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাতে শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহে যত্ন নেন এবং শিক্ষকরা নিজেরাও যাতে যথেষ্ট সামগ্রী হাতে প্রস্তুত করে নিতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হয়। নমুনা (Model), প্রদীপন, নকশা, ছক, ছবি, তালিকা, টেবিল প্রভৃতি কতকগুলি সামগ্রী আছে যেগুলিকে শিক্ষক নিজেই অথবা সহকর্মী শিক্ষক ও ছাত্রের সহযোগিতায় প্রস্তুত করতে পারেন। পাঠটীকা পরিকল্পনা ও সার্থক পাঠদানের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী ব্যবহারের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব পাঠ-পরিকল্পনার প্রাথমিক আগ্রহকে বিনষ্ট করে। তাই এটি পাঠ-পরিকল্পনা ও পাঠদানের অন্যতম শর্ত।

শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার

শুধু শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী শিক্ষাকর্মকে প্রাণবন্ত করতে পারে না। শিক্ষাকর্মকে গতিশীল ও জীবন্ত করার জন্য প্রয়োজন অনুকূল শিক্ষা-পরিবেশ। বিদ্যালয় গৃহ, শ্রেণীকক্ষ, পাঠাগার, প্রয়োগশালা, অফিস, আসবাবপত্র ইত্যাদি শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রধান সহায়ক। উন্নততর শিক্ষাদানের ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে সুশিক্ষককেও হতাশ হতে হয়। সে কারণ সার্থক শিক্ষাদানের জন্য প্রশস্ত শ্রেণীকক্ষ, সহায়ক সামগ্রী ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় সুষ্ঠু পরিকল্পনা যেমন সম্ভব হয় না, তেমনি শিক্ষকের হতাশা শিক্ষার্থীর মনে নিরাশার প্রভাব বিস্তার করে।

শিক্ষা-পরিবেশ

শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা শিক্ষার্থীর বয়স, শ্রেণী ও গ্রহণক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। বয়স্ক ব্যক্তি যে খাদ্য হজম করতে পারেন শিশু নিশ্চয়ই তা পারে না। শিক্ষাদান ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। সুতরাং, শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও সামর্থ অনুসারে নির্বাচিত বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষাদান করা উচিত। বিষয়-নির্বাচনের ও পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তি একই। এজন্য একজন শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে পাঠদানের জন্য যেসব পাঠ-পরিকল্পনা করেন তাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ রূপ ভিন্নতর হতে পারে। সুতরাং

শিক্ষার্থীর চাহিদার ওপর গুরুত্ব আরোপ

পাঠ-পরিকল্পনার শর্ত হিসেবে শিক্ষার্থীর চাহিদা, প্রবণতা ইত্যাদি বিচার করা কর্তব্য।

(২) **আনুষ্ঠানিক ও প্রাথমিক ব্যবস্থা** (Formal & Preliminary Procedures) **:** লেকচারার, সুপারভাইজার, পদ্ধতিশিক্ষক বা পরীক্ষকের অবগতির জন্য পদটীকার মূল অংশের পূর্বেই কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর পাঠে সাহায্যের জন্যে এসব বিষয়ের প্রয়োজন বিশেষ কিছু না থাকলেও বক্তা (শিক্ষক) এবং পরীক্ষকের সমালোচনা, বিচার ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এগুলি সহায়তা করে। তাই পাঠটীকা পরিকল্পনার প্রথমাংশেই এই বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা আনুষ্ঠানিক ও প্রাথমিক শর্তরূপে গৃহীত।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ :

বিদ্যালয়—হ্যামিন্টন মাধ্যমিক স্কুল
শ্রেণী—নবম
ছাত্র সংখ্যা—৪০
বয়সের গড়—১৫
শিক্ষক—
তাং........ ..

বিষয়—অর্থনীতি
বিশেষ পাঠ—অর্থনীতির বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ও সংজ্ঞা
পাঠক্রম—(ক) অর্থনীতির বিষয়বস্তু
(খ) অর্থনীতির প্রকৃতি ও সংজ্ঞা
(গ) অর্থনীতির কার্যাবলী
অদ্যকার পাঠ—খ ও গ অংশ

উদ্দেশ্য
প্রত্যক্ষ :
পরোক্ষ :

উপকরণ
(১) শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।
(২) দৈনন্দিন কাজকর্মের রেখাচিত্র, বিচিত্র কর্মব্যস্ততার চিত্র।

পূর্বোক্ত বিষয়গুলির বৈশিষ্ট্য আত্মবিশ্লেষণমূলক। বিদ্যালয়, শ্রেণী, ছাত্রসংখ্যা ও তাদের গড় বয়সের দ্বারা শিক্ষক নিজেই পাঠ-পরিকল্পনাকে সুন্দর করে তুলতে পারবেন। কোন্ শ্রেণী এবং কোন্ বয়সের শিক্ষার্থীদের শ্রেণীতে কি বিষয়ে কি কি উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে শিক্ষকের সুস্পষ্ট ধারণা আছে কি না তা বুঝে নেওয়া তত্ত্বাবধায়ক ও

পরীক্ষকের পক্ষে যেমন সহজ, তেমনি পরিকল্পটি শিক্ষকের পাঠ-পরিচালনায় যথেষ্ট শৃঙ্খলা এনে দেয়।

'অন্তকার পাঠের' উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হলে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে তদনুসারে অগ্রসর হতে পারেন ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে পারেন। পাঠটীকা পরিকল্পনার সময় শিক্ষককে পাঠের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা করতে হয়। এর ফলে পাঠ-পরিচালনার সময় তিনি কিভাবে উদ্দেশ্যে পৌঁছবেন এবং তার জন্য কি কি উপকরণ ব্যবহার করবেন তাও তাকে ভাবতে হবে। ফলে চিন্তাধারা সুনির্দিষ্ট হয়ে পাঠদানে সাফল্য আনয়ন করবে বলে আশা করা যায়। **পাঠের উদ্দেশ্যকে পাঠ-পরিকল্পার প্রাণকেন্দ্র বলে গণ্য করা হয়।** উদ্দেশ্যহীন পাঠটীকা লক্ষ্যহীন সমুদ্র যাত্রার মতো অনির্দিষ্ট কর্মপরিচালনা মাত্র। তাই পাঠটীকায় লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্দেশ করা অপরিহার্য।

(৩) হারবার্টের সোপান (Herbart's Steps) :

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ইতিবৃত্ত অনুসারে দেখা যায় শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া বহু প্রাচীনকালেই উদ্ভূত হয়েছে। তখন শিক্ষকরা স্ব-স্ব অভিজ্ঞতা অনুসারে পাঠদান করতেন। এর জন্যে কোন পূর্ব-পরিকল্পনার প্রয়োজন হত না। মনোবিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাদান-প্রক্রিয়ার আবিষ্কারের পর পাঠদানের পূর্ব-পরিকল্পনা সম্পর্কে শিক্ষাবিদরা নানাভাবে চিন্তা করেন। এ বিষয়ে জার্মান শিক্ষাবিদ জে. এফ. হারবার্ট (*J. F. Herbart : 1776—1841*) একটি সুচিন্তিত মনস্তত্ত্বভিত্তিক রীতি শিক্ষকের নিকট উপস্থিত করেন। সুষ্ঠু শিক্ষাদান প্রসঙ্গে এটি যে একটি অপূর্ব অবদান তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হারবার্টের মতে শিশু জন্মকালে কোন পূর্ব-সংস্কার নিয়ে আসে না। মাতৃগর্ভ থেকেই তার দেহ ও মনের ক্রমবিকাশ হতে থাকে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার দেহ ও মনের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তার মনে পারিপার্শ্বিক অবস্থার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এভাবে নানা অনুভূতি বা ধারণা তার মনের মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকে। এই সঞ্চিত অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানা অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়। এভাবে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান বা ধারণাপুঞ্জকে হারবার্ট apperceptivemass বা **সমবেক্ষণ মণ্ডল** বলে অভিহিত করেছেন। মনের

হারবার্টের মনস্তত্ত্বভিত্তিক রীতি

এই পূর্বসঞ্চিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা কখনও নষ্ট হয় না। নতুন কোন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অর্জন করতে হলে পূর্বজ্ঞান তাকে যাচাই করতে সাহায্য করে এবং সঞ্চিত জ্ঞানের ভিত্তি, আরো বেশী সুদৃঢ় হয়। হারবার্টের মতে পূর্বসঞ্চিত জ্ঞান নতুন শিক্ষালাভের সহায়ক। পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে লব্ধ নতুন জ্ঞান প্রতিটি শিক্ষার্থীর জ্ঞানভাণ্ডারকে স্ফীত ও সমৃদ্ধ করে। এটাই হল হারবার্টের শিক্ষাদর্শনের মনস্তত্ত্বভিত্তিকতা। এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে হারবার্ট **পাঠ-পরিকল্পনায় চারটি সোপানের উল্লেখ করেন।** সেগুলি হল :

(১) **স্পষ্টতা** (Clearness) : এর দ্বারা শিক্ষার্থীর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং নতুন জ্ঞানের মধ্যে সুস্পষ্ট সম্পর্ক স্থাপনের কথা ব্যক্ত করা হয়। শিশু মনে অনেক অভিজ্ঞতা জট পাকিয়ে থাকে, তার মধ্যে যেটি নতুন জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত সেটিকে স্পষ্টভাবে বেছে নিতে হয়।

(২) **সংযোগ** (Association) : এর দ্বারা পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞানের অনুষঙ্গ স্থাপনের কথা ব্যক্ত করা হয়। পুরাতন অভিজ্ঞতা ও নতুন জ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য বিচার-বিবেচনা করে শিক্ষার্থীর মনের স্তরে নতুন জ্ঞানকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়।

(৩) **পারম্পর্য** (System) : এর দ্বারা সংযোগ স্থাপনকে নিয়ম ও যুক্তির দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। নতুন ও পুরাতন জ্ঞানের সংযোগটা যেন পারম্পর্য রক্ষা করেই স্থাপিত হয়।

(৪) **পদ্ধতি** (Method) : এর দ্বারা নবলব্ধজ্ঞানের প্রয়োগযোগ্যতা (applicability) বিচার করা হয়।

পরবর্তীকালে হারবার্টের অনুগামী জিলার (*Zeiller*) এবং রেন (*Rein*) উক্ত চারটি সোপানকে কেন্দ্র করে নিম্নরূপ **পাঁচটি সোপানের** কথা উল্লেখ করলেন। যথা—

(ক) আয়োজন (Preparation), (খ) উপস্থাপন (Presentation), (গ) সংযোগ (Association), (ঘ) সূত্র নির্ধারণ বা সাধারণীকরণ (Generalisation) এবং (ঙ) অভিযোজন (Application)।

(ক) **আয়োজন** (Preparation) : এই স্তরটি অনেকে শিক্ষকের পাঠদানের প্রস্তুতি হিসেবে গ্রহণ করেন। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা ঠিক, কিন্তু

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যায় আয়োজন পর্ব হল শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি পর্ব। এ পর্যায়ে তাদেরকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত করে নেন শিক্ষক। কারণ, শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে নতুন কিছু জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বসে থাকে না। তাদের মনে আগ্রহ জাগাতে হয়; আর এ দায়িত্ব শিক্ষকের। শিক্ষক দুভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

প্রথমতঃ, তিনি পূর্বপাঠের ওপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—ছাত্রদের সেদিনের পাঠের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করতে পারেন। এর দ্বারা পূর্বপাঠের ওপর লব্ধ অভিজ্ঞতার পুনরালোচনার সুযোগ দেওয়া হয় এবং ধীরে ধীরে বর্তমান পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে এমন প্রশ্নের অবতারণা করা হয় যেন শিক্ষার্থীর অজ্ঞাতে বর্তমান পাঠ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রেণীকক্ষের আলোচ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হয় অথবা পাঠ-ঘোষণাব অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক স্বীয় অভিরুচি অনুসারে পূর্বপাঠের সঙ্গে সঙ্গতি না রেখেও প্রশ্ন করতে পারেন বা কোন নতুন চলতি-প্রসঙ্গ আলোচনা করতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হয়। শিক্ষার্থীকে জানা থেকে অজানা বিষয়ের ওপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শিক্ষক বর্তমান পাঠ-ঘোষণার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। মোট কথা, শিক্ষার্থীকে নতুন পাঠের প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তার মনের প্রস্তুতি নিয়ে আসাই হল আয়োজন পর্বের মর্মকথা।

(খ) **উপস্থাপন** (Presentation)ঃ এই অংশে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে নতুন অভিজ্ঞতা পরিবেশন করেন। শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণাকে সুস্পষ্ট করার জন্যে এবং পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে শিক্ষক প্রয়োজন মতো বর্ণনা, ব্যাখ্যা, প্রশ্নোত্তর, শিক্ষোপকরণ ইত্যাদির সহযোগিতা গ্রহণ করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হারবার্ট প্রদত্ত Clearness-কে কেন্দ্র করে তাঁর শিষ্যগণ যে দুটি সোপানের কথা বললেন সে দুটি হল—(ক) আয়োজন (Preparation) এবং (খ) উপস্থাপন (Presentation)।

(গ) সংযোগ (Association): এখানে হারবার্টপ্রদত্ত Association-এর স্তরটি অপরিবর্তনীয় রয়ে গেল। এই স্তরে থাকে তুলনামূলক আলোচনা ও অনুবন্ধসাধন। উপস্থাপিত বিষয়ের স ঙ্গ পূর্বপাঠের সঙ্গতি রক্ষা অথবা শিক্ষার্থীদের পঠিত বা লব্ধজ্ঞানের সঙ্গে নতুন কোন বিষয়ের তুলনা করাই এই স্তবের বৈশিষ্ট্য। হারবার্টের শিষ্যদের অনেকেই পরবর্তীকালে এই স্তরের নাম দিয়েছেন (Correlation) বা অনুবন্ধসাধন। তুলনা বা সাদৃশ্যকরণের মধ্যে কোন অসঙ্গতি থাকলে শিক্ষার্থীর ধারণা সংগঠিত হতে পারে না। সে কারণে খুব সাবধানে তুলনা করা উচিত। **হারবার্ট যদিও পৃথকভাবে এই স্তরের অবতারণা করেছেন তবুও শিক্ষকরা পৃথকভাবে এর ব্যবহার করেন না, কারণ উপস্থাপন পর্বের অন্তর্ভুক্ত করে অনেকেই সংযোগ কার্যটি সমাধা করেন।**

(ঘ) সূত্র নির্ধারণ বা সাধারণীকরণ (Generalisation): এই স্তরে উপস্থাপিত বিষয়টি থেকে সাধারণ সূত্র (common underlying principle) নির্ধারণ করা হয়। প্রয়োজন হলে এই স্তরে পূর্বে আলোচিত তথ্যগুলিকে পর্যালোচনা করে সূত্র নির্ধারণ করা যেতে পারে।

বৈজ্ঞানিক বিষয়াদিতে এরূপ সূত্র নির্ধারণের প্রয়োজন থাকলেও মানবিক বিষয়ে (Humanities) পৃথকভাবে সূত্র নির্ধারণের প্রয়োজন হয় না। **তাই মানবিক বিষয় পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে পাঠটীকায় পৃথক একটি সোপান ব্যবহার না করে অনেকেই উপস্থাপন পর্বে এ কাজ সম্পন্ন করেন এবং সেটা যথেষ্ট ফলপ্রসূ—তাতে সন্দেহ নাই।** হারবার্টের মূল সোপানে এটি ছিল System-এর অন্তর্ভুক্ত।

(ঙ) অভিযোজন (Application): হারবার্ট-অনুগামীরা এটিকে পাঠদানের শেষ সোপান হিসেবে নির্দেশ করেছেন। হারবার্টের মূল সোপানে এটি ছিল Method-শীর্ষক সোপানের অন্তর্ভুক্ত।

পাঠটীকার এই অভিযোজন অংশে শিক্ষকের দক্ষতা ও পরিচালনশক্তি বিশেষ প্রয়োজন। বিজ্ঞানশিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় কোন একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে অথবা কোন বিষয়ের সংজ্ঞা প্রকাশ করে তার ওপর পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ-ক্রিয়া পরিচালনা করতে পারেন। কিন্তু হিউম্যানিটিস-এর কোন

বিষয়ের পাঠদান কালে শিক্ষার্থীর নবলব্ধ জ্ঞান পরিমাপের জন্য বিষয়বস্তুর ওপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়। প্রশ্ন ছাড়া প্রয়োজনবোধে মানচিত্র, ডায়াগ্রাম প্রভৃতি প্রদর্শন (Pointing), অঙ্কন অথবা রচনা লেখার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দিতে পারেন।

পাঠটীকার এই অংশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণীকক্ষে কি আলোচনা হল, কি কি বিষয় উপস্থাপন করা হল সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীর সুস্পষ্ট ধারণা হল কি না তা জানবার উপায়স্বরূপ অভিযোজন পর্বের অবতারণা।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, হার্বার্ট এবং তার শিষ্যদের অবদান **'পঞ্চ সোপান'**-কে আধুনিক পাঠটীকায় **ত্রি-সোপানে** সুসংহত করা হয়েছে। যেমন—

(১) আয়োজন বা প্রস্তুতি (Preparation), (২) উপস্থাপন বা পরিবেশন (Presentation) এবং (৩) অভিযোজন বা প্রয়োগ (Application)।

হারবার্টের অবদান ও তার সমালোচনা (Herbart's Contribution and its Criticism) : পাঠটীকায় ব্যবহৃত 'পঞ্চসোপান' পরিকল্পনা শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার বাস্তবায়নে হারবার্ট এবং তাঁর শিষ্যবর্গের এক অপূর্ব অবদান—তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর পূর্বে শিক্ষকরা স্ব-স্ব ইচ্ছা অনুসারে পরিকল্পনাহীন পাঠদানে অভ্যস্থ ছিলেন। পরে হারবার্টের পরিকল্পনা এলোমেলো শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে সুসংহত করে। এই পরিকল্পনার প্রথম

অবদান

উল্লেখযোগ্য উপযোগিতা হল এর মনস্তত্ত্বভিত্তিকতা। প্রায় শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ হারবার্টের পঞ্চ বা ত্রি-সোপানে পরিকল্পিত পাঠশিক্ষার বাস্তবায়নে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান পেয়ে এসেছে। আধুনিককালে এর যেটুকু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে তা হারবার্টের মৌলিক পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুত হয়নি।

তবে হারবর্টের সোপান সহ পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। **প্রথমতঃ**, এরূপ পরিকল্পনা শিক্ষকের কাজকে যান্ত্রিক ও নির্জীব করে তোলে। সাধারণতঃ শিক্ষকরা একে একটা নির্দিষ্ট ছাঁচ (fixed mould) বা কাঠামো বলে মনে করেন এবং প্রয়োজন থাকলেও কাঠামোর বাইরে যেতে চান না। এর ফলে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া হয় একঘেয়ে ও নির্জীব। **দ্বিতীয়তঃ**, সোপানগুলি কৃত্রিম এবং কঠোর সীমায় নিয়মবদ্ধ (rigid)। পাঁচটি সোপান সীমিত সময়ের মধ্যে

অতিক্রম করার বাধ্যবাধকতার ভাব এই পরিকল্পনায় বিদ্যমান। ফলে, শিক্ষকরা শিক্ষার্থীর আগ্রহ, ইচ্ছা, প্রবণতা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য না রেখে শুধু সোপানগুলি সঠিকভাবে অতিক্রম করার দিকে লক্ষ্য রাখেন। হার্বার্টের পরিকল্পনায় সর্বাপেক্ষা **গুরুত্বপূর্ণ** ত্রুটি হল এর শিক্ষককেন্দ্রিকতা। শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা না করেই শিক্ষক কত সুন্দর করে পরিকল্পনা করতে পারেন সেদিকে অধিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার্থীর শিক্ষা কতটুকু হল সেদিক থেকে শিক্ষক প্রায়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পরিকল্পনার উৎকর্ষের দিকে অধিকতর মনোযোগী হন। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে পরিকল্পনার সার্থকতা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর চাহিদা তথা শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের ওপর।

ত্রুটি

৫। আধুনিক পাঠ-পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ রূপ (Complete Form of Modern Lesson Plan) :

মনস্তত্ত্বভিত্তিক বিচারে আধুনিক পাঠদানকে মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) **জ্ঞানমূলক পাঠ**, (২) **কৌশল** বা **নৈপুণ্যমূলক পাঠ** এবং (৩) **রসানুভূতিমূলক পাঠ**। ঠিক একই চিন্তাধারায় তিন প্রকার পাঠের (Lesson) জন্য তিন প্রকার পাঠ-পরিকল্পনার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক প্রকার পাঠের জন্য নির্বাচিত সোপানগুলির ওপর **আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শর্তাদি সর্বদা যুক্ত থাকবে**। এক্ষণে তিন প্রকার পাঠের জন্য তিন প্রকার পরিকল্পনার নির্দেশ আলোচিত হল :

জ্ঞানমূলক পাঠ-পরিকল্পনা :

১। আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শর্তাদি।*

২। পাঠ-পরিকল্পনার সোপান : (১) আয়োজন (Preparation), (২) পাঠ-ঘোষণা (Announcement of the lesson), (৩) উপস্থাপন (Presentation), (৪) অভিযোজন (Application) এবং (৫) গৃহে পাঠচর্চা (Home task)।

অভিযোজন পর্বের পর অনেকেই 'সারাংশ লিখন' বা 'বোর্ডের কাজ' (Board Work) নামে একটি সোপান ব্যবহার করেন। পৃথক 'বোর্ড ওয়ার্ক'

---

* ১২০ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে।

পাঠের অবতারণা করা অর্থহীন। কারণ পাঠদানের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বোর্ড ব্যবহারের প্রয়োজন হয় এবং বোর্ডের কাজ মাত্রই বোর্ডওয়ার্ক।

নৈপুণ্যমূলক-পাঠ পরিকল্পনা (Planning of a Skill lesson)**ঃ** নৈপুণ্যমূলক পাঠের লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে বিশেষ বিশেষ কর্মে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সকল প্রকার কায়িক শ্রমভিত্তিক শিক্ষণ, অঙ্কন, লিখন-পদ্ধতি শিক্ষা, সঙ্গীত-নৃত্য শিক্ষণ প্রভৃতি নৈপুণ্যমূলক পাঠের অন্তর্ভুক্ত। প্রচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার সবটুকুই প্রায় নৈপুণ্য অর্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে দেওয়া হয়। নৈপুণ্যের সঙ্গে জ্ঞানের যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে এবং দুটিকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন করা যায় না। কারণ মস্তিষ্কের চিন্তা, অন্তরের আবেগ ও প্রেরণা এবং ইন্দ্রিয়াদির কাজ কখনও সম্পর্কহীন অবস্থায় প্রকাশিত হতে পারে না। সুতরাং, জ্ঞানমূলক (cognitive), ভাবমূলক (affective) এবং ইচ্ছামূলক (conative) পাঠ-পরিবেশন পৃথক সম্পর্কহীন অবস্থায় সম্ভব নয়। কর্মভিত্তিক শিক্ষণ দেওয়া হয় নৈপুণ্য অর্জনের জন্য। সেই নৈপুণ্যই জ্ঞানলাভে যেমন সাহায্য করে তেমনি আবেগমূলক তৃপ্তিদানেও কার্যকর হয়।

পাঠ-পরিকল্পনার সোপান ঃ নৈপুণ্যমূলক পাঠদানের ক্ষেত্রেও আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শর্তাদি* প্রথমে উল্লেখ করতে হয়। তবে এখানে হারবার্টের সোপানের সবগুলি কার্যকর নয়। কারণ, হারবার্টের সোপানগুলি মূলতঃ জ্ঞানমূলক পাঠদানের সোপানরূপে বিশেষ ফলপ্রসূ। তবে হারবার্টের কয়েকটি সোপানকে প্রয়োজনভিত্তিতে একটু পরিবর্তন করে নিম্নরূপ উপায়ে নৈপুণ্যমূলক পাঠদানের জন্য পরিকল্পনা রচনা করা যায় ঃ

(১) **আয়োজন** (Preparation) **ঃ** জ্ঞানমূলক পাঠের অনুকরণে আমরা আয়োজন পর্বটিকে গ্রহণ করতে পারি। কোন নৈপুণ্য শিক্ষাদানের পূর্বে জানা প্রয়োজন শিক্ষার্থীরা সেই নতুন বিষয়টি সম্পর্কে কতটুকু জানে। শিক্ষার্থীর অর্জিত অভিজ্ঞতা ও কৌশলের ওপর ভিত্তি করে নতুন পাঠদানে অগ্রসর হওয়ার সময় মডেল তৈরি, চিত্র অঙ্কন, শিল্প সামগ্রী প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষক নিজে কাজ করে শিক্ষার্থীকে কর্মে অনুপ্রাণিত করতে পারেন।

---

* ১২০ পৃঃ আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শর্তাদি দ্রষ্টব্য।

(২) **পাঠ-ঘোষণা** (Announcement of the Lasson) **:** জ্ঞানমূলক পাঠের ন্যায় নৈপুণ্যমূলক পাঠ-পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও পাঠ-ঘোষণা করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীকে কি শেখানো হচ্ছে এটা যদি সে জানতে না পারে তাহলে তার মনে প্রেরণা বা আগ্রহ সঞ্চারিত হয় না। এজন্য উদ্দেশ্য ঘোষণা করা অপরিহার্য।

(৩) **উপস্থাপন** (Presentation) **:** এই পর্বটি জ্ঞানমূলক পাঠ-পরিকল্পনার রীতি থেকে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। নৈপুণ্যমূলক শিক্ষণের শিক্ষক এই পর্বে কর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখাবেন। অর্থাৎ শিক্ষক হবেন Demonstator এবং শিক্ষার্থী হবে দর্শক। এই পর্বের মাঝে মাঝে শিক্ষক কর্মের ব্যাখ্যাও করবেন, তখন শিক্ষার্থী হবে শ্রোতা। শিক্ষক শিক্ষার্থীর যে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করছেন সেই বিষয়ে শিক্ষক নিজের দক্ষতার ব্যবহারিক প্রকাশ করবেন এবং শিক্ষার্থীকেও হাতে-কলমে শিক্ষাদানের চেষ্টা করবেন।

(৪) **প্র্যাকটিস** (Practice) **:** জ্ঞানমূলক পাঠের ন্যায় এই স্তরে শিক্ষার্থী তার অর্জিত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের জন্য বার বার চেষ্টা করবে। এখানে শিক্ষককে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করলে চলবে না। তাঁকে হতে হবে শিক্ষার্থীর দক্ষতা অর্জনের সক্রিয় সহায়ক। শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি থেকে তাঁকে প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য করতে হবে। নৈপুণ্যমূলক পাঠ-পরিকল্পনার এটাই হবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সোপান।

(৫) **প্রয়োগ** (Application) **:** অর্জিত দক্ষতার স্বীকৃতি হল তার ব্যবহারিক প্রয়োগে। এই প্রয়োগ দুপ্রকারের হতে পারে। প্রথমটি হল, তৎক্ষণাৎ প্রয়োগ; যেমন—শিক্ষার্থীকে গোলাপ ফুল অঙ্কন শেখানো হল। সঙ্গে সঙ্গে যদি সে প্রায় একই আকৃতির অন্য একটি (যেমন, জবা) ফুল অঙ্কন করতে পারে তাহলে তার অর্জিত দক্ষতার ব্যবহারিক প্রয়োগ করা হল। দ্বিতীয়টি হল, পরবর্তী যে কোন সময়ে অর্জিত দক্ষতার প্রয়োগ। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তির পর যদি কোন শিক্ষার্থী জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কাজে প্রয়োগ করতে পারে তবেই হবে দক্ষতার দূরবর্তী ব্যবহারিক প্রয়োগ।

রসানুভূতিমূলক পাঠ-পরিকল্পনা (Planning of an Appreciation Lesson): রসবোধমূলক পাঠের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবিষয়ের রূপ, রস, গন্ধ উপভোগে সাহায্য করা। এরূপ পাঠ শিক্ষার্থীর সৌন্দর্য পিপাসার তৃপ্তিদান করে। শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক প্রকাশ এবং বৃদ্ধির ন্যায় প্রাক্ষোভিক বৃত্তির বাঞ্ছনীয় বিকাশ অত্যাবশ্যক। রসবোধমূলক পাঠ শিক্ষার্থীর মানসিক আবেগ বা প্রক্ষোভ বিকাশে যথাযথ সাহায্য করে। স্মিথ এবং হেরিসন (*Smith and Harrison*) তাঁদের 'Principle of Class Teaching' নামক পুস্তকে রসবোধমূলক পাঠের সংজ্ঞায় বলেছেন যে, দক্ষ শিক্ষক কোন বিষয় সম্পর্কে অনুকূল পরিবেশে শিক্ষার্থীর মনে এমন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেন যখন সেটি শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুনবে, দেখবে ও তার রূপ-রস-গন্ধ উপভোগে উদ্বুদ্ধ হবে। তখন সেটি হবে রসবোধমূলক পাঠ।[1]

পাঠ-পরিকল্পনার সোপান (Steps): অন্যান্য পাঠ-পরিকল্পনার ন্যায় রসানুভূতিমূলক পাঠ-পরিকল্পনার প্রথমে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শর্তাদি উল্লেখ করতে হয়।[2] এর পরবর্তী সোপানগুলি হল:

(১) **প্রস্তুতি** (Preparation): রসবোধমূলক পাঠের প্রধান উপাদান হল অনুকূল পরিবেশ। পরিবেশটি নিশ্চয়ই পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সমন্বিত হবে। যেমন—'বর্ষামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ নির্ঝর বর্ষার দিনে, 'বসন্ত উৎসব'মূলক কবিতা বসন্তের মলয় হিল্লোলেই মধুর হয়ে ওঠে। সেইরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা প্রাকৃতিক পরিবেশেই মনোমুগ্ধকর হয়। ঋতুভিত্তিক কবিতা পাঠও অনুকূল ঋতুতেই হৃদয়ে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে।

শ্রেণীপাঠের ক্ষেত্রে এটা সর্বদা সম্ভব না হলেও শিক্ষক স্বীয় দক্ষতা দ্বারা সেরূপ অনুকূল পরিবেশ রচনা করতে পারেন। শিক্ষকের ভাবময় ব্যঞ্জনা ও অনুভূতিপূর্ণ ইঙ্গিতদানের ক্ষমতা ভাবরসমূলক পাঠদানের অপরিহার্য সম্পদ। এর জন্য প্রথমে শিক্ষককেই ভাবে-রসে অভিভূত হতে হবে। তাহলে তিনি শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হবেন।

---

1. "The appreciation lesson is an invitation to look at or to listen to something beautiful with leisure, to enjoy it in a favourable atmosphere, and with the teacher's use of suggestion to heighten its appeal. The results must be left to develop as they will."—*As quoted in B. E. G.* Page—41.

2, ১২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) **পাঠ-ঘোষণা** (Announcement of the Lesson) : অন্যান্য পাঠের ন্যায় এই পর্বে শ্রেণীর পাঠ্যসম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করতে হবে।

(৩) **উপস্থাপন** (Presentation) : এই সোপানে শিক্ষক বিষয়বস্তু পরিবেশন করবেন। পরিবেশন প্রক্রিয়াটি হবে বিষয়বস্তুর ভাবরসদ্বারা সম্পৃক্ত। এর দ্বারা শিক্ষার্থীদের চিন্তা, কল্পনা ও অনুধাবনের শক্তি উদ্বুদ্ধ হবে। এর ফলে, স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত রস অনুধাবন করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করবে। কবিতার পাঠদানে সংগঠন (form) এবং বিষয়ের অন্তর্নিহিত ভাব—এই দুটি বিষয়ে রসবোধমূলক পাঠ দেওয়া যায়। কিন্তু ব্যাকরণ ও শব্দার্থবিষয়ের ধারাটি জ্ঞানমূলক পাঠের অন্তর্গত।

(৪) **চিন্তা** (Contemplation) : এই স্তরে উপস্থাপিত বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য কিছু সময় দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থী তখন নিজে চিন্তা করবে ও ভাবরস অনুভব করবে। এই রসানুভব বিচ্ছিন্নভাবে বিষয়বস্তুর কোন অংশকে আশ্রয় করে সম্ভব হতে পারে না। উহা সমগ্র বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে উৎপত্তি লাভ করে।

(৫) **প্রয়োগ** (Application) : শিক্ষার্থীরা সমপ্রায় বিষয়বস্তুর মধ্য থেকে সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারে কি না সেটি লক্ষ্য করা—এই সোপানের অন্তর্গত।

(৬) **বিষয়বস্তুর সমালোচনামূলক উপলব্ধি** (Critical Appreciation) : এই পর্বে বিষয়বস্তুর সমালোচনার দ্বারা পাঠদান-ক্রিয়া শেষ করা যেতে পারে।

রসবোধমূলক পাঠ-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শিক্ষককে নিম্নরূপ বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা যুক্তিযুক্ত :

(ক) শিক্ষক নিজে বিষয়টিকে প্রথমে উপলব্ধি করবেন।

(খ) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ইঙ্গিত, সঙ্কেত প্রভৃতির মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

(গ) শিক্ষার্থীদের বয়স, সামর্থ্য, প্রবণতা, আগ্রহ ইত্যাদি অনুসারে বিষয়ের ভাষা ও ভাব প্রয়োগ করবেন।

(ঘ) কবি, লেখক বা শিল্পীর মনোভাবে ভাবিত হয়ে, শিক্ষক বিষয় পরিবেশনের চেষ্টা করবেন।

(ঙ) রসবোধ, সৌন্দর্যপ্রীতি, মানসিক তৃপ্তিলাভের ইচ্ছা ইত্যাদি প্রাক্ষোভিক বিষয়গুলি যেন সামাজিক ও বাঞ্ছনীয় পথে নিয়ন্ত্রিত হয়।

(চ) সবশেষে মনে রাখা উচিত, রসানুভূতিমূলক পাঠ কখনও বাঁধাধরা ছাঁচে সীমিত ধারায় পরিকল্পনা করা যায় না। পাঠের উদ্দেশ্য অনুসারে পাঠ-পরিকল্পনার সোপানগুলিকে যে কোন সংখ্যায় বিন্যস্ত করা চলে।

সার্থক পাঠ-পরিকল্পনার লক্ষণ (Criteria of a Good Lesson Plan) ঃ সার্থক পাঠ-পরিকল্পনা সম্পর্কে নিম্নরূপ লক্ষণগুলি আলোচনা করা যেতে পারে :

(১) একটি সুষ্ঠু পাঠটীকার পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিক ও লিখিত শর্তসহ পরিপূর্ণরূপে লিখিত হবে।

(২) পাঠ-পরিকল্পনায় সোপান যতগুলি থাকুন না কেন তাদের পরস্পরের মধ্যে থাকবে ধারাবাহিকতা ও পারস্পরিকতা, যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষক শেষ সোপানের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন।

(৩) উত্তম পাঠ-পরিকল্পনার প্রশ্নগুলি হবে সোপানভিত্তিক ও উত্তম প্রশ্নের বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

(৪) উত্তম পাঠ-পরিকল্পনায় বিষয়ের বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুসারে বর্ণনা, ব্যাখ্যা, আলোচনা, শিক্ষোপকরণের ব্যবহার, শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার সুযোগ প্রভৃতি লিখিত থাকবে।

(৫) সার্থক পাঠ-পরিকল্পনায় থাকবে রেফারেন্স পুস্তক, সহ-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা পাঠের নির্দেশ।

(৬) অবশেষে বলা যায়, সার্থক পাঠ-পরিকল্পনা বিদ্যালয়ের পাঠদানের সময়-সীমার অনুপাতে রচিত হবে।

৬। প্রশ্নোত্তর রীতি (Question-Answer Technique) :

মৌখিক পাঠদান পদ্ধতির সহায়ক হিসেবে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির উপযোগিতা সর্বজনস্বীকৃত। তবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তর গ্রহণ করাকে সঠিক পদ্ধতি না বলে রীতি (Technique) বলাই যুক্তিযুক্ত। আধুনিক শিক্ষাদান রীতিগুলির

মধ্যে প্রশ্নোত্তরের স্থান সর্বোচ্চ। কারণ, অতীতে মৌখিক পদ্ধতি ছিল শিক্ষককেন্দ্রিক। তখন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষকের বক্তৃতা ছিল গাম্ভীর্যপূর্ণ। আধুনিক কালে শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রয়েছে শিক্ষার্থী। সেই সঙ্গে প্রাচীন মৌখিক পাঠদান-পদ্ধতিও আধুনিক শ্রেণী-শিক্ষণ পর্যায়ে অপরিহার্যরূপে বিদ্যমান। তবে আধুনিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক হওয়াতে অনেকগুলি রীতি মৌখিক পদ্ধতিকে আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলেছে। এই রীতিগুলির মধ্যে প্রশ্নোত্তর প্রণালীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মৌখিক পদ্ধতির (oral methods) সাফল্য নির্ভর করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তর গ্রহণের ওপর। শিক্ষার্থীর মানসিক সহযোগিতা ছাড়া শিক্ষাকর্ম চলতে পারে না। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই মানসিক সাহায্য লাভ করা যায়। প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনকে নতুন পাঠের প্রতি আগ্রহান্বিত করা, উপস্থাপিত বিষয়ের প্রতি অধিক মনযোগী করে তোলা, সদ্যলব্ধ জ্ঞানের মূল্যায়ন, গৃহে পাঠচর্চার নির্দেশ দান ইত্যাদি শিক্ষাকর্ম পরিচালনা করা যায়।

উপযোগিতা

প্রশ্নকর্তা কে ঃ এই বিচারে প্রশ্নকে দুভাগে ভাগ করা যায়। (i) শিক্ষকের প্রশ্ন এবং (ii) শিক্ষার্থীর প্রশ্ন শিক্ষক প্রশ্ন করেন শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান, রুচি, অভিরুচি, কৌশল ও সামর্থ্য জানবার জন্য এবং শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা বিধানের জন্য। শিক্ষকের প্রশ্নকে আনুষ্ঠানিক প্রশ্ন হিসেবে অভিহিত করা যায়। এক সময় ছিল যখন একমাত্র শিক্ষকই প্রশ্ন করতেন, সে যুগে প্রশ্ন করার অধিকার শিক্ষার্থীর ছিল না। অথচ কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন করতে চাইত। বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা-প্রচেষ্টায় আজ শিক্ষার্থীর এই স্বাভাবিক প্রশ্নকে মূল্য দেওয়া হচ্ছে। বস্তুতঃ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক প্রশ্নোত্তরের দ্বারাই শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীর একাত্মতা সৃষ্টি হয়। তাই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা হয়।

প্রশ্নের শ্রেণীবিভাগ (Classifications of Questions) **ঃ** উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যের বিচারে প্রশ্ন নানা ধরনের হতে পারে; যেমন—

উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যের বিচারে শ্রেণীবিভাগ

(১) **পরীক্ষামূলক প্রশ্ন** (Testing Questions),
(২) **শিক্ষামূলক প্রশ্ন** (Training Questions) এবং
(৩) **শৃঙ্খলামূলক প্রশ্ন** (Disciplinary Questions)।

এই তিন ধরনের প্রশ্নকে আবার বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) পরীক্ষামূলক প্রশ্ন: (ক) প্রস্তুতিমূলক বা পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্ন, (খ) পাঠানুসরণ প্রশ্ন, (গ) পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন, (ঘ) পাঠের ফলাফল পরিমাপক প্রশ্ন প্রভৃতি।

(২) শিক্ষামূলক প্রশ্ন: (ক) কৌতূহল উদ্দীপক, (খ) তথ্য আহরণের সহায়ক, (গ) আত্মবিশ্বাসকারী প্রশ্ন প্রভৃতি। মূলতঃ শিক্ষামূলক প্রশ্ন শিক্ষার্থীকে সামনে এগিয়ে চলার জন্য অনুপ্রাণিত করে।

(৩) শৃঙ্খলামূলক প্রশ্ন: (ক) শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা-বিধায়ক প্রশ্ন, (খ) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সহযোগিতা-বিধায়ক প্রশ্ন (গ) মনোযোগ আকর্ষণী প্রশ্ন প্রভৃতি।

আবার উত্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। যথা—(১) **তথ্যসূচক** (Data band), (২) **সমস্যাসূচক** (Problematic) এবং (৩) **মতামতধর্মী** (Opinion type)। প্রথম প্রকার প্রশ্নের উত্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তক, রেফারেন্স পুস্তক, সহপাঠ্য পুস্তক, পত্র-পত্রিকাদির ওপর নির্ভর করতে হয়। দ্বিতীয় প্রকার প্রশ্নের উত্তরের জন্য বিষয়ের যুক্তিধর্মী ব্যাখ্যা, বিচার-বিশ্লেষণ, কর্মসম্পাদন, সমস্যা সমাধান ইত্যাদির ওপর নির্ভর করতে হয়। তৃতীয় স্তরের প্রশ্নে শিক্ষার্থীদের মতামত গ্রহণ করা হয়। এই মতামত ব্যক্তিসাপেক্ষ অথবা নিরপেক্ষ হতে পারে। উত্তরের বিভিন্নতার মধ্যে যুক্তি থাকলে তার মর্যাদা দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

উত্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণীবিভাগ

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের পূর্বে শিক্ষককে পাঠটীকা প্রস্তুত করতে হয়। পাঠটীকায় মূলতঃ তিনটি পর্ব, যথা—(১) প্রস্তুতি বা আয়োজন (preparation), (২) উপস্থাপন (presentation) এবং (৩) মূল্যায়ন (evaluation)। এই পর্বত্রয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রশ্নকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়। **প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন** (Preparatory questions), **বিষয়ের ক্রমগতিসূচক প্রশ্ন** (Developing questions) এবং **পরীক্ষামূলক প্রশ্ন** (Testing questions)।

পাঠটীকা পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নের শ্রেণীবিভাগ

প্রথম প্রকার প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করেন এবং শিক্ষক ধীরে ধীরে অন্তকার পাঠ-ঘোষণার পথ প্রস্তুত

করেন। দ্বিতীয় প্রকার প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠের ক্রম অনুসারে শিক্ষক ধাপে ধাপে অগ্রসর হন। তৃতীয় প্রকার প্রশ্ন দ্বারা শিক্ষার্থী কতটুকু নবলব্ধ জ্ঞান আয়ত্ত করতে পেরেছে তা পরীক্ষা করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, টি. রেমণ্ট তাঁর 'Principles of Education' নামক পুস্তকে পর্যালোচনামূলক প্রশ্নের (Recapitulatory questions) কথাও বলেছেন। উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর প্রতিটি শীর্ষের (Point) পরিবেশনান্তে অথবা সমগ্র পাঠের শেষ প্রান্তে এরূপ পুনরাবৃত্তি বা পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায়।

আদর্শ প্রশ্নের লক্ষণ (Marks of Good Questions)ঃ প্রশ্নের উদ্দেশ্যে হল শিক্ষার্থীর মনে সৃজনমূলক এবং যুক্তিমূলক চিন্তাধারার বিকাশসাধন করা। এদিক থেকে বিচার করে সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ প্রশ্নের নিম্নরূপ লক্ষণগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে:

প্রথমতঃ, প্রশ্নের ভাব ও ভাষা হবে সুন্দর, সহজ ও সুস্পষ্ট এবং তা শিক্ষার্থীর বয়স ও বুদ্ধির অনুপাতে হওয়াই বাঞ্ছনীয় হবে। পাঠ্য পুস্তকের জটিল ও গুরুগম্ভীর ভাষা প্রশ্নের ক্ষেত্রে সর্বদা পরিত্যজ্য। অন্যথায় শিক্ষার্থীরা পুস্তকের ভাষাতেই উত্তর দেওয়ার ইচ্ছায় না বুঝেই বিষয় মুখস্থ রাখার চেষ্টা করবে। এ কথাও মনে রাখা উচিত, নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহৃত ভাষা এবং উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের ভাষা সমান হবে না।

দ্বিতীয়তঃ, আদর্শ প্রশ্নের উত্তর এমন হবে যেন তার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা বা অসামঞ্জস্য না থাকে। অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রশ্নের উত্তর যতটা সীমিত করা যায় ততই ভাল। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ উত্তর সংবলিত প্রশ্ন করা যেতে পারে। তবে সকলের ক্ষেত্রেই উত্তর সীমিত করাই বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয়তঃ, যার উত্তর 'হাঁ' বা 'না' এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করাই বাঞ্ছনীয়। অন্ততঃ পাঠ পরিবেশনের সময় এরূপ প্রশ্ন উদ্দেশ্যসাধনের পরিপন্থী। তবে ঘরোয়া আলোচনায় অথবা পাঠের আয়োজনপর্বে অনেক সময় এরূপ উত্তর সংবলিত প্রশ্ন কথায় কথায় এসে যায়, একে সম্পূর্ণ এড়ানো সম্ভব হয় না।

চতুর্থতঃ, উত্তরটি প্রশ্নের মধ্যে আছে এমন প্রশ্ন বাঞ্ছনীয় প্রশ্নই নয়। যেমন, ১৮৫৭ সালে সিপাহী যুদ্ধ হয়েছে, তাই না? এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় শিক্ষার্থীকে চিন্তা করতে হয় না। তাই এমন প্রশ্ন, আদর্শ প্রশ্ন নয়।

পঞ্চমতঃ, অনেক প্রশ্ন আছে যেগুলি বক্তব্যের মাধ্যমে প্রশ্নবোধ জাগাতে পারে কিন্তু বাক্যগঠনে প্রশ্নের রূপ ধারণ করে না। যেমন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হলেন? এভাবে ঘুরিয়ে প্রশ্ন না করে সোজাসুজি প্রশ্ন করাই হল আদর্শ প্রশ্নের লক্ষণ।

ষষ্ঠতঃ, যে প্রশ্ন চিন্তা উদ্দীপক (thought-provoking), যে প্রশ্ন শিক্ষার্থীকে পরিবেশিত পাঠের প্রতি আকর্ষণ করে, যে প্রশ্ন শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও নবলব্ধ জ্ঞানের সমন্বয় হল কিনা এবং নবলব্ধ জ্ঞানকে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে কিনা তা পরীক্ষা করায় সাহায্য করে তাই আদর্শ প্রশ্ন।

প্রশ্নোত্তর রীতির প্রয়োগ (Application of Question-answer Technique)ঃ প্রশ্নোত্তর রীতির প্রয়োগ ব্যবস্থাপনায় তিনটি সূক্ষ্ম স্তর বিদ্যমান। যথা—(১) প্রশ্ন তৈরি, (২) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, (৩) প্রশ্নের উত্তর গ্রহণ। প্রতিটি স্তরে শিক্ষককে কতকগুলি অবশ্য পালনীয় নীতি স্মরণ করতে হয়।

(১) প্রশ্ন তৈরিঃ প্রশ্ন তৈরির সময় **প্রথমতঃ,** আদর্শ প্রশ্নের বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণ করা এবং সেই অনুসারে প্রশ্ন তৈরি করা কর্তব্য। **দ্বিতীয়তঃ,** প্রশ্ন তৈরির সময় শিক্ষক নিজেই তার উত্তর মনে মনে ঠিক করবেন। উত্তরগুলি যেন দ্ব্যর্থবোধক ও পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে অসমঞ্জস না হয়। **তৃতীয়তঃ,** প্রশ্নগুলি যেন পাঠ্যবিষয়ের ধারানুকূল, উদ্দেশ্যমূলক, যুক্তিপূর্ণ ও সুপরিকল্পিত হয়। **চতুর্থতঃ,** প্রশ্নগুলিতে যেন ব্যাকরণগত কোন ত্রুটি না থাকে। অবশেষে বলা যায়, প্রশ্নগুলি যেন শিক্ষার্থীদের বয়স ও সামর্থ্যের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে।

(২) প্রশ্ন জিজ্ঞাসাঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সময় নিম্নরূপ নীতি পালন করা কর্তব্য।

প্রথমতঃ, শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে। সকলের জন্য প্রশ্ন ঘোষণা করলে সকলেই তার উত্তর সম্পর্কে চিন্তা করবে।

কোন বিশেষ একজনকে প্রশ্ন করলে কেবলমাত্র সেই শিক্ষার্থীই উত্তরদানের জন্য সচেষ্ট হবে, অন্যেরা নিশ্চিন্ত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। সকলের জন্য প্রশ্ন ঘোষণার পর যারা হাত তুলে উত্তরদানের প্রস্তুতি-সঙ্কেত জানাবে তাদের মধ্যে একজনকে উত্তর জিজ্ঞাসা করতে হবে। সঠিক উত্তর না পেলে শিক্ষার্থীদের অন্য একজনকে জিজ্ঞাসা করতে হয়। এইভাবে সঠিক উত্তর প্রাপ্তির পর যারা হাত তোলেনি তাদের কাউকে ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়। কারণ, প্রথম বা দ্বিতীয় শিক্ষার্থীর নিকট থেকে সঠিক উত্তর জানার পর পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীরা বিষয়টি জানল কিনা পরীক্ষা করা দরকার।

দ্বিতীয়তঃ, বিষয় উপস্থাপন স্তরে বেশ খানিকটা বিষয় শিক্ষার্থীদের নিকট পরিবেশনের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়। এতে বিষয় মনে রাখার জন্যে শিক্ষার্থীরা চেষ্টা করবে। কোন একটি বিষয় (যেটি প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নের উত্তর) পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলে শিক্ষার্থীরা মনে রাখার চেষ্টা না করে ঐ বিষয়গত কথাটিকে উত্তর হিসেবে ফিরিয়ে দেবে। যেমন (বক্তব্য) ভারতের রাজধানী দিল্লী। (প্রশ্ন) ভারতের রাজধানী কোথায় ?—বক্তব্যের মাধ্যমে এরূপ উত্তরটি প্রকাশ করেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কোন মূল্য নেই।

তৃতীয়তঃ, একই প্রশ্ন বার বার জিজ্ঞাসা করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। এর দ্বারা শিক্ষার্থীরা বিরক্ত ও অমনযোগী হয়ে পড়ে। আবার প্রশ্ন করার সময় কষ্টকল্পিত ভাব প্রকাশ করা, দ্বিধাগ্রস্থ হওয়া অথবা শিক্ষকের নিজের মুখস্থ করা বিষয় স্মরণ করতে করতে সময় নষ্ট করা মোটেই চলবে না। প্রশ্ন করার ভাবধারা হবে স্বতঃস্ফূর্ত, অবিচ্ছেদ্য ও মনোগ্রাহী।

(৩) **প্রশ্নের উত্তর গ্রহণ**ঃ আদর্শ প্রশ্ন তৈরি এবং ঘোষণার সময় শিক্ষককে যেমন সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তেমনি উত্তর গ্রহণ প্রসঙ্গেও সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

(i) শিক্ষার্থীর উত্তর হবে সম্পূর্ণ ও নির্ভুল। মৌখিক উত্তর অনেক সময় বাক্যবিন্যাসের বিচারে অসম্পূর্ণ থাকতে পারে। কিন্তু লিখিত উত্তর হবে পরিপূর্ণ বাক্যদ্বারা। বিষয়বস্তুর দিক থেকে সম্পূর্ণ ও নির্ভুল উত্তর সর্বদা বাঞ্ছনীয়।

(ii) নির্ভুল ও সম্পূর্ণ উত্তর আদায় সম্ভব না হলে শিক্ষককে সহজভাবে উত্তরটি বলে দেওয়া কর্তব্য। এরপর পুনরায় ঐ উত্তর জিজ্ঞাসা করে

শিক্ষার্থীরা বিষয়টি সঠিক জানল কিনা পরীক্ষা করা যেতে পারে। এভাবে নির্ভুল উত্তরটি জানবার জন্য প্রশ্নটিকে শ্রেণীকক্ষে পুনরাবৃত্তি (drilling) করা উচিত।

(iii) শিক্ষার্থীপ্রদত্ত উত্তরটি হল শ্রেণীকক্ষের সম্পদ। এরূপ সম্পদ থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না হয় সেজন্যে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টস্বরে উত্তরটি বলার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে।

(iv) ভুল উত্তর প্রদানের জন্য শিক্ষার্থীকে ভৎর্সনা করা যেমন উচিত নয় তেমনি নির্ভুল উত্তরের জন্য কাউকে প্রত্যক্ষভাবে অত্যধিক প্রশংসা করাও উচিত নয়। কারণ, এর দ্বারা অগ্রসর শিক্ষার্থীরা অবাঞ্ছনীয় দম্ভ অনুভব করবে এবং অনগ্রসর বা অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের মনে হীনমন্যতা সৃষ্টি হবে। লাজুক ও অকৃতকার্য শিক্ষার্থীকে সর্বদা উৎসাহিত করা যুক্তিযুক্ত।

(v) প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সঙ্গে সাঙ্গে অগ্রসর শিক্ষার্থীরা আগে উত্তর দেওয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। অনেক সময় কোন বিশেষ শিক্ষার্থীকে উত্তরদানের নির্দেশ দেওয়ার পূর্বেই একত্রে একাধিক শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে। এরূপ ঘটনা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করা বাঞ্ছনীয়।

(vi) নির্ভুল, সম্পূর্ণ এবং পাঠ্যবিষয়ের ধারাবাহিক প্রশ্নোত্তরের জন্য সর্বদা শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর নির্ভর করা এবং সেই অনুসারে প্রশ্নোত্তর-প্রক্রিয়া পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়।

গ। অনুবন্ধ, সহযোজন ও সমন্বয় রীতি (Correlation, Co-ordination and Integration Technique)ঃ

অনুবন্ধের তাৎপর্য (Significance of Correlation)ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা আসে জ্ঞান অর্জন করতে। তারা অনুমোদিত পাঠ্য-তালিকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করে। বাংলা, ইংরাজী, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। পাঠ্যতালিকায় বিষয়ের যেমন বৈচিত্র্য আছে তেমনি আবার যে কোন বিশেষ বিষয়ের মধ্যেও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এক অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে আছে—পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি; তেমনি ইতিহাসের মধ্যে আছে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস; ভূগোলে

থাকে প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, মানবিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি অংশ। বিভিন্ন বিষয়গুলি এমনকি নির্দিষ্ট বিষয়ের অংশগুলি অনন্যসাপেক্ষ স্বতন্ত্র বলে মনে হয়। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, জ্ঞান হল অখণ্ড ও অবিভাজ্য। পাঠ্যবিষয়গুলি এই অখণ্ড জ্ঞানের এক একটি উপকরণ মাত্র। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। এ সম্পর্ক বজায় রেখে যদি পাঠদান করা যায় তাহলে সে শিক্ষা প্রচেষ্টা হবে সার্থক ও স্বাভাবিক। এভাবে **অখণ্ড জ্ঞানের অন্বেষণে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের পদ্ধতিকে বলা হয় অনুবন্ধ প্রণালী** (Correlation technique))

পাঠ্যতালিকায় বিষয়ের ভিন্নতা সত্ত্বেও সম্পর্ক বিদ্যমান

অতীতেও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক রেখে পঠন-পাঠনের রীতি প্রচলিত ছিল। ফ্রান্সিস বলডুইনাস্ (*Francis Balduinus*) ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপন করে পুস্তক রচনার চেষ্টা করেন। শিক্ষাবিদ্ পেস্তালোৎসীও (*Pestalozzi*) অনুবন্ধ প্রণালী সমর্থন করতেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই প্রণালীর বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অনুবন্ধ প্রণালীর বাস্তব ও আধুনিক ধারণা প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে প্রচলিত। এ সময় থেকেই মনীষী হারবার্ট জ্ঞানের অখণ্ডতা সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন,'শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠনই শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য।' তাঁর মতে 'চরিত্র' ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল, ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার ওপর, আকাঙ্ক্ষা আগ্রহের ওপর, আগ্রহ চিন্তাবৃত্তের ওপর নির্ভরশীল এবং একটি শক্তিশালী চরিত্র এই চিন্তাবৃত্তের (Circle of thought) ব্যাপক ও সুসংহত অনুশীলন দ্বারা গঠন করা যেতে পারে।'[1] বস্তুতঃ এই চরিত্র তখনই গঠিত হয় যখন বিভিন্ন অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে একক ও অখণ্ড জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে হারবার্টের সুযোগ্য অনুগামী জিলার (*Ziller*) অনুবন্ধ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলতেন, কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া পরিচালনা করা কর্তব্য। ইতিহাসকে তিনি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে গণ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ, ইতিহাসে মানুষ ও মানুষ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় স্থান পেয়েছে। ভারতে মহাত্মা গান্ধী

অনুবন্ধস্থাপনে শিক্ষাবিদদের প্রচেষ্টা

1. Character depends upon will, will upon desire, desire upon interest and interest upon the circle of thought and a strong character can be formed only by cultivating an excessive and coherent circle of thought.—"
—*Harbert*

শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা (Craft centred education) প্রচলনের চেষ্টা করেছেন। আমেরিকার জন ডিউই (*John Dewey*) অনুবন্ধ নীতিকে (Correlation) সমন্বয় (integration) হিসেবে ব্যবহার করে বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে সংহতি বিধানের চেষ্টা করেন। শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের এই প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে অখণ্ড জ্ঞানলাভের উপায় নির্ধারণের প্রবণতা।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, জ্ঞান হল এক, অখণ্ড ও অবিভাজ্য। আমাদের চিন্তাধারাকে সুসংহত করতে পারলে জ্ঞানলাভ সহজসাধ্য হয়। চিন্তাগুলি যদি এলোমেলো ও আলগাভাবে মনের মধ্যে ভেসে বেড়ায় তাহলে তার কোন শক্তি থাকে না। জ্ঞান বা শিক্ষালাভের অনুকূলে চিন্তাকে সংহত করার জন্যই আমাদের আনুষ্ঠানিক এই শিক্ষাব্যবস্থা। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে বিচিত্র পাঠ্যবিষয় আমাদের এই চিন্তাধারাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। তাই এমন শিক্ষণ-প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা দরকার যেন বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা এবং চিন্তাধারাকে সংহত করা সম্ভব হয়। অখণ্ড জ্ঞানের সন্ধানে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের এই প্রক্রিয়া হল অনুবন্ধ প্রণালী (Correlation Technique)। অনুবন্ধ সম্পর্কে আমেরিকার আর্থার সি. বাইনিং (*Arthur C. Bining*) ও ডেভিড এইচ. বাইনিং (*David H. Bining*)-এর অভিমত[1] হল, সম্পর্কযুক্ত উপাদান বা বিষয়গুলি থেকে শিক্ষার্থী কর্তৃক লব্ধজ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনকে অনুবন্ধ বলা হয়। আধুনিক শিক্ষাধারায় এই অনুবন্ধ প্রণালী সাদরে গৃহীত হয়েছে।

অনুবন্ধের সংজ্ঞা

অনুবন্ধের প্রকার (Types of Correlations) **:** অনুবন্ধ স্থাপনের উপায়গুলির বৈশিষ্ট্য নিয়ে শ্রেণীবিভাগ করলে আমরা দুটি প্রধান উপায়ের (Means) সন্ধান পাই। যথা—(১) **বিষয়গত অনুবন্ধ** ও (২) **শিক্ষণ-পদ্ধতিগত অনুবন্ধ**।

আধুনিক যুগ হল বিশেষীকরণের যুগ। এ যুগে যে কোন একটি বিশেষ বিষয়ে (Subject) গভীর ও ব্যাপক পাণ্ডিত্য অর্জনের প্রবণতা খুব বেশী।

1. Correlation is nothing more than the attempt to tie up the knowledge that the pupil is studying with the knowledge in a related field." —Teaching the Social Studies in Secondary School, Page 178.

যিনি অঙ্কশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন তিনি হয়ত ইতিহাসে অধিক পাণ্ডিত্য অর্জন নাও করতে পারেন। ফলে, সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়-জ্ঞানের অভাব সামাজিক জীবনেও লক্ষ্য করা যায়। এর প্রতিবাদ স্বরূপ পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপনের প্রচেষ্টা চলছে। ফলে, সমাজবিদ্যা, সাধারণ-বিজ্ঞান, সাধারণ অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি কোর বিষয়গুলির (Core Subjects) মাধ্যমে পাঠ্যবিষয়গত অনুবন্ধসাধনের রীতি প্রবর্তিত হয়েছে।

শিক্ষণ-পদ্ধতিগত অনুবন্ধ প্রক্রিয়াকে আমরা প্রধানতঃ তিন প্রকারে ভাগ করতে পারি। যথা—

(ক) উল্লম্ব (Vertical), (খ) আনুভূমিক (Horizontal) এবং (গ) জীবনমুখী (Life-oriented) অনুবন্ধ।

(ক) **উল্লম্ব অনুবন্ধ:** এই শ্রেণীর অনুবন্ধ মূলতঃ একটি বিষয়ের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তাই একে অভ্যন্তরীণ অনুবন্ধও (Internal Correlation) বলা যেতে পারে। নানা উপায়ে এরূপ অনুবন্ধসাধনে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা যায়। **প্রথমতঃ**, একই বিষয়ের বিভিন্ন অংশ বা অধ্যায়ের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপন করা; যেমন—উৎপাদন, ব্যবহার, বণ্টন, বিনিময় ইত্যাদি হল অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। এর যে কোন অংশের আলোচনাকালে অন্য অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষণের প্রয়োজন আছে। **দ্বিতীয়তঃ**, পূর্বপাঠের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য বর্তমান পাঠের অনুকূল সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। **তৃতীয়তঃ**, একটি বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে অনুবন্ধসাধন করা হয়; যেমন—পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতির মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করা। তেমনি ইংরাজী শিক্ষার সময় সাহিত্যের সঙ্গে ব্যাকরণের সঙ্গতি রক্ষা করা হয়। **চতুর্থতঃ**, বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে উল্লম্ব অনুবন্ধ স্থাপনের জন্যে সমগোত্রীয় বিষয় নিয়ে কয়েকটি দল (group) গঠন করা যেতে পারে। লক্ষ্য রাখা দরকার, দলীয় বিষয়গুলির মধ্যে যেন সহজ ও স্বাভাবিক যোগসূত্র থাকে। এরূপ উল্লম্বকে **সহবন্ধ প্রণালী** (Co-ordination) বা সহযোজনাও বলা হয়। এরূপ প্রণালীর প্রবক্তা হলেন ডক্টর হ্যারিস (*Dr. Harries*)। তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত বিষয়গুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেন, যথা—(i) সাহিত্য ও কলা, (ii) জীববিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা, (iii) ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা, (iv) ভূগোল-বিজ্ঞান এবং (v) ব্যাকরণ তর্কশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান।

পূর্বোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপনের জন্য বিষয়-শিক্ষকরা পূর্বনির্ধারিত সময়তালিকার ভিত্তিতে যুগপৎ পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করবেন। তবে এক গুচ্ছের সঙ্গে অন্য গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির অনুবন্ধ রচনা করা চলবে না। আধুনিক কর্মবহুল বিদ্যালয়জীবনে এভাবে অনুবন্ধ স্থাপন করে সময়তালিকা ও পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। অপেক্ষাকৃত উচ্চতর শ্রেণীতে সহযোজনার ব্যবস্থা করলে প্রকৃতপক্ষে বিষয়-সম্পর্ককে সুস্পষ্ট ও বাস্তবায়িত করা যায় এবং এরদ্বারা শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হতে পারে।

(খ) **আনুভূমিক অনুবন্ধ:** এই শ্রেণীর অনুবন্ধে বিভিন্ন বিষয়ের (Subjects) মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। তাই একে আমরা বাহ্যিক অনুবন্ধ (External Correlation) নামে অভিহিত করতে পারি। দুটি পন্থায় আনুভূমিক অনুবন্ধসাধন করা যায়, যথা—(i) আকস্মিক বা প্রাসঙ্গিক (Incidental), এবং (ii) পূর্বপরিকল্পিত (Pre-planned) অনুবন্ধ।

(i) **প্রাসঙ্গিক অনুবন্ধ:** শ্রেণীতে পাঠদানের সময় প্রসঙ্গত একটি বিষয় থেকে অন্যটিতে যাওয়ার সুযোগ এসে যায়। এর জন্য পূর্বপরিকল্পনার কোন প্রয়োজন হয় না। যেমন, অর্থনীতির পাঠদানের সময় শিক্ষক সমাজবিজ্ঞানের যে-কোন শাখার সঙ্গে অনুবন্ধ স্থাপন করতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বস্ত্রের উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনার সময় ভৌগোলিক উপাদানের (Geographical factors) গুরুত্ব বর্ণনা করা যায়। তখন মাটি, বৃষ্টিপাত, জলবায়ু প্রভৃতি ভৌগোলিক বিষয় অপরিকল্পিতভাবেই আলোচনার বিষয়রূপে পরিগণিত হয়। ইতিহাসের দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, শিবাজীর বিষয় আলোচনার সময় মারাঠা জাতির বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে ভৌগোলিক প্রভাব, 'শিবাজী উৎসব' কবিতা পাঠের সময় ঐতিহাসিক পটভূমিকার অবতারণার দ্বারা সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাসের অনুবন্ধ রচনা করা যায়।

(ii) **পূর্বপরিকল্পিত** বা **প্রণালী সম্মত অনুবন্ধ** (Systematic Cotrelation): পূর্বপরিকল্পিত অনুবন্ধে শিক্ষককে পূর্ব থেকে পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকগণ একত্রে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এরূপ পরিকল্পনা রচনা করেন। পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ের

পাঠ সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলে। যেমন—অর্থনীতির ইতিকথা আলোচনা করার সময় পৌরবিজ্ঞানের উদ্ভব এবং রাষ্ট্র সংগঠনের ইতিহাসকে সমান্তরালভাবে বর্ণনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। প্রসঙ্গত মনে রাখা উচিত, অনুবন্ধ স্থাপন যেন সহজ, সরল ও যুক্তিপূর্ণ হয়। কারণ, অহেতুক কষ্টকল্পিত অনুবন্ধ পাঠ্য বিষয়টিকে কৃত্রিম করে তোলে। এছাড়া, বিষয়-বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে অনুবন্ধ স্থাপন করাও কর্তব্য।

আনুভূমিক অনুবন্ধ (Horizontal Correlation) যখন চরম অবস্থায় পৌছায় তখন তাকে **কেন্দ্রবদ্ধ প্রণালী** (Concentration technique) নাম দেওয়া যেতে পারে। এই প্রণালীতে কোন একটি পাঠ্যবিষয়কে কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে ধরা হয় এবং অন্যান্য বিষয়কে কেন্দ্রাভিসারী বা অনুগামীরূপে গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় বিষয়ের সঙ্গে অনুবন্ধ স্থাপন করা হয়। বিষয়গুলির মধ্যে কোনটি কেন্দ্র হবে এবং কোনটি হবে অনুগামী এ নিয়ে মতভেদ রয়ে গেছে। হার্বার্টের অনুগামীরা চেয়েছেন ইতিহাসকে কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে গণ্য করতে; বার্কারের মতে প্রকৃতি বিজ্ঞান হবে কেন্দ্রীয় বিষয়। আবার ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় কারুশিল্পকে (Craft) ধরা হয়েছে কেন্দ্রীয় বিষয়। **এই মতভেদের ফলে আমরা কেন্দ্রবদ্ধ প্রণালীকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে নিতে পারি।**

প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে স্বতন্ত্র (অনন্য সাপেক্ষ নয়) বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে পঠন-পাঠনের সময় প্রণালীসিদ্ধ (Systematic technique) অন্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে। যখন, ইতিহাস শিক্ষণ-প্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ বা আলোচনা দ্বারা ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে সমৃদ্ধ করে নিতে পারা যায়। সহায়ক-পাঠ্যপুস্তক পাঠ (Collateral Reading) এরূপ প্রাসঙ্গিক উপায় হিসেবে গণ্য। এজন্যই সার্থক অনুবন্ধসাধনের প্রয়োজনে বিষয়বস্তুর ওপর শিক্ষকের পাণ্ডিত্য গভীর ও ব্যাপক হওয়া চাই।

দ্বিতীয়তঃ, কোন নির্দিষ্ট বিষয়কে প্রধান এবং অন্যান্য বিষয়কে অপ্রধান বা অনুগামী হিসেবে গণ্য না করে অখণ্ড জ্ঞানবস্তুকে বা ক্রিয়াকে (activity) মৌলিক বিষয় ধরে অন্য সকল বিষয়ের মধ্যে সংহতি বা সংযোগসাধনের চেষ্টা করা যেতে পারে। একে সংযোজন, সংহতি বা সমন্বয় প্রণালী

(Integration technique) বলা হয়। এরূপ প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য যথাযথ থাকলেও তাদের সীমা (demarcation) সম্পূর্ণ একাকার হয়ে মূল বক্তব্য প্রকাশে সাহায্য করে। এর ফলেই বিষয়ের মধ্যে সংহতি স্থাপন করা সম্ভব হয়।[1] মনে রাখা দরকার, এখানে মূল পাঠ্যসূচীর মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রথম প্রয়োজন। তাহলে পদ্ধতির ক্ষেত্রেও প্রণালী প্রয়োগ করা সহজতর হবে। যেমন—সমাজবিদ্যা পুস্তকখানি সমন্বয় প্রণালীতে বিন্যস্ত। এর যে কোন বিষয়াংশকে (topic) কেন্দ্র করে প্রকল্প-পদ্ধতির (Project Method) দ্বারা অনুবন্ধসাধন করা যায়।

তৃতীয়তঃ, সংহতির (integtation) পরবর্তী স্তর হল **একাত্মকরণ** (fusion)। এই প্রণালীতে নির্বাচিত বিষয়াদির স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।[2] সমন্বয় ও একাত্মকরণ প্রণালীতে শিশুর জীবন ও পরিবেশকে কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে গণ্য করে প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করা যায়। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রেই এটা সম্ভব। টি. রেমণ্ট (*T. Raymont*) তাই ছোটদের জন্য রবিনসন ক্রুসোকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে গণ্য করতে চেয়েছিলেন। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রণালীর উপযোগিতা অনস্বীকার্য। কিন্তু যখন পৃথক পৃথকভাবে মূল-ইতিহাস, ভূগোল বা বিজ্ঞান পাঠ শুরু হয় তখন আর সংহতি ও একাত্মকরণ প্রণালী কার্যকর হতে পারে না।

চতুর্থতঃ পাঠ্য বিষয়াদির মধ্যে কোনটি কেন্দ্রীয় ও কোনগুলি তার শাখা-প্রশাখা—এ-নিয়ে মতভেদ আছে। তাই জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন—মানবিক বিষয়, প্রকৃতি বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ইত্যাদির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি প্রধান প্রধান বিষয়ের আবার উপবিভাগ রয়েছে। যেমন, মানবিক বিষয়ের মধ্যে আছে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি।

---

1. "Integration means the creation of units of understanding that consists of integrated materials of instruction from several fields, in order to present a whole picture of a phase of knowledge rather than a part".

Bining & Bining

2. "Fusion implies the breakdown of subject boundaries and the selection of material from various fields, to achieve the objectives that have been set up." *Bining & Bining*

এসব শাখা প্রশাখার মধ্যে বিষয়বস্তু ও তার পরিধির সীমারেখাও চিহ্নিত। এদিকে সত্যিকারের জ্ঞান হল এক ও অখণ্ড। এই অখণ্ড জ্ঞান অর্জনে সহায়তার জন্য শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু সংগঠন ও পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংহতি, একাত্মকরণ, কেন্দ্রবদ্ধ ইত্যাদি প্রণালী প্রয়োগ করা বিজ্ঞানসম্মত উপায়। মাধ্যমিক স্তরের নিম্নশ্রেণীর দিকে পাঠ্যবিষয়গুলির সীমা অনেকখানি সুস্পষ্ট। এসব ক্ষেত্রে পঠন-পাঠন নীতি প্রসঙ্গে অনুবন্ধ প্রণালীর বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হয়। মাধ্যমিক স্তরের উঁচু শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত পাঠ্য বিষয়গুলির সীমারেখা অনেক বেশী সুস্পষ্ট। এইসব ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের সময় অনুবন্ধ প্রণালী কষ্টকল্পিত হতে পারে। তাই এই স্তরে যে নীতি অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত তাকে বলা যায় **সহযোজন কৌশল** (Co-ordination technique)। সহযোজন কৌশল বাস্তবতঃ অনুবন্ধ নীতির সমগোত্রীয়। তবে এটিতে বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে চিন্তার গভীরতা নেই বললেও চলে।

সহযোজনের ক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয়গুলিকে সমতুল বা সমমানের (equal in rank or order) বলে ধরা হয় বা অনুরূপ মর্যাদা দেওয়া হয়। মূলতঃ পাঠ্যবিষয়গুলি সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীকে এক ও অখণ্ড জ্ঞান লাভে সাহায্য করে। শিক্ষক এক্ষেত্রে সহযোজক বা সমন্বয় সাধকের (Co-ordinator) ভূমিকা পালন করেন। তিনি এমন কৌশল প্রয়োগ করেন যাতে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে যে তাদের পাঠ্যবিষয়গুলি সম-মর্যাদা সম্পন্ন এবং তারা অখণ্ড জ্ঞানের সহায়করূপে একত্রে কাজ করে চলেছে (Working together or functioning in harmony)। এক্ষেত্রে কোন বিষয়কে কেন্দ্রীয়রূপে এবং অন্যান্য বিষয়কে তার সহায়ক শাখা-প্রশাখারূপে গণ্য করা হয় না। প্রতিটি বিষয় সমমর্যাদা সম্পন্ন অথচ প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। পাঠদানের বা পাঠ পরিবেশনের সময় অতি সাধারণ উপায়ে প্রতিটি বিষয়ের মর্যাদা ও পারস্পরিক সম্পর্ককে তুলে ধরা যায়। এরূপভাবে সম্পর্ক স্থাপন প্রক্রিয়া প্রাসঙ্গিক অথবা পূর্বকল্পিত অনুবন্ধের অনুরূপ।

(গ) **জীবনমুখী অনুবন্ধঃ** এই শ্রেনীর অনুবন্ধে পাঠ্য গ্রন্থ ও জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। জীবনমুখী শিক্ষাই বাস্তব ও সার্থক শিক্ষা। এই অনুবন্ধ বৈজ্ঞানিক ও সর্বজনস্বীকৃত। শিক্ষায় এর গুরুত্ব

সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবসর নেই। হারবার্ট প্রথম এই জীবনমুখী অনুবন্ধের উল্লেখ করেন। তাঁর মতে আমাদের বর্তমান শিক্ষার্থীকে ভাবী জীবনযুদ্ধের উপযোগী করে তৈরি করে দিতে হবে। সুতরাং বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা ও জীবনমুখী অনুবন্ধ-পদ্ধতি প্রয়োগ করাই বাঞ্ছনীয়। তাই পাঠ্যসূচীর তত্ত্বগত (Theoretical) ও ব্যবহারিক (Practical) বিষয়ের মধ্যে সংহতি বিধান করা অত্যাবশ্যক। সমাজবিদ্যার বিভিন্ন শাখার (ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি ইত্যাদি) পঠন-পাঠন প্রসঙ্গে সামাজীকরণের রীতি প্রয়োগও এই নীতির অন্তর্ভুক্ত। তাই শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর জীবন ও পরিবেশকে কেন্দ্র করে প্রকৃতি পাঠকে (Nature Study) জীবনধর্মী করা হয়েছে।

অনুবন্ধের গুরুত্ব ও উপযোগিতা (Importance and Utility of Correlation) : অন্যান্য বিষয় বা উৎস থেকে লব্ধজ্ঞানের সঙ্গে অনুবন্ধ স্থাপিত না হলে কোন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান স্থায়ী ও জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে না। বস্তুতঃ জ্ঞান হল অখণ্ড ও অবিভাজ্য। জ্ঞানকে খণ্ড-বিখণ্ড করে অনন্যসাপেক্ষ স্বতন্ত্র বিষয়রূপে গণ্য করা যায় না। শিক্ষালাভের সুবিধার্থে আমরা অখণ্ড জ্ঞানকে বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত করে অনুশীলন করি। আমাদের মন (Mind) বিচ্ছিন্নভাবে সংগৃহীত অভিজ্ঞতাকে রূপান্তরিত করে 'জ্ঞানরূপ' একীভূত সত্তার সৃষ্টি করতে পারে। মনের এই সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ ক্ষমতা অনন্যসাধারণ। তাই আমরা যদি জ্ঞানের বিভিন্ন উপাদান বা বিষয়গুলিকে নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বিষয়রূপে আলোচনা করি, তাহলে প্রকৃত অখণ্ড জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। মনের সংযোগ ক্ষমতাকে (Power of cohesion) যেমন অবহেলা করা যায় না, তেমনি শিক্ষার্থীর মনকে কতকগুলি সম্পর্কহীন স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠেও বিভক্ত করা সম্ভব নয়।

এক ও অখণ্ড জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে গুরুত্ব

মানুষের প্রতিটি কাজকর্মও পারস্পরিক সম্পর্কে সম্পর্কিত। কোন কর্মই একক ও নিরপেক্ষভাবে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং তুলা উৎপাদনকারীর কাজের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায়ই বস্ত্রের উৎপাদন সম্ভব হয়। চিকিৎসকের জন্মনিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলীর সঙ্গে খাদ্য-সমস্যা সমাধান প্রচেষ্টার সম্পর্ক না থাকলে বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

বাস্তব কর্ম-সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনুবন্ধের গুরুত্ব

সুতরাং অনুবন্ধ স্থাপনের দ্বারা শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব অভিজ্ঞতায় এরূপ পরিপূর্ণ জ্ঞানসত্তার উপলব্ধি করতে পারে। তাই **অনুবন্ধের গুরুত্ব** অপরিসীম।

বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপন করে শিক্ষাদান-পদ্ধতি পরিচালনা করলে লব্ধজ্ঞান সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী হতে পারে। জ্ঞানকে স্থায়ী ও বাস্তবধর্মী করতে হলে তত্ত্বগত বিষয়গুলির ব্যবহারিক প্রয়োগও জানতে হয় এবং মানুষ ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। অনুবন্ধ প্রণালীতে প্রদত্ত শিক্ষা প্রত্যক্ষ ও পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তাই সেই অভিজ্ঞতা মনের অনুধাবন প্রক্রিয়ায় স্মৃতিশক্তির গভীরে প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে জ্ঞান জীবন প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে ঈপ্সিত গুণ-বিকাশে সাহায্য করে।

জ্ঞানকে সুদৃঢ় ও স্থায়ী-করণে অনুবন্ধের গুরুত্ব

অল্প সময়ে যে কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভের জন্য অনুবন্ধ প্রণালী অধিক ফলদায়ী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সমাজবিদ্যা নামক পুস্তকখানি ইতিহাস ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান এবং মানুষের সমাজ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের সমন্বয়ে রচিত। তাই এর বিষয়সূচীতে আমরা অনুবন্ধনীতি দেখতে পাই। এরূপ যে-কোন বিষয়ে পাঠদান-প্রসঙ্গে অনুবন্ধ-নীতির সঠিক প্রয়োগ করলে অল্প সময়ে একই সঙ্গে অনেকগুলি বিষয় জানা যায়।

অল্প সময়ে অধিক জ্ঞান অর্জন করা যায়

অনুবন্ধ প্রণালী শিক্ষার্থীর আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জানবার আগ্রহ অত্যধিক। এই নীতি প্রয়োগের ফলেই তারা তত্ত্বগত বিষয়ের সঙ্গে বাস্তব বিষয় এবং সামগ্রী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করে। তাই বাস্তবতার সন্নিকর্ষে শিক্ষার্থীর মন আরও বেশী জানবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে এবং সে আগ্রহ সহকারে স্ব-স্ব পাঠে অগ্রসর হতে পারে।

অনুবন্ধ শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ জাগাতে পারে

অনুবন্ধ প্রণালী প্রয়োগে তালিকাভুক্ত পাঠ্যবিষয়ের চাপ কমে যায়। কোন একটি বিশেষ বিষয়ের বিভিন্ন অংশ থেকে জ্ঞানলাভ করা যেমন সহজ হয় তেমনি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানও এমন সহজ উপায়ে শিক্ষার্থীর মনে একীভূত হতে থাকে যে, তাদের কাছে পাঠ্যতালিকা বোঝাস্বরূপ আর মনে হয় না। কারণ, বিষয়গুলির স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে সম্ভাব্য যোগাযোগ স্থাপন করে পাঠদান করাই হল অনুবন্ধ প্রণালীর মূল লক্ষ্য।

অনুবন্ধ প্রণালী শিক্ষার্থীর সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক ইত্যাদি বিবিধ আকাঙ্ক্ষিত গুণ ও কৌশল বিকাশের পরমসহায়ক। হারবার্ট তাঁর শিক্ষাদর্শনে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে চরিত্র গঠনের কথা উল্লেখ করেছেন। জ্ঞানের পরিপূর্ণতা দ্বারা এই চরিত্র গঠন হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন হয় সুসমঞ্জস চিন্তাধারা। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতাগুলি সুসংবদ্ধ হলে তবে সুসমঞ্জস চিন্তাধারা গড়ে উঠতে পারে ও শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয়।

আকাঙ্খিত গুণ বিকাশের সহায়ক

অনুবন্ধের অসম্পূর্ণতা (Limitations of Correlation technique) ঃ অনুবন্ধ পদ্ধতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট থাকলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর কতকগুলি অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করা যায়। **প্রথমতঃ**, পাঠ্যতালিকাভুক্ত বিষয়গুলি একটা সুনির্দিষ্ট নীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সেই নীতির বেড়াজাল ভেঙে অনুবন্ধ স্থাপন করা সহজ নয়। **দ্বিতীয়তঃ**, অনুবন্ধ যদি বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ না হয় তাহলে শিক্ষার্থীর চিন্তাধারা সুসংহত হতে পারে না। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিষয়বস্তুর আকারগত বা বাহ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায় কিন্তু এর দ্বারা অনুবন্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। **তৃতীয়তঃ**, অনুবন্ধের উপযোগিতার কথা স্মরণ করে শিক্ষকরা অনেক সময় কষ্টকল্পিত অনুবন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করেন। এর দ্বারা বিষয়-পরিবেশন নীরস জটিল হয়ে পড়ে। **অবশেষে** বলা যায়, অনুবন্ধ প্রণালী প্রয়োগ করতে পারেন সেই শিক্ষক যাঁর বিষয়বস্তুর ওপর ব্যাপক ও গভীর পাণ্ডিত্য আছে এবং যিনি পদ্ধতি প্রয়োগ ও পরিচালনায় সুদক্ষ। অথচ আমাদের দেশে তেমন শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা যায়।

সাবধানতা ঃ শিক্ষণ-প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে অনুবন্ধ স্থাপনের সময় কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। **প্রথমতঃ**, অনুবন্ধ স্থাপন যেন সহজ, সরল ও স্বাভাবিক পথে পরিচালিত হয়। **দ্বিতীয়তঃ**, কোন বিষয় শিক্ষণের সময় সে-বিষয়টি যদি অন্য কোন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে অথবা অন্য কোন বিষয় দ্বারা যদি পাঠ্য বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় তবে তেমন অনুবন্ধকে অবহেলা করা উচিত নয়। **তৃতীয়তঃ**, অনুবন্ধ স্থাপন যেন উদ্দেশ্যমুখী, জীবনধর্মী, মনস্তত্ত্বভিত্তিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক হয়। কষ্টকল্পিত অনুবন্ধ স্থাপন কখনও সার্থক শিক্ষাদানে সক্ষম নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষণ-কৌশল

[Devices of Teaching]

[**অধ্যায় পরিচয় :** চতুর্থ অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এবং পঞ্চম অধ্যায়ে পাঠদান রীতি ও পাঠ-পরিকল্পনা আলোচিত হয়েছে। এর পর প্রশ্ন দাঁড়ায় পরিকল্পিত পাঠের বাস্তবায়ন কিভাবে সম্ভব? শ্রেণীকক্ষে কি কি কৌশল প্রয়োগ করতে হয়? তাই আলোচ্য অধ্যায়ে পাঠের বাস্তবায়ন-প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় কতকগুলি আঙ্গিক বা কৌশলের (Devices) বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হল।

পূর্ব অধ্যায় পড়ার সময় একটা প্রশ্ন সর্বদা আমাদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। প্রশ্নটি হল : ইংরেজী Technique আর Device-এ দুটি শব্দের বাংলা অর্থ কি হবে এবং এদের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্যটি কোথায়? এই পুস্তকে Technique শব্দটির জন্যে 'প্রণালী' বা 'রীতি' এবং Device জন্যে 'কৌশল' বা 'আঙ্গিক' ব্যবহার করা হয়েছে। Technique শব্দটিতে বুঝাতে চেয়েছি শব্দটির The manner (রীতি) in which Technical details are treated, আর Device শব্দটি দ্বারা বুঝাতে চেয়েছি কোন একটি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কৌশল। পঞ্চম অধ্যায়ের পাঠ-পরিকল্পনায় পাঠদানের রীতি (Technique) আলোচিত হয়েছে। এই রীতির মধ্যে উল্লেখ আছে বর্ণনা, গল্প কথন, বিবরণ দান, ব্যাখ্যা, অনুবন্ধ স্থাপন, প্রশ্ন, উপকরণ ইত্যাদির ব্যবহার। বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে এগুলিই কৌশল বা আঙ্গিকরূপে পরিগণিত হয়। তাই আলোচ্য অধ্যায়ে বাস্তবায়ন কৌশলগুলি আলোচনা করা হল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে সম্পর্ক এত নিবিড় ও পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে উভয় অধ্যায়ে Technique বা রীতি এবং Device বা কৌশল শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নের পর শ্রেণীকক্ষে পাঠদান-প্রক্রিয়ার কথা স্বাভাবিক ভাবে এসে যায়। পাঠদান নিছক একটি ব্যবহারিক প্রক্রিয়া। তবে 'পাঠদান' কথাটির মধ্যে একটা কিছু দেওয়া-নেওয়ার ভাব বিদ্যমান। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষায় এই দেওয়া-নেওয়ার ভাব আর নেই। তার পরিবর্তে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক পূর্ণাঙ্গ বিকাশে সাহায্য করাই হল শিক্ষাদানের বাস্তব অভিব্যক্তি। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ জ্ঞান বিকাশে সাহায্য করার মনোভাব নিয়ে আজ শিক্ষককে শিক্ষাদানে এগিয়ে আসতে হয়। তাই শিক্ষককে গ্রহণ করতে হয় পদ্ধতি আর রচনা করতে হয় পাঠ-পরিকল্পনা। অবশেষে শ্রেণীকক্ষে পরিকল্পিত পাঠের বাস্তবায়ন উদ্দেশ্যে কতকগুলি কৌশল বা আঙ্গিকের সাহায্য নিতে হয়। আঙ্গিক হল পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির এক একটা অংশবিশেষ। আঙ্গিকগুলির সহযোগিতায় এক একটা পদ্ধতি সার্থক ও কার্যকর হয়ে ওঠে।

পাঠদানের বিজ্ঞান ভিত্তিক অর্থ

আঙ্গিক কাকে বলে?

প্রচলিত আঙ্গিককে আমরা মোট তিনটি স্তরে ভাগ করতে পারি ; যথা—(১) মৌখিক আঙ্গিক (Verbal devices), (২) বস্তুভিত্তিক আঙ্গিক (Material devices) এবং (৩) পরিবেশগত আঙ্গিক (Environmental devices)।

১। মৌখিক আঙ্গিক বা কৌশল (Verbal Devices) ঃ

শিক্ষণের একক (Unit of Teaching) এবং শিক্ষা পরিবেশ যেমনই হোক না কেন শিক্ষকের তরফ থেকে কোন কিছু মুখে বলাই অপরিহার্য কর্ম। অতীতে বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষক ভাষার মাধ্যমে বিষয় পরিবেশন করতেন। আর আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুসারে পঠন-পাঠনের সঙ্গে কর্মভিত্তিকতার সংযোগ হয়েছে। কর্ম কেন্দ্রিকতার অর্থ সর্বদা কায়িক শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করা—এমন কথা চিন্তা করার কোন কারণ নেই। আধুনিক শিক্ষায় কর্মভিত্তিকতার অর্থ হল শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ কর্ম, পাঠের অনুশীলন এবং শিক্ষালাভের জন্য উভয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টা। এরূপ কর্মভিত্তিক শিক্ষাতেও ভাষা ব্যবহারের বা শিক্ষকের পক্ষ থেকে কোন কিছু কথা বলার যথেষ্ট অবকাশ ও প্রয়োজন রয়েছে। জ্ঞানাশ্রয়ী বিষয় যেমন—ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষণের সময় ভাষার মাধ্যমে বিষয় পরিবেশন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আবার বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষণে কর্মের বা পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের অবকাশ থাকে বেশী। তবুও এ সব ক্ষেত্রে কর্মের সঙ্গে ভাষার সমাবেশ না হলে বিষয় পরিবেশন করা সম্ভব হয় না। শ্রেণী-শিক্ষণে আমরা ভাষাভিত্তিক যেসব কৌশল অবলম্বন করি সেগুলিকে আমরা মৌখিক কৌশল বা আঙ্গিক বলি। এরূপ প্রধান প্রধান আঙ্গিকগুলির বিস্তৃত আলোচনা এখানে করা হল :

(১) বর্ণনা (Narration) ঃ অন্যের কাছে কোন ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ পেশ করার নাম হল বর্ণনা। বর্ণনা এবং গল্প বলা (Story telling) সমগোত্রীয়। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় শিক্ষক কোন ঘটনা গল্পাকারে বর্ণনা করেন। তাই বর্ণনা করাই হল শ্রেণীকক্ষে বিষয় পরিবেশনের একটা কৌশল বা আঙ্গিক মাত্র। মৌখিক পদ্ধতির (Oral methods) সর্বশ্রেষ্ঠ আঙ্গিক (device) হিসেবে বর্ণনার সমাদর সর্বত্রই রয়েছে। কোন কিছু বর্ণনা করার

কৌশলের উপযোগিতা তখনই প্রতিভাত হয় যখন বর্ণনা প্রকৃত গল্পাকারে রূপায়িত হয়।

যখন কোন ঘটনাকে গল্পাকারে পরিবেশন করা যায় তখনই বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়। কারণ, গল্পে আছে নাটকীয় আবেদন, বিষয়গত পরিপূর্ণতা ও ঘটনার পারম্পর্য। তাই গল্প সহজে শিক্ষার্থীর মনকে আকর্ষণ করে, অনুভূতিকে সুস্পষ্ট করে তোলে এবং মনের ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে অধীত বিষয়টি বহুকাল শিক্ষার্থী স্মরণ রাখতে পারে, এমনকি ঘটনা পরম্পরা শিক্ষার্থীর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে।

তবে স্মরণ রাখা দরকার, গল্প-বলা একপ্রকার সূক্ষ্ম শিল্প (Art)। যে কেউ গল্প বলে অন্যের মন জয় করতে পারে না। তাই একে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত গুণ হিসেবে স্বীকার করা হয়। তবে আত্ম-প্রচেষ্টা দ্বারাও গল্প বলার কৌশল অনেকখানি আয়ত্ত করা সম্ভব। তাই গল্প বলার গুণ অর্জন করা প্রত্যেক শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য। কারণ, শিক্ষকের প্রধান কাজ হল চিন্তার আদান-প্রদান করা। সুষ্ঠু গল্পকথনের নৈপুণ্য থাকলে শিক্ষক সহজে শিক্ষার্থীর মনে নতুন জ্ঞান বা চিন্তা সরবরাহ করতে পারেন।

গল্প-বলার কৌশল অর্জনের জন্য কতকগুলি রীতি (Technique) **অবলম্বন করা যেতে পারে। সেগুলি হল:** (i) নিজে অনুপ্রাণিত হলে অন্যকে সহজে অনুপ্রাণিত করা যায়। ঘটনার বিষয়বস্তুতে শিক্ষক যদি নিজেই আকর্ষিত হতে পারেন তবেই তিনি শিক্ষার্থীর নিকট ঘটনাটিকে চিত্তাকর্ষক করে বর্ণনা করতে পারবেন।

(ii) পুস্তকে লিখিত ঘটনা যথাযথ পাঠ করলে গল্প বলা হয় না। শিক্ষককেই নিজের ভাষায় গল্প বলতে হয় এবং গল্প বলার সময় ঘটনার ভাবরসে শিক্ষককে উদ্বুদ্ধ হতে হয়।

(iii) অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীরা বিমূর্ত কথার চেয়ে মূর্ত কাজ ও কথাকে বেশী পছন্দ করে। জীবন্ত মানুষের মুখ থেকে প্রত্যক্ষভাবে ঘটনা শুনতে তারা ভালবাসে। ঘটনার বিষয়বস্তু অনুসারে নাটকীয় আবেদন সৃষ্টি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনা, গল্পের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সঙ্গে মিল রেখে কণ্ঠস্বরের সঠিক ব্যঞ্জনা দ্বারা গল্পটিকে সহজে মনোগ্রাহী করা যায়।

(iv) মাঝে মাঝে হাস্যরস পরিবেশন করলে বর্ণনা অনেক বেশী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এসবের জন্যে শিক্ষকের পূর্বপ্রস্তুতি দরকার। চেষ্টা করলে যে কোন শিক্ষক সুন্দর গল্প বলার কলা-কৌশল আয়ত্ত করতে সমর্থ হবেন।

(v) বর্ণনা হবে শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুসারে নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত।

(vi) গল্পের একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকবে।

(vii) বর্ণনা খুব বেশী বড় হলে শিক্ষার্থীরা আগ্রহ ও প্রেরণা হারিয়ে ফেলতে পারে।' তাই শিক্ষার্থীর মানসিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে গল্পের পটভূমি সীমায়িত করা দক্ষ শিক্ষকের কর্তব্য।

(২) **বিবরণ** (Description) **:** বর্ণনার (Narration) ন্যায় বিবরণও মৌখিক শিক্ষাদানের একটা বিশেষ কৌশল। তবে উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বর্ণনা হল কোন ঘটনা বা গল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত কৌশল। পক্ষান্তরে বিবরণ হল কোন সামগ্রী, প্রাকৃতিক বিষয় বা কোন সমস্যা উপস্থাপনার সঙ্গে জড়িত কৌশল। কোন লিখিত বিবরণকে গল্প না বলে প্রবন্ধ বলাই যুক্তিযুক্ত। পাঠ্যবিষয় থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় বিজ্ঞান (Science), ভূগোল (Geography), ভাষা (Language) ইত্যাদি পঠন-পাঠনের সময় বিষয় বিবৃত করতে হয়। যেমন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মিশিয়ে কিভাবে জল তৈরি হয় তা যেমন বিবরণ দ্বারা সুস্পষ্ট করা যায়, তেমনি কোন একটি ভৌগোলিক পটভূমির আলোচনা বিবরণের মাধ্যমেই সহজবোধ্য হয়।

বিবরণ প্রদানের অনুকূল নৈপুণ্য অর্জনের জন্য কতকগুলি রীতি (Technique) **অনুসরণ করা যেতে পারে।** যেমন—(i) নীতিগত ও যুক্তিভিত্তিক বিবরণের জন্য প্রয়োজন হয় প্রখর কল্পনাশক্তি। এর জন্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষকের মনোভাব (Mental Image) বা পাণ্ডিত্য অনেক বেশী গভীর ও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষক যদি বিবরণের অন্তর্ভুক্ত বিষয়টি স্বচক্ষে দেখতে পারেন তাহলে সে সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যথেষ্ট গভীর হয়। আগ্রার তাজমহলের বিবরণ সেই শিক্ষকই সহজ ও সুন্দরভাবে দিতে পারেন যিনি স্বচক্ষে সৌধটি দেখেছেন।

(ii) বিবরণটি মনোগ্রাহী করার জন্য বিষয়বস্তুর লক্ষ্যটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের নিকট সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

(iii) বিবরণটি যেন শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, প্রবণতা, গ্রহণ ক্ষমতার অনুকূল হয়।

(iv) সর্বোপরি, বিবরণটি হবে সহজ, সরল, পাঠের লক্ষ্যভিত্তিক, পয়েন্টেড (pointed), সংক্ষিপ্ত, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও দৃষ্টান্ত সংবলিত। কোন কিছুর বিবরণ প্রদানের সময় প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করা শিক্ষকের অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ উপকরণ বিবরণকে প্রত্যক্ষ করে তোলে।

(৩) ব্যাখ্যা (Explanation): কোন ঘটনা বর্ণনা করার (narrate) সময় অথবা সমস্যা, বিষয় বা সামগ্রীর বিবরণ প্রদানের সময় এমন অনেক জটিল অংশ (point) থাকে যেগুলির ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়। কোন প্রবন্ধ বা কবিতার মধ্যে এরূপ ব্যাখ্যা করার যথেষ্ট অবকাশ থাকে। ব্যাখ্যা করার সময় বিষয়ের যথাযথ অবস্থা (actual form) বিবৃত না করে তার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাগুলিকে সুস্পষ্ট করে পরিবেশন করা হয়। শুধু কল্পনা শক্তির দ্বারা বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করার নাম ব্যাখ্যা নয়। ব্যাখ্যা করার সময় শিক্ষকের কল্পনাশক্তি বিচরণ করবে বিষয়ের উৎসে, পূর্বাপর সম্পর্কে, বিষয়গত ভাব ও রসের ব্যঞ্জনায়। বিষয়টিকে সুস্পষ্ট ও মনোগ্রাহী করে তোলার জন্যে শিক্ষকের স্বাধীনতা এখানে অনস্বীকার্য।

ব্যাখ্যা করার সময় যে-সব রীতিগুলি স্মরণযোগ্য তা হল—

(i) ব্যাখ্যার সময় পাঠের লক্ষ্য (Aim of the Lesson) সর্বদা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দিশারী হিসেবে কাজ করবে। লক্ষ্যভ্রষ্ট ব্যাখ্যা অনেক সময় শ্রেণীপাঠকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

(ii) ব্যক্তিবৈষম্য, শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রেরণা, বয়স ও গ্রহণ ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত।

(iii) ব্যাখ্যার সময় মূল অংশগুলি (point) ব্লাকবোর্ডে লেখা, সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, দৃষ্টান্ত দেওয়া এবং উপকরণ ব্যবহার করা কর্তব্য।

(iv) প্রথমে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার পর সারসংক্ষেপের মাধ্যমে সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় পাঠের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। তবে বিশ্লেষণের সময় শিক্ষককে যতবেশী সক্রিয় হতে হবে, সংশ্লেষণের সময় অথবা সিদ্ধান্ত

গ্রহণের সময় শিক্ষার্থীকে তার চেয়ে বেশী সক্রিয় ও সচেষ্ট করে তুলতে হবে। কারণ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী নীরব শ্রোতা নয়, সে সক্রিয় সহযোগীও বটে। তাই 'Learning and Teaching' নামক গ্রন্থে *Hughes and Hughes* বলেন, ব্যাখ্যার নিশ্চিত স্বরূপ হল প্রয়োজনীয় তথ্যগুলিকে এমনভাবে সাজানো ও পরিবেশন করা যেন শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয় এবং তারাই যেন ব্যাখ্যার প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ করতে পারে।[1]

(৪) **দৃষ্টান্ত** (Illustration)**:** পঠন-পাঠনকালে পাঠ্যবিষয়বস্তুর সঙ্গে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা একটা বিশেষ কৌশল। পাঠ্যবিষয়টিকে সুস্পষ্ট বোধগম্য করানোর জন্য দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয়টি যতবেশী সুস্পষ্ট হবে ততবেশী শিক্ষার্থীর মনে স্থায়ী আসন-লাভ করবে। উপরন্তু, দৃষ্টান্ত যদি শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে শিক্ষার্থীর মনে শিখবার ও জানবার ব্যাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানে দৃষ্টান্ত স্থাপন অপূর্ব সুফল প্রদান করে। অমূর্ত বিষয়টি তাদের কাছে মূর্ত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

দৃষ্টান্ত দু-ধরনের হতে পারে, যথা—মৌখিক (verbal) এবং বস্তুগত (concrete)। শেষোক্তটি বস্তুভিত্তিক কৌশল বা আঙ্গিকের অন্তর্ভুক্ত[2]। মৌখিক দৃষ্টান্ত যে কোন বিষয় পঠন-পাঠনের সময় প্রয়োগ করা চলে। পাঠ্যবিষয়ের সমজাতীয় কোন পাঠ্যাংশ, সমপ্রায় ঘটনা, ব্যক্তি বা বস্তু দ্বারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায়। 'শ্বেতবর্ণ'কে শিক্ষার্থীর বোধগম্য করানোর জন্য দুধের রঙের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বিমূর্ত গুণের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তেমনি গুণবান ব্যক্তির কার্যকলাপ দিয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

তবে মৌখিক দৃষ্টান্ত প্রদানের সময় স্মরণ রাখা দরকার, দৃষ্টান্তটি যেন বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে মৌখিক দৃষ্টান্ত অপেক্ষা বস্তুগত দৃষ্টান্ত অনেক বেশী ফলপ্রসূ। কারণ বস্তুগত দৃষ্টান্ত ছোটদের নিকট সরাসরি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

---

1. "The surest form of explanation is one that presents and arranges the necessary facts in such a way that pupils draw their own conclusions, they themselves complete the explaining process."

2. পরবর্তী ২নং আলোচনা দ্রষ্টব্য।

উচ্চতর শ্রেণীতে মৌখিক দৃষ্টান্তের অন্য কয়েকটি রূপের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—ইংরেজী Reference এবং Allusions প্রভৃতি প্রক্রিয়া পাঠ্যবিষয়কে সুস্পষ্ট, জীবন্ত এবং হৃদয়গ্রাহী করার অন্যতম উপায়। তবে কোন বিষয়ের পূর্বউল্লেখ (Reference) দেওয়ার সময় কিছু বর্ণনা বা বিবরণ কৌশলের প্রয়োজন হয়। তাই পূর্বউল্লেখের সঙ্গে বর্ণনা ও বিবরণের যোগসূত্র অতি নিবিড়।

আবার বিষয়গত কোন পূর্বসূত্র সমন্বয় বিধানের পরম সহায়ক। বিষয়ের প্রয়োজন অনুসারে ঐতিহাসিক ভূমিকা ও দৃষ্টান্ত, ভৌগোলিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক যোগসূত্র উল্লেখ করলে পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের অনুবন্ধ স্থাপন করা যায়। সুতরাং পূর্বসূত্র উল্লেখ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অনুবন্ধ[1] সাধনের নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে।

(৫) **প্রশ্নোত্তর** (Question-Answer) : মৌখিক কৌশল হিসেবে প্রশ্নোত্তর প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তাধারাকে উত্তর প্রদানের জন্য স্বাভাবিকভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা যায়। পাঠ-পরিকল্পনার আয়োজন, উপস্থাপন, প্রয়োগ, মূল্যায়ন প্রভৃতি সর্বস্তরেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। প্রশ্নই শিক্ষার্থীকে নিজপাঠে আগ্রহী করে, চিন্তাধারাকে সুষ্ঠু পথে পরিচালিত করে। আবার প্রশ্নোত্তর[2]-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কর্মের মূল্যায়ন করা যায়।

এই প্রসঙ্গে অনুশীলন (Exercise) এবং পরীক্ষা (Test) গ্রহণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ, অনুশীলন ও পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীকে সঠিক শিক্ষাকর্মে পরিচালিত করা সম্ভব। তাই অনুশীলন ও পরীক্ষার সঙ্গে পাঠদান প্রক্রিয়ার আঙ্গিকের যথেষ্ট যোগসূত্র রয়েছে—সন্দেহ নেই।

২। বস্তুভিত্তিক কৌশল (Material Device) :

আধুনিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার উৎকর্ষসাধনের জন্যে যেসব সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করা হয় সাধারণতঃ সেগুলিকে আমরা বস্তুভিত্তিক কৌশল বা আঙ্গিক বলতে পারি। শিক্ষক এগুলির সাহায্যে পুস্তকের বিমূর্ত বিষয়গুলিকে মূর্ত করে

1. পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।
2. প্রশ্নোত্তর রীতি দ্রষ্টব্য।

শিক্ষার্থীদের নিকট পরিবেশন করেন এবং শিক্ষার্থীর জ্ঞান; কৌশল, বোধশক্তি ও ধারণা লাভে সাহায্য করেন। **আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় উপকরণ ব্যবহার শিক্ষকের অপরিহার্য কর্তব্য।** কারণ :

প্রথমতঃ, পঞ্চেন্দ্রিয়ই হল আমাদের জ্ঞানের প্রাথমিক সোপান। বহির্জগতের সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের মনের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। উদ্দীপক (Stimulus) বিভিন্নভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে। পরিবেশ বা বাহ্যজগতের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের দ্বারা আমাদের মনে প্রত্যক্ষণ হয়। প্রত্যক্ষণ থেকেই মনের মধ্যে ধারণা (Idea) সঞ্জাত হয়। জ্ঞান (Knowledge) হল উক্ত উপায়ে লব্ধ ধারণারই বিবর্তিত রূপ। অতএব দেখা যাচ্ছে, জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ, আর তারই সংব্যাখ্যান হল জ্ঞান। সুতরাং, শিক্ষাদান কালে যদি বিমূর্তজ্ঞান বা কোন ভাবরাশিকে আমরা মূর্ত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে পারি, তবে শিক্ষার্থী তা সহজে গ্রহণ করে এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার ধারণা বা লব্ধজ্ঞান সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক হয়। এ ব্যাপারে শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী পরম সহায়ক।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রবণ নিরীক্ষণ উপকরণের (Audio-visual aids) সুস্পষ্ট, জীবন্ত ও নাটকীয় আবেদন শিক্ষার্থীর আনন্দানুভূতিতে সাড়া জাগায়। ফলে, তাদের অভিজ্ঞতার মাত্রা প্রসারিত হয়। ক্রমশঃ তাদের জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষাও বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়তঃ, স্বল্প মেধা, পশ্চাৎপদ, স্থূলবুদ্ধি, পাঠে ধীরগতি শিক্ষার্থী শুধু পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে অথবা শিক্ষকের বক্তৃতার দ্বারা বিষয় অনুধাবন করতে পারে না। প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিক্ষা তাদের কাছে নিতান্ত প্রয়োজন। তাই উপকরণের সহায়তা তাদের পক্ষে অপরিহার্য।

চতুর্থতঃ, দেখে ও শুনে শেখার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে সেশিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এর দ্বারা শিক্ষার ভিত্তি হয় পাকা, জ্ঞানের বুনিয়াদ হয় সুদৃঢ়। এরূপ বাস্তবধর্মী জ্ঞান শিক্ষার্থীর জীবনকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

পঞ্চমতঃ, উপকরণ শুধু চিন্তন ও মনন শক্তির বিকাশে সাহায্য করে তা নয়, তা পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ক্ষমতা বা দক্ষতার বিকাশ সাধন করে। উচ্চতর শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে এ-ক্ষমতা নিতান্ত প্রয়োজন।

সবশেষে বলা যায়, 'শিক্ষণ-উপকরণ' শ্রেণীকক্ষের একঘেয়েমীকে নষ্ট করে শিক্ষাকর্মে নিয়ে আসে গতিশীলতা, শিক্ষার্থীর মনে সঞ্চার করে উত্তম ও অনুপ্রেরণা, বক্তৃতা ও কথার বিমূর্ততার পরিবর্তে নিয়ে আসে মূর্তকর্মের জীবন্ত আবেদন। এসব আবেদন থেকে শিক্ষার্থীরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তা কেবল শিক্ষার্থীর পরিবেশে বা জাতীয় জীবনে সীমিত নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্ত। রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন প্রভৃতি শিক্ষার্থীর মনকে নিয়ে যায় দূর-দূরান্তে, বিশ্বের সর্বত্র। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী হয়ত চন্দ্রে পৌছিতে পারবে না কিন্তু চিত্রাদির মাধ্যমে চন্দ্র সম্পর্কে তারা যে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করে তার মূল্য নিতান্ত কম নয়।

উপকরণের শ্রেণীবিভাগ ও ব্যবহার (Classification of teaching aids and their applications): শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলির মধ্যে যেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা' হল—

(১) **শ্রবণভিত্তিক শিক্ষোপকরণ** (Auditory aids)। যথা—

(ক) বেতার (Radio), (খ) টেপ-রেকর্ডার (Tape-recorder), এবং (গ) গ্রামোফোন (Gramophone)।

(২) **দৃষ্টিসংক্রান্ত শিক্ষোপকরণ** (Visual aids)। যথা—

(ক) ব্লাকবোর্ড (Black board), (খ) প্রকৃত বস্তুসমূহ (Real objects), (গ) মডেল ও নমুনা (Model and symbols); ছবি ও ফটোগ্রাফ (Pictures and photograph), (ঘ) ভূ-গোলক, মানচিত্র (Globe, Map), (ঙ) অনুচিত্র (Diagram), (চ) চার্ট বা তালিকা (Chart), (ছ) রেখাচিত্র (Graphs) এবং (জ) প্রতিফলনের যন্ত্রাদি (Instruments for reflection) —(i) এপিডায়াস্কোপ (Epidiascope), (ii) ম্যাজিক লণ্ঠন (Magic lantern), (iii) চলচ্চিত্র (Motion Picture) ইত্যাদি।

(৩) **শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক শিক্ষোপকরণ** (Audio-visual aids)। যথা—

(ক) সবাক চলচ্চিত্র (Sound-Motion Picture) এবং (খ) টেলিভিশন (Television)।

(৪) **পঠনযোগ্য শিক্ষোপকরণ** (Reading materials)। যথা—

(ক) পাঠ্যপুস্তক (Text-book), (খ) সহায়ক ও সমপর্যায়ের পুস্তক-পুস্তিকা (Reference books), এবং (গ) পত্র-পত্রিকা ও চলতি প্রসঙ্গ (Papers, journals and current affairs)।

(৫) **শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞানের নতুন অবদান** (New contribution of Educational Technology) :

প্রোগ্রামভিত্তিক-শিক্ষণ (Programmed Instruction) :

(১) **শ্রবণভিত্তিক উপকরণ** (Auditory Aids): (ক) **বেতার** (Radio) : শুধু শুনে শেখার বা জানার উপকরণগুলিকে শ্রবণভিত্তিক শিক্ষোপকরণ নামে অভিহিত করা যায়। শ্রবণভিত্তিক উপকরণের মধ্যে বেতারযন্ত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। দেশবিদেশের সংবাদ, রাজনীতি, সমাজনীতি, সঙ্গীত, নাটক, কথোপকথন, সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের ভাষণ প্রভৃতি বেতার সূচীর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশে বিদ্যার্থীদের উপযোগী বিষয় নিয়ে হিন্দী শিক্ষার আসর, অতি আধুনিক ঘটনার আলোচনা এবং শিক্ষাগত নানা প্রশ্নের উত্তর প্রভৃতি বেতার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা থাকে। পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলির অনুকরণে আমাদের সরকার বিদ্যালয়ে রেডিও রাখার ব্যবস্থা করেছেন। বিদ্যালয়ে কর্মসূচী প্রণয়নের সময় বেতার-কর্মসূচী শোনার নির্দিষ্ট সময় ধার্য করে কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন।

শিক্ষা-প্রসঙ্গে বেতারের উপকারিতা সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের (UNESCO) অভিমত প্রণিধানযোগ্য : "School broadcasting service provides training in selective and oritical listening ; and it serves to interpret the school." বেতারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী দেশ বিদেশের বহু মনীষীর অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারার কথা জানতে পারে। বেতারযন্ত্রে পরিবেশিত কর্মসূচীর মাধ্যমে এসব চিন্তাধারায় তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সচেতন হয়ে ওঠে। কোন-না-কোন পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক বিদ্যমান। এছাড়া বেতারে সঙ্গীত, একাঙ্ক নাটক, রঙ্গ-রস যেমন শিক্ষার্থীকে আনন্দ দান করে, তেমনি পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করে তারা স্ব-স্ব জ্ঞানের সীমা সম্প্রসারিত করে।

ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পাঠ্যবিষয়ভুক্ত বহু বিষয় বেতারযোগে পরিবেশন করে। দেশের নাগরিকতা, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য,

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিষয়াদি সে-সব দেশে বেতারে প্রচারিত হয়। ফলে, সেখানকার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বেতার মারফত শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট উপকৃত হতে পারে।

বেতার মারফত শিক্ষার সর্বাপেক্ষা অসুবিধাগুলি হল ঃ

(i) এখানে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায় না,

(ii) কথোপকথন, বক্তৃতা বা কোন উপস্থাপিত বিষয় অস্পষ্ট হলে পুনরায় তা উচ্চারিত হয় না;

(iii) সঙ্গীত, নাটক বা অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়ের প্রতি অল্পবয়স্করা বা বয়ঃ-সন্ধিক্ষণের শিক্ষার্থীরা অধিক অনুরক্ত হয়,

(iv) বেতারসূচী শোনার পর পরবর্তী শ্রেণী পাঠনায় শিক্ষার্থীর মন বসতে চায় না।

অসুবিধা দূরীকরণ ঃ উপরিউক্ত অসুবিধা দূর করার প্রয়োজনে **সর্ব প্রথমে** স্মরণ করা যেতে পারে যে, বেতারে যতই শিক্ষণীয় বিষয় পরিবেশিত হোক, এই যন্ত্র কখনও শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তমাধ্যমে (Substitute) রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না। বেতার হল সহায়ক উপকরণ। শিক্ষক একে পাঠদানের সহায়ক উপকরণ অথবা শিক্ষার্থীর লব্ধ অভিজ্ঞতাকে সম্প্রসারণের জন্য বেতার কর্মসূচী শ্রবণের ব্যবস্থা করতে পারেন। **দ্বিতীয়তঃ**, বেতার কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না। তাই সংবাদপত্র অথবা 'বেতার জগৎ' পত্রিকা থেকে কার্যসূচী নির্বাচন করে শিক্ষক বিদ্যালয়ের রুটিনের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করতে পারেন। কোন্ কোন্ পুস্তক থেকে ঐ সকল বিষয় জানতে পারা যায়, সে সম্পর্কেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিতে পারেন। **এছাড়া** বেতার শুনবার পূর্বে জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষক বিষয়টি শ্রেণীকক্ষে অল্পবিস্তর আলোচনা করতে পারেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের সমবেত চেষ্টা থাকলে আমাদের শিক্ষার্থীরা বেতার মাধ্যমে শিক্ষার উপযোগিতা লাভ করতে পারে।

(খ) টেপ-রেকর্ডার (Tape-recorder) **ঃ** শ্রুতিনির্ভর উপকরণ হিসেবে টেপ-রেকর্ডার বর্তমানে শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট সহায়তা করে। বিদ্যুৎচালিত এই যন্ত্রের চৌম্বক ফিতায় (Magnetic Tape) বক্তৃতা, গান, আবৃত্তি, কথোপকথন ইত্যাদি রেকর্ড করা যায়। এই রেকর্ড করা বিষয়টি

স্পিকার (Speaker) যন্ত্রের সাহায্যে পুনরাবৃত্তি (Reproduce) করা হয়। **দ্বিতীয়তঃ**, ফিতার রেকর্ড মুছে ফেলে (Erased) পুনরায় অন্য একটি বিষয় রেকর্ড করা চলে। আবার কোন উল্লেখযোগ্য রেকর্ডকে দীর্ঘস্থায়ী করাও যায়।

শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় এই যন্ত্র থেকে যেসব সুবিধা লাভ করা যায় সেগুলি হল :

(i) শিক্ষক শিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য কোন বক্তৃতা বা আলোচনা এই যন্ত্রে ধরে রেখে প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে পারেন। এতে শিক্ষকের মুখনিঃসৃত বাণী, বা বক্তার একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পেয়ে শিক্ষার্থী নতুনত্বের আস্বাদ পাবে।

(ii) শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ বক্তৃতা, আবৃত্তি, গান, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি রেকর্ড করে নিজেরাই তা শুনতে পারে ও স্ব-স্ব ত্রুটি সংশোধন করতে পারে। টেপ-রেকর্ডার শিক্ষার্থীর স্ব-স্ব কর্মের অনুশীলনে সুযোগ সৃষ্টি করে।

(iii) কোন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে তাঁর পাঠটিকে তিনি পূর্বেই রেকর্ড করে রাখতে পারেন। এতে শিক্ষকের অনুপস্থিতিজনিত ক্ষতি অনেকখানি পূরণ করা যায়।

(গ) গ্রামোফোন (Gramophone) : টেপ-রেকর্ডারের ন্যায় গ্রামোফোন যন্ত্রটিও শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার অন্যতম সহায়ক। শিক্ষায় উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষা-সহায়ক হিসেবে গ্রামোফোন ব্যবহৃত হয়। গ্রামোফোন মারফত উচ্চারণ ভঙ্গিমা, সঙ্গীত, হাস্যরস ইত্যাদি অনেক কিছু শিক্ষামূলক বিষয় পরিবেশন করা যেতে পারে। আজকাল বিদেশী ভাষা শিক্ষার সহায়ক অনেক বিষয় রেকর্ড করা হয়েছে। এসব রেকর্ডকে বলা হয় লিংগুয়াফোন (Linguaphone)। নিম্ন থেকে ক্রমশঃ উচ্চতর মানের ভাষা শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে রেকর্ড তৈরি করা থাকে। প্রখ্যাত লেখক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদদের শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা নিয়ে রেকর্ড করা হয়। লিংগুয়াফোন-কে সহজে অনুসরণ করার জন্যে সহায়ক পুস্তকও রচিত হয়েছে। শিক্ষার উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রেখে ভাষা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের জন্যও রেকর্ড তৈরি করা সম্ভব

(২) দৃষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষোপকরণ (Visual Aids) : **(ক) ব্লাকবোর্ড** (Black-Board) : দৃষ্টি-নির্ভর উপকরণের মধ্যে ব্লাকবোর্ডের ব্যবহার শুধু

অপরিহার্য নয়, অদ্বিতীয়ও বলা চলে। ব্লাকবোর্ড নিজে কোন শিক্ষোপকরণ নয়, এটি হল শিক্ষোপকরণ ব্যবহারের বা প্রদর্শনের সর্বাপেক্ষা উপযোগী ও নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী মাত্র। তাই একে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা-সামগ্রী হিসেবে গণ্য করা যায়।) সুদূর অতীত থেকে ব্লাকবোর্ডেব ব্যবহার চলে আসছে বিদ্যামন্দিরের ঘরে ঘরে। (বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত, সুস্পষ্ট ও দৃষ্টিগ্রাহ্য করতে ব্লাকবোর্ডের ন্যায় সুলভ ও সর্বাপেক্ষা সহায়ক সামগ্রী আর দ্বিতীয়টি নেই। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি পাঠ্যবিষয় শিক্ষণ প্রসঙ্গে প্রয়োজন হয় ছবি, অনুচিত্র, মডেল, ম্যাপ, চার্ট ইত্যাদি। অঙ্কনে পারদর্শী শিক্ষক অনেক সময় এসব দ্রব্যাদি পৃথকভাবে ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করেন না। পাঠদানকালে দক্ষ শিক্ষক এগুলি বোর্ডে অঙ্কন করে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করেন। এর ফলে বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য হয়ে ওঠে।[1] শ্রেণীকক্ষে ব্লাকবোর্ডের পাশাপাশি একখানি গ্রাফ-বোর্ড রাখা যুক্তিযুক্ত। তাহলে মানচিত্র, চিত্ররেখা, সময়-রেখা, জ্যামিতি ইত্যাদি পরিমাপ-নির্ভর বিষয়াদি অঙ্কন করার সুবিধা হয়। অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞান-শিক্ষণে ব্লাকবোর্ড ও গ্রাফ-বোর্ড ব্যবহারের প্রয়োজন হয় পদে পদে। কারণ, কোন কিছু অনুশীলন বা সমাধান করা, পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদির জন্য প্রতি পদক্ষেপে বোর্ডের প্রয়োজন হয়।)

সাধারণতঃ শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার্য বোর্ডের রঙ হয় কালো, তাই এর নাম ব্লাকবোর্ড। অনেক শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্ বর্তমানে কালো রঙের পরিবর্তে হাল্কা সবুজ (Green) রঙ পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে চক্‌চকে দৃষ্টিঘাতী রঙ কখনই বোর্ডে ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ, শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিতে আঘাত লাগলে বোর্ডের বহুবিধ উপযোগিতা ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়।

ব্লাকবোর্ড ব্যবহারের জন্য শিক্ষককে অঙ্কনে পারদর্শী হতে হয়। তাঁর হস্তলিপি হবে সুন্দর ও সহজবোধ্য। আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির মধ্যে সাদা বা রঙিন চক, সুন্দর একখানি ডাষ্টার এবং অঙ্কিত বা লিখিত বিষয় দূরে দাঁড়িয়ে দেখবার জন্যে একখানি পয়েন্টিং ষ্টিক (Pointing Stick) হবে শ্রেণীকক্ষের অপরিহার্য উপাদান।

---

1 "Black-board drawing, sketches and maps are superior to finished Productions at least in the early lessons."—*Raymont.*

(খ) **প্রকৃত বস্তু সমূহ (Real objects)** : দৃষ্টিনির্ভর উপকরণসমূহের মধ্যে ব্লাকবোর্ডের পর প্রকৃত বস্তুসমূহের আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, বস্তুগত বিষয়ের পঠন-পাঠনে প্রকৃত বস্তুসমূহ শিক্ষাকে যত জীবন্ত ও সুস্পষ্ট করে তুলতে পারে, অন্য কিছু তা পারে না। সমগ্র পাঠ্য বিষয়ের জন্য প্রকৃত সামগ্রী আমদানী করা বা দেখানো অসম্ভব। যেমন, ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনার সময় ভারতের নদ-নদী, পাহাড় পর্বত, গাছ-পালা, মরু-প্রান্তর ইত্যাদি বাস্তবে শিক্ষার্থীদের দেখানো সম্ভব নয়। কিন্তু ভৌগোলিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় কৃষিজ, খনিজ; শিল্পজ সামগ্রীর আলোচনার সময় মাঝে মাঝে প্রকৃত বস্তুসমূহ দেখানো সম্ভব। সাধারণ বিজ্ঞান পড়ানোর সময় এরূপ প্রকৃত বস্তু দ্বারা শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করার যথেষ্ট সুযোগ থাকে। ঐতিহাসিক বিষয় শিক্ষণের সময় সংগ্রহশালায় সংগৃহীত নানা ধরনের সামগ্রী (যেমন—মুদ্রা, অস্ত্র-শস্ত্রের অংশ, প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে প্রাপ্ত সামগ্রী ইত্যাদি) দেখানো যেতে পারে। বাস্তব সামগ্রী শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করে পড়াতে পারলে শ্রেণীকক্ষের পাঠ সহজে সজীব ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

(গ) **মডেল ও নমুনা; ছবি ও ফটোগ্রাফ** : প্রকৃত বস্তুসমূহের অভাবে আমরা সেই সকল বস্তুর মডেল, নমুনা, ছবি, ফটোগ্রাফ প্রভৃতি দেখাতে পারি। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানাশ্রয়ী বিষয় (Knowledge Subject) পঠন-পাঠনের সময় এসব উপকরণের উপযোগিতা যথেষ্ট আছে। বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করে তুলতে পারে মডেল, নিদর্শন, ছবি প্রভৃতি। কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এগুলি তৈরি করে বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে। শিক্ষক পাঠদানের সময় সেগুলি যথাযথ ব্যবহার করলে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষণ-ক্রিয়া প্রাণস্পর্শী হয়ে ওঠবে।

(ঘ) **ভূ-গোলক, মানচিত্র (Globe, Map)** : ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান এবং ভৌগোলিক পটভূমির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় পঠন-পাঠন কালে অপরিহার্য উপকরণগুলির মধ্যে মানচিত্র, গ্লোব ইত্যাদির ব্যবহার অন্যতম। মানচিত্র ঐতিহ্যগাহী উপকরণ (Traditional aid) হিসেবে সমাদৃত। মানচিত্রবিহীন বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। ভূগোলের ক্ষেত্রে মানচিত্র ও গ্লোব যে নিতান্ত অপরিহার্য সে সম্পর্কে যুক্তির অপেক্ষা

যাবে না। ইতিহাস, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় ভৌগোলিক পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। ভৌগোলিক পটভূমিকে দৃষ্টি গ্রাহ্য করার উপায় হল মানচিত্র, গ্লোব ইত্যাদি।

শিক্ষাকর্মে আগত নতুন শিক্ষকদের মানচিত্রের প্রকার ভেদ ও তার ব্যবহার সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলা যুক্তিযুক্ত। কারণ দেওয়াল-মানচিত্র (wall-maps) অথবা ভূচিত্রাবলী (Atlases) এবং পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত মানচিত্রাদিতে পাঠের প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়াও অনেক অনাবশ্যক বিষয় পরিবেশিত থাকে। দ্বিতীয়তঃ, এসব মানচিত্র অসামঞ্জস্য কালক্রম দ্বারা ত্রুটিপূর্ণ। তাই শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সহায়তায় দৈনন্দিন পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় মানচিত্র অঙ্কন করে নিতে পারেন। বর্তমানে বৃহদাকার রেখা-মানচিত্র (outline map) কিনতে পাওয়া যায়। শিক্ষক এরূপ রেখা-মানচিত্রে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনমত নির্দিষ্ট পাঠ্যাংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে স্থান, কাল ও ঘটনা সন্নিবেশিত (insert) করতে পারেন। যেসব শিক্ষক পাঠদান কাল ও ঘটনা শ্রেণীকক্ষে ব্লাকবোর্ডে মানচিত্র অঙ্কন করতে পারেন তাঁদের পাঠ অনেক বেশী হৃদয়গ্রাহী ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। যাঁরা মানচিত্র অঙ্কনে পারদর্শী নন তাঁরা রেখা-মানচিত্র ব্যবহার করলেও পাঠদান অনেকখানি বাস্তবায়িত ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ, রেখা-মানচিত্রে প্রয়োজনমত নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বন্দর, শহর, নগর প্রভৃতির অবস্থান লিখলে বা নির্দেশ করলে (point out) খানিকটা ব্লাকবোর্ডে অঙ্কিত মানচিত্রের উপযোগিতা লাভ করা যায়।

কোন দেশের ভৌগোলিক এবং সমপর্যায়ের বিষয় পঠন-পাঠনের সময় গ্লোব ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক বিষয় এখানে সংক্ষেপে দেওয়া থাকে। তাই ছোট্ট সীমিত স্থানের বিবরণ পঠন-পাঠনের সময় গ্লোবের কার্যকারিতা কম। তবে পৃথিবীর আকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়, দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি বা ঋতু পরিবর্তন প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের গ্লোবের ব্যবহার অপরিহার্য।

(ঙ) **অঙ্কচিত্র (Diagram)ঃ** কতকগুলি রেখা (line) এবং নিদর্শন (symbols) দ্বারা অঙ্কচিত্র অঙ্কন করা হয়। অঙ্কচিত্র হল সরল, সহজ ও অমূর্ত বিষয়ের অল্পবিস্তর মূর্ত প্রকাশ। বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক, সংক্ষিপ্তসার

(summary) এবং সামগ্রিক বিষয়ের পুনরীক্ষণের (review) নিমিত্ত অনুচিত্র ব্যবহার করা হয়। শিক্ষক পূর্বেই আর্ট পেপারে কোন বিষয়ের অনুচিত্র অঙ্কন করে রাখতে পারেন ; আবার শ্রেণীকক্ষে ব্লাকবোর্ডেও তিনি তা অঙ্কন করে শিক্ষার্থীদের দেখাতে পারেন। তবে অনুচিত্র প্রদর্শনের পূর্বে শিক্ষার্থীদের মনে পাঠ্যবিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

অনুচিত্র সম্পর্কে কতকগুলি সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। **প্রথমতঃ**, এর মধ্যে বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয় লেখা বা কোন চিহ্ন বসানো মোটেই উচিত নয়। **দ্বিতীয়তঃ**, এটি হওয়া উচিত স্বয়ংসম্পূর্ণ, সুস্পষ্ট আকর্ষণীয় ও ব্যাখ্যামূলক। মনে রাখা উচিত, পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর অস্পষ্ট ধারণাকে সুস্পষ্ট করে দেওয়াই অনুচিত্র বা এরূপ শিক্ষাসহায়ক উপকরণাদির একমাত্র উদ্দেশ্য।

(চ) **চার্ট বা তালিকা** (Chart) : বিষয়ের ভাবগত ব্যঞ্জনাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করবার জন্য চার্ট-এর সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। চার্টকে গ্রাফিক ও চিত্রসূচক বিষয়ের যুগ্ম প্রতিরূপ বলা চলে। চার্ট এর প্রধান কাজ হল বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, প্রগতি, শ্রেণীবিভাগ, সংগঠন প্রভৃতি বিষয়কে ব্যক্ত ও সুস্পষ্ট করা। শিক্ষামূলক কোন প্রদর্শনীর সময় এরূপ **বিভিন্ন প্রকার চার্ট দেখানো যায়।** যেমন—(i) বংশ-তালিকা, (ii) সম্পর্ক প্রকাশ, (iii) সময়-তালিকা, (iv) বিষয়ের শ্রেণীবিভাগ, (v) সরবরাহ, (vi) তুলনামূলক বিষয়ের তালিকা ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক,—ইত্যাদি বিষয়কে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিগ্রাহ্য করার জন্য এসব চার্টের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অনুচিত্রের ন্যায় চার্টও সরল, সহজ, সুস্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষক নির্দেশিত কোন বিষয়ের চার্ট যদি শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে তৈরি করে, তাহলে বিষয়টি তাদের মনে স্থায়িভাবে রেখাপাত করে। এ শুধু চার্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়—মানচিত্র, অনুচিত্র, চার্ট, মডেল প্রভৃতি প্রতিটি উপকরণ তৈরির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বকীয় প্রচেষ্টা সর্বজনকাম্য। এরূপ শিক্ষা learning by doing পর্যায়-ভুক্ত। তাই এ-শিক্ষা অধিকতর সক্রিয় ও দীর্ঘস্থায়ী।

(ছ) **লেখচিত্র** (Graph) : তুলনামূলক হিসাব, অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরিসংখ্যান বিষয়াদি পরিবেশনের সময় সাধারণতঃ লেখচিত্র বা গ্রাফ

ব্যবহার করা হয়। এর দ্বারা কোন ভাবগত বা বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করে তোলা যায়। গ্রাফের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা সহজে বিষয়বস্তু স্মরণ রাখতে পারে।

গ্রাফের প্রকার ভেদ: (i) রেখা গ্রাফ (Line graph), (ii) স্তম্ভ গ্রাফ (Bar graph) (iii) বৃত্তাকার গ্রাফ (Circle graph), (iv) চিত্রসূচক গ্রাফ (Pictorial graph)।

গ্রাফের ব্যবহার মূলতঃ হিসাবশাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত। তাই অঙ্ক এবং পরিসংখ্যান বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত পাঠ্য বিষয় শিক্ষণ-প্রসঙ্গে গ্রাফ ব্যবহারের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। অর্থনীতির ক্ষেত্রে জনসংখ্যা, জাতীয় আয়, দ্রব্যমূল্য, উৎপাদন, ইতিহাস পাঠে ঘটনার কালানুক্রমিক বর্ণনা; ভূগোলশাস্ত্রে বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, জলবায়ু, উচ্চতা, পরিমাপ ইত্যাদির ব্যাখ্যা ও প্রকাশের জন্য নানা উপায়ে গ্রাফ ব্যবহার করা হয়। বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ধারাকে গ্রাফের মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ করা যায় যে, শিক্ষার্থীর মনে তা গভীরভাবে রেখাপাত করতে সমর্থ হয়। ফলে, শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সহজে ভুলে যায় না।

গ্রাফ ব্যবহারের সময় **নিম্নরূপ সতর্কতা** অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত।

(i) গ্রাফ হবে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর।

(ii) গ্রাফের পরিমাপ হবে নির্ভুল ও শিক্ষার্থীর বোধগম্য।

(iii) গ্রাফ-কাগজ অথবা গ্রাফ-বোর্ড হবে সুন্দর ও সুস্পষ্ট, যেন দূর থেকে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি দেখতে ও বুঝতে পারে।

(iv) অঙ্কিত গ্রাফের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করা উচিত। ব্যাখ্যার সুবিধার্থে গ্রাফের পাশাপাশি বিষয়টি অল্প কথায় লিখে দেওয়াও বাঞ্ছনীয়।

(v) শিক্ষার্থী যাতে সহজে গ্রাফ অঙ্কন কৌশল এবং এর ব্যবহার করা শিখতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়।

(জ) **প্রতিফলনের যন্ত্রাদি** (Instrument for reflection): ছবি, অনুচিত্র, ম্যাপ, ইত্যাদিকে পর্দায় প্রতিফলিত করবার জন্য কতকগুলি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। আধুনিক যুগে শিক্ষায় উন্নত দেশগুলিতে এরূপ যন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এক্ষণে এরূপ কয়েকটি যন্ত্রের বিবরণ ও ব্যবহার প্রণালী আলোচনা করা হল:

(i) **এপিডায়াস্কোপ** (Epidiascope)ঃ কোন অস্বচ্ছ সামগ্রীকে পর্দায় প্রতিবিম্বিত করে শিক্ষার্থীদের দেখানোর জন্য এপিডায়াস্কোপ ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে থাকে দুটি জোরালো আলো এবং কনভেক্স লেন্স (convex lens)। শিক্ষক পাঠ পরিবেশনের সময় প্রকৃত বস্তু (real objects), ছবি, অনুচিত্র, গাছের পাতা, ডাল, ছোটছোট জীব, পোকা-মাকড়, প্রস্তরখণ্ড, প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য প্রভৃতি এই যন্ত্রের সাহায্যে সরাসরি পর্দায় প্রতিফলিত করতে পারেন। শিক্ষক মুখে মুখে প্রতিফলিত বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করলে শিক্ষোপকরণটি যুগপৎ শ্রুতি ও দৃষ্টি গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

(ii) **ম্যাজিক লণ্ঠন** (Magic Lantern)ঃ বহুল প্রচলিত পুরাতন প্রক্ষেপণ যন্ত্রগুলির মধ্যে ম্যাজিক লণ্ঠন অন্যতম। যখন বিদ্যুতের প্রচলন হয়নি তখন কারবাইড অথবা কেরোসিন গ্যাসের বাতি এই যন্ত্রে ব্যবহার করা হত। শ্রেণীকক্ষে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে পর্দায় ছবি প্রতিফলিত করে সুন্দর শিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। এই যন্ত্রের অসুবিধা হল, পুস্তকের ছাপা চিত্রাদিকে পর্দায় প্রতিফলিত করা যায় না। এর জন্য পৃথকভাবে বর্গাকৃতি কাচের স্লাইড (Slide) তৈরি করে রাখতে হয়। প্রতিফলিত হলে স্লাইডের ছবিগুলি অনেক বড় দেখায়। কোন পাঠ্যবিষয়ের সম্পূর্ণ অংশ সম্পর্কে ধারাবাহিক স্লাইড তৈরি করা থাকলে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সামনে প্রতিফলিত করে দেখানো যায় ও সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করে বিষয়টি বুঝানো যায়। বহু শিক্ষার্থী একত্রে এগুলি দেখবার ও বুঝবার সুযোগ পায়।

ফিলম্ স্ট্রিপস (Film-Strips)ঃ ম্যাজিক লণ্ঠন-এর আধুনিকতম সংস্করণ হল ফিলম্ ষ্ট্রিপস। এর জন্যে কাচের স্লাইড প্রয়োজন হয় না। ফটো ফিলম্-এর সাহায্যে ছবি দেখানো যায়। স্লাইড তৈরি করার চেয়ে ফটো তোলা সহজ এবং কোন একটি বিষয়ের ধারাবাহিক ফটো তোলা যায়। যন্ত্রটির হাতল ঘুরিয়ে একত্রে বহু ফটো প্রতিফলিত করে দেখানো যায়। এই ছবিগুলির সুবিধা হল, যতক্ষণ ইচ্ছা খুশীমত শিক্ষার্থীদের সামনে এগুলিকে দৃশ্যমান রাখা যায়। ফলে শিক্ষার্থীরা ঘটনা-পরম্পরায় চিত্রগুলি অনেকক্ষণ মনোযোগ সহকারে দেখতে পায় ও বিষয়টিকে বার বার দেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক প্রদত্ত ব্যাখ্যা শুনে অনুধাবন করতে পারে। এরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হৃদয়গ্রাহী শিক্ষণীয় বিষয় বহুকাল শিক্ষার্থীরা স্মরণ করে রাখতেও সমর্থ হয়।

(iii) **চলচ্চিত্র** (Motion Picture) **:** এপিডায়াস্কোপ, ম্যাজিক লণ্ঠন ও ফিলম্ ষ্ট্রিপস দ্বারা পুস্তকাদির চিত্র ও স্লাইড পর্দায় প্রতিফলিত করে শ্রেণীকক্ষে সরাসরি দেখানো যায়। এরূপ সামগ্রী বা চিত্রাদি সাধারণতঃ খণ্ড-বিখণ্ড ও সম্পর্কহীন হয়। উপরন্তু এগুলি স্থিরচিত্র (Still-picture) তাই এগুলি শিক্ষার্থীর মনে খুব বেশী উৎসাহের সৃষ্টি করতে পারে না স্থিরচিত্রাদির পরিবর্তে যদি চলমান ধারাবাহিক চিত্রের দ্বারা শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে ধরা যায়, তাহলে শিক্ষা আরও জীবন্ত, আবেদনশীল ও স্থায়ী হতে পারে।

নির্বাক চলচ্চিত্র বা মোশান পিকচার হল এরূপ একটি উপযুক্ত যন্ত্র। সরকারী প্রচার কার্যের জন্য প্রামাণিক চিত্রাদি (Documentary Films) দেখানো হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা, শিল্পোৎপাদন, কৃষি, সঞ্চয়, বণ্টন, ব্যাঙ্ক ব্যবসা, ভোট গ্রহণ, সংসদ পরিচালনা, দেশী ও বিদেশী প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিদের কার্যকলাপ, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ের প্রামাণিক চিত্রাদি প্রদর্শিত হয়। এগুলি সরকারী প্রচার ছাড়াও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অনুকূল শিক্ষণীয় বিষয়ও বটে। শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে পৃথক ধারাবাহিক ফিলম্ ফটো নিয়ে মোশান পিকচারের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে বিষয়টি যে শিক্ষার্থীর নিকট হৃদয়গ্রাহী হবে এ বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

(৩) **শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক শিক্ষোপকরণ** (Audio-Visual Aids) **:**

(ক) **সবাক চলচ্চিত্র** (Sound motion picture) **:** যুগপৎ শ্রবণ ও দর্শনের মাধ্যমে শিক্ষাকর্ম পরিচালনার সম্ভাব্য উপকরণ হিসেবে সবাক চলচ্চিত্র বা সিনেমা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে প্রধানতঃ সিনেমা আমোদ-প্রমোদের উপকরণ যোগায়। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সহায়ক বিষয় হিসেবে এর বিশেষ উন্নতি হয়নি, তবে প্রচলিত ছবির মধ্যে কোনটিই যে শিক্ষামূলক নয়, তা বলা চলে না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামমোহন, পথের পাঁচালী, লবকুশ, সুভাষচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ক্ষুদিরাম, বাবা যতীন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল প্রভৃতি ছবি শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নয়, সমাজের যে কোন স্তরের নাগরিকের শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযোগী চিত্র। তবুও একথা সত্য যে, বিদ্যালয়ে পাঠক্রমের প্রত্যক্ষ সহায়ক সবাক

চলচ্চিত্রের ব্যবহার আমাদের দেশে বিরল। শিক্ষায় উন্নত দেশগুলিতে সরকারী প্রচেষ্টায় পাঠক্রম অনুসারে বহু চিত্র তৈরি ও প্রদর্শিত হয়। চিত্র ও বিষয়বস্তুর যোগসূত্র সেখানে বিদ্যমান। শিক্ষা পুনর্গঠনে এরূপ শিক্ষাবিষয়ক চিত্রের বহুল প্রচার সর্বজনকাম্য। আজকাল কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির অনেকেই শিক্ষাবিষয়ক চিত্র নির্মাণে সচেষ্ট ও অনেকখানি অগ্রসর। সিনেমার মূল বিষয় আরম্ভের পূর্বে অনেকগুলি তথ্যচিত্র (Documentary Films) দেখাবার রীতি এদেশে প্রচলিত। এর মধ্যে শিক্ষামূলক বিষয়ও সংযোজিত হয়। এই তথ্যচিত্র নির্বাক চলচ্চিত্রের অংশ, তবে এতে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার ব্যবস্থা থাকে। তবে কোন্ ছবিতে কোন্ শ্রেণী সংবাদ পরিবেশিত হবে তা পূর্ব থেকে জানা যায় না। তাই একে বিষয়-শিক্ষার পরিপূরক অথবা শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ হিসেবে শিক্ষক ব্যবহার করতে পারেন না। আমাদের দেশে যেদিন আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য পৃথক সবাক চলচ্চিত্রের ব্যবস্থা করা হবে সেদিন বিষয়টি শিক্ষাসহায়ক শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক উপকরণ হিসেবে মর্যাদা লাভ করবে।

(খ) **টেলিভিশন** (Television)**ঃ** সর্বাধুনিক আবিষ্কৃত শ্রবণ-বীক্ষণ উপকরণ হিসেবে টেলিভিশন শিক্ষাক্ষেত্রের অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র। রেডিওতে আমরা শুধু বক্তার কথা শুনি কিন্তু টেলিভিশনে কথার সঙ্গে বক্তার চেহারা ও কথা বলার সুস্পষ্ট ভঙ্গিমা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। শ্রবণের সঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয়ের যোগাযোগ অপূর্ব শিক্ষাসহায়ক—এতে সন্দেহ নেই।

দুঃখের বিষয়, এটি এত ব্যয়বহুল যে বিদ্যালয়ে টেলিভিশন স্থাপন আমাদের কাছে আজও স্বপ্নাতীত বিষয়। প্রগতিশীল দেশগুলিতে এই যন্ত্রের বহুল প্রচলনে শিক্ষাদান কর্ম যথেষ্ট ত্বরান্বিত ও সহজসাধ্য হয়েছে। আমাদের দেশেও শিক্ষণ-প্রসঙ্গে এরূপ যন্ত্রের প্রচলন সর্বজনকাম্য।

দৃষ্টি সংক্রান্ত এবং শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক শিক্ষোপকরণ সম্পর্কে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা (Some relevant aspects of visul and Audio-visual Aids)**ঃ** জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষালাভ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও কার্যকর শিক্ষা। কতকগুলি শিক্ষোপকরণ আছে যেগুলি শুধু দর্শেন্দ্রিয় মারফত শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করে। যেমন—ব্লাকবোর্ড, প্রকৃতবস্তু, মানচিত্র ও গ্লোব, ছবি ও মডেল, অনুচিত্র ও চার্ট, বিভিন্ন প্রজেক্টরের মাধ্যমে

স্থির অথবা নির্বাক চলমান চিত্র প্রভৃতি শুধু দৃষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষোপকরণের শ্রেণীভুক্ত সামগ্রী। আবার কতকগুলি উপকরণ আছে যেগুলির সাহায্যে যুগপৎ কানে শুনে ও চোখে দেখে শিক্ষালাভ করা যায়। যেমন—চলচ্চিত্র (Sound motion picture) বা সিনেমা, টেলিভিশন প্রভৃতি এই শ্রেণীর শিক্ষোপকরণ। কারণ এসব উপকরণে যে ব্যক্তির কার্যকলাপ আমরা চোখে দেখতে পাই, সেই একই ব্যক্তির কথাও আমরা কানে শুনতে পাই। তাই শেষোক্ত উপকরণগুলিকে শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক শিক্ষোপকরণ (Audio-visual Aids) বলা হয়।

তবে দৃষ্টি সংক্রান্ত উপকরণগুলিকে (Visual Aids) শ্রবণভিত্তিক করেও পরিবেশন করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ব্লাকবোর্ডে লিখিত বা অঙ্কিত বিষয় শিক্ষককে ব্যাখ্যা করতে হয়। প্রজেক্টরের সাহায্যে প্রতিফলিত চিত্র সম্পর্কে শিক্ষক ব্যাখ্যা করেন এবং শিক্ষার্থীরা চিত্রটি দেখে ও শিক্ষকের কথা কানে শোনে। সেইরূপ গ্লোব, ম্যাপ, চার্ট, ডায়গ্রাম, গ্রাফ ইত্যাদি সামগ্রীও শিক্ষার্থীরা চোখে দেখে ও ঐগুলি সম্পর্কে শিক্ষক প্রদত্ত ব্যাখ্যা একই সঙ্গে শ্রবণ করে। তাহলে বলা যায়, দৃষ্টি সংক্রান্ত উপকরণগুলি প্রদর্শন ও পরিবেশনের সময় দৃষ্টি ও শ্রবণভিত্তিক উপকরণ (Audio-visual Aids) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

শ্রবণভিত্তিক (Auditory Aids) উপকরণগুলির ক্ষেত্রে শুধু শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া দর্শন-ইন্দ্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ করা যায় না। রেডিও, গ্রামোফোন, টেপ-রেকর্ডার-এর দ্বারা পরিবেশিত বিষয়ের বক্তাকে চোখে দেখা যায় না—এক্ষেত্রে শুধু শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ই ক্রিয়াশীল থাকে। তাহলে দর্শন-শ্রবণভিত্তিক উপকরণ (Audio-visual Aids) হিসেবে সিনেমা, টেলিভিশনের সঙ্গে দৃষ্টি-সংক্রান্ত উপকরণগুলির কথাও উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়।

(৪) **পঠনযোগ্য শিক্ষোপকরণ** (Reading materials) **:**
(ক) পাঠ্যপুস্তক (Text Book)**:** পুঁথিগত বিদ্যার বিরুদ্ধে নানা যুক্তির অবতারণা করেছেন রুশো থেকে শুরু করে পেষ্টালৎসী, ফ্রোয়েবেল, জন ডিউই, মহাত্মা গান্ধী ও আরও অনেকে। এসব যুক্তির অনুকূলে অনেকেই পাঠ্য-পুস্তককে সম্পূর্ণ বর্জন করলে চলে কিনা, তা পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু তার

ফল আশাপ্রদ হয়নি। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমাংশে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকজন চিন্তাশীল 'শিক্ষা' বিভাগীয় ছাত্র (Students of Education) পরীক্ষণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত পর্যায়ক্রমিক শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তক হল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অপরিহার্য হাতিয়ার। বস্তুতঃ, বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থায় সার্থক পাঠদান ও শিক্ষালাভের জন্যে বহু প্রকার পদ্ধতি ও রীতিনীতির প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। এর ফলে পাঠ্যপুস্তকে লিখিত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সহজসাধ্য হয় মাত্র, কিন্তু এসব পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্ত-বিষয়রূপে গণ্য হতে পারে না। সুতরাং, পাঠ্যপুস্তক-বর্জনের চিন্তা বাতুলতা মাত্র। বিশ্বের অন্যান্য শিক্ষাগ্রসর দেশের ন্যায় ভারতের শিক্ষাবিদরা তাই পাঠ্য-পুস্তককে শিক্ষাকর্মের অপরিহার্য সহায়ক বলে মনে করেন। এ সম্পর্কে **বিভিন্ন শিক্ষাকমিশনের মতামতগুলি প্রণিধানযোগ্য**ঃ

(i) কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষৎ (C.A.B.E.)—এর পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত পরামর্শদান সভার বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "ডেনমার্কের রাজকুমার ছাড়া হ্যামলেটকে যেমন চিন্তা করা যায় না, তেমনি পাঠ্যপুস্তকবিহীন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকেও চিন্তা করা দুরূহ।"[1]

(ii) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের মতে কতকগুলি অনুমোদিত পাঠ্য-পুস্তকের ওপর আমাদের শিক্ষাকর্ম সম্পূর্ণ নির্ভর করবে, এ নিয়মের কড়াকড়ি যত শীঘ্র সম্ভব পরিবর্তনের দাবী রাখে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য মাত্র একখানি পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট (prescribe) করা উচিত নয়। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেণীর মান অনুযায়ী প্রতি শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক কমিটি যেন একাধিক উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন করেন। বিদ্যালয় খুশীমত তাদের ভিতর থেকে প্রয়োজন অনুসারে পুস্তক বাছাই করে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করবে।[2]

(iii) পাঠ্যপুস্তক প্রসঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাবিভাগ ঠিক একই মতামত পোষণ করে। সেখানে পাঠ্যপুস্তককে শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী হিসেবে

---

1. A modern educational system without text book is as difficult to imagine as Hamlet without the Prince of Denmark—C. A. B. E.

2. Report of the Secondary Education Commission 1952-53; Chapter—VI.

গণ্য করা হয়। শিক্ষকগণ সাধারণতঃ পাঠ্যপুস্তকের ওপর অধিক নির্ভরশীল। তবে প্রাথমিক অপেক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক অধিকতর মর্যাদায় সমাদৃত।

(iv) ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) উন্নততর পদ্ধতি প্রয়োগ এবং শিক্ষাদানের কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা স্বীকার করেছেন। কমিশনের মতে সার্থক পাঠ্যপুস্তক শিক্ষালাভের ও শিক্ষাদানের অপরিহার্য সহায়ক।[1]

পাঠ্যপুস্তক অপরিহার্য কেন? (Why Text Book is indispensable): আধুনিক শিক্ষাধারায় পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত শিক্ষাকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় না—এটা সর্ববাদীসম্মত অভিমত। সুতরাং পাঠ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ের জন্য উপযোগী পাঠ্যপুস্তক আবশ্যক। পাঠ্যপুস্তকের অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি অবশ্য বিবেচ্য:

(i) শিক্ষা পুনর্গঠন পরিকল্পনায় স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নতুন বিষয় পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের পরিধি গভীর, ব্যাপক ও সমাজ-কল্যাণমুখী করার প্রচেষ্টা চলছে। ফলে নির্ধারিত (prescribed) বিষয়ের ওপর গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান সম্পন্ন সুদক্ষ শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব আছে। তাই বিষয়বস্তুর ওপর পাণ্ডিত্য অর্জনের সুবিধার জন্যে শিক্ষককে নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকের ওপর খুব বেশী নির্ভর করতে হয়।

(ii) আমাদের দেশে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান-পদ্ধতি হিসেবে বক্তৃতা পদ্ধতি অধিক প্রচলিত ও সমাদৃত। কিন্তু এই পদ্ধতির বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান। শিক্ষকের বক্তৃতা শোনার পর শিক্ষার্থীরা বিষয়টি অবিকল মনে রাখবে—এটা কল্পনা করা যায় না। পাঠ্যপুস্তক থেকে শ্রেণীকক্ষের বিষয়টি সম্পর্কে স্বগৃহে বিশেষভাবে পড়াশুনা করতে হয়। সুতরাং বক্তৃতার বিষয়বস্তুর পরিপূরক হিসেবে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

(iii) আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলির পাঠাগারে পাঠোপযোগী গ্রন্থাদির অভাব সর্বজনবিদিত। ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীরা পাঠাগারে

---

1 Report of the Education Commission (1964-66); Page 229.

পড়াশুনা করবার উপযোগী মূলগ্রন্থ (Source Book) ও পত্র-পত্রিকা পায় না। এই অভাব আংশিকভাবে পূরণ করতে পারে একমাত্র পাঠ্যপুস্তক।

(iv) শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত পাঠক্রমের বিষয়বস্তু পাঠ্যপুস্তকে লিখিত হয়। পুস্তক প্রণয়নের সময় শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, বিষয়বস্তু জানা আগ্রহ ও সামর্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখেই ইহা করা হয়। পাঠ্যপুস্তকে থেকে অজানা, সহজ থেকে জটিল ও যুক্তিসিদ্ধ বিষয়াদি ধারানুক্রমে লিখিত থাকে। ফলে, পাঠ্যপুস্তকের ওপর ভিত্তি করে পাঠচর্চায় অগ্রসর হলে শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ উভয়দিকে যথেষ্ট সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। অধিকন্তু প্রতি অধ্যায়ের শেষে অথবা পুস্তকের শেষে থাকে অনুশীলনী, নানা প্রকল্পের নমুনা ইত্যাদি। বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্তের জন্য পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে মানচিত্র, অনুচিত্র, তালিকা, ছক, ছবি ইত্যাদি দেওয়া থাকে। ফলে পাঠ্যপুস্তকের সহায়তায় অগ্রসর, অনগ্রসর ও সাধারণ—সকল প্রকার শিক্ষার্থী উপকৃত হয়।

(v) আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষামুখী। বার্ষিক শেষ পরীক্ষায় কৃতকার্যতার জন্য শিক্ষার্থীকে পাঠ্যপুস্তকের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়। নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষের মধ্যে অনুমোদিত পাঠ্যসূচী শেষ করার অনুকূলে পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক শ্রেণী-শিক্ষার মান বজায় রাখার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও দায়িত্ব বহন করে।

(vi) এছাড়া **শ্রেণীশিক্ষার যেসব ত্রুটির ফলে শিক্ষাকর্মে পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেগুলি হল ঃ**

প্রথমতঃ, এক একটা শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যাধিক্যের ফলে দলগত, যৌথ বা ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুসারে নির্দেশদান ও তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক সর্বদা অনুমোদিত পাঠ্যসূচী শেষ করে শিক্ষার্থীদের সারা বৎসরের প্রগতির মূল্যায়ন ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়ে দিতে উদ্বিগ্ন থাকেন।

তৃতীয়তঃ, শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, আচার-আচরণ, আগ্রহ ও প্রবণতা ইত্যাদিতে এত বেশী বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় যে, পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত শ্রেণীতে একটা সর্বজনগ্রাহ্য পন্থায় পাঠ-পরিচালনা নিতান্ত অসম্ভব হয়ে ওঠে।

চতুর্থতঃ, অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রাচুর্য ত দূরের কথা ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার মত শিক্ষাসহায়ক উপকরণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে শ্রেণী শিক্ষা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে। তাই ঐতিহ্যবাহী সহায়ক উপকরণ (Traditional aids) হিসেবে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় নিতান্ত অপরিহার্য।

(খ) সহায়ক ও সমপর্যায়ের পুস্তক-পুস্তিকা (Reference Books)**:** মূল পাঠ্যপুস্তকের পরিপূরক বিষয় হিসেবে সমপর্যায়ের পুস্তক-পুস্তিকা পাঠের ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত। একই বিষয় অবলম্বনে বিভিন্ন পুস্তক রচিত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বিষয়বস্তু আলোচিত হয়। যেমন, ইতিহাস পুস্তক রচনায় বহু লেখক বহুভাবে বিষয়বস্তু আলোচনা করতে পারেন। সম্রাট অশোকের বিষয় যে শুধু একখানা পুস্তকে আলোচিত হবে—এমন কোন কথা নেই। তাই ভিন্ন ভিন্ন লেখকের ইতিহাসের গ্রন্থ থেকে ঐ বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। তেমনি আবার ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বনে নানা প্রকার পুস্তক রচিত হতে পারে। এসব পুস্তকও শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনের সহায়ক হতে পারে। তাই এরূপ সহায়কপুস্তক পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা উচিত। সমাজ বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত ইতিহাস, ভূগোল, অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতি, যুক্তিবিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি নানা বিষয় বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের পাঠ্যরূপে অনুমোদিত। এসব বিষয় পরস্পরের সঙ্গে বিশেষভাবে অন্বিত। তাই শিক্ষাদান প্রসঙ্গে অনুবন্ধ নীতি অবলম্বন করে শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা যায়।

সহায়ক পুস্তকাদিকে কাজে লাগানর উপায় (How to utilise reference books)**: প্রথমতঃ,** বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাধিক লেখকের পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষিত করতে পারেন। বিভিন্ন লেখকের একই বিষয় (Subject) পৃথক পৃথক উদাহরণ ও চিত্রাদি সহ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচিত হয়। বিভিন্ন লেখকের লেখা পুস্তক পাঠে উৎসাহিত করলে শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক পাঠের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পাবে। এর ফলে শিক্ষার্থীর বিষয়গত জ্ঞান হবে সুস্পষ্ট ও তাদের পুস্তক পাঠের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয়তঃ, পুরাতন পুস্তক অপেক্ষা আধুনিক সংস্করণের পুস্তক-পুস্তিকায় আলোচিত সংজ্ঞা, বিবরণ, বিষয়বস্তুর সংস্থাপন, পূর্বাপর সঙ্গতি, ব্যাখ্যা ও

দৃষ্টান্ত অনেক বেশী উন্নত ও গবেষণাপ্রসূত। তাই নতুন সংস্করণের পুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে শিক্ষার্থীদের তা পাঠের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত।

তৃতীয়তঃ, সংগৃহীত পুস্তক-পুস্তিকা থেকে বিষয়বস্তু নির্বাচন করে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যেমন পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করতে পারেন, তেমনি এসব পুস্তক পাঠের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের নির্দেশ (assignment) দিতে পারেন। একাধিক পুস্তক-পুস্তিকা পাঠের নির্দেশ দিয়ে শিক্ষার্থীর সহায়ক পাঠনা (collateral reading) এবং পরিপূরক পাঠনাকে (Supplementary reading) উৎসাহিত করা যায়।

৩। পরিবেশ ও কর্মকেন্দ্রিক কৌশল (Environmental and activity-centred devices):

কর্ম ও অভিজ্ঞতামুখী শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এ-শিক্ষা ইন্দ্রিয়, দেহ ও মনের নিজস্ব ধারা। বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষার কুফল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মনস্তত্ত্ববিদ্ শিক্ষাবিদরা পুঁথির সঙ্গে কর্ম ও অভিজ্ঞতার যোগসাধন করেছেন। এর জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে কর্মশিক্ষা (work education), শারীর শিক্ষা (Physical education) ও সমাজসেবা (Social Service)। কিছুকাল পূর্বে এগুলিই ছিল সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী (Co-curricular activities) এবং তারও পূর্বে অতিরিক্ত পাঠ্যসূচী (Extra-curricular activities) নামে পরিচিত ছিল। এই পাঠ্যসূচী প্রবর্তনে নীরস গতানুগতিক পুঁথিসর্বস্ব যান্ত্রিক শিক্ষার কুফল আজ অপসারিত। নতুন কর্মসূচীতে শিক্ষায় সঞ্চারিত হয়েছে প্রবল প্রাণবেগ। এই প্রাণবেগকে ছন্দোময় ও মুখর করে তুলবার দায়িত্ব শিক্ষকের। কর্মই হবে শিক্ষাসহায়ক কর্মকেন্দ্রিক কৌশল (activitiy centred devices)। শিক্ষামূলক ভ্রমণ (Educational excursion) ও পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কর্মক্ষেত্র প্রদক্ষিণ (Field Trips) ইত্যাদি এরূপ কর্মভিত্তিক কৌশলের অন্তর্ভুক্ত।

কর্মের সঙ্গে জড়িত আছে পরিবেশ। উপযুক্ত পরিবেশ যেমন শিক্ষার্থীকে কর্মে উৎসাহিত করে, তেমনি কর্ম-পরিচালনা উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাই পরিবেশভিত্তিক কৌশল অবলম্বনের দ্বারা শিক্ষাদান কর্ম সুষ্ঠু ও প্রাণবন্ত

হয়ে ওঠে। বিভিন্ন বিষয়-কক্ষ (Subject room), রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত পরিবেশ (Histrionic Atmosphere), শিক্ষা প্রদর্শনী (Educational Exhibition) ও সমাজ কর্মীদের বিদ্যালয় পরিদর্শন, গ্রন্থাগার (Library) ও পাঠাগার (Reading-room), সংগ্রশালা (Museum), বিভিন্ন বিষয়-ক্লাব (যেমন, বিজ্ঞান ক্লাব, ইতিহাস ক্লাব, সমাজবিদ্যা ক্লাব প্রভৃতি) ইত্যাদি উপযুক্ত শিক্ষা-পরিবেশ রচনা করতে পারে।

একণে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কর্মকেন্দ্রিক ও পরিবেশজনিত কৌশল আলোচনা করা যাচ্ছে ঃ

(ক) **শিক্ষামূলক ভ্রমণ** (Educational Excursion) ঃ আধুনিক শিক্ষণ-প্রসঙ্গে দেশভ্রমণ শিক্ষালাভের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গৃহীত। ভ্রমণ ও পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব ক্ষেত্র থেকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। তবে সকল শিক্ষার্থীকে নিয়ে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ হয়ত সম্ভব নাও হতে পারে, কিন্তু তাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে সীমিত দূরত্বে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যায়। যে ভ্রমণ নিছক সৌন্দর্য উপভোগের বিষয় না হয়ে শিক্ষার্থীর পাঠ্যবিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিপূরক ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সহায়ক হতে পারে তাকে শিক্ষামূলক ভ্রমণ হিসেবে অভিহিত করা যায়। শিক্ষামূলক ভ্রমণের তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ হল বহির্বিভাগীয় শিক্ষা (outdoor lesson)। এ শিক্ষা বিদ্যালয় কক্ষের পুঁথিগত শিক্ষার পরিপূরক। শিক্ষামূলক ভ্রমণ ব্যতীত বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। আঞ্চলিক কারখানা, হাট-বাজার, বেকারী, রেডিও স্টেশন, বিমান বন্দর, ব্যাঙ্ক, বীমা অফিস, মন্দির-মসজিদ, গীর্জা, কোর্ট কাছারী, ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থান প্রভৃতি হল বাস্তব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীরা এ সকল স্থান ভ্রমণ করে তাদের কাজকর্ম-সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করবে। তবেই প্রতিষ্ঠিত হবে পুঁথিগত বিদ্যা এবং বাস্তবতার সম্পর্ক। বাস্তব বিষয়ের মাধ্যমে যদি সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভ করাই জ্ঞানার্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হয়, তাহলে বিদ্যালয়ের সীমিত পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থীকে নিয়ে যেতে হবে সমাজের বাস্তব কর্মস্থলে, যেখানে তারা বাস্তব পরিবেশে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাবে। শিক্ষার্থী স্বচক্ষে দেখবে দূর আকাশ থেকে বিমান

শিক্ষামূলক ভ্রমণ কাকে বলে

শিক্ষামূলক ভ্রমণের তাৎপর্য

কিভাবে ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করে, আবার ভূ পৃষ্ঠ থেকে দূরে আকাশে কিভাবে উড়ে যায় ; বিশাল চুল্লীগুলি কিভাবে কঠিন লোহার রূপান্তর ঘটায়, অবহেলিত বালুকা কাচ হয়ে কিভাবে ঘরে ঘরে মানুষের সেবা করে ; সুমধুর সঙ্গীত-নাটক, বক্তৃতা কিভাবে রেডিও স্টেশনে পরিবেশিত হয় ইত্যাদি। তবেই পুঁথিগত জ্ঞান হবে সুস্পষ্ট, বাস্তব, জীবন্ত ও গতিশীল (Dynamic)।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ বহুমুখী হতে পারে। প্রথমতঃ, সপ্তাহ শেষে শনিবার বা রবিবার আঞ্চলিক কারখানা, হাট-বাজার, পোষ্টঅফিস, ব্যাঙ্ক, ডেয়ারী ফার্ম, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি পরিদর্শনের জন্য কার্যক্রম নির্ধারণ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাশকালে দূর অঞ্চলে ভ্রমণের জন্য ব্যবস্থা করা চলে। তৃতীয়তঃ, বাৎসরিক পরীক্ষান্তে যখন শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট অবকাশ পায় তখন শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যায়। তবে সুদূর ভ্রমণের জন্য বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাশের সময় অথবা বার্ষিক পরীক্ষা শেষে গৃহীত কর্মসূচীর উপযোগিতা সমধিক।

ভ্রমণের সময় নির্বাচন

শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য সরকারী-তরফ থেকে কিছু কিছু অর্থ ব্যয় করার রীতি গৃহীত হয়েছে। এ-উদ্দেশ্যে রেলওয়ে কনসেশন শিক্ষামূলক ভ্রমণের যথেষ্ট সুযোগ এনে দিয়েছে। তবুও দেখা যায়, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য ও শিক্ষকদের ব্যক্তিগত অসুবিধা বশতঃ শিক্ষার্থীরা সেই সুযোগ লাভ করতে পারে না। আবার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের সহযোগিতায় অগ্রণী হয়ে যদি সুপরিকল্পিতভাবে ভ্রমণের ব্যবস্থা না করেন, সে ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীরা শিক্ষামূলক ভ্রমণের উপযোগিতা লাভ করতে পারে না। কারণ, পরিকল্পনাবিহীন ভ্রমণ থেকে ফিরে শিক্ষার্থীরা কোন প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে না। তারা ফিরে আসে শুধু শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি নিয়ে। সুতরাং শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা অপরিহার্য।

ভ্রমণের জন্য পরিকল্পনা প্রযোজন

শিক্ষামূলক ভ্রমণ পরিকল্পনা (How to plan for Excursion) : উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য **প্রথমতঃ**, শিক্ষককে সর্বপ্রথম শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। শিক্ষার্থীদের কোন প্রকার বা কোন বিষয় শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তিনি ভ্রমণ বা অঞ্চল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবেন তা জানা না থাকলে ভ্রমণ সার্থক হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য সর্বপ্রথমে অনুকূল স্থান নির্বাচন করা উচিত। এরপর প্রয়োজনবোধে নির্ধারিত স্থান, অঞ্চল বা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি লওয়া যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ভ্রমণে যাত্রা করার পূর্বেই শিক্ষককে সেই নির্দিষ্ট স্থান পর্যটন করে বিশ্রামাগার, খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা ও আনুষঙ্গিক সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ, নির্বাচিত স্থানের কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়ার পর সেখানকার কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে ভ্রমণের তারিখ, সময়, ছাত্র সংখ্যা, পরিচালক সংখ্যা ও ক্ষেত্রগত কার্যসূচী নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

পঞ্চমতঃ, যাত্রার পূর্বে খাদ্য, পানীয় ও বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে সুনির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করাই যুক্তিযুক্ত। শিক্ষকের নির্দেশ মত নগদ টাকা পয়সা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে রাখাও কর্তব্য।

ষষ্ঠতঃ, যাত্রার পূর্বে শিক্ষার্থীকে উপযুক্তরূপে তৈরি করে নেওয়া উচিত। ভ্রমণের জন্য প্রথম প্রয়োজন আগ্রহ ও প্রেরণা সৃষ্টি। ভ্রমণ ও পরিদর্শনের সময় কি কি নির্দেশ পালন করতে হবে সে সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা প্রয়োজন। যে স্থান বা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হবে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান যাতে শিক্ষার্থীরা পায় তার জন্য শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন শিক্ষাসহায়ক সামগ্রীর সাহায্যে তাদের ধারণাকে সুস্পষ্ট করে তোলা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা যাতে নোট-বুক, অ্যালবাম, ক্যামেরা প্রভৃতি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছায় সেরূপ নির্দেশ থাকাও প্রয়োজন।

সপ্তমতঃ, প্রত্যাবর্তনের পর শিক্ষকের নির্দেশমত শিক্ষার্থীরা প্রথমে সংগৃহীত মডেল, নিদর্শন, প্রয়োজনীয় অনুচিত্র ইত্যাদি বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় জমা দেবে। এর পর তারা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিবরণী (Report) লিখবে এবং শ্রেণীকক্ষে সকলের সম্মুখে সেগুলি পাঠ করবে। রিপোর্টগুলি শিক্ষার্থীদের কর্মের মূল্যায়নের কাজেও ব্যবহৃত হতে পারে। ভ্রমণের সময় শিক্ষার্থীরা অনেকেই অনেক অন্যায় ও ত্রুটিবহুল কর্মে লিপ্ত হতে পারে; শিক্ষক তাদের এসব ত্রুটি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

এভাবে পরিকল্পিত উপায়ে যদি শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে শিক্ষার্থীদের অধীত বিদ্যা সত্যই সজীব ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষামূলক ভ্রমণ সার্থক রূপায়ণের জন্য শিক্ষকের দক্ষতা, বিদ্যাবুদ্ধি, পরিচালন ক্ষমতা ও নিপুণতা এক্ষেত্রে অপরিহার্য।

শিক্ষামূলক ভ্রমণের উপযোগিতা (Utility of Educational Excursion) ঃ শিক্ষামূলক ভ্রমণের মৌলিক উপযোগিতাগুলি হল ঃ

প্রথমতঃ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ পুঁথিগত বিষয়-শিক্ষার পরিপূরক বা সম্পূরক। শ্রেণীকক্ষের অধীত বিষয় যখন শিক্ষার্থী স্বচক্ষে দেখতে ও স্বকর্ণে শুনতে পায়, তখন বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বুনিয়াদ সুদৃঢ় প্রসারিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা (first-hand knowledge) দান করে। ফলে বিষয়টি তার মনে দীর্ঘস্থায়ী হয়। অথচ শুধু কানে শোনা বক্তৃতা বা পুঁথিগত বিদ্যা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বাস্তবতাবোধ বিকশিত হয়, ফলে সে বাস্তব সমস্যাগুলিকে অনুধাবন করতে শেখে।

চতুর্থতঃ, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে তার ভৌগোলিক পটভূমি বা ঘটনা স্থলের স্মৃতি চিহ্নাদি স্বচক্ষে পরিদর্শন করলে ইতিহাসের বিমূর্ত বিষয় মূর্ত, বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

পঞ্চমতঃ, এরূপ ভ্রমণে শ্রেণীকক্ষের একঘেয়েমির হাত থেকে শিক্ষার্থীরা মুক্তি পায়। শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য পরিকল্পনা রচনা, পরিচালনা ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে শেখে।

ষষ্ঠতঃ, ভ্রমণান্তে শিক্ষকের সাহচর্যে রচিত ভ্রমণবৃত্তান্ত পরবর্তী শিক্ষার্থীদের মনে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারে। অধিকন্তু ভ্রমণের সময় শিক্ষার্থীরা প্রচুর দর্শনীয় এবং শিক্ষনীয় নিদর্শন সংগ্রহ করে সংগ্রহশালায় সংরক্ষণের দ্বারা বিদ্যালয়ের সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে। এভাবে শিক্ষার্থীরা চিন্তার ভাববস্তু সংগ্রহ করে স্ব-স্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের পুষ্টি বিধান করতে সমর্থ হয়।

সপ্তমতঃ, পরিভ্রমণ ও পরিদর্শনের সময় শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যে হৃদ্যতা, সক্রিয় সহযোগিতা, সমবেদনার মনোভাব সৃষ্টি হয়, তাও শিক্ষার্থীর জীবনের অমূল্য সম্পদ—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(খ) রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত পরিবেশ (Histrionic Atmosphere) : নাটক অভিনয়, আবৃত্তি, দৃশ্যাভিনয়, নির্বাক অভিনয় ও রূপসৃষ্টি, অনুকরণ ও অভিনয়, ছায়াভিনয়, নকল রূপসৃষ্টি প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলি রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত পরিবেশের অন্তর্গত। বিভিন্ন ধরনের অভিনয় প্রক্রিয়ার জন্য আমাদের দেশে উপযুক্ত পুস্তকাদির যথেষ্ট অভাব আছে। এই অভাব পূরণের দায়িত্ব নিতে হবে শিক্ষককে। চিন্তাশীল, দক্ষ সু-শিক্ষক পাঠ্যসূচীর বিশেষ বিশেষ অংশ নিয়ে শিক্ষার্থীদের দ্বারা অভিনয় করাতে পারেন ও অনুকূল শিক্ষা-পরিবেশ গড়ে তুলতে পারেন। অতীত ও অজ্ঞাত বিমূর্ত বিষয়কে মঞ্চ পরিবেশে উপস্থাপিত করলে শিক্ষার্থীদের নিকট বিষয়বস্তু হয়ে ওঠবে জীবন্ত, মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী। অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সঙ্কোচ ও শৈথিল্য ভুলে নিজেদেরকে প্রকাশ করতে সমর্থ হবে।

তবে বিদ্যালয়ে পুনঃ পুনঃ রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত নয়। শ্রেণী-পাঠের একঘেয়েমি দূর করার জন্যে প্রচলিত কর্মসূচী পরিপ্রেক্ষিতে মাঝে মাঝে অভিনয়ের আয়োজন করাই বাঞ্ছনীয়। বিষয়-কক্ষ (subject room) রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত পরিবেশ সৃষ্টির উপযুক্ত স্থান। প্রতিফলিত চিত্রের জন্য নির্দিষ্ট পর্দার সম্মুখ ভাগে মঞ্চ তৈরির স্থান নির্ধারিত হলে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি হবে আশা করা যায়।

(গ) শিক্ষা-প্রদর্শনী (Educational Exhibition) : বিদ্যালয়ে শিক্ষা-পরিবেশ সৃষ্টির অন্যতম কৌশল (Device) হল শিক্ষা-প্রদর্শনীর আয়োজন করা। বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালার স্থায়ী প্রদর্শনী ছাড়া বৎসরান্তে একবার বিভিন্ন বিষয়ক শিক্ষা-প্রদর্শনীর আয়োজন করা যায়। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষাধারা যে সামগ্রিক ও অখণ্ড তার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে এই প্রদর্শনীতে। এটা যেন বৈচিত্র্যময় বিদ্যালয়-জীবনের একক প্রকাশ। সারা বছর শিক্ষার্থীরা যেসব প্রকল্প (project) ও সমস্যার সমাধান করল বা শিক্ষামূলক কর্ম সম্পাদন করল তার সর্বাত্মক প্রকাশ হবে এই শিক্ষা-প্রদর্শনীতে। এই প্রদর্শনীতে শিক্ষকের সাহচর্যে শিক্ষার্থীদের স্বহস্তে তৈরি মডেল, চার্ট, অনুচিত্র, তাদের সংগৃহীত শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী, লিখিত বিবরণী, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি বিদ্যালয়ের অভিভাবক ও নিকটবর্তী অঞ্চলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মনে শিক্ষা সম্পর্কে ঔৎসুক্য ও প্রেরণা জাগাতে সমর্থ হবে। প্রদর্শনটি হবে

শিক্ষার্থীদের প্রতিভা, দক্ষতা, কৌশল, কর্মক্ষমতা, সংগঠনী শক্তির বাস্তবায়িত রূপ। অনগ্রসর, স্বল্পমেধা, দুর্বল প্রভৃতি সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থী এতে অংশ গ্রহণ করবে। এরূপ প্রদর্শনীর দ্বারা তত্ত্বাবধান, সাজসজ্জা, দর্শকদের আদর-আপ্যায়ন প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সামাজিক ও নাগরিক জীবনের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী অর্জন করবে। সুতরাং শিক্ষা-প্রদর্শনী হল—শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার অন্যতম কৌশল।

এসব কর্মকেন্দ্রিক ও পরিবেশজনিত কৌশলগুলি ছাড়াও **বিভিন্ন বিষয়ের ক্লাব, বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক কক্ষ** (Subject rooms), **গ্রন্থাগার** (Library), **পাঠাগার** (Reading-room), **সংগ্রহশালা** (Museum) প্রভৃতি বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষা পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে।* মৌখিক কৌশল (Oral devices) ও বস্তুবাচক উপকরণাদির ন্যায় কর্মসূচক এবং পরিবেশজনিত কৌশলগুলিও শিক্ষাসহায়ক—এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

(৫) **শিক্ষা-প্রযুক্তিবিজ্ঞানের নতুন অবদান** (New Contribution of Educational Technology) **:** প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নানা আঙ্গিক আবিষ্কার ও প্রচলন করার চেষ্টা চলছে। শিক্ষা-প্রযুক্তিবিজ্ঞান দিনে দিনে উন্নত পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে। এ-সম্পর্কে বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের নিরলস প্রয়াস অব্যাহত আছে। ফলে শিক্ষা-সহায়ক নানা প্রকার নতুন কৌশল আবিষ্কৃত হচ্ছে। প্রোগ্রামভিত্তিক শিক্ষণ-কৌশল এরূপ একটি নতুন আবিষ্কার। প্রচলিত শিক্ষণ-উপকরণ থেকে এটির নতুনত্ব লক্ষ্যণীয় বিষয়।

প্রোগ্রামভিত্তিক শিক্ষণ-আঙ্গিক (Device for Programmed Instruction or Learning) **:** প্রোগ্রামভিত্তিক আঙ্গিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়া হিসেবে সর্বাধুনিক আবিষ্কার। ভারতের ক্ষেত্রে আলোচ্য আঙ্গিকের ব্যবহার আজও গবেষণা স্তরে রয়ে গেছে। নেশান্যাল ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন (National Institute of Education) ১৯৬৬ সালে 'প্রোগ্রামভিত্তিক আঙ্গিক' বিষয়ে পৃথক একটি সংস্থা (Indian Association for Programmed Learning) প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থার শাখা-প্রশাখা ভারতের

* বিশেষ বর্ণনা দ্বিতীয় খণ্ডে দেওয়া হল।

অন্যান্য রাজ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে। এই নতুন আঙ্গিকটি সম্পর্কে দিল্লী, ভুবনেশ্বর ও অন্যান্য শিক্ষা-বিষয়ক আঞ্চলিক কলেজগুলিতে (Regional College of Education) গবেষণা চলছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রোগ্রামভিত্তিক আঙ্গিকের ব্যবহার একটি নতুন পদ্ধতির অবতারণা করেছে।

প্রোগ্রাম-শিক্ষণ (Programmed Instruction) সম্পর্কে মৌলিক ধারণাটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম উদ্ভূত হয়। পরে এই ধারণা ছড়িয়ে পড়ে ইংল্যাণ্ড, সোভিয়েট রাশিয়া, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশে। প্রথমে 'প্রোগ্রাম-শিক্ষণ' (Programmed Instruction) হিসেবে কথাটি ব্যবহৃত হলেও পরে একই বিষয় 'প্রোগ্রাম-শিখন' (Programmed learning) হিসেবে ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত হয়। কারণ, পদ্ধতিটি মূলতঃ শিক্ষার্থীভিত্তিক (learning oriented system)। এখানে স্বয়ং-শিক্ষণ (Auto-instructional) প্রক্রিয়ার বিষয়বস্তু পরিবেশিত হয়।

যুগের প্রয়োজনে যখন শিক্ষার সম্প্রসারণ গণদাবীতে পরিণত হল তখন শিক্ষা-প্রযুক্তিবিজ্ঞানেরও (Educational Technology) উন্নতি হল। নতুন প্রযুক্তিবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে শিক্ষা সম্প্রসারণের নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবিত হল। আমাদের আলোচ্য প্রোগ্রামভিত্তিক পদ্ধতি সেই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি মাত্র। নতুন প্রযুক্তিবিজ্ঞানের উদ্ভাবক হিসেবে আমরা প্রথমে হারবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের (Harvart University) মনস্তত্ত্ব বিষয়ের অধ্যাপক ও গবেষক ডক্টর বি. এফ. স্কিনার-এর (*Dr. B. F. Skinner*) নাম স্মরণ করতে পারি। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস *Walden Two*-তে তিনি নতুন চিন্তাধারার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালের Harvard Educational Review-তে প্রকাশিত হয় তাঁর "The Science of learning and the Art of teaching" নামক প্রবন্ধ। ডক্টর স্কিনারের গবেষণার ফল হল সুদূরপ্রসারী।

প্রোগ্রাম পদ্ধতির চিন্তাধারা শিখণের (learning) মৌলিক নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। শিখণের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বিশেষ কার্যকর। **প্রথমটি হল,** শিক্ষার্থীর স্বয়ং সক্রিয় অংশ গ্রহণ। **দ্বিতীয়টি হল,** শিক্ষার বিষয়টি সঠিক হল কি না তা অবগত হওয়া। এর দ্বারা প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। **তৃতীয়টি**

হল প্রেষণা (motivation)। প্রেষণা শিক্ষাকে স্থায়ী করে ও শিক্ষার্থীকে শিক্ষালাভে নিয়োজিত (engaged) রাখে। আন্তরিকতা নিয়ে শিক্ষার্থী সহজে শিখতে পারে। এই তিনটি সূত্রের সমবায়ে উদ্ভূত হয়েছে স্বয়ং-শিক্ষণ (self-instruction) এবং স্বয়ং অভীক্ষার বিষয়বস্তু (self-testing meterials)।

প্রোগ্রাম সাধারণতঃ পুস্তকের আকারে অথবা মেসিনের আকারে হতে পারে। পুস্তকে শিখনের জন্য বক্তব্য (statement), প্রশ্ন (question) এবং তার সঠিক উত্তর (correct response) দেওয়া থাকে। শিক্ষার্থী-প্রদত্ত উত্তরটি ঠিক হল কি না তা এই সঠিক উত্তর দেখে যাচাই (check) করা হয়। প্রোগ্রামের সাজসরঞ্জামগুলিকে ছোট বাক্সের ভিতর সংরক্ষণ করলে এটি একটি সরল মেসিনের আকার ধারণ করে। তখন এটিকে শিক্ষা-মেসিন (Teaching machine) বলা হয়। আধুনিক গবেষণার ফলে এই সরল মেসিনটিকে অনেক জটিল অথচ শিখন সহায়ক করা হয়েছে। এই মেসিনের মধ্যে প্রোগ্রাম পুস্তক (programmed text), টেপরেকর্ডার, নানা ধরনের ফিল্ম ইত্যাদি সাজিয়ে ইলেকট্রনিক (Electronic) যন্ত্রের সাহায্যে বোতাম টিপে চালনা করা হয়।

প্রোগ্রামের জন্য নির্বাচিত বিষয়বস্তুকে যুক্তির ভিত্তিতে (logically) সংগঠন করা হয়। সংগঠনের একটি ধাপের (step) সঙ্গে পরবর্তী ধাপের অর্থপূর্ণ ও ধারাগত সম্পর্ক থাকে। প্রতিটি ধাপকে শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞানের ভাষায় ফ্রেম (Frame) বলা হয়।

প্রতিটি ফ্রেমের মধ্যে কিছু তথ্য দেওয়া থাকে। তথ্য থেকে যেসব প্রশ্ন বা সমস্যা উদ্ভূত হয় সেগুলি শিক্ষার্থীরা সমাধান করে। সমাধানকে বলা হয় শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া (response)। শিক্ষার্থীব প্রতিক্রিয়া শুদ্ধ হল কি না তা যাচাই (check) করার জন্য প্রোগ্রামের শেষদিকে বিশুদ্ধ প্রতিক্রিয়া (correct response) দেওয়া থাকে। শিক্ষার্থীর উত্তর বা প্রতিক্রিয়া শুদ্ধ হলে সে নতুন ও পরবর্তী ফ্রেম অনুশীলন করে।

প্রোগ্রামের ফ্রেম তৈরি করা খুবই বুদ্ধি ও চিন্তাপ্রসূতকর্ম। প্রোগ্রাম সংগঠনের পূর্বে শিক্ষার লক্ষ্য ঠিক করে নিতে হয়। লক্ষ্য নির্ধারণেরমৌলিক-

উপায় হল শিক্ষার্থী কি জানতে চায় অথবা শিক্ষার্থী কতটুকু জানতে সমর্থ সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা। নির্ধারিত লক্ষ্যকে ভিত্তি করে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে যুক্তিপূর্ণ উপায়ে ধাপ (step) বা ফ্রেমের (Frame) অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। ফ্রেমের ভাষা হবে শিক্ষার্থীর সচেষ্টায় জানবার বা বুঝবার অনুকূল।

প্রতিটি ফ্রেমের মূল শক্তি হল উদ্দীপনা ও প্রতিক্রিয়া (Stimulus and response)। প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থী একটা বিষয় সঠিকভাবে শিখবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বিষয় জানবার জন্য সে স্বাভাবিকভাবে অনুপ্রাণিত হবে। প্রেষণাই (motivation) তার শিক্ষাকে গতিশীল করবে।

প্রোগ্রামভিত্তিক পদ্ধতির **সুবিধাগুলি** (Advantages) হল: প্রোগ্রাম পদ্ধতি একান্তভাবে কর্মভিত্তিক প্রক্রিয়া। এখানে শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষভাবে স্বয়ং কর্ম সম্পাদন করে ও শিক্ষালাভ করে।

একটি ফ্রেমের তথ্য ও প্রশ্ন জানার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে প্রতিক্রিয়া জাগে, সে প্রশ্নের সমাধান করে। উত্তরটি ঠিক হল কিনা তাও সে সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারে। তাই তার মনে শিখবার আগ্রহ বেড়ে যায়। পরীক্ষকরা এরূপ স্বয়ং-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর আচরণমূলক পরিবর্তনও মূল্যায়ন করতে পারেন।

অনেক সময় শিক্ষক কর্তৃক উপস্থাপিত বিষয় শিক্ষার্থীরা শিখতে পারে না। উপস্থাপন প্রক্রিয়ার ত্রুটিই হল এর মূল কারণ। প্রোগ্রাম রীতিতে বিষয়বস্তু উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকে না। তাই তারা ধীরে ধীরে বিষয়বস্তুর পরিমাণ ও দুরূহতা অনুসারে শিক্ষালাভ করতে পারে। তবে প্রোগ্রাম পদ্ধতির **সীমাবদ্ধতা** (limitations) নিতান্ত কম নয়। কারণ:

প্রথমতঃ, প্রোগ্রাম তৈরি করা, শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুসারে বিষয়বস্তুর স্তরবিভাগ (grading) ও সংগঠন (organisation) করা অতি দুরূহ কর্ম। বিশেষজ্ঞ ভিন্ন প্রোগ্রাম ও ফ্রেম তৈরি করা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রশ্ন তৈরির সময় যেমন অনুকূল ভাষা প্রয়োজন তেমনি প্রশ্নের সমাধানের জন্য ভাষা প্রয়োজন। আলোচ্য প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষাগত ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয়তঃ, প্রোগ্রাম প্রক্রিয়া ব্যয়সাপেক্ষ। প্রোগ্রাম তৈরি করা, তার মুদ্রণ এবং বহু সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করা ব্যয়বহুল কর্ম। তাছাড়া প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য আধুনিক জটিল ইলেকট্রনিক মেসিন ব্যবহারের ব্যবস্থা করা কোনক্রমে এদেশের বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়।

শিক্ষোপকরণ ও প্রোগ্রাম-এর প্রভেদ: আমরা সাধারণ শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে দৃষ্টি সংক্রান্ত, শ্রবণ সংক্রান্ত, দৃষ্টি-শ্রবণ সংক্রান্ত নানাবিধ উপকরণ ব্যবহার করি। উপকরণগুলি বিষয়বস্তুর উপস্থাপনাকে সুস্পষ্ট ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলে। উপকরণ কখনও শুধু মৌখিক পদ্ধতির সহায়ক হয় কখনও বা এগুলি কর্মভিত্তিক পাঠদানে সুযোগ সৃষ্টি করে। শিক্ষোপকরণ পরিপূর্ণ শিক্ষাকর্মকে রূপায়িত করে না। পক্ষান্তরে প্রোগ্রাম দ্বারা (১) বিষয়বস্তুর উপস্থাপন, (২) শিক্ষার্থীর অনুশীলন, (৩) ফলশ্রুতি বিচার দ্বারা শিক্ষা-চক্রটির (Education-cycle) পরিপূর্ণ আবর্তন সম্ভব হয়ে ওঠে। তাই প্রোগ্রাম পদ্ধতি হল স্বয়ং-শিক্ষণের প্রয়োজনে স্বয়ং সম্পূর্ণ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। ফলে এটি প্রচলিত শিক্ষোপকরণ (Conventional Aids) থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং এটি শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞানের নতুন অবদান। প্রোগ্রামভিত্তিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে বিদ্যালয়ের প্রচলন করতে হলে সরকারী সাহায্যে আমাদের জাতীয় শিক্ষণ ও গবেষণা সংসদকে (NCERT) এগিয়ে আসতে হবে। তাদেরই প্রচেষ্টায় শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে ঐ শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয় পাঠ্যভুক্ত করতে হবে। শিক্ষক যদি ঐ বিষয়ে শিক্ষণ প্রাপ্ত হন এবং বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে তা হলে প্রোগ্রামভিত্তিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে।

সপ্তম অধ্যায়

পরীক্ষা ও অভীক্ষা

[Examinations and Tests]

[**অধ্যায় পরিচয় :** বিদ্যালয়ে বা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের পাঠদান এবং শিক্ষার্থীর পাঠানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাকর্ম সমাপ্ত হয় না। শিক্ষার্থীরা কি শিখলো, কতটুকু শিখলো, শিক্ষালাভের দ্বারা তাদের আচার-আচরণে কোন পরিবর্তন হল কি না ইত্যাদি বিষয় পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। তাই পরীক্ষা ও অভীক্ষা শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। এই অধ্যায়ে পরীক্ষা ও অভীক্ষার নানা দিক পর্যালোচনা করা হল।

আবার পরীক্ষা ও অভীক্ষা সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট। তাই শিক্ষায় প্রয়োজন হল পরীক্ষা নয়, মূল্যায়ন। মূল্যায়ন সার্থক মূল্যায়নের উপায়, সর্বাত্মক লিপি, শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি (progress) ও উন্নীতকরণ (promotion) এবং শিক্ষকের শিক্ষণ-যোগ্যতার পরিমাপ প্রভৃতি পরীক্ষা ও মূল্যায়নের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলিও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হল।]

১। পরীক্ষার ইতিবৃত্ত (History of Examinations) :

স্বরূপ ও প্রকৃতি যেমনই হোক, পরীক্ষা-ব্যবস্থা সুদূর অতীতেও প্রচলিত ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহামানবেরা তাদের সমগোত্রীয়দের যোগ্যতা পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করত। এক্ষেত্রে তাদের শিকার সন্ধানযোগ্যতাই ছিল বড় কথা। আবার দ্বন্দ্বযুদ্ধে অস্ত্র পরিচালনার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় যোদ্ধাদের যোগ্যতা বিচার করা হত। এক্ষেত্রেও শারীরিক শক্তি ও অস্ত্রবিদ্যার নিপুণতাই ছিল যোগ্যতার মাপকাঠি। রামায়ণ-মহাভারতের যুগে অস্ত্র পরীক্ষার প্রচলন ছিল। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, দ্রোণাচার্যের তত্ত্বাবধানে কুরু ও পাণ্ডবদের অস্ত্র পরীক্ষা, পবিত্রতা বিচারে সীতার অগ্নি-পরীক্ষা প্রভৃতি সে-যুগের যোগ্যতা ও গুণাগুণ নিরূপণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রাচীন সাহিত্য থেকে আবার মৌখিক (Oral) পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়। এরূপ প্রথার প্রথম দৃষ্টান্ত পাই ওল্ড টেষ্টামেণ্টে। Gileadite জর্ডান নদী অতিক্রমে ইচ্ছুক তাঁর শত্রু Ephraimites-দের নিধনের জন্য মৌখিক পরীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পরীক্ষার শর্ত হিসেবে শত্রুদেরকে 'Shibboleth' শব্দটি উচ্চারণ করতে বলা

হয়েছিল। যাদের উচ্চারণ বিশুদ্ধ না হয়ে Sibboleth-এর ন্যায় ভুল উচ্চারণ হল, তারা শত্রুরূপে গণ্য হল। কারণ, শত্রুপক্ষ উপজাতিরা শব্দটির বিশুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারত না। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার Ephraimites-কে হত্যা করা হয়।

লিখিত (*Written*) পরীক্ষা পদ্ধতি অতি আধুনিক বলে মনে হয়। কিন্তু সূত্র সন্ধানে জানা যায়, প্রাচীনকালেও কোন কোন দেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কুয়ো (*Ping Wen Kuo*) তাঁর Chinese System of Public Examination বইতে লিখিত পরীক্ষার বিষয় উল্লেখ করেছেন। প্রায় দু-হাজার বছর পূর্বেও চীনের মহামতি শান (*Shun*) তাঁর কর্মচারীদের যোগ্যতা পরিমাপের জন্য লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। আর এটাই ছিল চীনাদের জাতীয় রীতি।

ইউরোপ ভূখণ্ডের দেশগুলিতেও এ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত। এই পরীক্ষার সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে সম্মানসূচক পদবী (degree or certificate) প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার বোষ্টন বন্দরে এবং পরে ক্রমশঃ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা প্রচলিত হয়। এ সম্পর্কে হোরেস মান (*Horace Mann*)-এর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ছিলেন মৌখিক পরীক্ষার বিরোধী এবং লিখিত পরীক্ষার পক্ষপাতী।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইংরেজ শিক্ষক রেভাঃ জর্জ ফিসার কৃতকার্যতা পরিমাপক বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করেন। আধুনিক নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (Objective type test) গ্রহণের উপায় উদ্ভাবন করে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম ধন্য হলেন উইলিয়াম ম্যাক কল (*William McCall*)।

প্রাচীন ভারতে প্রচলিত লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রের নিতান্ত অভাব থাকার জন্য সঠিক বিবরণ প্রদান করা যায় না। প্রাচীন ভারতের উল্লেখযোগ্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষা গৃহীত হত। মধ্যযুগের ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। আধুনিক কালে গৃহীত লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতি

ব্রিটিশ শাসনের প্রথমাংশে ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে এদেশে প্রয়োগ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের পরীক্ষা গ্রহণের রীতি ও পদ্ধতি আজ বহুলাংশে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। তবুও এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নয়। মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় বিবর্তনে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ও ক্রমোন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

২। পরীক্ষা ও অভীক্ষার উদ্দেশ্য (Purposes of Examinations and Tests) :

(১) **পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার পরিমাপক।** শিক্ষার্থী একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন বিশেষ পাঠ্যবিষয়ে কতটুকু জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করল তা পরীক্ষার মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। এক একটা শিক্ষাবর্ষ শেষে যেমন এরূপ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তেমনি তার পূর্বেও প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

(২) **পরীক্ষা শিক্ষার্থীকে উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ায় সাহায্য করে।** পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে শিক্ষার্থীকে এক শ্রেণী থেকে পরবর্তী উচ্চ শ্রেণীতে ভর্তি বা উন্নীত করা হয়। সুতরাং পরীক্ষা হল শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষের পরিসমাপ্তি পরিমাপক ও উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সহায়ক।

(৩) **পরীক্ষা হল বিদ্যালয় ও শিক্ষকের কর্মসাফল্যের পরিমাপক।** পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীর সাফল্য বিচার করা হয়। আবার এই বিচারের দ্বারা পরোক্ষভাবে শিক্ষকের কর্ম সাফল্যের পরিমাপও করা যায়। কারণ শিক্ষকের পাঠদান প্রক্রিয়ার ওপর শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফল নির্ভর করে। তাই কোন বিদ্যালয়ের কোন শ্রেণীবিশেষের শিক্ষার্থীরা যে বিষয়ের (Subject) পরীক্ষায় সুফল অর্জন করে সেই বিষয়-শিক্ষক (Subject Teacher) সুনাম অর্জন করেন। আবার বিদ্যালয়ে সামগ্রিক পরীক্ষার (যেমন, বার্ষিক শেষ পরীক্ষা) ওপর বিদ্যালয়ের সুনাম নির্ভর করে। একসময় পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সরকারী অনুদান (grant) দেওয়া হত। আজও সরকারী অনুমোদন প্রদানের সময় বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করা হয়।

(৪) **পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের ত্রুটি নির্ণয়ে সাহায্য করে।** পরীক্ষার ফলাফল লক্ষ্য করে শিক্ষকরা যেমন শিক্ষার্থীর ত্রুটি দূরীকরণে তৎপর হন

তেমনি মাতাপিতা ও অভিভাবকরা স্ব-স্ব সন্তানদের উন্নতির জন্য মনোযোগ দিতে পারেন। এক কথায় পরবর্তী পরীক্ষায় যাতে শিক্ষার্থী তার ত্রুটি দূর করতে পারে সেজন্যে শিক্ষক ও অভিভাবক সকলেই চেষ্টা করার সুযোগ পান। তাই পরীক্ষা হল শিক্ষার্থীর দুর্বলতা বা ত্রুটির স্বরূপ নির্ণয়ের উপায় (means for diagnosis)।

(৫) **পরীক্ষা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কৃতকার্যতার দিশারী।** পরীক্ষার ফলাফল দেখে অনেক সময় বিচার করা যায় শিক্ষার্থীর প্রবণতা কোন দিকে। সেই অনুসারে শিক্ষালাভে শিক্ষার্থীকে পরিচালিত করা যায়। বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল বিচার করে বলা যায় ডিগ্রী স্তরে শিক্ষার্থী কি নিয়ে পড়াশুনা করবে বা তার যোগ্যতা ও প্রবণতার গতি কোন্‌দিকে—ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এরূপ ইঙ্গিত দেওয়াকে বলা হয় পূর্বাভাস (Prognosis)। পরীক্ষা-ব্যবস্থা এরূপ সাফল্য নিরূপণের সুযোগ সৃষ্টি করে।

(৬) **পরীক্ষা হল শিক্ষার্থীর ঈপ্সিত গুণ ও ব্যক্তিত্বের পরিমাপক।** পরীক্ষার দ্বারা শুধু যে শিক্ষার্থীর অধীত বিদ্যার পরিমাপ করা যায় তা নয়, এর দ্বারা তার মানসিকতা, ধৈর্য, অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণের বিকাশ হল কি না তাও জানা যায়। প্রচলিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থীর এসব গুণ অর্জন করা প্রয়োজন। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর প্রেষণা, প্রবণতা, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি পৃথক পৃথক ভাবে পরীক্ষা করার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। বিশেষ বিশেষ পেশার ক্ষেত্রেও এ ধরনের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

(৭) **পরীক্ষা সুপরিচালনার সহায়ক।** পরীক্ষার ফলাফল বিচার করে শিক্ষার্থীর অধীত জ্ঞানের ত্রুটি ও দুর্বলতা যেমন নির্ণয় করা (diagnosis) যায় তেমনি তার ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করে আরোগ্য সম্ভাবনার (Prognosis) ইঙ্গিত দেওয়াও যেতে পারে। সুতরাং পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীর আগামী দিনের পেশা, বৃত্তি, বা শিক্ষা কি হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া যায়। তাই কেণ্ডাল (*Kendall*) প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌রা বলেন, সুপরিচালনায় সাহায্য করাই পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

(৮) **পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিন্যাসে ও শিক্ষার নির্দিষ্ট মান রক্ষার সহায়ক।** প্রত্যেক দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট। আবার বিভিন্ন

বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকেন। পরীক্ষা-ব্যবস্থা আছে বলেই বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষার্থীর শিক্ষার মানের সমতা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। আবার পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের শ্রেণী বিন্যাস করা ও এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করাও সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া পরীক্ষার ফলাফলের বিচারে একই শ্রেণীকে ক, খ, গ ইত্যাদি বিভাগ করা এবং শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে।

(৯) **পরীক্ষা প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনে সাহায্য করে**। সীমিত আসনযুক্ত চাকরির ক্ষেত্রে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য বহু প্রার্থীর মধ্যে নির্বাচনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এরূপ নির্বাচন কর্মে সাহায্য করে।

(১০) **অবশেষে বলা যায়, পরীক্ষা-ব্যবস্থা শিক্ষা-প্রচেষ্টার উদ্দীপক**। পরীক্ষায় কৃতকার্যতার জন্য শিক্ষার্থীরা শিক্ষাকর্মে কঠিন পরিশ্রমে উৎসাহিত হয়। সাপ্তাহিক, মাসিক, ষান্মাসিক, বার্ষিক—প্রতিটি পরীক্ষায় ভাল ফল পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে। বার্ষিক পরীক্ষার পূর্বে এরূপ চেষ্টার বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। তাই বলা হয়, পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা করার জন্য উদ্বোধকের কাজ করে। পরীক্ষা ব্যবস্থার এই উদ্দীপক-ধর্মিতা মোটেই কাম্য নয়, তবুও এ ব্যবস্থা আজও প্রচলিত। কারণ এর জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীকে সমাপ্ত করতে হবে, এ ধরনের চাপ বা তাড়না শিক্ষার্থী অনুভব করে। শিক্ষার্থীর বিক্ষিপ্ত মনের ওপর পরীক্ষা ব্যবস্থা এক ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control) রূপে কাজ করে। অবশ্য এটা হল কৃত্রিম উদ্‌বোধক রূপে কাজ করে (artificial incentive), স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করে না।

৩। সার্থক পরীক্ষার লক্ষণ (Criteria of a good Examination) ঃ

সার্থক পরীক্ষার জন্য যে লক্ষণগুলি প্রণিধানযোগ্য তা হল :

(১) **নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity)** ঃ পরীক্ষা পদ্ধতি একটা মাপকাঠি। মাপকাঠি হবে পরিমাপকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-অভিরুচি, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের উর্ধ্বে। পরিমাপক যন্ত্রটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ হয়ে সকলের প্রতি সমান বিচার করে

পরিমাপ করবে। সার্থক পরীক্ষা পদ্ধতিতে ব্যক্তিকর্তার (Subjectivity) কোন স্থান থাকে না।

(২) **নির্ভরযোগ্যতা** (Reliability) **:** সার্থক পরীক্ষা-পদ্ধতি হবে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ মাপকাঠি। তাই এর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গুণ হল নির্ভরযোগ্যতা। যেমন, এক কিলো ওজনের মাছ সকল দাঁড়িপাল্লায় এক কিলো হবে। তা না হলে ওজন করার যন্ত্রটির নির্ভরযোগ্যতা থাকে না। পরীক্ষার উত্তরপত্রের মান যদি বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে পরীক্ষারূপ পরিমাপক যন্ত্রটি নির্ভরযোগ্য নয় বলেই প্রতীয়মান হয়। তাই উত্তম পরীক্ষা-পদ্ধতির একটি বিশেষ গুণ হল তার নির্ভরযোগ্যতা।

(৩) **যথার্থ্যতা** (Validity) **:** সার্থক পরীক্ষাব অন্যতম গুণ হল তার যাথার্থ্যতা বা সঠিকতা। যে বিশেষ বিষয় (শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল, ভাষা ইত্যাদির যে কোনটি) পরিমাপের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, শুধু তাই যদি পরিমাপ করতে পারে তবে সেরূপ পরীক্ষার যথার্থ্যতা অক্ষুণ্ণ থাকে। সার্থক পরীক্ষার প্রশ্ন হবে বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। প্রশ্নের উত্তর বিচার কবার সময় সেই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞান বিচারের সময় শিক্ষার্থীর হস্তাক্ষর, যুক্তিধর্মিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয় বিচাব করতে গেলে পরীক্ষার যথার্থ্যতা অক্ষুণ্ণ থাকে না। সার্থক পরীক্ষার বিশেষ লক্ষ হল এই যথার্থ্যতা বা সঠিকতা।

(৪) **প্রয়োগশীলতা** (Administrability) **:** সার্থক পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা হবে সহজ ও প্রয়োগানুকূল। প্রথমতঃ, প্রশ্নপত্রে পরীক্ষক কি চান তা হবে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। পরীক্ষার্থী যেন তা সহজে অনুধাবন করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, উত্তরপত্রে নিরপেক্ষভাবে সাফল্যাঙ্ক প্রদান করার (scoring) ব্যবস্থা বা উপায় থাকবে। তৃতীয়তঃ, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করাও যেন সহজসাধ্য হয়। তবেই পরীক্ষা গ্রহণ করা সহজ হবে।

(৫) **পরিমিতত্তা** (Economy) **:** সার্থক পরীক্ষা-ব্যবস্থাপনার অন্যতম লক্ষণ হল পরিমিতিতা। সময় ও অর্থের মিতব্যয়িতাই হল পরিমিততা। যে ব্যবস্থায় অপরিমিত সময় ও অপর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় হয় না সেটাই সার্থক পরীক্ষা-ব্যবস্থা। উত্তম পরীক্ষায় সাফল্যাঙ্ক নির্দেশ করা সহজ এবং উত্তরপত্রের পরীক্ষার জন্য অযথা সময় ব্যয় হয় না।

(৬) **বাস্তবতা** (Practicability): পরীক্ষা হবে বাস্তবতাভিত্তিক। বাস্তবজীবনে যা যা প্রয়োজন তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলে তবেই সেই পরীক্ষা হবে বাস্তবধর্মী। পরীক্ষায় বাস্তবতা আসে তখনই যখন ব্যবস্থাটি একমাত্র লক্ষণ না হয়ে উপায় (means) হিসেবে গণ্য হয়।

(৭) **নির্দিষ্ট মান** (Norm): সার্থক পরীক্ষার একটা নির্দিষ্ট মান অক্ষুণ্ণ থাকে। নির্দিষ্ট মান বলতে বোঝায় ব্যাখ্যা এবং তুলনা করার সুযোগ। তাই বলা হয়, সার্থক পরীক্ষার একটা গুণ হল তুলনীয়তা (Comparability)। তুলনা ও সংব্যাখ্যানের সুযোগ থাকলে সেই পরীক্ষা নির্দিষ্ট মানবিশিষ্ট হয় এবং সেটাই সার্থক পরীক্ষার লক্ষণ।

(৮) **পর্যায়ক্রম** (Gradation): পরীক্ষা হবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানসম্মত। এক এক বয়সের শিক্ষার্থীর এক এক প্রকার সামর্থ্য, দক্ষতা, গ্রহণ-ক্ষমতা থাকে। শিক্ষার্থীর মানসিকতা ও বয়সের ক্রম অনুসারে সার্থক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচিত ও উত্তর পরীক্ষিত হয়।

৪। পরীক্ষা ও অভীক্ষার পার্থক্য (Distinction between Examinations and Tests):

পরীক্ষা (Examination) এবং অভীক্ষা (Tests) শব্দদ্বয় পরস্পরের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাহ্যত উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও বিদ্যমান। কিন্তু শব্দদ্বয়ের ভাব ও অর্থগত ব্যঞ্জনার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রথমতঃ, পরীক্ষা শব্দটি দ্বারা পদ্ধতি সম্পর্কিত ভাব ধ্বনিত হয়। পক্ষান্তরে অভীক্ষা শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য বিচার করার উপায় (Technique) বা যন্ত্রের (Tools) তাৎপর্য ব্যক্ত করে।

দ্বিতীয়তঃ, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষা হল একটা ব্যাপক ও দীর্ঘায়িত কর্মধারা। শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত সামগ্রিক পাঠ্যসূচীর মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত। পক্ষান্তরে অভীক্ষা হল স্বল্পস্থায়ী বিশেষ উদ্দেশ্যমুখী ব্যবস্থা। এ হল এটা পাঠ্যসূচীর একটা নির্দিষ্ট অংশের সঙ্গে জড়িত জ্ঞানের মূল্য-নিরূপণের ব্যবস্থা। মূলতঃ, অভীক্ষা হল পরীক্ষার একটা অংশ মাত্র।

তৃতীয়তঃ, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর লব্ধশিক্ষার স্বীকৃতিস্বরূপ অভিজ্ঞানপত্র (Certificate) দেওয়া অথবা পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীতকরণের (Promotion) জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। আর অভীক্ষা ঠিক এই উদ্দেশ্যে গৃহীত হয় না। শ্রেণীকক্ষে পাঠের অগ্রগতি নির্ধারণের জন্য সাময়িক অভীক্ষা গৃহীত হয়। তবে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীতকরণের সময় অভীক্ষার ফলাফলও বিবেচিত হতে পারে।

চতুর্থতঃ, স্কুল-কলেজের পূর্বনির্ধারিত সময় তালিকার অন্তর্ভুক্ত কর্ম হল পরীক্ষা। ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক বা চূড়ান্ত পরীক্ষা এরূপ পূর্ব-পরিকল্পিত এবং সঠিকভাবে বিজ্ঞাপিত কর্মধারার শ্রেণীভুক্ত। আর অভীক্ষার জন্যে বিশেষভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের প্রয়োজন হয় না এবং এটা প্রতিষ্ঠানের সময় তালিকার বহির্ভূত বিষয়ও হতে পারে।

অবশেষে বলা যায়, পরীক্ষা শব্দটির মধ্যে ব্যাপকতার ভাব বিদ্যমান থাকায় বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাগত মান নিরূপণের জন্য ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে কোন একটা বিশেষ কার্যধারার (Course) জন্য শিক্ষার্থী ও নির্দিষ্ট পদে কর্মপ্রার্থী নির্বাচনের সময় অভীক্ষা (Test) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন, ভর্তি-অভীক্ষা, নির্বাচনী অভীক্ষা (Selection Test) ইত্যাদি। সুতরাং পরীক্ষা ও অভীক্ষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তবে বাংলা ভাষায় অভীক্ষা শব্দ অপেক্ষা পরীক্ষা শব্দের ব্যবহার বেশী। তাই অনেক সময় Test শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'পরীক্ষা' শব্দের ব্যবহার করা হয়।

৫। প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতি (Examination System in Vogue) ঃ

পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা দুপ্রকারের—যথা, **আভ্যন্তরীণ** (Internal) ও **বহির্বিভাগীয়** (External)। প্রতিটি বিদ্যালয়েই আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা গৃহীত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বাৎসরিক পরীক্ষা ব্যবস্থা করে থাকেন এবং এটাই হল আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-গ্রহণে অগ্রগতি হচ্ছে কি না, বা শিক্ষকের শিক্ষাদান এগিয়ে চলছে কি না, এসব নির্ণয় করার জন্যই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষকগণ

পরীক্ষার প্রকার ভেদ

এরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। বহির্বিভাগীয় পরীক্ষা (External Examination) হল বিদ্যালয়ের বাইরের কোন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ রাষ্ট্র, বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপর্ষৎ কর্তৃক রচিত প্রশ্নপত্রের দ্বারা শিক্ষার্থীর যোগ্যতা নির্ণয়ের ব্যবস্থাপনা। এই বহির্বিভাগীয় পরীক্ষাই **সাধারণী পরীক্ষা** (Public Examination) নামে অভিহিত হয়েছে। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার বিশেষ কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই। সাধারণী বা বহির্বিভাগীয় পরীক্ষাকেই রাষ্ট্র বা সমাজ স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর যোগ্যতার নিদর্শনস্বরূপ অভিজ্ঞানপত্র (certificate) বা উপাধি (degree) দেওয়া হয়। এগুলিরই সামাজিক মান (social standard) রয়েছে।

পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষাকে আবার (ক) **যোগ্যতা-বৃদ্ধির অভীক্ষা** (Qualifying Test) বা **ভরতির পরীক্ষা** (Admission Test) এবং (খ) **প্রতিযোগিতামূলক** (Competitive) **পরীক্ষা**—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। (ক) যোগ্যতা-বৃদ্ধির পরীক্ষা বলতে বিদ্যালয় বা অন্য কোন শিক্ষাসংস্থা কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষা বোঝায়। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ, আর্ট কলেজ, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ছাত্র নির্বাচন বা ভরতির প্রয়োজনে এরূপ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। আবার এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বৃত্তি দেওয়ার ব্যাপারেও এরূপ পরীক্ষা-গ্রহণের রীতি প্রচলিত আছে। (খ) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বলতে শিক্ষার্থীর বৃত্তিগত (Vocational) যোগ্যতার পরিমাপ বোঝায়। যাঁরা শিক্ষার্থীকে কোন কাজ, বৃত্তি বা পেশাতে নিয়োগ করবেন তাঁরাই তাঁদের উদ্দেশ্য অনুসারে প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা গ্রহণ করেন। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইত্যাদি সংস্থা এই ধরনের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে থাকেন।

সময়ের বিচারে পরীক্ষাকে সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, বার্ষিক প্রভৃতি নামে অভিহিত করা যায়। সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষা প্রকৃত পক্ষে অভীক্ষা নামের যোগ্য। কারণ, পাঠ্যসূচীর কোন এক বা একাধিক অংশের ওপর প্রশ্ন রচনা করে বিষয় শিক্ষকরাই (Subject Teacher) এরূপ অভীক্ষার ব্যবস্থা করেন। তবে এসব অভীক্ষা মূলতঃ বিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতিরূপে নিয়মিত হয়।

প্রশ্নের উত্তরদানের বৈশিষ্ট্য বিচারে পরীক্ষাকে আবার মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(ক) **মৌখিক অভীক্ষা** (Oral test), (খ) **লিখিত পরীক্ষা** (Written Examination) এবং (গ) **ব্যবহারিক পরীক্ষা** (Practical Examination)।

(ক) **মৌখিক অভীক্ষা** (Oral Test)**:** মৌখিক অভীক্ষা বা পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা অতি প্রাচীন। কোন বিশেষ বিশেষ বিষয়ে লব্ধজ্ঞানের সুস্পষ্টতা বিচারার্থে ধারাবাহিক প্রশ্নের মাধ্যমে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক স্তরের নিম্নশ্রেণীতে আজও এই ধরনের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের Viva-Voce-কে মৌখিক অভীক্ষার পর্যায়ভুক্ত করা চলে। ব্যক্তিগত বৈষম্যের জন্য সকল শিক্ষার্থী সমানভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। সঙ্কোচ ও শৈথিল্য অনেক সময় শিক্ষার্থীর ভাবপ্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে। তবে বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে আভ্যন্তরীণ অভীক্ষাপ্রসঙ্গে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা এবং তার নথিপত্র (Record) সংরক্ষণ করা উচিত। বার্ষিক লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের পাশাপাশি মৌখিক পরীক্ষার ফলশ্রুতিকে বিচার করে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীতকরণ (Promotion) এবং যোগ্যতা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

(খ) **লিখিত পরীক্ষা** (Written Examination)**:** প্রশ্নপত্র রচনা ও উত্তরদানের রীতি ও বৈশিষ্ট্য বিচারে লিখিত পরীক্ষাকে দুটি প্রধান অংশে শ্রেণীবিভক্ত করতে পারি। যথা—(১) **রচনাধর্মী পরীক্ষা** (Essay-type Test) এবং (২) **নৈর্ব্যক্তিক বা বিষয়াত্মক পরীক্ষা** (Objective Test)।

* (১) আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে সাধারণতঃ **রচনাধর্মী পরীক্ষার** প্রচলন সর্বাধিক। এ পরীক্ষায় প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তর হয় দীর্ঘ ও সমালোচনা-মূলক। প্রচলিত আনুষ্ঠানিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ লক্ষ্য করা যায় তা মূলতঃ এই রচনাধর্মী পরীক্ষার ত্রুটি ও দুর্বলতার বিরুদ্ধে।

* (২) রচনাধর্মী পরীক্ষার ত্রুটি দূর করার প্রয়োজনে উদ্ভূত হয়েছে **বিষয়াত্মক অভীক্ষা**। এই বিষয়াত্মক অভীক্ষার প্রচলন সর্বাধুনিক। বর্তমানেও এই পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রশ্নের সংগঠন ও প্রয়োগ সম্পর্কে যথেষ্ট

---

* অংশ দুটির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পরবর্তী দুটি পৃথক অনুচ্ছেদে দেওয়া হল। উপরন্তু আদর্শায়িত অভীক্ষাও সবিস্তারে আলোচিত হল।

গবেষণা চলছে। তাই একে **নতুন ধরনের অভীক্ষাও** (New-type Test) বলা হয়। আবার এগুলির বার বার প্রয়োগের ফলে উদ্ভূত হয়েছে **আদর্শায়িত অভীক্ষা** (Standardised Test)। বলা বাহুল্য, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে **আজও রচনাধর্মী পরীক্ষার প্রভাব অক্ষুণ্ণ আছে।**

(গ) **ব্যবহারিক পরীক্ষা** (Practical Examination) ঃ চিকিৎসা শাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রভৃতি পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া সাধারণ শিক্ষায় (General Education) বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিজ্ঞান, টেকনিক্যাল (Technical) ইত্যাদি কার্যধারায় (Course) ব্যবহারিক পরীক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে। এরূপ পরীক্ষার ক্ষেত্রে কথা ও কাজ—দুয়েরই ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ব্যবহারিক পরীক্ষায় **মৌখিক উত্তর প্রদানের** প্রয়োজন যেমন হয় তেমনি হাতে কাজ করার প্রয়োজন হয়। হাতের কাজ আবার দু'ধরনের হতে পারে; যথা—নির্ধারিত কর্ম-সম্পাদনের প্রক্রিয়া এবং কিছু **লিখন প্রক্রিয়া**। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়টি হল, ব্যবহারিক পরীক্ষায় মৌখিক (Oral Test) এবং লিখিত পরীক্ষার (Written) সমন্বয়ে নির্ধারিত কর্মের বাস্তব প্রক্রিয়াটি (Actual activities) সম্পন্ন হচ্ছে। ব্যবহারিক পরীক্ষার উপযোগিতা আজ সর্বজন স্বীকৃত। আধুনিক যুগে জ্ঞানাশ্রয়ী বিষয় (Knowledge Subject) বা মানবিক বিষয় (Humanities) শিক্ষণ প্রসঙ্গেও ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা প্রচলনের প্রচেষ্টা চলেছে।

৬। প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষা (Conventional Essay-type Examination) ঃ

রচনাধর্মী পরীক্ষার বৈশিষ্ট্য ঃ রচনাধর্মী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীকে যে প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়, তার মধ্যে একাধিক প্রশ্ন থাকে। শিক্ষার্থীরা যথাসম্ভব নিজ-ভাষায় এসব প্রশ্নের জবাব দেয়। প্রশ্নগুলির উত্তর বেশ বড় হয়। সিম্‌স (*Sims*) তাঁর 'The Essay Examination is a Projective Technique' নামক পুস্তকে রচনাধর্মী পরীক্ষা সম্পর্কে বলেন: রচনামূলক প্রশ্নে যে সমস্যাসূচক পরিস্থিতি থাকে শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে তার উত্তর লিখতে পারে। এতে শিক্ষার্থীর মানসিক অভিজ্ঞতার গঠন, গতিশীলতা এবং কর্মধারা

প্রকাশিত হয়। এই আলোচনা থেকে রচনামূলক পরীক্ষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। (ক) প্রশ্নের উত্তর লিখতে শিক্ষার্থীকে স্বীয় মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।[1] (খ) এরূপ প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ ও যথার্থ হিসেবে মাত্র একটি বা একপ্রকার হতে পারে না। এমনকি বিশেষজ্ঞরাও একটি নির্দিষ্ট জবাব ঠিক করে দিতে পারে না।[2] (গ) বিভিন্ন গুণ ও কৃতিত্বের তারতম্য দ্বারা এসব প্রশ্নের জবাব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।[3]

রচনাধর্মী পরীক্ষার গুণ (Merits of Essay-type Examination) ঃ প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষা-পদ্ধতির কতকগুলি গুণকে অস্বীকার করা যায় না। এই পরীক্ষার দ্বারা **প্রথমতঃ**, শিক্ষার্থীর অধীত পাঠ্যসূচী সম্পর্কে জ্ঞানের পরিমাপ করা যায়। **দ্বিতীয়তঃ**, শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে ভাব প্রকাশ করতে ও রচনাশৈলীর পরিচয় দিতে পারে। **তৃতীয়তঃ**, তথ্যের ব্যাখ্যা, যুক্তিসহ বিচার বিশ্লেষণের যথেষ্ট সুযোগ থাকে এই পরীক্ষায়। **চতুর্থতঃ**, পরিচালনার ক্ষেত্রে রচনাধর্মী পরীক্ষার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা আছে। এর প্রশ্নপত্র রচনা করা সহজ এবং মুদ্রণ-খরচ এত কম যে আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলি সহজে ব্যয়ভার বহন করতে পারে। **পঞ্চমতঃ**, পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ওপর একটা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিকভাবে এসে যায়। ফলে পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তোলে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট বিষয় লেখার প্রয়োজনে তারা সময়ানুবর্তী হয়। শিক্ষার্থীরা দ্রুততার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্ম সম্পাদন করতে শেখে। **ষষ্ঠতঃ**, রচনাধর্মী প্রশ্নপত্রের উত্তর দীর্ঘ হওয়ায় নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা অপেক্ষা এরূপ পরীক্ষার অসৎ উপায় অবলম্বনের সুযোগ থাকে কম।

রচনাধর্মী পরীক্ষার ত্রুটি (Demerits of Essay-type Examination) ঃ রচনাধর্মী পরীক্ষায় সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি হল, এতে সার্থক পরীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলির অভাব, যে উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় সেসব উদ্দেশ্যে প্রচলিত

---

1. The Examinee is permitted freedom of response in answering the question.

2. There is no single answer to the question which can be regarded as correct and complete, even by experts.

3. Answer of the questions are characterised by different degree of ability owner. —শিক্ষাতত্ত্ব : রায়, পৃঃ ২৫৮

রচনাধর্মী পরীক্ষায় সফল হয় না। উল্লিখিত আলোচনা অনুসারে রচনাধর্মী পরীক্ষার কিছু কিছু গুণ (Merit) থাকা সত্ত্বেও নিম্নরূপ ত্রুটিগুলি সর্বদা উল্লেখযোগ্য :

(১) **নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব** (Want of Objectivity) : রচনাধর্মী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর উত্তরপত্রে সাফল্যাঙ্ক নির্দেশ করার মধ্যে অত্যন্ত ব্যক্তি-মুখীনতা (subjectivity) বিদ্যমান। পরীক্ষকের বিশ্বাস, ধারণা, পছন্দ-অপছন্দ, রুচি-অভিরুচি, সংস্কার—সর্বোপরি মেজাজ ও মানসিক অবস্থার ওপর এটি অনেকাংশে নির্ভরশীল। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের ব্যক্তিকতার দ্বারা উত্তরপত্র বিচার ও তার ফলাফল প্রভাবিত হয়। আবার একজন শিক্ষক একই উত্তরপত্র ভিন্ন ভিন্ন সময় ও অবস্থায় পরীক্ষা করলে সাফল্যাঙ্ক পরিবর্তিত হয়। সুতরাং রচনাধর্মী পরীক্ষায় ব্যক্তিকতার প্রভাব খুব বেশী।

(২) **নির্ভরযোগ্যতার অভাব** (Want of reliability) : পরীক্ষা ব্যবস্থা নৈর্ব্যক্তিকতার অভাবে স্বাভাবিকভাবে নির্ভরযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। এক কিলো ওজনের দ্রব্য সকল প্রকার পরিমাপক যন্ত্রে এক কিলোই হবে। পরীক্ষা ব্যবস্থাও একপ্রকার পরিমাপক যন্ত্র। কিন্তু রচনাধর্মী পরীক্ষা নির্ভর-যোগ্য পরিমাপক নয়। কারণ—(১) একই বিষয়ে দুবার পরীক্ষা দিলে শিক্ষার্থী একই প্রকার উত্তর দিতে পারে না। (২) একই উত্তর পত্র একজন পরীক্ষক একাধিকবার পরীক্ষা করলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সাফল্যাঙ্ক নির্ণীত হয়। (৩) একই উত্তর পত্রে দু-জন পরীক্ষকের কাছে দু-রকম সাফল্যাঙ্ক লাভ করে। (৪) বিভিন্ন পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর সাফল্য পরিমাপের ভিন্ন ভিন্ন মান (standard) প্রয়োগ করেন। এরূপ **নির্ভরযোগ্যতার অভাবের কারণ হল** :

প্রথমতঃ, পরীক্ষা প্রস্তুতি, উত্তর লিখন ও আনুসঙ্গিক ক্রিয়াদি শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। সময় ও অবস্থার ভিন্নতা অনুসারে পরীক্ষা-ফলের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষকের উত্তরপত্র পরীক্ষার মান নির্ভর করে তাঁর শারীরিক, মানসিক ও আনুসঙ্গিক অবস্থার ওপর।

তৃতীয়তঃ, সকল পরীক্ষকের মেজাজ, রুচি, সংস্কার, বিষয়সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতা ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য থাকায় উত্তরপত্র পরীক্ষা করার স্বরূপ ও প্রকৃতি এক নয়।

(৩) **প্রয়োগশীলতার অভাব** (Want of Administrability) : প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষায় প্রয়োগশীলতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। **প্রথমতঃ,** প্রশ্নপত্রের মধ্যে পরীক্ষক কতটুকু জবাব চান বা একটা প্রশ্নের উত্তর লিখতে পরীক্ষার্থী কোন্ কোন্ বিষয়াংশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করবে তার সঠিক কোন ইঙ্গিত থাকে না। **দ্বিতীয়তঃ,** সঠিক নির্দেশনাব ত্রুটির জন্য উত্তরপত্রে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাফল্যাঙ্ক দেবার (Scoring) কোন সঠিক ব্যবস্থা নেই। এটা নিতান্ত ব্যক্তিসাপেক্ষ ব্যাপার।

(৪) **পরিমিততার অভাব** (Want of Economy) : রচনাধর্মী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা থেকে ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত যথেষ্ট সময় ব্যয় হয়। পক্ষান্তরে এরূপ পবীক্ষা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। যথেষ্ট সময় দেওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর লেখার সময়ের অভাববোধ করে। তারা মনে করে, আর একটু সময় পেলে আরও কিছু উত্তর লেখা সম্ভব হত। সুতরাং এ পরীক্ষা-ব্যবস্থায় পরিমিততার অভাব লক্ষ্য করা যায়।

(৫) **নির্দিষ্ট মানের অভাব** (Want of Norm) : রচনাধর্মী পরীক্ষাতে কোন নির্দিষ্ট মান (norm) নেই। পরীক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, রচনাধর্মী পরীক্ষার উত্তরপত্র বিচারে পরীক্ষকদের কোন নির্দিষ্ট মান নেই। ১৯২১ সালে শিক্ষাবিদ্ উড (*Wood*) কতকগুলি উত্তরপত্র ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষা করে ৫০ অঙ্কের পার্থক্য লক্ষ্য করেন। সর্বোচ্চ সাফল্যাঙ্ক ৯০% এবং সর্বনিম্ন সাফল্যাঙ্ক হল ৪০%। ১৯৫২ সালে মিঃ টিস (*Teys*) একই প্রকারে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, দুজন পরীক্ষক একই উত্তরপত্রে যথাক্রমে ৫০% এবং ৭৫% সাফল্যাঙ্ক দিয়েছেন, একই প্রকারে আর একখানা খাতায় ঐ দুজন পরীক্ষক যথাক্রমে ৮০% এবং ৬০% দিয়েছেন। ভ্যালেন্টাইন এবং ইমেট (*Vallentine & Emmet*) দেখেছেন, ১৯ মাস পূর্বে পরীক্ষিত কয়েকখানি উত্তরপত্র ১৪ জন পরীক্ষককে পুনরায় পরীক্ষা করতে বলায় একজন মাত্র পূর্ব-প্রদত্ত সাফল্যাঙ্ক অপরিবর্তিত রেখে ছিলেন। আর ১৩ জন পরীক্ষক তাদের পূর্বমত পরিবর্তন করে নতুন সাফল্যাঙ্ক বসালেন। এরূপ পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে, পরীক্ষকের রুচি, পাণ্ডিত্য, সংস্কার, শারীরিক, মানসিক ও আনুসঙ্গিক অবস্থার বৈষম্যের জন্য শিক্ষার্থীর উত্তরপত্রের প্রাপ্তমূল্যের পার্থক্য হয়।

আবার তুলনা ও ব্যাখ্যার দিক থেকে বিচার করে বলা যায়, রচনাধর্মী পরীক্ষার কোন নির্দিষ্ট মান নেই। কারণ এরূপ পরীক্ষার ফলাফলের যথাযথ ব্যাখ্যা ও তুলনা করার কোন অবকাশ নেই।

(৬) অবাঞ্ছনীয় প্রতিযোগিতাকে প্রশ্রয় দেয় (It brings Undesired or Unhealthy Competition)**ঃ** শিক্ষা হল শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্ছনীয় গুণ বিকাশের সহায়ক। কিন্তু রচনাধর্মী পরীক্ষা সুস্থ শিক্ষাপরিবেশের পরিবর্তে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, হীনমন্যতা, অহঙ্কার প্রভৃতি অবাঞ্ছনীয় বৃত্তির বিকাশসাধনের সহায়ক হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, এ পরীক্ষা শিক্ষাকে পরীক্ষামুখী করে তোলে। পরীক্ষার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার জন্য পরীক্ষায়-উত্তীর্ণ হওয়ার তাগিদে শিক্ষার্থীরা অসৎ উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়।

(৭) কতকগুলি বিশেষ ত্রুটি (Some special short-comings)**ঃ** উপরোক্ত ত্রুটিগুলি ছাড়াও রচনামূলক পরীক্ষার কয়েকটি বিশেষ ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। **প্রথমতঃ,** এ পরীক্ষা বিষয়বস্তুর বিস্তৃত ক্ষেত্রের জ্ঞান পরীক্ষার পরিবর্তে বিশেষ অভিভাবন (Suggestion) প্রাধান্য লাভ করে। **দ্বিতীয়তঃ,** বহির্বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের হাতে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা থাকায় রচনাধর্মী পরীক্ষা অনমনীয় ও নিয়মসিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। **তৃতীয়তঃ,** রচনাধর্মী পরীক্ষা শিক্ষার্থীর বাঞ্ছনীয় গুণাবলী পরিমাপ করতে পারে না। শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য শিক্ষার্থীরা ভুলে যায় এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া হয়ে পড়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য।

৭। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (Objective Test)ঃ

রচনাধর্মী পরীক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার উদ্ভব। পূর্বেই বলেছি, এই পরীক্ষার প্রশ্নের সংগঠন ও প্রয়োগ সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা চলছে। তাই একে নতুন ধরনের পরীক্ষাও (New-type Test) বলা হয়। সার্থক পরীক্ষার গুণাবলী যাতে বিদ্যমান থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশ্নপত্র রচনা থেকে উত্তরপত্র পরীক্ষা এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশ পর্যন্ত সময় ও অর্থের পরিমিততার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য ব্যবস্থাপনা অপেক্ষা প্রশ্নোত্তরের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ায় এরূপ পরীক্ষাকে অভীক্ষা বলাই যুক্তিযুক্ত।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় প্রশ্নপত্রের ধরন (Kinds of Test) :

(১) **সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা** (Completion Test) : এই জাতীয় প্রশ্নে একটি বাক্যে এক বা একাধিক শব্দ উহ্য থাকে। শিক্ষার্থীকে অনুক্ত স্থানটি প্রকৃত শব্দ দ্বারা পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যেমন—

প্রশ্ন : (১) গীতাঞ্জলী-রচয়িতা হলেন —। (২) শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন — খ্রীষ্টাব্দে। (৩) আগুনের ধর্ম হল —। (৪) — গিরিপথে আকবরের সেনাপতি — সঙ্গে প্রতাপসিংহের ভীষণ যুদ্ধ হয়।

অনেকে বাক্যের শেষে একটি শূন্যস্থান পূরণ করার প্রশ্নকে স্মরণ-অভীক্ষা (Recall-type Test) বলেন। এই বিচারের উক্ত প্রশ্নগুলির পর পর তিনটি প্রশ্ন স্মরণ-অভীক্ষা। তবে স্মরণ-অভীক্ষা প্রশ্নের রূপ নিম্নরূপও হতে পারে :

(২) **স্মৃতিমন্থন** অথবা **প্রশ্নোত্তর অভীক্ষা** (Recall বা Question-Answer-type Test) : এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ স্মৃতির ওপর নির্ভর করতে হয়। যেমন—

প্রথম প্রকৃতির প্রশ্ন—(১) ভারতের মোট জনসংখ্যা কত? (২) ভূ-দান আন্দোলনের প্রবর্তক কে? (৩) ভারতের বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?

দ্বিতীয় প্রকৃতির প্রশ্ন—নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির শতাব্দী পাশাপাশি লিখ : (১) বুদ্ধের জন্ম, (২) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ, (৩) অশোকের অভিষেক, (৪) প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সমর।

(৩) **সত্য-মিথ্যা বিচারমূলক অভীক্ষা** (True-false type) : এই ধরনের প্রশ্নে বিষয়বস্তু সংক্রান্ত কতকগুলি উক্তি, ঘটনার বিবরণ বা মন্তব্য পর পর সাজানো থাকে। এর মধ্যে কতকগুলি ভুল এবং কতকগুলি সত্য বিষয় মেশানো থাকে। পরীক্ষার্থীদের কাজ হল এর ভিতর থেকে সত্য ও মিথ্যা বিষয়গুলি খুঁজে বের করা। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর করার সময় শিক্ষার্থীকে স্মৃতিমন্থন (Recall) এবং প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition)—এই

দুপ্রকার মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়। এরূপ অভীক্ষায় বিষয়গত জ্ঞান ও বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা পরীক্ষা করা যায়।

নিম্নের ভুল উক্তির পাশে 'না' এবং শুদ্ধ উক্তির পাশে 'হাঁ' বসাও:

প্রশ্ন : (ক) ভারতের রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

(খ) পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে।

(গ) 'দিল্লী' শব্দটি সর্বনাম।

(ঘ) সম্রাট আকবর ধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন।

নিম্নের প্রশ্ন দুইটির উত্তর হিসেবে কয়েকটি বিবৃতি আছে। বিবৃতিগুলির যেটি সত্য সেটির পাশে '✓' এবং যেটি মিথ্যা তার পাশে X চিহ্ন বসাও :

প্রশ্ন : (ক) কিভাবে শর্করা শিল্পের উন্নতি হয় ?

উত্তর : (i) ইক্ষু চাষ বৃদ্ধির দ্বারা।

(ii) শ্রমিকের মজুরী হ্রাস করে।

(iii) চিনির রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা।

(iv) বড় বড় শহরে কলকারখানা স্থাপন করে।

প্রশ্ন : (খ) টাটানগরে ইস্পাত শিল্পের উন্নতি হয়েছে ; কারণ—

উত্তর : (i) ঝরিয়া ও সিংভূমে লৌহ খনি আছে।

(ii) পশ্চাৎভূমি খুব উর্বর।

(iii) এখানে নদীর সংখ্যা প্রচুর।

(iv) কয়লা ও লৌহের একত্র সমাবেশ হয়েছে।

এরূপ অভীক্ষাকে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' (Yes or no type) অভীক্ষাও বলা যেতে পারে।

(৪) **সঠিক উত্তর নির্বাচনী অভীক্ষা প্রশ্ন** : (Multiple choice test) : এক্ষেত্রে কয়েকটি প্রস্তাবিত তথ্য থেকে সম্ভাব্য উত্তর, মতামত, ব্যাখ্যা বা কারণ নির্ণয় করতে বলা হয়। তথ্যগুলি চরিত্র-নির্ধারক, সময় নির্ধারক, ঘটনা-নির্ধারক, বিচারমূলক ইত্যাদি হতে পারে।

বন্ধনীর মধ্যেকার সঠিক শব্দ/শব্দগুলির পাশে ✓ চিহ্ন বসাও :

প্রশ্ন : (i) ভারতীয়দের মধ্যে নোবল পুরস্কার পান গান্ধীজী / রবীন্দ্রনাথ / দাদাভাই নৌরজী / নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

(ii) জাপানের রাজধানীর নাম ওসাকা / নাগাসাকি / টোকিও / হোক্কাইডো।

(iii) ভারত অর্থনীতিতে অনগ্রসর, কারণ :

(ক) ভারতের মানুষ অলস।

(খ) ভারতের সরকার অর্থনীতির অগ্রসরতা চান না।

(গ) শিল্প ও কারিগরের অভাব।

(ঘ) ভারতের অর্থনীতি গ্রামীন, তাই অনগ্রসর।

(iv) মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে, কারণ :

(ক) মেয়েদের রাজনৈতিক সম-সুযোগ দান।

(খ) নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য।

(গ) গণতন্ত্রকে সার্থক করার জন্য।

(ঘ) ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য।

(৫) **জোড়মেলানো অভীক্ষা** (Matching test) : এই পদ্ধতিতে দুটি সারিতে ঘটনা ও তারিখ, ঘটনা ও ব্যক্তি, ব্যক্তি ও বিশেষ কর্মের তারিখ, ফলশ্রুতি ইত্যাদি সাজানো থাকে। বাম দিকের সারির সঙ্গে দিকের ডান সারির বিষয়ের সামঞ্জস্য করতে হয়। যেমন,

প্রশ্ন : নিম্নে প্রথম সারিতে ক্রমিক নম্বর সহ বিষয়, দ্বিতীয় সারিতে সামঞ্জস্য পূর্ণ কতকগুলি বিষয় এলোমেলো করে সাজানো আছে। আর মাঝখানে আছে ( ) বন্ধনী। দ্বিতীয় সারির কোন বিষয়ের সঙ্গে প্রথম সারির কোন বিষয়ের সম্পর্ক থাকলে বন্ধনীর মধ্যে তার ক্রমিক নম্বরটি বসাও :

প্রথম সারি		দ্বিতীয় সারি
১। উডের শিক্ষা ডেসপ্যাচ	( )	১৮৫৭ সাল
২। সিপাহী যুদ্ধ	( )	১৮৫৪ সাল
৩। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী	( )	কৌটিল্য
৪। অর্থশাস্ত্রের লেখক	( )	জহরলাল নেহরু
	( )	১৭৪৭ সাল
	( )	বাণভট্ট
	( )	ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

প্রশ্ন : নিম্নের বাম দিকের সারির বিষয়গুলির সঙ্গে মিল রেখে ডান দিকের বিষয়গুলি সাজাও :

(১) পি. সি. সরকার	একজন খেলোয়াড়
(২) গিরিশচন্দ্র ঘোষ	একজন যাদুকর
(৩) আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা
(৪) গান্ধীজীর তিরোধান	১৪৮৩ খ্রীঃ
(৫) ভাস্কো-দা-গামার-ভারতে আগমন	১৭৭৬ খ্রীঃ
(৬) বাবরের জন্ম	১৭০৭ খ্রীঃ
(৭) ঔরংজেবের মৃত্যু	১৯৪৮ খ্রীঃ
	১৪৯৮ খ্রীঃ
	১৫৩০ খ্রীঃ

(৬) **সজ্জিতকরণ অভীক্ষা** (Arrangement type test) **:** এক্ষেত্রে **প্রথমতঃ**, এলোমেলোভাবে উপস্থাপিত ঘটনা বা তারিখকে কালানুক্রমে (Time Sequence) সাজাতে বলা হয়। **দ্বিতীয়তঃ**, বংশতালিকা (Geneological table) তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। **তৃতীয়তঃ**, নির্দিষ্ট (যুগের তারিখ ও ঘটনার তালিকা (Time chart) তৈরি করা অথবা, সময়-রেখা (Time line) অঙ্কন করতে বলা হয়। তাই এরূপ অভীক্ষাকে **যুগজ্ঞান অভীক্ষা** (Time-sense Test) বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন : নিম্নের ঘটনাগুলিকে সময়ানুক্রমে সাজাও :

(ক) সিপাহী যুদ্ধ, (খ) পলাশীর যুদ্ধ, (গ) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (ঘ) আকবরের মৃত্যু, (ঙ) হাণ্টার কমিশন, (চ) কলিকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা।

(৭) **উপমান অভীক্ষা** (Analogy type test) **:** এখানে দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য বর্ণিত থাকে, শিক্ষার্থীকে তৃতীয় বস্তুর সঙ্গে চতুর্থ বস্তুর অনুরূপ সাদৃশ্য খুঁজে নিতে হয়। যেমন—

(ক) পিতা : পুত্র : : শিক্ষক :—

(খ) জল : মাছ : : কেঁচো :—

(গ) দুঃখ : সুখ : : আলো :—

অন্য উপায়ে প্রশ্ন ঃ

(ক) আলোর সঙ্গে অন্ধকার যেমন সম্পর্কিত তেমনি দুঃখের সঙ্গে বন্ধুত্বের / সুখের / মাধুর্যের সেই সম্পর্ক।

(খ) রিক্সার সঙ্গে রিক্সাওয়ালার সম্পর্কের ন্যায় রেলগাড়ীর সঙ্গে বাষ্পীয় ইঞ্জিন / কয়লা / আরোহী / ড্রাইভার-এর সেই সম্পর্ক।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার গুণ (Merits of Objective test) ঃ (১) নতুন পরীক্ষা পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হল, এ-পদ্ধতি বস্তুনিষ্ঠ (objective)। এই প্রক্রিয়ায় পাঠ্যবিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান যাচাই-এর প্রবণতা অধিক। পরীক্ষক বা পরীক্ষার্থীর মানসিক প্রবণতা ও ব্যক্তিত্ব এখানে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না অর্থাৎ ব্যক্তি-সাপেক্ষতা (Subjectivity) থেকে এ পদ্ধতি মুক্ত। সুতরাং এই প্রথায় শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতার মুল্যায়ন যথাসম্ভব বিশুদ্ধ হয়। সেজন্য এই পদ্ধতিকে আমরা নির্ভরযোগ্য (reliable) পদ্ধতি বলে গণ্য করতে পারি।

(২) এই পরীক্ষায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নির্দিষ্ট। অবান্তর বিষয় অবতারণা এখানে সম্ভব নয়। ফলে শিক্ষার্থীর উত্তরের সঠিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। পূর্ব নির্দিষ্ট উত্তরের সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রদত্ত উত্তর এক হলে সাফল্যাঙ্ক যথাযথ প্রদান করা যায়। সুতরাং এ অভীক্ষার যাথার্থ্যও (Validity) বিদ্যমান।

(৩) প্রশ্নের উত্তর এক বা দু-কথায় অথবা শুধু চিহ্ন বসিয়ে দেওয়া যায়। ফলে অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব হয় এবং পরীক্ষার্থীর পরিশ্রমও লাঘব হয়। তেমনি পরীক্ষকও অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক পরীক্ষাপত্রে (Answer Scripts) সাফল্যাঙ্ক প্রদান করে (Scoring) শ্রম লাঘব করতে পারেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় পরিমিততা (Economy) বিদ্যমান।

(৪) বিষয়াত্মক অভীক্ষার মান অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত (Standerdised) থাকে। তাই এরূপ অভীক্ষায় ফলাফল নিয়ে ব্যাখ্যা (Interpretation) এবং বিভিন্ন পরিক্ষার্থীর পরীক্ষা ফলের তুলনা করাও চলে। মোট কথা এরূপ অভীক্ষায় তুলনীয়তা (comparability) বিদ্যমান।

(৫) এ-অভীক্ষায় পাঠ্যবিষয়ের ওপর ব্যাপকভাবে বহু সংখ্যক উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রশ্ন করা চলে। রচনাধর্মী পরীক্ষার ন্যায় বাছা বাছা কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে এ-পরীক্ষা পাস করা যায় না। বিষয়াত্মক পরীক্ষায় পাস করার জন্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক ও ব্যাপক জ্ঞানার্জন করার প্রয়োজন হয়।

(৬) অভিজ্ঞ পরীক্ষক ছাড়াও যে কোন ব্যক্তি বিষয়াত্মক অভীক্ষার প্রশ্নোত্তর মূল্যায়ন করতে পারেন। কারণ, অনেক সময় প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নের সঙ্গেই দেওয়া থাকে। এ অভীক্ষায় প্রয়োগযোগ্যতা (Administrability) অংশতঃ বিদ্যমান। প্রশ্নপত্রের মধ্যে পরীক্ষক কতটুকু উত্তর চান এবং প্রশ্নের উত্তর লিখতে পরীক্ষার্থী কোন্ কোন্ দিক বিবেচনা করবে তার ইঙ্গিত প্রশ্নপত্রে দেওয়া থাকে।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার ত্রুটি (Demerits of Objective test): নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় সার্থক মূল্যায়ন ব্যবস্থার অধিকাংশ লক্ষণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এর কতকগুলি ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল—

প্রথমতঃ, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ব্যয়বহুল। কারণ, ব্যাপক বিষয়ের ওপর বহু সংখ্যক প্রশ্ন তৈরি করতে হয়। বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রশ্নপত্র রচনা করা দুরূহ। এই অভীক্ষায় প্রশ্নপত্র সুদীর্ঘ হওয়ায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণের খরচ এত বেশী যে আমাদের দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয় তা বহন করতে পারে না। সুতরাং অর্থনৈতিক অন্তরায় সার্থক নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা গ্রহণের পথে বিরাট বাধা। অথচ পরীক্ষার্থীর উত্তরপ্রদান ও পরীক্ষকের খাতা দেখার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের পরিমাণ স্বল্প হলেও অর্থব্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে এ পরীক্ষা ব্যবস্থা মোটেই পরিমিত (Economy) নয়।

দ্বিতীয়তঃ, এ পরীক্ষা প্রথায় শিক্ষার্থীর ভাব, ভাষার নিপুণতা ও রচনা কৌশলের ওপর মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। শুধু বিষয়গত জ্ঞান পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতা এবং গুণ ও দক্ষতা বিকাশের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। এই অভীক্ষার সমালোচনা করে স্যাণ্ডিফোর্ড (*Sandiford*) বলেন: The examiner cannot tell where knowledge stops and guessing begins। পরীক্ষার্থীরা অনেকটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে প্রশ্নের উত্তর লেখে। তাই পরীক্ষার্থীর মৌলিকতার পরিমাপ করা এই অভীক্ষায় সম্ভব হয় না

তৃতীয়তঃ, এই পরীক্ষায় প্রয়োগশীলতার (Administrability) আংশিক অভাব লক্ষ্য করা যায়। কারণ, এ ধরনের পরীক্ষা পরিচালনা করতে প্রচুর কৌশলের প্রয়োজন হয়। অথচ সাধারণ বিদ্যালয়ে সেরূপ অভিজ্ঞ ও কৌশলী পরীক্ষকের সংখ্যা খুবই কম।

চতুর্থতঃ, দু-এক কথায় উত্তর লেখা সম্ভব বলে পরীক্ষার্থীরা পারস্পরিক সাহায্য লাভের সুযোগ অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অসৎ উপায়ে মাত্র কয়েকটি সঠিক উত্তর সংগ্রহ করতে পারলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তাই এই পদ্ধতিতে অসৎ উপায় অবলম্বের প্রবণতা বেশী পরিলক্ষিত হয়।

পঞ্চমতঃ, যে কোন বিষয়াত্মক পরীক্ষায় ফলাফলের ব্যাখ্যা ও তুলনা (Interpretation and Comparability) সম্ভব নয়। একমাত্র আদর্শায়িত অভীক্ষায় (Standardised test) ফলাফলকে ব্যাখ্যা ও অন্যান্য ফলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অথচ সকল প্রকার বিষয়াত্মক প্রশ্নপত্রকে আদর্শায়িত করা শ্রমসাধ্য ও গবেষণা সাপেক্ষ বিষয়।

ষষ্ঠতঃ, বিষয়াত্মক অভীক্ষায় প্রশ্নের উত্তরগুলি অত্যধিক সংক্ষিপ্ত হওয়ায় কোন কোন শিক্ষক উত্তর বলে দেওয়ার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেন না। উপরন্তু পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষক পরীক্ষার পূর্বেই শিক্ষার্থীকে প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। এতে পরীক্ষার কোন উদ্দেশ্যই সার্থক হয় না।

সপ্তমতঃ, বিষয়াত্মক অভীক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীদের ব্যর্থতার কারণ নির্ধারণ করা (diagnosis) যায় না। শিক্ষক বুঝতে পারেন না কেন শিক্ষার্থী ভুল করছে, কোথায় তার শিক্ষাগত ত্রুটি। কারণ, এ পরীক্ষায় বিষয়বস্তুর ওপর শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরীক্ষা করা হয় কিন্তু তার বিচার, বুদ্ধি, যুক্তিশীলতা, রচনাশৈলী এবং অন্যান্য মানবিক বৃত্তি মূল্যায়ন করা হয় না। তাই এর দ্বারা পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ইঙ্গিত করাও (prognosis) সম্ভব নয়।

অষ্টমতঃ, মনস্তত্ত্বের বিচারে বিষয়াত্মক পরীক্ষা অবৈজ্ঞানিক। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের মাধ্যমে সর্বদা, সত্য-মিথ্যা তথ্য, ভুল উক্তি, মিথ্যা উত্তর ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হয়। বার বার এরূপ ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ বিষয়ের পরিচিত হতে হতে

বিষয়গুলির সঙ্গে শিশু-শিক্ষার্থী স্বাভাবিকভাবে পরিচিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাদের বিশ্লেষণ করার শক্তি হ্রাস পায়।

৮। আদর্শায়িত অভীক্ষা (Standardised Test):

পরীক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে তার নির্ভরযোগ্যতার, যাথার্থ্য এবং নৈর্ব্যক্তিকতার ওপর। এর জন্য প্রশ্ন অথবা সমস্যাগুলির সংগঠন ও পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন। তাহলে পরীক্ষার ফলাফলকে যেমন ব্যাখ্যা করা যায় তেমনি একটির সঙ্গে অন্যটির তুলনা করা যায়। ব্যাখ্যা (Interpretation) ও তুলনা (Comparability) হল এই অভীক্ষার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

প্রচলিত পরীক্ষাগুলিতে (এমনকি নতুন অভীক্ষাতেও) এই ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। এসব অভীক্ষার কোন একটি ফলাফলকে অন্যান্য ফলফলের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। যেমন, ধরা যাক্ একটি পরীক্ষার্থী অঙ্কে ৩৫ নম্বর পেয়েছে, তার এই ফলকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? যদি ধরা যায় অঙ্কে মোট নম্বর ছিল ১০০ এবং উত্তীর্ণ হওয়ার ন্যূনতম নম্বর ৩০, তবে বলা যেতে পারে ছেলেটি অঙ্কে মোটামুটি পাশ করেছে, কিন্তু অঙ্কে কাঁচা। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে, এ-ব্যাখ্যা মোটেই সন্তোষজনক নয়। কারণ অঙ্কে পাশ করার ন্যূনতম নম্বরটি খেয়ালখুশীমত দেওয়া হয়েছে। এই তিরিশ সংখ্যাটির সঙ্গে কোন যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যার যোগ নেই। ছাত্রের কৃতিত্ব বা দুর্বলতাকে বিচার করতে গেলে আমাদের আরও কয়েকটি প্রশ্ন করতে হয়। যেমন, এই শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা কত? তারা কে কত পেয়েছে? তাদের প্রাপ্ত নম্বরের গড় (Average) কত? যে ছেলেটি অঙ্কে ৩৫ পেয়েছে সে ঐ গড় নম্বরের উর্ধে বা নিম্নে?—ইত্যাদি প্রশ্ন থেকে যায়। এসব প্রশ্নের সমাধান না করে ছাত্রের ফলকে ব্যাখ্যা করা যায় না এবং নম্বর দান কখনও বিজ্ঞান-সম্মত হতে পারে না।

অতএব অভীক্ষার এমন একটি **সাধারণ মান** (Standard or Norm) নির্ণয় করা প্রয়োজন যার সঙ্গে অভীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরকে তুলনা না করে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। এ-ধরনের মানকে **সর্বসম্মত মান** (Population Norm) বলা হয়। বার বার প্রয়োগ করে একটি অভীক্ষার

প্রতিনিধিমূলক গড় মান স্থির করা হয়। তাই একে **আদর্শায়িত অভীক্ষা** (Standardised Test) নামে অভিহিত করা হয়। এ-ধরনের অভীক্ষায় সহায়করূপে নম্বর দানের জন্যে নানা ধরনের পরিমাপক (Scale) আছে।

কোন বিশেষ অভীক্ষার সাধারণ মান (Norm) স্থির করার উপায় হল: কোন বিশেষ বিষয়ে কোন বিশেষ শ্রেণীর সকল পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের যোগফলকে পরীক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হয়। এই ভাগফল হবে নর্ম বা সাধারণ মান। ধরা যাক্, অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত শিক্ষার্থীদের অঙ্কের আদর্শ মান নির্ণয় করা হবে। তাহলে একটা দেশের অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্রসংখ্যা দ্বারা তাদের প্রাপ্ত নম্বরের যোগফলকে ভাগ করা দরকার। এরূপ প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও ব্যাপক। তাই কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট শ্রেণীর ছাত্রদের নিয়ে পরীক্ষা করা যুক্তিযুক্ত। তবে লক্ষ্য রাখা দরকার ছাত্রদের দলে যেন সকল পরিবেশ, সকল রকম অবস্থার (আর্থিক, সামাজিক ইত্যাদি) ছাত্র থাকে। বার বার এরূপ বাছাই করা ছাত্রদের ওপর প্রয়োগ করে প্রশ্নগুলিকে যেমন আদর্শায়িত করা যায়, তেমনি অভীক্ষার নির্দিষ্ট নর্ম নির্ধারণ করা যায়।

মনে করা যাক্, যে শিক্ষার্থী অঙ্কে ৩৫ নম্বর পেয়েছে, সেই শ্রেণীতে ২০ জন ছাত্র এবং গড়ে প্রত্যেকে পেয়েছে ২৫ নম্বর। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঐ বিদ্যালয়ে ৩৫ নম্বর পাওয়া ছাত্রটি দুর্বল নয়, সে ঐ বিদ্যালয়ের অন্যতম ভাল ছাত্র। এবার আদর্শায়িত মানটিকে ধরে বিচার করা যাক্। মনে করা যাক্ সেই আদর্শায়িত মান বা নর্মটি ৪০। এবার এই নম্বরের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় উপরোক্ত ৩৫ নম্বর পাওয়া ছাত্রটি অঙ্কে কাঁচা। সুতরাং বিদ্যালয়ের অঙ্কের মান নিম্ন।

আদর্শায়িত অভীক্ষায় এরূপ তুলনামূলক বিচার করা সহজসাধ্য। পরিমাপক (Scale) ব্যবহার করার ফলে এই অভীক্ষায় নম্বর দান নির্ভরশীলতা ও ব্যক্তি-সাপেক্ষতা থেকে মুক্ত। আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষাগুলিকে এভাবে আদর্শায়িত মানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। আদর্শায়িত অভীক্ষার জন্য যে সব প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত সেগুলি পরবর্তী পৃষ্ঠায় পর পর আলোচনা করা হল:

(১) কিছু সংখ্যক নানা শ্রেণীর বিদ্যালয় নির্বাচন ;
(২) এইসব বিদ্যালয়ের বিশেষ শ্রেণী ও বিশেষ বিষয় নির্বাচন ;
(৩) অভীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বহু সংখ্যক প্রশ্নপত্র রচনা ;
(৪) নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্নপত্র দিয়ে অধিকবার পরীক্ষা গ্রহণ এবং ত্রুটিপূর্ণ বা অনুপযুক্ত প্রশ্নগুলিকে বাতিল করা ;
(৫) বার বার প্রয়োগ করে উপযুক্ত প্রশ্নপত্র রচনা ও পরীক্ষা গ্রহণ ;
(৬) অবশেষে পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে আদর্শ মান বা নর্ম স্থির করা যুক্তিযুক্ত।

৯। পুরাতন ও নতুন পরীক্ষা নীতির পার্থক্য (Difference between Old and New Type Tests) :

পুরাতন পরীক্ষা নীতি	নতুন পরীক্ষা নীতি
১। প্রশ্নের সংখ্যা কম কিন্তু উত্তর দীর্ঘ।	১। প্রশ্নের সংখ্যা খুব বেশী কিন্তু উত্তর খুব ছোট।
২। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয়।	২। কোন কোন উত্তর শুধু চিহ্ন বসিয়ে শেষ করা যায়।
৩। এখানে পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভাগ্য বা দৈব ঘটনার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।	৩। এ অভীক্ষায় ভাগ্য পরীক্ষা বা দৈব ঘটনার কোন সুযোগ নেই।
৪। ক্ষুদ্রাকার কাগজে অল্পশ্রমে ও সময়ে প্রশ্নপত্র রচনা করা যায়। প্রশ্নপত্র মুদ্রণের খরচও অল্প।	৪। প্রশ্নপত্র রচনায় অধিক কাগজ, শ্রম ও সময় লাগে। মুদ্রণের ব্যয়ও অধিক।
৫। উত্তর-পত্র পরীক্ষা করা, নম্বর বসানো অধিক শ্রম, সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ।	৫। অল্প শ্রম, সময় ও ব্যয়ে উত্তর পত্র পরীক্ষা করা ও নম্বর দেওয়া যায়।
৬। উত্তর সীমিত ও পূর্ব নির্দিষ্ট নয়। তাই এই পরীক্ষা ব্যক্তি-ভিত্তিকতা দোষে দুষ্ট।	৬। উত্তর সীমিত, পূর্বনির্দিষ্ট ও অনেক সময় আদর্শায়িত (Standardised)। এ পরীক্ষা ব্যক্তিভিত্তিকতা থেকে মুক্ত।

৭। বিষয়বস্তু না বুঝে মুখস্থ করার সুযোগ খুব বেশী। মুখস্থ করা প্রশ্ন বা Suggestion-এর ওপর নির্ভর করা যায়।	৭। না বুঝে বিষয় মুখস্থ করার বা প্রশ্ন বেছে তৈরি করার সুযোগ নিতান্ত কম।
৮। সার্থক পরীক্ষার লক্ষণগুলির অভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।	৮। সার্থক পরীক্ষার লক্ষণগুলি মোটামুটি এখানে বিদ্যমান।

১০। প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি (Shortcomings of Conventional Examination System) ঃ

আধুনিক বিদ্যালয় (প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক), কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যে পরীক্ষা-ব্যবস্থা চলে আসছে এর সূত্রপাত হয় কয়েক শতাব্দী পূর্বে। রচনাধর্মীতাই ছিল এর গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে দীর্ঘ প্রশ্নোত্তরের মধ্যে কিছু টীকা-টিপ্পনী বা short notes-এর অবতারণা দেখা গেল। তবুও রচনাধর্মী পরীক্ষার ত্রুটি অত্যধিক থাকায় বিষয়াত্মক অভীক্ষা উদ্ভূত হল। শেষোক্ত অভীক্ষায় ত্রুটিও নিতান্ত কম নয়। তবে রচনাধর্মী ও বিষয়াত্মক অভীক্ষার সমন্বয়ে সামগ্রিক পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি অনেকখানি দূর করা যায়। কিন্তু তত্ত্বগত প্রচেষ্টা অনেকখানি অগ্রসর হলেও উক্ত সমন্বয় প্রচেষ্টা মোটেই বাস্তবায়িত হয় নি। ফলে সেই চিরাচরিত পরীক্ষা প্রথা আজও স্কুল-কলেজগুলিতে বিদ্যমান। এই পরীক্ষার ওপর এত বেশী পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যে গত দুই বা তিন দশক যাবৎ এর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা দানা বেঁধে উঠেছে। সেই সমালোচনা আজ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। **তাই সর্বস্তরে প্রচলিত পরীক্ষার বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু হয়েছে।**

(ক) শিক্ষার্থীদের অভিযোগ হল, এ পরীক্ষা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মের সহায়ক নয়; অথচ তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। (খ) শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, পরীক্ষা প্রথার প্রভাবে বিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষাসূচক কোন কাজ হয় না। (গ) মাতাপিতা বা অভিভাবকদের অভিযোগ হল পরীক্ষা তাদের সন্তানদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। (ঘ) বাস্তববাদী মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, পরীক্ষার কোন নির্ভরযোগ্যতা প্রয়োগ-যোগ্যতা, যথার্থতা নেই। আবার, (ঙ) শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, এ পরীক্ষাব্যবস্থা

শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অন্তরায়। তাই প্রচলিত **পরীক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক সংজ্ঞা আজ দিকে দিকে প্রচারিত।**

তাই পরীক্ষা হল: (১) শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনাশের কারণ (A bane on the educational system), (২) রক্তশোষক (A blood sucker), (৩) শিক্ষা-লাভের অন্তরায় (An obstacle to learning), (৪) একটি দুঃস্বপ্ন (An incubus), (৫) প্রকৃত শিক্ষার শত্রু (An enemy of true education), (৬) একটি প্রয়োজনীয় অনিষ্টকারক প্রথা (A necessary evil), (৭) প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও হিংসাবৃত্তির উদ্ভাবক (A begetter of rivalry and strife), (৮) স্মৃতিশক্তির গৌরব (Glorification of memory), (৯) মানুষের অজ্ঞতার গভীরতা পরিমাপের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা (A Presumptuous attempt to gauge the depth of human ignorance), (১০) শিক্ষার একখানি মৃত অঙ্গ, (A dead hand of education), (১১) ক্রমবর্ধমান উৎপীড়ন (A growing tyranny).

উল্লিখিত নিন্দাসূচক সংজ্ঞাগুলির ভেতর দিয়ে পরীক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। **পরীক্ষার ক্ষতিকারক ফলশ্রুতি সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রনিধানযোগ্য।** শিক্ষাবিদ্ রাইবার্ন (*W. M. Ryburn*) প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। তার মতে, অন্ততঃপক্ষে যেভাবে পরীক্ষ-পদ্ধতি পরিচালিত হচ্ছে তাতে বলা বাহুল্য যে এ-পদ্ধতি সৃজনধর্মী কর্মের শত্রু।[1] কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কর্মের পরিমাপক হিসেবে প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থা যথার্থ্যও নয়, সম্পূর্ণও নয়। ব্যবস্থাটি নিতান্ত অসম্পূর্ণ, অবিশ্বাস্য, ক্ষতিকারক ও খেয়ালীপনায় দুষ্ট।[2] তাই রাধাকৃষ্ণান কমিশনের মতে "প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ পরীক্ষা-ব্যবস্থা ভারতীয় শিক্ষার দুষ্ট ক্ষত হিসেবে স্বীকৃত।"[3] মাধ্যমিক

---

1. It goes without saying that examinations are the enemies of creative work, at least as they are usually conducted". —*Ryburn.*

2. "As a measure of work.........examinations are neither valid nor complete. They are inadequate, unreliable, capricious and arbitrary." —*Wardha Committee.*

3. "For nearly half a century, the examination has been recognised as one of the worst features of Indian education.

শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়র কমিশন এবং জাতীয় শিক্ষা, কমিশন অথবা কোঠারী কমিশন একই সুরে প্রচলিত পরীক্ষার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিমত :

(১) এ সম্পর্কে শিক্ষাদানে সাধারণী পরীক্ষার প্রভাব (Influence of Public Exmination on Teaching) আমাদের প্রথম বিবেচ্য বিষয়। শিক্ষাদানের ওপর পরীক্ষার প্রভাব এত বেশী প্রতিফলিত যে সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা এখন সম্পূর্ণ পরীক্ষামুখী (Examination Oriented)। তাই সাধারণী পরীক্ষা (Public Examination) স্কুল কলেজের শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ্, উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদ, বিশ্ববিদ্যালয় বা রাষ্ট্র যে পরীক্ষা গ্রহণ করে তাকেই আমরা সাধারণী পরীক্ষা বলি। পরীক্ষার্থীরা একটা নির্দিষ্ট বিষয় অধ্যয়ন করে। সেই বিষয়ের ওপর পর্ষদ্, সংসদ, বিশ্ববিদ্যালয় বা রাষ্ট্র প্রশ্নপত্র রচনা করে। অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা উক্ত সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষা দেয়। এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞানপত্র (Certificate), উপাধি (degree) ইত্যাদি লাভ করে। রাষ্ট্র বা সমাজ এই অভিজ্ঞানপত্র বা উপাধির স্বীকৃতি দেয়। সুতরাং এই পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষকের দক্ষতা ও যোগ্যতা পরোক্ষভাবে জড়িত। তাই সাধারণী পরীক্ষার যথেষ্ট প্রভাব শিক্ষদানে বিদ্যমান। **সেই প্রভাবগুলি হল ঃ**

প্রথমতঃ, পরীক্ষাকেই শিক্ষকরা তাদের সক্রিয়তার প্রধান উৎস বলে বিবেচনা করেন। বিদ্যালয়ের সমস্ত সংগঠন, এমন কি বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব যেন এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করেই স্থির হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণী পরীক্ষার বৈষয়িক সাফল্যটুকু (material success) মুখ্য আর জ্ঞানার্জনটুকু গৌণ বলে পরিগণিত হয়। এটি একটি মারাত্মক প্রভাব—সন্দেহ নেই। কারণ শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করাই হল শিক্ষাদানের আসল লক্ষ্য। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষার দেওয়াল অতিক্রম করাই শিক্ষার্থীর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর পরীক্ষা ব্যবস্থাটি উপায় না হয়ে

শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। তাই মুখস্থ করে পাশ করাই হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজপথ।[1]

(২) **পরীক্ষার রচনা-ধর্মিতা** (Essay type character): বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থায় অত্যধিক রচনা-ধর্মিতা বিদ্যমান। ফলে হাতের লেখা, ভাব ও ভাষা প্রকাশের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। হাতের লেখা খারাপ হলে বিষয়বস্তুতে গভীর জ্ঞানও কোন কাজে আসে না। তাছাড়া রচনাধর্মী পরীক্ষার সামগ্রিক ত্রুটিগুলিও প্রচলিত সাধারণী পরীক্ষায় বিদ্যমান[2]। আবার এই সাধারণী পরীক্ষা দ্বারা বিদ্যালয়ের প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা প্রভাবিত। তাই এ পরীক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এত বিক্ষোভ।

(৩) **পরীক্ষা শিক্ষার মানের অবনতি ঘটিয়েছে** (Lowering the standard of Education): প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থাই বর্তমান শিক্ষামানের অবনতির জন্য দায়ী। পরীক্ষায় পাসই শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, এমনকি অভিভাবকরাও নানাপ্রকার অবাঞ্ছিত কৌশল অবলম্বন করেন। বেছে বেছে প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করা, সারা বছর পড়াশুনার কথা চিন্তা না করে পরীক্ষার কিছু দিন পূর্বে রাত্রি জেগে পড়া ও প্রাইভেট পড়ার ব্যবস্থা, নোট বই, সাজেসশান, নির্দিষ্ট প্রশ্নের ওপর নির্ভর করা—প্রভৃতি পরীক্ষা সম্পর্কিত প্রক্রিয়া শিক্ষা-মানের অবনতি ঘটিয়েছে।

(৪) **নৈতিক মানের অবনতি** (Lowering of moral standard): পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার অর্থ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অর্জন করা। সুতরাং যে কোন উপায় অবলম্বন করে পরীক্ষা পাস করা চাই। এ জন্যই অসৎ উপায় অবলম্বনেও শিক্ষার্থীরা দ্বিধা বোধ করে না। তারা খাতা নকল করে, বদল করে, পর্যবেক্ষকদের ভীতি প্রদর্শন করে কাজ হাসিল করার চেষ্টা করে। বর্তমানে এর চরম বিকাশস্বরূপ 'গণটোকাটুকি' শব্দটি থেকে নৈতিক মানের অবনতির স্বরূপটি পরিষ্কার অনুমান করা যায়।

---

1. 'Examinations have become the end insted of being a means. * * * The child is more important than the subject he studies, and preparation for memory examinations is not preparation for life and the world. * * * As soon as the examination becomes the great end, cramming becomes the royal road."—*Wren*. (New Education—*K. K. Mukherjee*)

2. পূর্বেই রচনাধর্মী পরীক্ষার ত্রুটিগুলি সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

(৫) **পরীক্ষা পরীক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে** (Injurious to physical and mental health of a candidate) **:** পরীক্ষা পরীক্ষার্থীর শিক্ষার অন্তরায়। যতদিন পরীক্ষার কথা মনে পড়ে না ততদিন শিক্ষার্থী স্বতস্ফূর্তভাবে পাঠে অগ্রসর হয়। বিদ্যালয়ের এবং সাধারণী পরীক্ষার কথা মনে হলেই তাদের মনের ওপর চাপ এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পরীক্ষার পূর্বে অনেকের শরীরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরীক্ষা-ভীতিই হল এরূপ অসুস্থতার কারণ। আসল কথা, পরীক্ষা-ব্যবস্থাটিকে শিক্ষার্থীরা মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি। পরীক্ষা যেন শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি ব্যতিক্রম।

(৬) **প্রচলিত পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিক্ষার পরিমাপ করা যায় না** (Unable to evaluate real education) **:** প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থার বড় ত্রুটি হল, এর দ্বারা শিক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞানের পরিমাপ করা যায় না। পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া বা ভাল নম্বর পাওয়া অনেকটা ভাগ্যের ব্যাপার। আর পরীক্ষা পাসের জন্য অনুমোদিত পাঠ্যবিষয়ের সবটুকু সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনও হয় না। প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, বিচার-ক্ষমতা, চরিত্র প্রভৃতি বিষয় জড়িত থাকে। বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থা এসবের পরিমাপ করতে পারে না। তাই এ পরীক্ষা যতদূর সম্ভব সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট।

১১। পরীক্ষা সর্বজন কাম্য (Examination is wanted by all) :

বহুমুখী ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষা প্রথা সম্পূর্ণ বাতিল করা যায় না। শিক্ষার সঙ্গে পরীক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটিকে বর্জন করে অন্যটির চিন্তা করা যায় না। স্বরূপ যেমনই হোক পরীক্ষা ছাড়া শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য ; কারণ—(ক) শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিভক্তকরণ, ভরতি, প্রমোশন, কর্ম ও চিন্তার সামঞ্জস্যকরণের জন্য শিক্ষকরা পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করেন। (খ) মাতাপিতা ও অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের প্রকৃত সাফল্যের স্বীকৃতিপত্র দেখে উৎফুল্ল হতে চান। (গ) নিয়োগকারী তার কর্মীদের বিশেষ বিশেষ গুণের প্রকাশ ও স্বীকৃতি সম্পর্কে জানতে চান। (ঘ) সমাজ ও রাষ্ট্র দাবী করে যে সমাজের ও রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের মধ্যে

দায়িত্বশীল জ্ঞানী-গুণীর সংখ্যা বৃদ্ধি হোক। (ঙ) শিক্ষাবিদ, সমাজতত্ত্ববিদরা ভাবেন যে এমন পরীক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন হোক যার মাধ্যমে শিক্ষার সত্যিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তাই রেন (*Wren*) বলেন, 'সত্যিকার লক্ষ্যে পৌঁছনোর প্রয়োজনীয় উপায় হিসেবে পরীক্ষা-ব্যবস্থা অব্যাহত থাকুক।'[1] সে পরীক্ষার স্বরূপ কেমন হবে—এ প্রশ্ন আজ সর্বজনের।

পরীক্ষা হল শিক্ষার অঙ্গ। শিক্ষার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ণীত থাকে। পরীক্ষা সেই উদ্দেশ্যকে সফল করার সহায়ক মাত্র। আধুনিক শিক্ষা যে শুধু শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের ওপর লক্ষ্য নির্দেশ করে তা নয়—তার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি বিকাশের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করে।[2] পরীক্ষা-ব্যবস্থা এমন হবে যা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপ করবে। সেই পরীক্ষা-ব্যবস্থা কোনক্রমেই সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট হবে না। এরূপ পরিমাপ ব্যবস্থা হবে শিক্ষার ন্যায় ব্যাপক ও বিস্তৃত। সুতরাং প্রচলিত সংকীর্ণতাধর্মী পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। পরীক্ষা সংস্কারের বড় লক্ষ্য হবে তার নির্ভরযোগ্যতা (reliability) ও যথার্থতা (validily) বৃদ্ধি এবং সেটা নির্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য শিক্ষার্থীর কৃতকর্মের বিচার না হয়ে তার জীবনের সাফল্যের সহায়ক একটা চলমান প্রক্রিয়া হবে। এটাকে ঠিক পরীক্ষা নামে অভিহিত না করে মূল্যায়নরূপ ব্যাপক অর্থযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা কর্তব্য।[3]

১২। পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার (Reforms of Examination) ঃ

শিক্ষার সঙ্গে পরীক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরীক্ষা ছাড়া শিক্ষার কথা চিন্তা করা যায় না। কিন্তু প্রচলিত পরীক্ষার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আজ পুঞ্জীভূত।

---

1. "Let us keep examinations as one of many useful means to the true end—development.' —*Wren.*

2. "The school of today concerns itself not only with the intellectual pursuits but also with the emotional and social development of the child, his physical and mental health, his social adjustment and other equally important aspects of his life, in a word with an alround develoment of his personality.—' *S E. C.*—P. 118.

3. "A major goal of examination reform should be to improve the reliability and validity of examination and to make evaluation a continuous process aimed at helping the student to improve his level of achievement rather than at certifying the quality of his performance at a given moment of time"—*National Policy on Education*, 1968. P.—7

শিক্ষার সহায়ক হিসেবে পরীক্ষা-ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে এর সামগ্রিক সংস্কার প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের মতে আমরা যদি পরীক্ষাকে সঠিকভাবে ও বুদ্ধিসঙ্গত কৌশলে প্রয়োগ করতে পারি তাহলে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা সহায়ক উপায় হবে এই পরীক্ষা। যদি পরীক্ষার প্রয়োজন থাকে তবে সর্বাগ্রে এর আমূল সংস্কারের প্রয়োজন।[1] এক্ষণে **পরীক্ষা সংস্কারের পদ্ধতিগুলি আলোচনা করা হল :**

(১) আভ্যন্তরীণ (Internal) এবং সাধারণী পরীক্ষায় (Public or external examination) তিন প্রকার প্রশ্নের সমন্বয় হবে—রচনামূলক (Essay type), সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর মূলক (short answer type) এবং বিষয়াত্মক বা নৈর্ব্যক্তিক (objective type) প্রশ্ন। প্রশ্ন হবে সার্থক মূল্যায়নের লক্ষণ বিশিষ্ট অর্থাৎ এর ভাব, ভাষা, উত্তরের নির্দেশ যথাযথ, নির্ভরযোগ্য, উদ্দেশ্যমুখী ইত্যাদি। সামগ্রিক পাঠ্যসূচীকে কেন্দ্র করেই প্রশ্ন রচিত হবে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় নির্বাচনের সুযোগ যেন না থাকে। শিক্ষার্থীর মৌলিকত্ব বিচারের সুযোগ থাকাও বাঞ্ছনীয়। তাই প্রশ্ন রচনার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু মুখস্থ করার পরিবর্তে মৌলিক চিন্তাধারা (Original thinking) বিকাশে উৎসাহিত করা।

(২) বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ও সাধারণী পরীক্ষার ওপর সমান গুরুত্ব অর্পণ করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রে সমান সামাজিক মর্যাদা দেওয়াও প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণী বা বহির্বিভাগীয় পরীক্ষার সংখ্যা হ্রাস করে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করাও প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা হবে শিক্ষণ প্রক্রিয়া ও শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের উপায় স্বরূপ; অথচ সাধারণী পরীক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমনভাবে শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করে দিতে হবে যেন তারা আগ্রহ সহকারে সাধারণী পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হতে পারে।

(৩) পরীক্ষায় সাফল্যাঙ্ক প্রদানের পদ্ধতিও সংস্কার করা প্রয়োজন। বর্তমান প্রথায় সংখ্যাগত সাফল্যাঙ্ক প্রদানের রীতি খুব বেশী প্রচলিত।

---

1. "We......feel that examination rightly designed and intelligently used can be useful factor in the educational process. If examinations are necessary a through refom of these is still more necessary."

—*University Education Commission.*

সাফল্যাঙ্ক প্রদানের এই প্রচলিত প্রথা হল সমগ্র উত্তর পত্রখানি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা ও প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের শেষাংশে নম্বর বসানো। পরে এই প্রদত্ত নম্বরগুলির যোগফল হল পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ফল। এ প্রথার কুফল বহুবিধ। প্রথমতঃ, পরীক্ষার্থীদের বিশেষ কোন প্রশ্নের উত্তর তুলনামূলকভাবে মূল্যায়িত হয় না। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম একটি বা দুটি প্রশ্নের উত্তর ভাল হওয়ায় পরবর্তী নিম্নমানের উত্তর বিচারের সময় পরীক্ষকের একই মানসিকতা ক্রিয়াশীল হয়। আবার প্রথমাংশের উত্তর খারাপ এবং শেষাংশের উত্তর ভাল হওয়া সত্ত্বেও সুবিচার পাওয়া যায় না।

পরীক্ষাকে এসব ত্রুটি থেকে মুক্ত করার জন্য প্রথমেই সমগ্র উত্তর-পত্রটি পড়া এবং পরীক্ষকের নিজস্ব বিচার অনুসারে উত্তর-পত্রগুলিকে প্রথমে শ্রেণী বিভক্ত করে নেওয়া উচিত। উত্তর পত্রগুলিকে সাধারণতঃ পাঁচটি শ্রেণীতে (five-point-scale) ভাগ করা যায়—যেমন, (A) অতি উত্তম (excellent), (B) উত্তম (good), (C) মধ্যম (fair or average), (D) খারাপ (poor), (E) অত্যন্ত খারাপ (very poor)। একে আবার সংখ্যাগত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, যেমন—A = ৭১—৮০, B = ৬১—৭০, C = ৫১—৬০, D = ৪১—৫০, E = ৩১—৪০। সমগ্র উত্তরপত্র পড়ার পরেই পরীক্ষকের বিচার অনুসারে এগুলি পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে ভাগ করা হল।

এবার প্রশ্ন অনুসারে খাতা দেখা যেতে পারে। ১নং প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষা করে সাফল্যাঙ্ক দেওয়া শুরু হল। সমগ্র উত্তরপত্রগুলির ১নং প্রশ্নের উত্তর দেখা ও সাফল্যাঙ্ক দেওয়ার পর ২নং প্রশ্নের উত্তর (সবগুলি উত্তরপত্রের) পরীক্ষা করা ও সাফল্যাঙ্ক দিতে হবে। এইভাবে সবগুলি উত্তরপত্রের প্রশ্নগুলি দেখার পর প্রতিখানা উত্তরপত্রের সাফল্যাঙ্ক যোগ দিতে হবে। এতে দেখা যাবে A বিভাগের খাতার সাফল্যাঙ্ক ৭১ থেকে ৮০ এর মধ্যে, B বিভাগের খাতার সাফল্যাঙ্ক ৬১ থেকে ৭০ এর মধ্যে আছে—ইত্যাদি। এই শ্রেণীগত (অর্থাৎ A. B. C. ইত্যাদি) সাফল্যাঙ্কের সঙ্গে উত্তরপত্রের প্রশ্নগত সাফল্যাঙ্কের যোগফল সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে ধরা যেতে পারে যে, মোটামুটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ত্রুটিমুক্ত হয়েছে। এখানে দুটি ধারার সমন্বয় হল। প্রথমটি একবার একখানি উত্তরপত্রের সব প্রশ্নের উত্তর পাঠ করে উত্তরপত্রখানিকে five-point scale-এ শ্রেণী বিভক্ত করা। দ্বিতীয়টি হল সকল ছাত্রের

উত্তরপত্র থেকে একটি প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষা করা ও সাফল্যাঙ্ক বসানোর পর একই উপায়ে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বিচার করা ও নম্বর বসানো। এর ফলে ক্রটির পরিমাণ কম হবে—এতে সন্দেহ নেই।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন সংখ্যাগত সাফল্যাঙ্কের পরিবর্তে শুধু উপরোক্ত five-point-scale ব্যবহারের কথা সুপারিশ করেছেন (Report P. 122) এর দ্বারা শিক্ষার্থীকে শ্রেণীবিভক্ত করাও যায়। A নম্বরটি দ্বারা বোঝায় শিক্ষার্থী প্রথম ১০ জনের মধ্যে, B দ্বারা বোঝায় দ্বিতীয় ১০ জনের মধ্যে আছে —ইত্যাদি। এরূপ শ্রেণীবিভক্তকরণকে পুনরায় শতকরা হিসাবে (Percentile System) পরিবর্তিত করা যায়। ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষক শতকরা হিসাবে সংখ্যাগত মান ধার্য করার পর তাকে শ্রেণীগত (A. B. C. ইত্যাদি) পর্যায়ে পরিবর্তিত করে ফল প্রকাশ করতে পারেন।

ফল প্রকাশের সময় শ্রেণীর ছাত্র সমষ্টির আক্ষরিক ক্রম (alphabetical order) অনুসারে নাম সাজিয়ে প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয়। ধরা যাক—প্রথম শ্রেণীতে ৭ জন ছাত্র আছে। আক্ষরিক ক্রমঅনুসারে ফল প্রকাশ করলে হিংসাত্মক প্রতিযোগিতার দুষ্টক্ষত শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করবে না।

(৪) পরীক্ষা সংস্কারের জন্য পরীক্ষক, প্রশ্ন-রচয়িতা, মডারেটর (Moderator) প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের যথাযথ শিক্ষণ প্রয়োজন। এখানে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং প্রতিটি রাজ্য সরকারে তার শাখা থাকা প্রয়োজন। এই সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হবে পরীক্ষা-সংক্রান্ত গবেষণা, আলোচনাচক্র, সেমিনার প্রভৃতি। স্বজনপোষণ নীতি পরিত্যাগ করে প্রকৃত দক্ষ বিষয়শিক্ষককেই পরীক্ষক নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয় শিক্ষকদের মাঝে মাঝে পরীক্ষা-সংক্রান্ত in Service Training দেওয়ার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। পরীক্ষকের ওপর পরীক্ষার্থীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। অতএব পরীক্ষককে উপযুক্ত ও দক্ষ করে তোলা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্তব্য।

১৩। শিক্ষায় পরীক্ষা নয়, মূল্যায়ন (Not Examination but Evaluation in Education) ঃ

শিক্ষা একটি গতিশীল জীবন্ত ধারা। তার সজীব ধারায় প্রভাবিত হয় সামাজিক মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বভাব-প্রকৃতি,

হাবভাব, আচার-আচরণ, কর্মপ্রচেষ্টা আর তার ফলশ্রুতি। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞান, কৌশল ও দক্ষতা, আগ্রহ ও অভিরুচি সম্পর্কে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তনসাধন করাই হল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এই পরিবর্তন এল কিনা তা বুঝবার একমাত্র উপায় হল পরীক্ষা। পরীক্ষাই শিক্ষা-প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি অনুধাবনের একমাত্র ও অন্যতম উপায়।

বর্তমানে পরীক্ষার পাশাপাশি মূল্যায়ন শব্দটি ব্যবহৃত হয়। দুটি শব্দ প্রায় সমার্থক হলেও উভয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ভূমিকা এক নয়। পরীক্ষা শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়; পক্ষান্তরে মূল্যায়ন শব্দটি অতি ব্যাপক ও বহুমুখী উদ্দেশ্য দ্বারা অভিব্যক্ত। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর পুঁথিগত বিদ্যার আংশিক বিচার করা যায় মাত্র; তার সম্পূর্ণ শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করা সম্ভব নয়। প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার সংকীর্ণতা সম্পর্কে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এ পদ্ধতি শিশুকে সামগ্রিকভাবে বিচার ও যাচাই করে না। শিক্ষার্থীর বোধশক্তি, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, সামর্থ্য ও কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি এই পরীক্ষায় প্রকাশিত হয় না। পরীক্ষা শব্দটির মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির নিতান্ত অভাব। তাই আধুনিক শিক্ষায় পরীক্ষা (Examination) শব্দের পরিবর্তে মূল্যায়ন (Evaluation) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এ সম্পর্কে লিণ্ডকুইষ্ট (*E. F. Linquist*) বলেন যে পাঠ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণার সংকীর্ণতা থেকে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও সার্বিক বিকাশ যাচাই করার জন্য পরীক্ষার পরিবর্তে মূল্যায়ন শব্দের ব্যবহার অধিক যুক্তিসঙ্গত। শিক্ষা শব্দের ন্যায় মূল্যায়নও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবক্ষেত্রে মূল্যায়ন দ্রব্য পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত তুলাদণ্ড নয়—উহা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর উপায় মাত্র। মূল্যায়ন শুধু পাঠক্রমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অর্জিত জ্ঞানের যাচাই ও বিচার করে না। বরং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক গুণ, ক্ষমতা, দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব আচার-আচারণ প্রভৃতি সামগ্রিক যোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করে।[1]

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

---

1. তুলনীয়: In measurement the emphasis is upon single aspect of subject matter, achievement or specific skills and abilities whereas in evaluation the emphasis is upon broad personality changes and major objectives of educational programme." —*W. S. Monroe*

শিক্ষার্থীর ওপর শিক্ষার প্রভাব ও তার ফলশ্রুতি যাচাই করাই হল শিক্ষা-প্রক্রিয়ার মৌলিক মূল্যায়ন। সঠিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেই শিক্ষার কর্মসূচী স্থিরীকৃত হয়। এই উদ্দেশ্যগুলি গভীর আগ্রহ-প্রণোদিত। আর উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হলে শিক্ষাসূচীর ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়।

মূল্যায়নের মৌলিক ধারণা

শিক্ষার্থীর দেহে-মনে পরিবর্তন আনবার পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু (অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি) নির্ধারণ করা হয়। তাই শিক্ষাকর্ম চলাকালে নানা পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বাঞ্ছিত পরিবর্তন এল কিনা শিক্ষক তা লক্ষ্য করেন। শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন পরিবর্তন সূচিত হলে জানা যায় যে নির্ধারিত বিষয়ের শিক্ষা-অভিজ্ঞতার (learning-experience) ফলাফল সার্থক। কোন নির্দিষ্ট ক্ষণে শিক্ষার্থীর কৃতকর্মের ফলশ্রুতি বিচার করাকে মূল্যায়ন বলা যায় না। মূল্যায়ন হল একটা সজীব গতিশীল প্রক্রিয়া।[1] কতটুকু স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হল, শ্রেণীপাঠনায় শিক্ষা-অভিজ্ঞতার কার্যকারিতা এবং শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্যের প্রতি কতটুকু অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল—এই তিনটি বিষয় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় বিচার করা হয়।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা উদ্দেশ্য (end), শিক্ষা-অভিজ্ঞতা বা বিষয়বস্তু (Means) এবং মূল্যায়ন (evidence)—এই তিনটির মধ্যে একটা আন্তঃসম্পর্কের (Inter-relationship) সন্ধান পাই। স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধি হল কিনা তা জানবার জন্য মূল্যায়নের প্রয়োজন হয়। সুতরাং উদ্দেশ্যটি বিষয় শিক্ষার অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়নের প্রয়োজন বিধায় এটি কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তাই শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রথম স্তরে আসে উদ্দেশ্য স্থিরীকরণ। স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য অনুসারে বিষয় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। উদ্দেশ্যপূর্ণ হল কিনা অথবা উদ্দেশ্যের কতটুকু অংশ সিদ্ধ হল তা যাচাই করার জন্য মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। উদ্দেশ্য, শিক্ষা-অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়নের আন্তঃসম্পর্ককে চিত্ররূপ ত্রিকোণাকারে স্থাপন করা যায়।

উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও মূল্যায়নের সম্পর্ক

বর্ষশেষে একবার মাত্র লিখিত বা মৌখিক অথবা উভয় প্রকার অভীক্ষা দ্বারা কোন শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, গুণ ও কৌশলাদির বিচার সঠিক ও

1. National Policy on Education, 1969, Govt. of India—P. 7

যুক্তিসম্মত হতে পারে না। উদ্দেশ্যমুখী পাঠ্যতালিকার বিষয়াদি নিয়ে বিদ্যালয়ে সারা বৎসর পঠন-পাঠন কর্ম পরিচালিত হয়। শিক্ষাবর্ষের সর্বক্ষণ শিক্ষাকর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, আচার-আচরণ, সামর্থ্য ও অভিরুচির প্রগতিমূলক পরিবর্তন (Progressive change) অবিচ্ছেদ্যভাবে আসতে
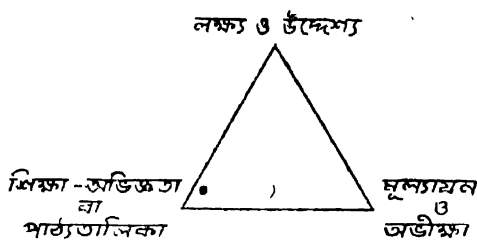
থাকে। সুতরাং কোন বিশেষ সময়ের অভীক্ষা দ্বারা এই পরিবর্তন বিচার করা সম্ভব নয়। **তাই সার্থক মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন—**

(i) শিক্ষারম্ভের সময় শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ রাখা; (ii) সমস্ত শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীর জীবনে কি কি পরিবর্তন সূচিত হল; পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার পূর্ণ বিবরণ রাখা, (iii) শিক্ষার্থীর জীবনে সংঘটিত পরিবর্তনের কতটুকু উন্নয়নমুখী অথবা সার্থকতার পথে এগিয়ে গেল, তার মূল্যায়ন বা প্রমাণভিত্তিক আলোকে (light of evidence) বিচার বিবেচনা করা।[1]

মূল্যায়ন শিক্ষাকর্মের সকল ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত। শুধুমাত্র কৃতিত্ব (achievement) যাচাই বা পরিমাপ করা মূল্যায়নের কাজ নয়। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার দ্বারা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য কতটুকু সাধিত হল, শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের কার্যকারিতা এবং সামগ্রিক শিক্ষার লক্ষ্য, এর দ্বারা কতটুকু সাফল্য লাভ হল তা পরিমাপ করা যায়।

১৪। মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা (Of what use is Evaluation):

শিক্ষা এমনই একটি জীবন্ত ও গতিশীল প্রক্রিয়া যে এটি শিশুর জীবনে অবিচ্ছেদ্য ধারায় পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই পরিবর্তনশীল পথে শিশু দিনে দিনে

1. The Concept of Evaluation in Education.—N.C.E.R.T. Page 12.

বর্ধিত ও বিকশিত হয়। আমাদের শিক্ষাধারা শিশুর জীবনে কতটুকু পরিবর্তন আনল, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আর কতটুকু পরিবর্তন আনতে হবে, তার জন্য কি কি পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন—এসব শিক্ষককে নিখুঁতভাবে জানতে হয়। তা জানবার একমাত্র উপায় হল মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থীর কৃতকর্মের মূল্যায়ন তার ভাবী কর্মসূচীর ভিত্তিস্বরূপ। মেনজেল (*E. W. Menzel*) উপমা দিয়ে সুন্দরভাবে কথাটি ব্যক্ত করেছেন—ছুতোর বা রাজমিস্ত্রী নির্ভুল ও সুন্দর করে কাজ করবার জন্য বারবার পরিমাপক যন্ত্রাদি ব্যবহার করেন। সেইরূপ শিক্ষককেও শিক্ষার্থীর শিক্ষাকর্মের প্রগতি বিচারের জন্য লক্ষ্য করতে হয় শিক্ষার্থীরা একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত কিনা, শিক্ষার্থীর দক্ষতা কতটুকু বিকাশ লাভ করল, প্রয়োজনীয় জ্ঞান তারা লাভ করছে কিনা এবং লব্ধ জ্ঞানকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারছে কিনা ইত্যাদি।

মূল্যায়ন ভাবী কর্মসূচীর ভিত্তি

শিক্ষক নিজেও মূল্যায়নের দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হন। শিক্ষাকর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বাঞ্ছিত শিক্ষা ও পরিবর্তনের মূল্যায়ন হল শিক্ষকের কর্মের মূল্যায়ন। উৎপাদনের প্রাচুর্যের দ্বারা কৃষকের শ্রমের বিচার হয়। আইন-ব্যবসায়ীর যুক্তির মূল্যায়ন করেন জুরী। রাজমিস্ত্রী ও ছুতোরের কর্ম যাচাই করেন গৃহকর্তা। পূর্ব নির্ধারিত ওষুধের প্রয়োগ-ফলাফল না জেনে চিকিৎসক তাঁর রোগীর জন্য পুনরায় ব্যবস্থাপত্র দিতে পারেন না। কারণ, রোগীকে রোগমুক্ত করাই হল চিকিৎসকের কাজ। তেমনি শিক্ষকের কর্মের যাচাই হয় শিক্ষার্থীর কর্মের মূল্যায়নের মাধ্যমে।

শিক্ষকের কর্মের মূল্যায়ন

শিক্ষাকর্ম পরিচালনার জন্য বিদ্যালয় কতকগুলি শিক্ষামুখী উদ্দেশ্য (Educational objectives) স্থিরীকৃত করে। মূল্যায়নের মাধ্যমে বিচার করা হয় এই উদ্দেশ্য কতখানি সিদ্ধ হল। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার দ্বারা বোঝা যায় শিক্ষার্থী কতখানি অগ্রসর অথবা অনগ্রসর, তার দুর্বলতা ও কৃতিত্ব কোথায়। মূল্যায়ন মারফত শিক্ষক জানতে পারেন কোন্ পদ্ধতি তাঁর শিক্ষাদানের প্রকৃষ্ট উপায় এবং প্রচলিত ও গৃহীত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী কতটুকু লাভবান হল। শিক্ষাকর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে এই মূল্যায়নের ফলশ্রুতি দ্বারা। শিক্ষার মূল্যায়ন শিক্ষককে

মূল্যায়ন উন্নততর শিক্ষণের সহায়ক

ভালমন্দ বিচারে সাহায্য করে। ফলে শিক্ষক বিষয়বস্তু পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আরও সুন্দর পাঠ-পরিচালনার উপায় (Improvement of instruction) উদ্ভাবন করতে পারেন এবং শিক্ষাকর্মকে আরও উন্নততর, সার্থক ও উদ্দেশ্যমুখী করে তুলতে পারেন।

মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্লেষণের সুযোগ দেয়

মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষকের ন্যায় শিক্ষার্থীও উপকৃত হয়। একটু বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থী সহজে বুঝতে পারে নিজের শিক্ষা কতটুকু হল, তার কৃতকার্যতা অথবা অকৃতকার্যতার মূলে কি আছে, ত্রুটি সংশোধনের উপায় কি ইত্যাদি। এ সম্পর্কে শিক্ষার্থী শিক্ষকের নিকট তার সুবিধা-অসুবিধার কথা আলোচনা করতে পারে। মূল্যায়ন এমনি করে শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। মূল্যায়নের প্রভাবে তারা কৃতকার্যতার উপায় উদ্ভাবন করে নতুন পথে, নতুন উদ্যমে স্ব-স্ব কর্মে অগ্রসর হতে পারে।

মূল্যায়ন সর্বাত্মক শিক্ষণে আগ্রহ সৃষ্টি করে

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা আধুনিক পরীক্ষার সংকীর্ণতা দ্বারা প্রভাবিত। তারা জানে যে বিষয়বস্তু সংক্রান্ত লব্ধ জ্ঞান অংশতঃ বর্ষশেষে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হবে। সুতরাং তারা পাঠ্যবিষয়ের অতি প্রয়োজনীয় অংশটুকু মুখস্থ করার জন্য উদ্যমটুকুকে শেষ করে দেয়। এক কথায় বর্তমান শিক্ষার্থীর পাঠ-প্রক্রিয়া পরীক্ষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অতি ব্যাপক। তাই শিক্ষার্থীরা যখন জানবে যে শিক্ষার বহুবিধ উদ্দেশ্য বিচিত্র উপায়ে (different devices) পরীক্ষিত হবে তখন তারা নিজেরাই আত্মবিকাশ ও শিক্ষালাভের জন্য বহুমুখী উদ্দেশ্য প্রণোদিত পন্থা অবলম্বন করবে।

মূল্যায়ন পাঠ্যতালিকা পরিবর্তন-পরিবর্ধনে সাহায্য করে

পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসারে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, সমাজের চাহিদা এবং শিক্ষা-মনস্তত্ত্ব দ্বারা উদ্দেশ্যগুলি স্থিরীকৃত হয়। সমাজ পরিবর্তনশীল, সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন এবং শিক্ষা-মনস্তত্ত্বও প্রভাবিত। পরিবর্তনশীল সমাজ ও ব্যক্তির প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার বিষয়সূচীও (Curriculum) নিয়ন্ত্রিত, পুনর্বিবেচিত ও পরিবর্ধিত হতে বাধ্য। মূল্যায়নের ফলশ্রুতি আমাদের পাঠ্যতালিকা পরিবর্তন ও পরিমার্জিত করতে সাহায্য করে।

১৪। সার্থক মূল্যায়নের কৌশল (Evaluation devices) :

মূল্যায়ন শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মূল্যায়নের দ্বারা পরীক্ষার একটা চলমান প্রকৃতি (Continuous Process) সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর দেহ, মন ও হৃদয়ের সর্বাঙ্গীন পরিবর্তনের পরিমাপ করা সম্ভব। কিন্তু যে কোন একটি প্রক্রিয়া দ্বারা (যেমন, রচনাধর্মী পরীক্ষা বা বিষয়াত্মক অভীক্ষা ইত্যাদি) শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। তাই সার্থক মূল্যায়নের জন্য দুই বা ততোধিক কৌশলের (Devices) আশ্রয় নিতে হয়। **নিম্নে এরূপ কয়েকটি প্রয়োজনীয় কৌশল উল্লেখ করা হল :**

(১) **লিখিত পরীক্ষা** (Written Examination) : লিখিত পরীক্ষা তিন প্রকার প্রশ্নের সমন্বয়ে পরিচালিত করা বাঞ্ছনীয়; যথা—রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay type question), সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (Short question-answer type) এবং বিষয়াত্মক প্রশ্ন (Objective based question)। তবে চিরাচরিত প্রথায় পরীক্ষার ব্যবস্থা না করে এর আমূল সংস্কার করে প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত।*

(২) **মৌখিক পরীক্ষা** (Oral Test) : লিখিত পরীক্ষার পরিপূরক হিসেবে মৌখিক পরীক্ষা অত্যাবশ্যক। শিক্ষার্থীর পাঠ-দক্ষতা, উচ্চারণ ভঙ্গিমা, ভাষার দখল, সাধারণ জ্ঞান, সংবাদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষমতা—ইত্যাদি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়ার জন্য মৌখিক পরীক্ষা অত্যাবশ্যক।

(৩) **ব্যবহারিক পরীক্ষা** (Practical Examination) : ১২৫ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

(৪) **পর্যবেক্ষণ** (Observation) : সারা বৎসর শিক্ষাকর্ম পরিচালনার সময় শিক্ষক সতর্কতার সঙ্গে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, অনুরাগ, অভিরুচি, প্রবণতা, আচার-আচরণ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করতে এবং সে সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ (records) করতে পারেন। শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে এইভাবে লিখিত বিবরণ শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বিচারের অনুকূলে অতি অমূল্য সম্পদ—সন্দেহ নেই।

---

*'পরীক্ষা সংস্কার' পূর্ব অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।

(৫) **অনুসন্ধান তালিকা** (Check-list) : অনুসন্ধান-তালিকার ব্যবহার একপ্রকার প্রশ্নোত্তর সূচক অভীক্ষা। এর মধ্যে কিছু বক্তব্য সহ প্রশ্ন দেওয়া থাকে। বক্তব্যের ভেতর থেকে প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করতে হয়। শিক্ষাবর্ষে মাঝে মাঝে এরূপ অনুসন্ধান-তালিকা ব্যবহার দ্বারা প্রশ্নের উত্তরগুলির তাৎপর্য অনুসন্ধান করে শিক্ষার্থী সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। প্রশ্নগুলি সর্বদা উদ্দেশ্যমুখী হবে—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একে প্রশ্নোত্তর (Questionnaire) কৌশলও বলা হয়। অনুরাগ (interest), দৃষ্টিভঙ্গী (attitude) প্রভৃতি সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর শিক্ষার্থীর উক্ত বিষয়গুলি সহজে ব্যক্ত করে।

(৬) **আরোপিত কর্মভিত্তিক পরীক্ষা** (Assignment Test) : মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীকে স্বগৃহে পাঠচর্চার (Home task) জন্য বিভিন্ন প্রকার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। এই নির্দেশগুলিতে এমন প্রশ্নের উত্তর চাইতে হয় যাতে শিক্ষার্থীর শিক্ষাপ্রেরণা জাগরিত হয় এবং ঐ প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট সহায়ক পুস্তক, পত্রপত্রিকাদি পাঠ করতে হয়। এভাবে শিক্ষার্থীর স্বচেষ্টা প্রসূত কর্মের পরীক্ষা করে নম্বর (Scoring) বসানো যায়। এরূপ নম্বর দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতির রেখাচিত্র (graph) সংরক্ষণ করতে পারেন।

(৭) **শিক্ষার্থীর উৎপাদন** (Pupil's product) : কর্মভিত্তিক শিক্ষণ (Learning by doing) পর্যায়ে শিক্ষার্থী যেসব সামগ্রী তৈরি করে বা যেসব বাস্তব কর্মসম্পাদন করে সেগুলির বিচার করে বিবরণ রাখা এবং পাঁচ পয়েন্ট স্কেলে (five-point Scale) মূল্যায়ন করা ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা উচিত। উল্লেখ করা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক বর্তমান সিলেবাস অনুসারে নির্ধারিত যে কর্মশিক্ষা দেওয়া হয় তা থেকে বিবরণ সংগ্রহ করা সহজসাধ্য।

(৮) **বিভিন্ন বিবরণ** (Several records) : বিবরণ নানা প্রকারের হতে পারে—যেমন, শিক্ষার্থীর দিনলিপি (Pupil's diary), বিশেষ ঘটনালিপি (Anecdotal records) এবং সর্বাত্মক পরিচয় পত্র (Cumulative records) ইত্যাদি। শিক্ষার্থী নিজেই নিজের প্রতিদিনের কাজকর্মের বিবরণ লিখবে। এটাই হল তার দিনলিপি। এই দিনলিপি থেকে তার আচার-ব্যবহার, অভিরুচি, আগ্রহ প্রভৃতি বিষয় অবগত হওয়া যায়। এই দিনলিপি

ছাড়াও শিক্ষার্থী যাতে তার জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা সবিস্তারে লিখে রাখে তার নির্দেশ থাকা বাঞ্ছনীয়। এটি হল বিশেষ ঘটনা-লিপি। এরূপ ইঙ্গিতপূর্ব বিশেষ ঘটনা দ্বারা শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটিত হতে পারে। সর্বাত্মক পরিচয়লিপি দ্বারা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। শেষোক্ত পরিচয়-পত্র বিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত থাকে।*

অবশেষে বলা যায়, পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের জন্য উল্লিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্র, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাবোর্ড, বিদ্যালয় ও শিক্ষকের দায়িত্ব ও ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তবে শিক্ষকের ভূমিকা যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।

১৬। সর্বাত্মক পরিচয়-পত্র (Cumulative Record Card):

শিক্ষার সামগ্রিক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কতটুকু সার্থক হল, শিক্ষার্থীর শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং প্রাক্ষোভিক বিকাশ ও পরিবর্তন কতটুকু সার্থকতার দিকে অগ্রসর হল এসব সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ সংগ্রহের উপায় হিসেবে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। এর জন্য শিক্ষার্থীর শিক্ষাবর্ষব্যাপী কৃতকর্মের মূল্যায়ন প্রয়োজন। দেহে-মনে, বুদ্ধিতে ও হৃদয়ে শিক্ষার্থী যদি গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ সভ্য ও রাষ্ট্রের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে, তবেই শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হবে। শিক্ষার্থীর এই পরিচয় পাওয়া যাবে গৃহ-পরিবেশে, সমাজের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষামূলক ভ্রমণে, স্থান পরিদর্শনে, হাট-বাজার, মেলা-উৎসবে, খেলার মাঠে, ক্লাবে ও শ্রেণীকক্ষে। শিক্ষার্থীর এই সামগ্রিক পরিচয় সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রেই (Cumulative Record Card) লিখিত হয়।

আধুনিক শিক্ষায় ব্যক্তিবৈষম্য নীতি স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত কর্মধারা, আচার-আচরণ, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির যথাযথ বিবরণ জানা না থাকলে ব্যক্তি বৈষম্য নীতি অনুসারে শিক্ষায় সহায়তা করা যায় না। এরূপ চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত হয়েছে সর্বাত্মক পরিচয় সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রথা। সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রে থাকে শিশুর আত্মবিকাশের ধারা। আত্মবিকাশ কোন একটি নির্দিষ্ট ক্ষণের ঘটনা নয়। মাতৃক্রোড় থেকে শিশু পারিবারিক

* পরবর্তী অনুচ্ছেদে সর্বাত্মক পরিচয়লিপির বিবরণ দেওয়া হল।

গণ্ডী পেরিয়ে স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভের পর সমাজের বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করে। এভাবে বিরতিহীন ধারায় শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশ সম্ভব হয়। আত্ম-বিকাশের বিরতিহীন পথটি পরিবর্তনশীল ও ক্রমগতিশীল। এই আত্ম-বিকাশের ধারাবিবরণীই হল সর্বাত্মক পরিচয়-পত্র। প্রতি দিন, মাস এবং বছরে বছরে শিক্ষার্থীর জীবনে কি কি পরিবর্তন, প্রগতি ও বিকাশ লক্ষ্য করা যায় সবই লিপিবদ্ধ থাকে সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রে। তাই শিক্ষার্থীর ওপর প্রখর দৃষ্টি রেখে ও বিভিন্ন উৎস থেকে তার সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করে—তার আত্মবিকাশের ধারা লিপিবদ্ধ করতে হয়। এটা শিক্ষকের প্রতিদিনের এবং প্রতিক্ষণের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পরিচয়-পত্রটি হল শিক্ষার্থীর জীবনের পরিপূর্ণ সচল চিত্র। এর তথ্যপুঞ্জে থাকে সামগ্রিক ও ধারাবাহিক বৈশিষ্ট্য।

তথ্য সংগ্রহের উৎস (Sources for Information)**:** সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রে লিপিবদ্ধ করার জন্য তথ্য সংগ্রহের উৎসকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—ব্যক্তিভিত্তিক উৎস এবং নৈর্ব্যক্তিক উৎস।

ব্যক্তিভিত্তিক উৎস (Personal Sources)**:**

(ক) মাতাপিতা ও অভিভাবক: শিক্ষার্থীর পারিবারিক জীবন, শরীর-স্বাস্থ্য, মেজাজ, প্রবণতা, আচার-আচরণ ইত্যাদির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের নির্ভরযোগ্য উৎস হল তার মাতাপিতা ও অভিভাবক।

(খ) প্রতিবেশী: গৃহ-পরিবেশের বাইরে সমাজ-পরিবেশে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ, কাজকর্ম ভিন্নতর হতে পারে। সমাজ-পরিবেশে শিক্ষার্থীকে জীবনধারা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রতিবেশীদের ওপর নির্ভর করতে হয়।

(গ) বন্ধু, সহপাঠী ইত্যাদি: শিক্ষক সাধারণভাবে আলাপ-আলোচনা, কথাবার্তার মাধ্যমে কোন বিশেষ শিক্ষার্থী সম্পর্কে তার বন্ধু বা সহপাঠীদের নিকট থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

(ঘ) পূর্বতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক: শিক্ষার্থী বিদ্যালয় পরিবর্তন করলে পূর্বতন বিদ্যালয়ের শিক্ষকের নিকট থেকে তার সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এরূপ তথ্য যে খুবই নির্ভরযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

নৈর্ব্যক্তিক উৎস (Impersonal Sources)**:** ব্যক্তিভিত্তিক উৎস ছাড়া নানা উৎস থেকে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব, প্রবণতা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-অভিরুচি, বুদ্ধি-প্রক্ষোভ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এরূপ উৎসের মধ্যে

পরীক্ষা ও অভীক্ষার ফলাফল, প্রশ্নোত্তর, কর্মভিত্তিক অভীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার প্রভৃতির ফলাফল উল্লেখযোগ্য।

সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রের বিষয়বস্তু (Subject-matter of Cumulative Record Card) :

(১) **সাধারণ তথ্য** (General Data): (ক) পরিচিতি-তথ্য (identifying data): শিক্ষার্থীর নাম, জন্মতারিখ, পিতার নাম, জন্মস্থান, ঠিকানা, জাতীয়তা, ধর্ম, মাতৃভাষা ইত্যাদি তথ্য।

(খ) সমাজভিত্তিক তথ্য (Sociological data): পরিবারের সভ্য-সংখ্যা, মাতা/পিতা জীবিত বা মৃত, অভিভাবক ও তার সঙ্গে সম্পর্ক, মাতা-পিতার বয়স, পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা, অভিভাবক বা মাতা/পিতার পেশা, ভাই-বোনের সংখ্যা, শিক্ষার্থীর সংখ্যাগত স্থান, পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিদের পেশা, ইত্যাদি বিষয়।

(গ) ভবিষ্যতের আশা (Ambition): শিক্ষার্থী সম্পর্কে মাতা-পিতা বা অভিভাবকের আশা, শিক্ষার্থীর নিজের আশা-আকাজ্ক্ষা ইত্যাদি।

(২) **শিক্ষাবিষয়ক ইতিহাস** (Educational History): বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশের তারিখ, প্রথম বিদ্যালয়ের নাম/ঠিকানা, স্কুল পরিবর্তনের কারণ ও তারিখ, বর্তমান স্কুলের নাম/ঠিকানা ইত্যাদি।

(৩) **স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য** (Health Record): সাধারণ চেহারা, উচ্চতা, ওজন, বুকের মাপ, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, হৃদপিণ্ডের স্পন্দন, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, দৈহিক অক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়।

(৪) **শিক্ষালাভের ক্ষমতা** (Learning Capacity): বুদ্ধি, প্রবণতা, আগ্রহ-অনুরাগ, দৃষ্টিভঙ্গী, ইত্যাদি সম্পর্কে গৃহীত অভীক্ষার (test) মান এবং তাদের ফলাফল (result) এই পর্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হবে। এর দ্বারা শিক্ষা-লাভের ক্ষমতা বিচার করা সহজ।[১]

(৫) **পাঠোন্নতি পরিচয়** (Scholastic Attainment): পাঠ্যবিষয়, শিল্পকর্ম, খেলাধুলা, কর্মশিক্ষা, সমাজ সেবা কর্মে শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের পরিমাপ এই পর্যায়ে লেখা হবে। সংখ্যাগত নম্বরের পরিবর্তে শ্রেণীগত বিভাগ (যেমন —প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ বা A.B.C. ইত্যাদি) উল্লেখ করাই বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য বিষয়ে পাঁচ-পয়েণ্ট স্কেল (five point scale) ব্যবহৃত হলে সহ-পাঠমূলক কর্মের ফলাফল তিন-পয়েণ্ট স্কেলে (three-point scale) হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ সম্পর্কে পরপৃষ্ঠায় পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রকাশিত দু'খানি প্রগতি পত্রের উল্লেখ করা হল :

১। আলোচ্য অধ্যায়ের ১৭, ১৮, ১৯, ২০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তি-প্রগতি রেকর্ড কার্ড (কর্মশিক্ষা)

অভিজ্ঞতার তারিখ	অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র	ব্যক্তিগুণ					বিশেষ পটুতা						মনোভাব			আগ্রহ				বিষয় জ্ঞান ও বোধ				
		সময়ানুবর্তিতা	সহযোগিতা	নেতৃত্ব	শ্রমশীলতা	সামাজিকতা	সংগঠন ও	পরিচালনা,	কর্ম সম্পাদন,	যন্ত্রপাতি ব্যবহারে	কুশলতা,	কাঁচামাল ব্যবহার	কাজের প্রতি	সৃজন ধর্মিতার প্রতি	কর্মীদের প্রতি	তাত্ত্বিক জ্ঞান	আহরণে,	সমস্যা সমাধানে	সংগঠনে	ভাষা ও সাহিত্য	গণিত	বিজ্ঞান	ইতিহাস	ভূগোল

পঞ্চমান গ্রেডের বিস্তার : [৫] সাধারণ ছাত্রের তুলনায় খুব ভাল ৪% মাত্র
[৪] " " " " " ২৪% "
[৩] সাধারণ ছাত্রদের মত খুব ভাল ৪৪% মাত্র
[২] " ছাত্রের তুলনায় খারাপ ২৪% "
[১] " " " খুব খারাপ ৪% "

SOCIAL SERVICE (সমাজসেবা)

Roll No.	Names of boys	Date of Item No.	Award out of 10	Date & Item No.	Award out of 10.	Date & Item No.	Award out of 10.	Date & Item No.	Award out of 10.

ITEMS : (1) Nursing Units, (2) First Aid Squad, (3) 'Keep the Area Clean' Squad, (4) 'Teach the unlettered' Squad, (5) Observance Group : (i) Hero Day, (ii) National Integration Day, (iii) Social and Religious Reformer's Day, (iv) Science Day, etc.

(৬) **ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণ** (Personality traits): বুদ্ধিগত সামর্থ্য, সামাজিক গুণ, দৃষ্টিভঙ্গী, মনোভাব, দায়িত্বশীলতা, প্রতিনিধিত্বের শক্তি, আত্ম-বিশ্বাস, শিল্পপ্রবণতা ইত্যাদি বাঞ্ছনীয় গুণাবলী। নঞর্থক (negative) পরিচয়—যেমন, চৌর্যপ্রবণতা, লাজুক ভাব, মিথ্যা প্রবণতা ইত্যাদিও এখানে লিখিত হবে।

(৭) **বিশেষ প্রবণতা** (Special aptitude): এখানে পাঠপ্রবণতা, মৌলিকতা. শখ (hobbies) ইত্যাদি বিষয় থাকবে।

(৮) **শিক্ষার্থী সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য** (Reports from other sources): শিক্ষার্থীর সহপাঠী ও অন্যান্য বন্ধুদের নিকট থেকে তথ্য, সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য এই পর্যায়ে লেখা যেতে পারে।

(৯) **ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও কর্মজীবন সম্পর্কে ইঙ্গিত** (Educational and Vocational Prognosis): এখানে শিক্ষার্থীর ভাবী সম্ভাবনা সম্পর্কে ইঙ্গিত, পরিকল্পনা ও সম্ভাব্য তথ্য উল্লেখ থাকবে।

সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের সংরক্ষণ (Maintenance of the Record): সর্বাত্মক পরিচয়পত্র সংরক্ষণ করবেন শ্রেণীশিক্ষক। এক বছরের জন্য শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর দায়িত্ব-ভার তিনিই গ্রহণ করবেন। আর সেই শ্রেণীর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের (Subjects) শিক্ষকও হবেন তিনি। তাহলে অন্যান্য শিক্ষক অপেক্ষা তিনিই শিক্ষার্থীদের নিকট সান্নিধ্যে অধিকক্ষণ অতিবাহিত করার সুযোগ পাবেন ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। কোন কোন বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক এক শিক্ষাবর্ষব্যাপী একটি শ্রেণীর দায়িত্ব পালন করার পর পরবর্তী শ্রেণী-শিক্ষকের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। আবার কোন কোন বিদ্যালয়ে কোন একজন শিক্ষক প্রথম শ্রেণী থেকে দায়িত্ব গ্রহণের পর সেই শ্রেণী-শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় পরিত্যাগের বছর পর্যন্ত ঐ শ্রেণীর দায়িত্ব হাতে রাখেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের[1] মতে দুটি উপায়ের প্রত্যেকটিতেই যথেষ্ট সুবিধা আছে। আসল কথা, যে শিক্ষকের ওপর কোন শ্রেণীর দায়িত্ব থাকবে তাঁকে ঐ শ্রেণী-শিক্ষার্থীদের সর্বাপেক্ষা নিকটতম বন্ধু, দার্শনিক ও পরিচালক হতে হবে। তবে এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ যে, সর্বাত্মক পরিচয়লিপি যিনি সংরক্ষণ

1. Secondary Education Commission—Page 121.

করবেন তাঁকে যথেষ্ট দায়িত্বশীল, সুবিবেচক, বিশ্লেষক ও সুকৌশলী হতে হবে। এর জন্য পৃথক শিক্ষণ (Training) প্রদানের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন আশা প্রকাশ করেন[1]। প্রতিটি শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ে যদি সর্বাত্মক পরিচয়-লিপি সংগঠন ও সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক সর্বাত্মক পরিচয়লিপি সংরক্ষণ সম্ভব হবে। অন্যথায় ভুল তথ্য ও বিভ্রান্তিকর বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে পঙ্গু করে দেবে। তাই সর্বাত্মক পরিচয়লিপির সংরক্ষণ সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা করা—শিক্ষা-পুনর্গঠন পরিপ্রেক্ষিতে অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্য।

সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রের উপযোগিতা (Importance of Cumulative Record Card) ঃ

(১) বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিভাগীয় বা সাধারণী পরীক্ষা একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষা-জীবনের পরিপূর্ণ পরিচয় দিতে পারে না। এর জন্য তার শিক্ষার অগ্রগতিকে কেন্দ্র করে পরিপূর্ণ ও সঠিক পরিচয়-পত্র প্রয়োজন। সর্বাত্মক পরিচয়-পত্র শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরে।

(২) সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রের সাহায্যে আমরা শিক্ষার্থী, তার পারিবারিক ও সামাজিক পটভূমি, আগ্রহ, ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা ও সহায়ক কর্মে কৃতিত্ব ও নানা বিষয়ে প্রবণতা ইত্যাদি সবকিছু জানতে পারি।

(৩) এর দ্বারা অভিভাবক, মাতাপিতা, শিক্ষক ও শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শ-দাতা ইত্যাদি সকল শুভানুধ্যায়ী শিক্ষার্থীর শক্তি ও দুর্বলতা নির্ধারণ করে সম্ভাবনাময় জীবনের অগ্রগতির উপায় নির্দেশ করেন। পরিচয়পত্রের ইঙ্গিত অনুসারে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পরিচালিত করেন। নির্দেশনার ক্ষেত্রে এই পরিচয়পত্রের যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

---

1. Maintaining the records we need a certain amount of Training...... ......In order to maintain the Cumulative records properly the teacher will have to use a number of tests of different kinds ; intelligence tests, attainment tests, aptitude test and others. We expect that the State Bureau of Education which will prepare the forms of Cumulative records will also prepare these tests in collaboration with Training Colleges. There is need for continuous research in these fields."

—*Secondary Education Commission report*, Page 122.

(৪) শিক্ষার্থীর শিক্ষার গতি নির্ধারণ, বৃত্তি নির্বাচন ইত্যাদিতে পরিচয়-লিপি যেমন সাহায্য করে তেমনি কর্মে নিয়োগের সময় কর্মকর্তা কর্মপ্রার্থীর যোগ্যতা বিচারের সুযোগ পান।

(৫) সর্বাত্মক পরিচয়-লিপি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক বা শিক্ষার্থীর মাতা-পিতার মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করে।

১৭। শিক্ষায় ত্রুটি-নির্ণায়ক অভীক্ষা (Diagnostic Tests) ঃ *

মৌলিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের *Diagnostic* শব্দটিকে শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে। চিকিৎসক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগীর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করেন ও রোগের লক্ষণগুলি আবিষ্কার করেন। এরপর রোগের লক্ষণ অনুসারে তিনি ঔষধ প্রয়োগ করেন এবং রোগী রোগমুক্ত হল কিনা তা লক্ষ্য রাখেন। রোগীকে রোগমুক্ত না করা পর্যন্ত চিকিৎসক তাঁর সাধ্যমত পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করতে থাকেন। শিক্ষার্থীকে উন্নততর শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক ঐ একই ভূমিকা পালন করেন। তিনি পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা কোথায় তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন ও দুর্বলতার কারণ সন্ধান করে শিক্ষার্থীর শিক্ষায় সাহায্য করেন। শিক্ষার্থীর দুর্বলতার কারণ সন্ধানের সময় শিক্ষককে চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করতে হয়। তাঁকে শিক্ষার্থীর ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষার (diagnostic test) সাহায্য নিতে হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই অভীক্ষা মূলতঃ অর্জিত জ্ঞানের অভীক্ষা। তাই এই প্রক্রিয়া বিশেষ বিশেষ শিক্ষামূলক বিষয়ের ক্ষেত্রে সীমিত থাকে।

বর্তমানে শিক্ষামূলক নানা বিষয়ের মধ্যে গণিত ও পঠন বিষয়ে ত্রুটি-নির্ণায়ক অভীক্ষার বহুল প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। **গণিতে ত্রুটি নির্ণয় করার** জন্য বিশেষভাবে প্রচলিত অভীক্ষাটির নাম হল ঃ Compass Diagnostic Test in Arithmetic. এই অভীক্ষাটি প্রাথমিক থেকে নিম্ন মাধ্যমিকের (সাধারণতঃ দ্বিতীয়—অষ্টম শ্রেণী) ছাত্রদের জন্য তৈরি। এই অভীক্ষায় ২০টি অংশ এবং প্রতিটি অংশের জন্য ছোট ছোট টুকরো প্রশ্ন আছে। এই অভীক্ষা গ্রহণের সময়-সীমা নির্দিষ্ট করা থাকে।

* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুসারে পরিবেশন করা হল ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ নম্বর অনুচ্ছেদ।

গণিতের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় একটি অভীক্ষার নাম Diagnostic test for fundamental process in Arithmetic. এটি এক ধরনের মৌখিক অভীক্ষা। কারণ পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর মুখে মুখে দিয়ে দেয়। এছাড়া আজকাল শিক্ষামূলক বিষয়গত ত্রুটি নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট গবেষণা চলছে ও নতুন নতুন পদ্ধতি প্রবর্তিত হচ্ছে।

পঠনের জন্য দু-ধরনের অভীক্ষার প্রচলন লক্ষ্য করা যায় ; যথা—প্রস্তুতি-মূলক এবং ত্রুটি নির্ণায়ক অভীক্ষা। প্রস্তুতিমূলক অভীক্ষাগুলি সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণীতে বা শিশু যখন প্রথম পড়তে শেখে তখনই প্রয়োগ করা হয়। এরূপ উল্লেখযোগ্য অভীক্ষাগুলি হল : (ক) American School Reading Readiness Test. (খ) Gates Reading Readiness Test. (গ) Metropolitan Readiness Test ইত্যাদি। সাধারণতঃ শব্দ পরিচয়, শব্দ গঠন, ছবি ও অক্ষর পরিচয়, শব্দ নির্বাচন, চিত্র ও শব্দের মিলন, জ্যামিতির ছবি, চিহ্ন ইত্যাদি উপাদান নিয়ে উক্ত অভীক্ষাগুলি তৈরি।

পঠনের ত্রুটি, বা দুর্বলতা নির্ণায়ক অভীক্ষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : (ক) Gates Reading Diagnostic Test. (খ) Durrell Analysis of Reading Difficulty, (গ) Rosswell-Chall Diagnostic Reading Test ইত্যাদি। এসব অভীক্ষাতেও অক্ষর ও শব্দ থেকে সূত্রপাত করে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় পঠন-পাঠনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উক্ত অভীক্ষাগুলি আদর্শায়িত ও সুপরিকল্পিত। এসব অভীক্ষা শিক্ষার্থীর দুর্বলতা নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল। তাই শিক্ষকরা অনায়াসে ছাত্রের দুর্বলতা দূর করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন।

১৮। আগ্রহ-পরিমাপক তালিকা (Interest inventories) ঃ

কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য তার ক্ষমতা, প্রবণতা, আগ্রহ প্রভৃতি পরিমাপের প্রয়োজন হয়। শিক্ষা বা কোন বৃত্তিতে ব্যক্তির আগ্রহ ও সামর্থ্য কতটুকু তার বিচার যত বিশুদ্ধ হবে ততই ঐ ব্যক্তির বা ছাত্রের ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ দানের সুবিধা হয়। কোন কোন বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রের সাধ্য বা দক্ষতা অথবা সামর্থ্য থাকতে পারে, কিন্তু হয়ত তার সাধ বা আগ্রহ থাকে না। তাই ব্যক্তির দক্ষতা পরিমাপের সঙ্গে আগ্রহের পরিমাপ

করা অত্যাবশ্যক। শিক্ষামূলক অথবা বৃত্তিমূলক পরিচালনায় আগ্রহ পরিমাপের ফলাফল অপূর্ব সহায়ক।

আগ্রহ পরিমাপের সর্বাপেক্ষা সহজতর উপায় হল অভীক্ষার্থীকে সরাসরি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা। প্রশ্নের উত্তর থেকে তার আগ্রহের স্বরূপ সন্ধান করা যায়। কিন্তু সরাসরি জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নের উত্তর থেকে যে ফলাফল পাওয়া যায়—তা সব সময় বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হয় না। কারণ:

(১) অপরিণত বয়স্ক শিক্ষার্থী যে-সব পাঠ্যবিষয় বা বৃত্তি সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে সে সব বিষয় বা বৃত্তি সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না।

(২) পিতামাতা বা অভিভাবকরা চান যেন তাঁর সন্তান ডাক্তার হোক্। কিন্তু সে সন্তান হয়ত কোন পশুর রক্ত দেখলে বিব্রত বোধ করে। পিতার বা জনমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক শিক্ষার্থী অনুরূপ আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে। সুতরাং সরাসরি পাওয়া উত্তর বিশ্লেষণ করে ছাত্রের আগ্রহ সম্পর্কিত ধার্য ফলাফল বিশুদ্ধ নাও হতে পারে।

এই সব অসুবিধা থাকার দরুণ আজকাল মনোবিজ্ঞানীরা সরাসরি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পরিবর্তে পরোক্ষ ও প্রচ্ছন্ন উপায়ে আগ্রহ পরিমাপের চেষ্টা করেন।

কোন ব্যক্তির আগ্রহ পরিমাপের জন্য অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আগ্রহের স্বরূপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। আগ্রহ হল মূলতঃ বস্তু বা কর্মভিত্তিক। কোন না কোন বস্তু বা কর্ম ব্যক্তিকে তৃপ্তি বা আনন্দ দান করে। যে কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যক্তি আনন্দ পায় সেই কাজের জন্য তার মনে আসে প্রেষণা (motive)। এই প্রেষণা ব্যক্তিকে কর্মে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। আগ্রহের দ্বারা তার কর্ম-দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তাহলে প্রেষণা বা কর্মে তৃপ্তিই হল মূল কথা। কারণ, কোন্ কাজে কতটুকু আগ্রহ আছে তা পরিমাপ করতে পারলে শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক নির্দেশনায় ও সুপরিচালনায় সুফল পাওয়া যায়।

আগ্রহ পরিমাপক আধুনিক পদ্ধতিগুলির মধ্যে মিঃ ই. কে. স্ট্রং (*Mr. E. K. Strong*) কর্তৃক আবিষ্কৃত পদ্ধতির বিষয় সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মিঃ স্ট্রং-এর অভীক্ষাটির নাম Vocational Interest Blank; সংক্ষেপে VIB বলে পরিচিত।

মিঃ স্ট্রং দেখেছেন যে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত দক্ষ ব্যক্তিবর্গের বা ভিন্ন ভিন্ন

দলের ভিন্ন ভিন্ন আগ্রহ থাকে। এরূপ আগ্রহের আধিক্যের দরুণ এক এক দল এক এক প্রকার বৃত্তিতে দক্ষ হয়ে ওঠে। এরূপ আগ্রহ শিক্ষার্থীর আছে কিনা তা বিশেষভাবে বিচার করে শিক্ষার্থীর বৃত্তি সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া যায়।

VIB অভীক্ষার তালিকায় মিঃ স্ট্রং চারশটি প্রশ্ন সংযোজিত করেন। তাঁর তালিকায় নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক অভীক্ষা আছে। সতের বা তার ঊর্ধ বয়স্ক নারী-পুরুষের জন্য এগুলি প্রয়োগ করা হয়।

নিম্নে অভীক্ষার বিষয় ও তার প্রশ্ন সংখ্যা দেওয়া হল :

	বিষয়	প্রশ্নসংখ্যা
(১)	বৃত্তি	১০০
(২)	স্কুলপাঠ্য বিষয়সমূহ	৩৬
(৩)	আমোদ-প্রমোদ	৪৯
(৪)	বিচিত্র কার্যাবলী	৪৮
(৫)	মানুষের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যাবলী	৪৭
(৬)	পছন্দসই কর্ম	৪০
(৭)	বিভিন্ন কর্মের তুলনা	৪০
(৮)	বর্তমান কর্মক্ষমতা	৪০
		৪০০

প্রতিটি প্রশ্নের পাশে LID লেখা থাকে। L অর্থাৎ পছন্দ (Like), I অর্থাৎ উদাসীন (Indifference) এবং D অর্থাৎ অপছন্দ (Dislike)। অভীক্ষার্থীকে এই তিনটি অক্ষরের যে কোন একটিতে পছন্দ মত দাগ দিতে বলা হয়। যেমন—

	পছন্দ Like	উদাসীন Indifference	অপছন্দ Dislike
১। শিক্ষক			
২। সেনানায়ক			
৩। ক্রীড়া পরিচালক			
৪। অভিনেতা			
৫। কলাবিদ			

পূর্ব পৃষ্ঠার পরীক্ষাটি প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল (Empirical Approach)। তাই এর যাথার্থ্য, নির্ভরশীলতা যথেষ্ট সন্তোষজনক ও উন্নত মানবিশিষ্ট।

আগ্রহ পরিমাপের অন্য একটি নির্ভরশীল অভীক্ষার নাম কুডার প্রেফারেন্স রেকর্ডস (Kudar Preference Records)। মিঃ কুডার ছিলেন এর উদ্ভাবক। মাধ্যমিক স্তরের উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষার্থী এবং বয়স্কদের জন্য এই অভীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এই পরিমাপকের দ্বারা কোন বিশেষ বৃত্তি সম্পর্কে আগ্রহ পরিমাপ করা যায় না; বরং অনেকগুলি ব্যাপক বিষয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সম্পর্কে জানা যায়। মিঃ কুডার তিন প্রকার রেকর্ড বা তালিকা তৈরি করেছেন: (১) বৃত্তিমূলক, (২) পেশা বা কর্মমূলক ও (৩) ব্যক্তিগত।

প্রথমতঃ, বৃত্তিমূলক বিষয়ের মধ্যে আছে দশটি এলাকা; যেমন—যন্ত্র, গণনা, বিজ্ঞান, চারুকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত, সমাজসেবা, কারণিক, মুক্তস্থানগত বৃত্তি, প্রত্যয় উৎপাদনমূলক বৃত্তি।

দ্বিতীয়তঃ, পেশা বা কর্মমূলক তালিকায় আছে আটত্রিশটি পেশা সম্পর্কিত অভীক্ষা; যেমন—কৃষক, সংবাদপত্রের সম্পাদক, জাদুকর, চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, স্থপতি, মন্ত্রী, এঞ্জিনিয়ার. বস্ত্রবিক্রেতা ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত বিষয়ের তালিকায় আছে আচরণগত বৈশিষ্ট্যের কথা। এগুলি পাঁচটি ব্যাপক অংশে বিভক্ত; যথা—

(১) দলের মধ্যে সক্রিয় হওয়া; যেমন বীমাকোম্পানির এজেন্ট, ধর্মযাজক, বিশেষ শিল্পের যন্ত্রবিদ ইত্যাদি।

(২) সুপরিচিত ও স্থায়ী পরিবেশে থাকা; যেমন—কৃষক, মিস্ত্রী, শিক্ষক ইত্যাদি।

(৩) চিন্তামূলক পেশা; যেমন—অধ্যাপক, লেখক, কোন সংস্থার পরিচালক ইত্যাদি।

(৪) বিবাদ এড়িয়ে চলার কাজ; যেমন—চিকিৎসক, হিসাবরক্ষক, অধ্যাপক ইত্যাদি।

(৫) পরিচালনধর্মী কাজ; যেমন—ব্যারিস্টার, অধ্যক্ষ, পুলিস, ক্রীড়া-পরিচালক ইত্যাদি।

লক্ষ্য করা যায় যে, উক্ত তিন ধরনের (বৃত্তিমূলক, পেশামূলক, ব্যক্তিগত) তালিকায় অনেকগুলি পদ বা বিষয় আছে। প্রতিটি পদের মধ্যে তিনটি করে উক্তি বা কাজের বিষয় উল্লেখ করা থাকে। যেমন :

উক্তি	সবচেয়ে পছন্দ	সবচেয়ে অপছন্দ
(ক) (১) স্বাক্ষর সংগ্রহ করা (২) মুদ্রা সংগ্রহ করা (৩) ডাকটিকিট সংগ্রহ করা		
(খ) (১) মাছ ধরা (২) ফুটবল খেলা (৩) ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম করা		

শিক্ষার্থীকে উক্ত উক্তিগুলির যেটি সবচেয়ে পছন্দ এবং যেটি সবচেয়ে অপছন্দ সেই দুটিতে চিহ্ন দিতে বলা হয়। এইভাবে একপ্রকার জোর করেই শিক্ষার্থীর দ্বারাই তার অগ্রাধিকারী কাজটিকে বেছে নেওয়া হয়। তাই এই প্রক্রিয়াকে বাধ্যতামূলক নির্বাচনও (Forced-choice) বলা হয়।

ধরা যাক, উল্লিখিত দশটি বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রের প্রতিটির জন্য তিনটি উক্তি নিয়ে কোন শিক্ষার্থীর আগ্রহ পরীক্ষা করা হল এবং নম্বর বসানো হল। এবার ঐ নম্বর বা স্কোরকে শতাংশে পরিণত করা যায়। এইভাবে প্রাপ্ত শতাংশ-গুলিকে সারিতে সাজানো হল (Percentile Rank)। এই শতাংশ সারি দেখে কোন শিক্ষার্থীর কোন্ বৃত্তিতে কতটুকু আগ্রহ আছে তা জানা যায়। এরপর ঐ শতাংশ সারির সংখ্যাগুলি থেকে রেখচিত্র (Profile) অঙ্কন করা সহজ। রেখচিত্র দেখলে সরাসরি শিক্ষার্থীর ভিন্নভিন্ন বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রে আগ্রহের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। শিক্ষার্থীর আগ্রহের পরিমাণ নিয়ে তার ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ দান করা যেতে পারে। তাই এগুলি সর্বাত্মক বিবরণ তালিকায় (Cumulative Record Card) উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

১৯। প্রবণতা পরিমাপক অভীক্ষা (Aptitude Test):

ইংরাজী *Aptitude* শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দরূপে আমরা 'প্রবণতা' শব্দটি ব্যবহার করি। প্রবণতার সমপ্রায় আরও কয়েকটি শব্দ আছে যেগুলি ঐ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুধাবনে বাধা সৃষ্টি করে; যেমন—মনোভাব, ক্ষমতা, দক্ষতা, ধারণক্ষমতা প্রভৃতি। সুতরাং এরূপ সমপ্রায় শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি অনুধাবন করা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য।

মনোভাব (attitude) হল এক ধরনের মানসিক কাঠামো বা সংগঠন। ব্যক্তি তার এই মানসিক সংগঠনের প্রভাবে কোন পরিবেশ, প্রথা, রীতি-নীতি বা সংগঠনের প্রতি এক বিশেষ ধরনের আচরণ করে। ব্যক্তির হাব-ভাব, কথাবার্তা, আচার-আচরণ থেকে মনোভাব ব্যক্ত হয়।

ক্ষমতা বলতে আমরা কাজ করার শক্তিকে (ability) বুঝি। যেমন যার নাচের ক্ষমতা আছে সে ভাল নাচতে পারে—যার লেখার ক্ষমতা আছে সে ভাল লিখতে পারে—সঙ্গীতে ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ভাল গাইতে পারে। কাজ অনেকেই হয়ত করতে পারে। যে ব্যক্তি যে কাজ সুন্দরভাবে করে সেই ব্যক্তির সেই কাজে দক্ষতা (skill) আছে বলে আমরা ধরি।

ধারণক্ষমতা (capacity) বলতে আমরা কোন ব্যক্তির সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে বুঝি। ধারণ ক্ষমতার অধিক উচ্চে সে পৌঁছাতে পারে না।

সমপ্রায় শব্দ হলেও প্রবণতা (aptitude) ভিন্নতর এক ধরনের মানসিক অবস্থা বা গুণ (Trait)। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে থাকে সুপ্ত শক্তি। প্রবণতা এই শক্তিকে জাগাতে পারে। তবে প্রবণতা সর্বদা শিক্ষার্থীর বর্তমান মানসিক অবস্থা বা গুণ। বর্তমানের মানসিক অবস্থা ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ দিতে পারে।

প্রবণতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা কয়েকটি লক্ষণের কথা বলেন। (১) সকল বিষয়ের প্রতি ব্যক্তির প্রবণতা সমান নয়। (২) ব্যক্তিবৈষম্য অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রবণতা ভিন্ন ভিন্ন। (৩) বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ প্রবণতা সচারাচার অপরিবর্তিত। তবে প্রবণতার মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে মাত্র। অভীক্ষার সাহায্যে এই বিশেষ প্রবণতার সন্ধান মিললে যে-কোন শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ দেওয়া যুক্তিযুক্ত। প্রবণতার অভীক্ষার সাহায্যে সেই বিশেষ প্রবণতার সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রবণতা পরিমাপের অভীক্ষা তৈরির জন্য কয়েকটি নিয়ম মেনে চলতে হয়। যেমন, যে কাজ বা গুণের (Trait) অভীক্ষা তৈরি করা হবে তার সংজ্ঞা প্রথমে নির্ণয় করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, সেই কাজ বা গুণ বিশ্লেষণ করা সহজ হবে এমন প্রশ্ন রচনা করতে হয়। কর্মের ক্ষেত্রে যখন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয় এবং যখন কোন ব্যক্তিকে উচ্চতর পদে উন্নীত করা হয় তখন এই অভীক্ষা প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত।

প্রবণতা পরিমাপের কয়েকটি অভীক্ষা: সাধারণ প্রবণতা ও বিশেষ প্রবণতা পরিমাপের জন্য পৃথক পৃথক অভীক্ষা রয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রবণতা পরীক্ষা করে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ও পরিচালনার জন্য Differential Aptitude Test বিশেষ উপযোগী। এটি আমেরিকার সাইকোলজিক্যাল কর্পোরেশনের প্রচেষ্টায় উদ্ভূত। এই অভীক্ষার দ্বারা মোট ৮টি বিষয় সুস্পষ্টরূপে পরীক্ষা করা যায়; যথা: (ক) ভাষা সংক্রান্ত যুক্তি (Verbal Reasoning), (খ) সংখ্যামূলক সামর্থ্য (Numerical Ability), (গ) বিমূর্ত বিষয়ক যুক্তি (Abstract Reasoning), (ঘ) ক্ষেত্র সংক্রান্ত সম্পর্ক (Space Relation), (ঙ) যন্ত্রমূলক যুক্তি (Mechanical Reasoning), (চ) করণিক দ্রুততা ও বিশুদ্ধতা (Clerical Speed and Accuracy), (ছ) ভাষা ব্যবহার (Language Usage)। শেষোক্তটির দুটি অংশ, যথা—বানান সংক্রান্ত ও বাক্য সংক্রান্ত।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অভীক্ষা হল: Flanagan Aptitude Classification Test। এটিকে বৃত্তিমূলক প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা হয়। মোট ২১টি বৃত্তি নিয়ে এই অভীক্ষাটি তৈরি। কোন কোন অভীক্ষা কাগজ-কলম দিয়ে পরিচালনা করা হয়, আবার কতকগুলি অভীক্ষা কর্মসম্পাদনার মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়।

সাধারণ প্রবণতা অভীক্ষার জন্য এরূপ (ক) General Aptitude test Battery, (খ) Guilford-Zimmerman Aptitude Survey ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

বিশেষধর্মী প্রবণতা অভীক্ষার জন্য এরূপ নানা ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যেমন, ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত প্রবণতা (Sensory Aptitude) পরিমাপের জন্য দৃষ্টিশক্তি অভীক্ষা, শ্রবণশক্তির অভীক্ষা, হস্তপদাদি সঞ্চালনমূলক অভীক্ষার

প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। যন্ত্রমূলক প্রবণতা (Mechanical Aptitude) পরীক্ষার জন্য—(ক) Assembly test for General Mechanical Ability, (খ) Minnesota Mechanical Assembly Test, (গ) Minnesota Spatial Relation Test, (ঘ) Bennett Tests for Mechanical Comprehension ইত্যাদি ছাড়াও কারণিক, সঙ্গীতমূলক, চারুকলামূলক প্রবণতার পরীক্ষা পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রবণতা পরীক্ষার জন্য সাধারণ-ধর্মী অভীক্ষাগুলি ফলপ্রসূ। বৃত্তিতে নিয়োগ ও পদে উন্নীতকরণের জন্য বিশেষধর্মী প্রবণতা অভীক্ষাগুলি খুবই কার্যকর।

২০। রেটিং স্কেল (Rating Scale):

মনোবিজ্ঞানীরা বহুকাল ধরে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে আসছেন। নানা উপাদান নিয়ে মানুষের ব্যক্তিসত্তা গঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য উপাদানগুলি হল ব্যক্তির শারীরিক বৈশিষ্ট্য (Physical aspects) ও নানা প্রকার গুণ বা দৃষ্টিভঙ্গী (Traits)। শারীরিক বৈশিষ্ট্য বলতে ব্যক্তির চেহারা (Personal appearance), জীবনের সুখ-সুবিধা সংক্রান্ত ব্যাপারে সচেতনতা (Recognition of the amanities of life), কণ্ঠস্বর (Voice), ভাষা (Language), স্বাস্থ্য (Health) ইত্যাদিকে বোঝায়। ব্যক্তির গুণ বা দৃষ্টিভঙ্গী বলতে বন্ধুত্ব (Friendliness), সহানুভূতি ও বোধ (Sympathy and understanding), আন্তরিকতা (Sincerity), ধৈর্য (Patience), উৎসাহ (Enthusiasm), আশাবাদিতা (Optimism) ইত্যাদিকে বোঝায়। প্রথমদিকে পর্যবেক্ষণ করে ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা করার রীতি প্রচলিত ছিল। আধুনিক যুগে ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত নানা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। তার মধ্যে রেটিং স্কেল (Rating Scale) অন্যতম পরিমাপক পদ্ধতি। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে সুচিন্তিত ও সুসংহত ব্যাখ্যা প্রদানের প্রণালীকে এক কথায় রেটিং স্কেল বলা হয়। তবে রেটিং স্কেল প্রয়োগ-পদ্ধতির রকমারী বিদ্যমান।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য সহপাঠী, শিক্ষক, উপদেষ্টা, পরিদর্শক, পিতামাতা, অভিভাবক প্রভৃতি যে-কোন ব্যক্তি এই রেটিং স্কেল ব্যবহার করতে পারেন। চাকরির ক্ষেত্রে দলভুক্ত যে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা

পরিমাপের জন্য কর্তৃপক্ষ এরূপ পরিমাপক ব্যবহার করেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই নিজের দৃষ্টিভঙ্গী বিচার করতে পারেন। এরূপ বিচারকে আত্ম-পরিমাপ (Self-rating) বলা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে রেটিং স্কেলটি অন্যের দ্বারা তৈরি অথবা আদর্শায়িত (Standardised) হলে ভাল হয়। ছাত্রদের ক্ষেত্রে রেটিং স্কেলের দ্বারা পরিমাপের ফলাফল সর্বাত্মক পরিচয় পত্রে (Cumulative Record Card) লিপিবদ্ধ করা বা রেকর্ড করা যুক্তিযুক্ত। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে রেটিং স্কেলের পরিমাপ তাঁদের যোগ্যতা বৃদ্ধির সহায়ক।

সাধারণতঃ পাঁচ বা সাত মাত্রার রেটিং স্কেল ব্যবহারের রীতি প্রচলিত। এরূপ নির্দিষ্ট মাত্রাযুক্ত স্কেল অনুসারে পরিমাপক কোন ব্যক্তির গুণ বা দৃষ্টিভঙ্গীর মাত্রা অনুযায়ী এক থেকে পাঁচ বা এক থেকে সাতের মধ্যে নম্বর দিতে পারেন। যেমন, রাম, শ্যাম ও যদু—কে কতটুকু আত্মবিশ্বাসী তা বিচার করা হবে। এর জন্যে নিম্নরূপ পাঁচ মাত্রার রেটিং স্কেল ব্যবহার করা চলে:

	রেটিং স্কেল	রাম	শ্যাম	যদু
৫—	অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী			
৪—	প্রায় সর্বক্ষেত্রেই আত্মবিশ্বাসী	√		
৩—	অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী			√
২—	মোটমুটি আত্মবিশ্বাসী			
১—	কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী		√	
০—	কোন ক্ষেত্রেই নিজের ওপর বিশ্বাস নেই			

উল্লিখিতরূপ স্কেল পরিমাপকরাই ব্যবহার করতে পারেন। কারণ কোন ছাত্রের ব্যক্তিত্ব পরিমাপের সময় অভীক্ষার্থীর কাছে দিলে সে সর্বাপেক্ষা উত্তমটিতেই টিক্ চিহ্ন দেবে।

এছাড়া অন্য একটি উপায় হল, কোন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীর মাত্রা অনুযায়ী কয়েকটি উত্তর দিয়ে স্কেল তৈরি করা হয়। অভিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছা অনুসারে

সেই সব প্রশ্নের উত্তরে চিহ্ন দেবে। পরিমাপক সেই চিহ্ন অনুসারে নম্বর দিতে পারেন। নিম্নে এরূপ পাঁচ মাত্রা স্কেলের একটি নমুনা দেওয়া হল।

সুখ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা	এমন বাড়ী চাই যেখানে সকল প্রকার সুবিধা থাকবে।	এমন বাড়ী চাই যেথানে বেশী সুবিধা থাকবে।	এমন বাড়ী চাই যেখানে মোটা-মুটি সুবিধা থাকবে।	কিছু সুবিধা থাকলেই সে বাড়িতে থাকা যায়।	যেমন তেমন একখানা বাড়ী হলেই হল।
সামাজিকতা	মিলেমিশে থাকতে খুব বেশী পছন্দ করি।	মিলেমিশে থাকতে বেশ পছন্দ করি।	মোটামুটি সবার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে থাকার চেষ্টা কবি।	মেলামেশা করতে ভাল লাগে না। তবে প্রযোজন হলে মেলামেশা করি	লোকের সঙ্গে মিশতে মোটেই পছন্দ করি না।

উক্ত তালিকায় অভীক্ষার্থী নিজেই চিহ্ন বসাবে, তারপর পরিমাপক সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে নিজের স্কেল অনুসারে নম্বর দিতে পারেন। উক্ত তালিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি রেটিং স্কেল তৈরি করা হল :

সুখ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা	খুব বেশী সচেতন	বেশী সচেতন	মোটামুটি সচেতন	কোন কোন ক্ষেত্রে সচেতন	উদাসীন
সামাজিকতা	খুব বেশী সামাজিক	বেশী সামাজিক	মাঝামাঝি সামাজিক	অল্প সামাজিক	সামাজিক নয়

রেটিং স্কেলের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করা যায় সত্য, কিন্তু এটি নির্ভর করে পর্যবেক্ষণের বিশুদ্ধতার ওপর। বিশুদ্ধ পর্যবেক্ষণ হলে মতামত জ্ঞাপনও বিশুদ্ধ হয় এবং সুসংহত উপায়ে সেগুলি লিপিবদ্ধ করা যায়। তবে বিশুদ্ধ ফল পেতে হলে যে-সব বিষয়ের ওপর দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক সেগুলি পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হল :

(ক) যে-সব গুণ বা দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা প্রয়োজন সেগুলির সংজ্ঞা সুস্পষ্ট নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। সংজ্ঞা সুস্পষ্ট হলে বিচারকদের পক্ষে নম্বর দান করা অনেকখানি ত্রুটিমুক্ত হয়।

(খ) রেটিং স্কেল তৈরির সময় নির্দিষ্ট গুণের মাত্রাগুলি যাতে সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য হয় সেদিকে নজর রাখা প্রয়োজন। তাহলে আশা করা যায়, অভীক্ষকরা আন্দাজে নম্বর বসাবেন না।

(গ) ফলাফলকে নির্ভরযোগ্য করার জন্য সর্বক্ষেত্রে এক একটি বিষয়ের জন্য একাধিক পরিমাপক নিয়োগ করা কর্তব্য।

(ঘ) পরিমাপের সময় অনেক পরীক্ষক পক্ষপাতিত্ব (Halo Effect) দোষে দুষ্ট হতে পারেন। পরীক্ষাকে নিরপেক্ষ করার জন্য এক একটি গুণের বিচার এক এক সময় করা উচিত। তাহলে একটি দৃষ্টিভঙ্গীর রেটিং অন্যটিকে প্রভাবিত করতে পারে না।

২১। পাঠোন্নতি ও উত্তরণ (Progress and Promotion) ঃ

প্রাক্-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ স্তর পর্যন্ত পড়াশুনা করে একজন শিক্ষার্থী তার বিদ্যালয় জীবন শেষ করে। প্রাক্-প্রাথমিক স্তর পৃথক না হলে প্রাথমিক স্তরের সঙ্গে পরিচালিত হয়। শিশুরা চতুর্থ শ্রেণীতে বা পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক স্তর শেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়। উক্ত শ্রেণী থেকে ক্রমান্বয়ে দশম বা দ্বাদশ* শ্রেণীর পাঠ শেষ করে শিক্ষার্থী মাধ্যমিক স্তরের পাঠ শেষ করে। এই হল আমাদের দেশের প্রচলিত বিদ্যালয়ের শিক্ষাস্তর (Educational ladder)। বিদ্যালয় জীবনে শিক্ষার্থীকে **দুটি সাধারণী** পরীক্ষায় পাস করতে হয়—প্রথমটির **প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা**, দ্বিতীয়টি **স্কুল ফাইন্যাল** অথবা **মাধ্যমিক** পরীক্ষা, তৃতীয়টি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা।* এছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণীর নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীরা **বৃত্তি পরীক্ষা** দিতে পারে। তবে এটা আবশ্যকীয় (Compulsory) নয়। বিদ্যালয় জীবনে শিক্ষার্থীকে **অনেকগুলি অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায়** পাস করতে হয়। প্রথমতঃ, প্রতিটি শ্রেণীর

পাঠোন্নতি ও উত্তরণ

* উচ্চ মাধ্যমিক স্তরটিকে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিচার করা হয় না। অনেকের মতে এটি কলেজ স্তরের একটি অংশ।

শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবর্ষ শেষে **বার্ষিক পরীক্ষায়** (Annual Examination) উত্তীর্ণ হতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ে **সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, প্রান্তিক** ইত্যাদি পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে। এসব পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর পাঠোন্নতির (Progress) দিকে লক্ষ্য করা হয়। বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের (Examination Result) ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী পরবর্তী উচ্চ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ (Promoted) হয়।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যায়, পাঠোন্নতি (Progress), পরীক্ষা (Examination) এবং উত্তরণ (Promotion)—এই তিনটি বিষয় শিক্ষার্থীর সার্বিক বৃদ্ধি (total growth) ও বিকাশের (development) সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। শিক্ষার্থীর শিক্ষাবর্ষের পাঠোন্নতি অথবা নির্দিষ্ট বিদ্যালয় স্তরের পাঠোন্নতি (প্রাথমিক, মাধ্যমিক) বার্ষিক পরীক্ষা অথবা ফাইন্যাল পরীক্ষার (প্রাথমিক ফাইন্যাল, স্কুল ফাইন্যাল বা মাধ্যমিক ফাইন্যাল ইত্যাদি) মাধ্যমে বিচার করা হয় এবং তার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে উচ্চতর পরবর্তী শ্রেণীতে বা শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীর উত্তরণ (Promotion) হয়।

পাঠোন্নতি, পরীক্ষা ও উত্তরণ

শিক্ষার্থীর পাঠোন্নতি বিচার করা হয় দুটি ধারার সমন্বয়ে। **প্রথমটি** হল **আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা** (Formal Examination), যেমন—লিখিত পরীক্ষা। রচনাধর্মী, বিষয়াত্মক, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর পরীক্ষা—এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। এর সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল যুক্ত হতে পারে। **দ্বিতীয়টি** হল **অনিয়মিত পরীক্ষা** (Informal examination)। যেমন—পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান-তালিকা (Check-list), আরোপিত কর্মভিত্তিক অভীক্ষা (Assignment Test), নানা ধরনের খতিয়ান (Pupils diary, Anecdotal records, Cumulative records etc.), ইন্টারভিউ (Interview), প্রশ্নোত্তর (Questionnaire) ইত্যাদি। বস্তুতঃ আনুষ্ঠানিক ও অনিয়মিত অভীক্ষা উভয়ের ফলাফলের সমন্বয়েই একজন শিক্ষার্থীর পূর্ণাঙ্গ পাঠোন্নতি বিচার সম্ভব হয়। পাঠোন্নতি বিচার-প্রসঙ্গে শুধু আনুষ্ঠানিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর গুরুত্ব দেওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

পাঠোন্নতির বিচার

গতানুগতিক পরীক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয় সংখ্যাগত নম্বরের ভিত্তিতে। এতে পার্সেন্টাইল প্রথায় (Parcentile System)

সাফল্যাঙ্ক দানের প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন সংখ্যাগত নম্বরের পরিবর্তে পাঁচ পয়েন্ট স্কেল অথবা তিন পয়েন্ট স্কেল (five point/three point scale) ব্যবহারের বিষয়টি অনুমোদন করেছেন। A. B. C. D. বা প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী ইত্যাদির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর নামের আক্ষরিক ক্রম অনুসারে ফল প্রকাশের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। এছাড়া সাধারণী পরীক্ষার সংখ্যা হ্রাস করে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যুক্তিযুক্ত বলে কমিশন মত প্রকাশ করেন। চিরাচরিত পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের সঠিক মূল্যায়নের পরিমাপক হিসেবে পরীক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থাকে যথার্থ, নির্ভরযোগ্য ও প্রয়োগযোগ্য করে তোলা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাহলে শিক্ষার্থীর প্রগতিতে ও পাঠোন্নয়নে সঠিক পথ অবলম্বন করা সম্ভব হবে।

নম্বরদানের ও শ্রেণী-বিভক্ত করণের স্বরূপ*

২২। শিক্ষণ যোগ্যতার পরিমাপ (Measurement of Teaching efficiency) :

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী শেখে এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভে সাহায্য করেন। নানা ধরনের পরীক্ষা বা অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অধীত বিদ্যা, শিক্ষালাভের যোগ্যতা, তার বুদ্ধি, আগ্রহ ও প্রবণতা পরিমাপ করা হয়। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে তাঁর শ্রেণী পরিচালন দক্ষতা, বিষয়বস্তুর জ্ঞান, শিক্ষণ কর্মের প্রতি অনুরাগ, স্বীয় অভ্যাস, জ্ঞানার্জনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করার প্রবণতা ও দক্ষতা নিয়ে শিক্ষাদান-প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন। তাঁর যোগ্যতার ওপর শিক্ষার্থীর শিক্ষা নির্ভর করে। **শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের সামর্থ্য পরীক্ষা করার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি শিক্ষকের শিক্ষণ-যোগ্যতা পরিমাপেরও প্রয়োজন হয়।**

শিক্ষকের শিক্ষণযোগ্যতা পরিমাপের জন্য **নিম্নরূপ বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন :**

(১) বিষয়বস্তুর জ্ঞান (Knowledge of Subject matter), (২) পাঠটীকা পরিকল্পনা (Lesson Plan), (৩) উপযুক্ত পদ্ধতি (Suitable method), (৪) প্রকাশ করার শক্তি (Power of expression), (৫) শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ (Pupil participation) বা শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করায় শিক্ষকের ক্ষমতা, (৬) শিক্ষকের মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তি (Teachers originality and Resourcefulness) এবং (৭) ব্যক্তিগত গুণাবলী (Personal qualities)।

* 'পরীক্ষা সংস্কার প্রসঙ্গে' অংশে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া ব্লাকবোর্ড ব্যবহার, সুন্দর হস্তাক্ষর, কণ্ঠস্বর, শিক্ষোপকরণ ও তার ব্যবহার, প্রশ্ন তৈরি ও জিজ্ঞাসার কৌশল, ভাষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়গুলিও শিক্ষণ-যোগ্যতার সঙ্গে অন্বিত।

উল্লিখিত বিষয়গুলি মোটামুটি পাঠ-পরিকল্পনা ও শ্রেণীকক্ষে তার প্রয়োগ-পদ্ধতির সঙ্গে যে-কোন দিক থেকে সম্পর্কিত। কারণ বিষয়-বস্তুর জ্ঞান নিয়ে শিক্ষক পাঠ-পরিকল্পনা করেন এবং শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেন। প্রয়োগ পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকের উপস্থাপন ও প্রকাশ ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। তিনি তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি ও মৌলিকতা দ্বারা নব নব ধারায় শিক্ষার্থীকে সক্রিয় অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করেন। এর জন্য তাঁর কতকগুলি ব্যক্তিগত ও বৃত্তিগত গুণ থাকা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত গুণগুলি হল ধৈর্য, আন্তরিকতা, আত্মবিশ্বাস, সহনশীলতা, উদ্যম, কৌশল বা বুদ্ধি, সততা, আত্মসংযম ইত্যাদি। আর বৃত্তিগত গুণ হল প্রশ্ন রচনা ও জিজ্ঞাসা করার কৌশল, শিক্ষণ উপকরণ ব্যবহারের কৌশল, ব্লাকবোর্ড ব্যবহারের নৈপুণ্য ইত্যাদি।

শিক্ষকের শিক্ষণ-যোগ্যতা পরিমাপের জন্য আমরা এখানে সাতটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছি। শিক্ষণ-যোগ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই সাতটি বিষয়ের প্রতিটিকে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট বিভাগযুক্ত একটি নয় পয়েন্ট স্কেল দ্বারা পরিমাপ করতে পারি।

নাইন পয়েন্ট স্কেল (Nine point Scale) হল :

৯—	সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সঙ্গতিপূর্ণ
৮—	
৭—	অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুদ্ধ ও সঙ্গতিপূর্ণ
৬—	
৫—	কোন কোন ক্ষেত্রে শুদ্ধ ও সঙ্গতিপূর্ণ
৪—	
৩—	কোন কোন ক্ষেত্রে অশুদ্ধ ও অসঙ্গতিপূর্ণ
২—	
১—	অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশুদ্ধ ও অসঙ্গতিপূর্ণ
০—	সম্পূর্ণ অশুদ্ধ ও অসঙ্গতিপূর্ণ*

* এটিকে উল্লেখ না করলেও চলে।

এভাবে সাতটি যোগ্যতার প্রতিটিকে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট অংশে নাইন পয়েন্ট স্কেল (Nine-point Scale with five points clearly defined) দ্বারা পরিমাপ করে আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।

একটি শ্রেণীকক্ষে পাঠদানরত একজন শিক্ষকের যোগ্যতা পরিমাপ করে নিম্নরূপ তথ্য (data) সংগ্রহ করা যেতে পারে :

	গুণ		নম্বর
১।	বিষয়বস্তুর জ্ঞান	—	৫
২।	পাঠটীকা পরিকল্পনা	—	৪
৩।	যথাযথ পদ্ধতি প্রয়োগ ক্ষমতা	—	৫
৪।	প্রকাশ করার শক্তি	—	৬
৫।	শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করার শক্তি	—	৩
৬।	মৌলিকতা ও উদ্ভাবনীশক্তি	—	৩
৭।	ব্যক্তিগত গুণাবলী	—	৪

এই সংখ্যাগত ফলাফলটিকে আমরা রেখাচিত্রেও (graph) প্রকাশ করতে পারি। শিক্ষক নিজেই এরূপ রেখাচিত্রের সাহায্যে নিজের শক্তি ও দুর্বলতার সন্ধান পেয়ে শিক্ষণ-যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হতে পারেন। শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়েও অধ্যাপক বা পরিদর্শকরা (Supervisors) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিমাপের জন্য এরূপ পরিমাপ প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পারে। এই পরিমাপ প্রক্রিয়া অনেকখানি ব্যক্তিসাপেক্ষতা থেকে যে মুক্ত —তাতে সন্দেহ নেই।

এছাড়া পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি ও পরিমাপের জন্য **যোগ্যতা নির্ধারক সূচী** (rating sheet)* ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার যোগ্যতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানকালে সহকর্মীদের সহায়তায় যোগ্যতা নির্ধারক সূচী অনুসারে তাঁর নিজের যোগ্যতা বিচারের জন্য অনুরোধ ও উপরোধ করতে পারেন।

---

* যোগ্যতা-নির্ধারক সূচী (rating sheet) এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে 'শিক্ষক' অংশে আলোচিত হল।

দ্বিতীয় খণ্ড

বিদ্যালয় সংগঠন

(School Organisation)

সূচনা

(Introduction)

বিদ্যালয় হল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজ তার নিজস্ব প্রয়োজনে সন্তানসন্ততিদের আদর্শ সভ্যরূপে গড়ে তুলতে চায়। তাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল যোগ্য শিক্ষার্থী যেন সুযোগ্য শিক্ষকের নিকট থেকে সার্থক শিক্ষালাভ করতে পারে। এমন অনুকূল পরিবেশে শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করবে যেন তার সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের এই উদ্দেশ্যসূচক উক্তিটির মধ্যে আধুনিক শিক্ষা-সমস্যার বিভিন্ন দিক অভিব্যক্ত। উক্তিটির মধ্যে রয়েছে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পাঠ্যসূচী (curriculum) এবং বিদ্যালয় পরিবেশ। প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষণ-প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয় এবং তার ফলশ্রুতি স্বরূপ শিক্ষার্থীরা সমাজের আদর্শ সভ্য এবং রাষ্ট্রের যোগ্য ও সক্ষম নাগরিক হয়ে ওঠে। এর জন্যে চাই বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু সংগঠন। যেন সংগঠন যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে শিক্ষার্থীর বাঞ্ছনীয় শিক্ষার দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখে। সুষ্ঠু সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ভিন্ন শিক্ষার্থীকে অভিষ্ট পথে পরিচালিত করা যায় না। অর্থনৈতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন আমরা লক্ষ্য করি, প্রয়োজনীয় জমি (Land), শ্রম (Labour) এবং মূলধন (Capital) যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন সম্ভব নয়—সার্থক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হল উক্ত তিনটি উপাদানের সুষ্ঠু সমন্বয় ও পরিচালন। মূলতঃ সংগঠনই এই সমন্বয় ও পরিচালন-ক্রিয়া সম্পাদন করে। তেমনি বিদ্যালয়, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পাঠ্যবস্তু থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীর বাঞ্ছিত পরিবর্তন ও বিকাশ সাধন সম্ভব হয় না—এর জন্যেও চাই সুষ্ঠু সংগঠন।

সংগঠন সম্পর্কে ধারণা

বিদ্যালয় সংগঠন (School Organisation) সর্বদা শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্যের সঙ্গে অন্বিত। যুগে যুগে সমাজবিদ্, শিক্ষাবিদ্ ও মনীষীরা শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। বিদ্যালয় সংগঠন সে-সব আদর্শ ও লক্ষ্যের

সার্থক রূপায়ণের ব্যবস্থা করে।[1] ভাষান্তরে বলা যায়, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় (means) হল সংগঠন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখা কর্তব্য যে শিক্ষা নিজে একটি গতিশীল প্রক্রিয়া (dynamic process)। তাই তার আদর্শ এবং লক্ষ্য গতিশীল ও সজীব। যুগের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা এগিয়ে চলে এবং তার আদর্শ ও লক্ষ্য স্থিরীকৃত হয়। সেই আদর্শ ও লক্ষ্য সার্থকতা লাভ করে সুষ্ঠু সংগঠনের মাধ্যমে। তাই সংগঠনের মৌলিক ধারণাটিও গতিশীল। অতীতের শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক কালের মধ্যে চলে এসেছে। আধুনিক কালের শিক্ষাদর্শের সুবিধা-অসুবিধা বুঝে ভাবীকালের লক্ষ্য ও আদর্শ স্থিরিকৃত হবে। আর শিক্ষা সংগঠনও সমতালে সেই পরিবর্তিত লক্ষ্য ও আদর্শকে বাস্তবায়িত করবে।

সংগঠন সর্বদা শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে অন্বিত ও গতিশীল

বিদ্যালয় সংগঠনের ভিতর দিয়ে স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শ প্রতিফলিত হয়। রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পর ভাবী নাগরিককে প্রকৃত কমিউনিষ্ট রূপে গড়ে তোলার জন্য অনুকূল বিদ্যালয় সংগঠন তৈরি হল। কমিউনিষ্ট আদর্শে পরিচালিত হল ছাত্র সংস্থা, শিক্ষক সংস্থা, যুব সংস্থা ইত্যাদি। নাৎসী জার্মানীতে হিটলারকে সেলাম জানিয়ে স্কুল কলেজের পঠন-পাঠন শুরু হত। এখানে প্রকৃত শিক্ষার (Education) পরিবর্তে দেওয়া হত নির্ধারিত শিক্ষা (Indoctrination)। বিদ্যালয় সংগঠন ছিল এসবের অনুকূল। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের ভাবধারায় পরাধীন ভারতের শিক্ষা পরিচালিত হয়েছে। আজকের স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিফলিত হবে শিক্ষা সংগঠনের মাধ্যমে। জাতীয় সংহতি, ধর্মনিরপেক্ষতা, দারিদ্র্যমোচন, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে সমাজগঠনের লক্ষ্য ভারতের আদর্শ। এদেশের শিক্ষা সংগঠন এই আদর্শ ও লক্ষ্যকে প্রতিফলিত ও বাস্তবায়িত করবে।

সংগঠন সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শকে প্রতিফলিত করে

বিদ্যালয় সংগঠনের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য এর সঙ্গে জড়িত কতকগুলি বাস্তব কর্মের তালিকা নির্দেশ করা প্রয়োজন। অন্যথায় সাংগঠনিক কার্যের ব্যাপ্তি

1. "Organisation is the embodiment of a spirit and of an ideal. According to the aim that we have before us, so will the Organisation of our institution."—*Ryburn.* : The Organisation of Schools.

উপলব্ধি করা কঠিন। সংগঠনের সঙ্গে জড়িত অত্যাবশ্যক প্রক্রিয়াগুলি হল : (১) সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শের অনুকূলে প্রতিটি শিক্ষাস্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত করা, (২) সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের জন্যে যথাযথ পথনির্দেশ করা, (৩) রাষ্ট্র ও জনগণের সহযোগিতায় আর্থিক সুযোগ সৃষ্টি করা, (৪) অনুকূল পরিবেশে প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও শিক্ষাকর্ম পরিচালনার অনুকূল সুযোগ সৃষ্টি করা, (৫) শিক্ষার্থী সংগ্রহ, যোগ্য শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং লক্ষ্যভিত্তিক পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করা, (৬) শিক্ষকের শিক্ষাদানকর্ম ও শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের যথাযথ মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা, (৭) সুষ্ঠু শিক্ষাকর্ম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংহতি ও সমন্বয় বিধান করা ইত্যাদি। এগুলি বিদ্যালয় সাংগঠনিক কর্মের অপরিহার্য উপাদান।

বিদ্যালয় সংগঠনের সঙ্গে জড়িত উপাদান

বিদ্যালয় সংগঠন (School Organisation) এবং পরিশাসন (School administration) শব্দ দুটি প্রায়ই সম অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মূলতঃ সংগঠন শব্দটি পরিশাসন অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থিরীকৃত করা এবং বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ থেকে পরিচালন পর্যন্ত যাবতীয় কর্ম সংগঠনের এক্তিয়ারভুক্ত। পক্ষান্তরে, প্রতিষ্ঠিত গৃহে বিদ্যালয় পরিচালনার কর্মটুকু পরিশাসন ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাহলে বলা যায়, বিদ্যালয় সংগঠন একটি ব্যাপক, সামগ্রিক ও গতিশীল প্রক্রিয়া এবং বিদ্যালয় পরিশাসন এই সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার একটা অংশ মাত্র।

সংগঠন ও পরিশাসন

সাধারণতঃ বলা যায় সংগঠিত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হলেন পরিশাসক। তিনি তার সহকর্মীদের সহায়তায় নিত্যকর্ম সমাধা করেন। পরিশাসনে শৃঙ্খলা রক্ষা ও সুষ্ঠু পরিচালনার ওপর বিশেষ লক্ষ্য আরোপ করা হয়। দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা, সময়সূচী নির্ধারণ, পাঠ-পরিকল্পনা, বিদ্যালয় গৃহের তত্ত্বাবধান, সরকার ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ, অর্থের লেনদেন, নথিপত্র সংরক্ষণ প্রভৃতি পরিশাসন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রথমতঃ **শিক্ষার্থী এবং তার সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী** (attitude) ; কারণ, সামগ্রিক শিক্ষা-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে আছে শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীর সম্ভাবনাময় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যই শিক্ষাব্যবস্থা। এই কাজের সার্থকতার মধ্যে বিদ্যালয় সংগঠনের স্বরূপ অভিব্যক্ত। বিদ্যালয় সংগঠন

প্রসঙ্গে পি. সি. রেন (*P. C. Wren*)[1] বলেন, শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে তার মানসিক শক্তির বিকাশ, দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা, মনোবৃত্তির অনুশীলন, সুদৃঢ় চরিত্র গঠন, কোমল বৃত্তির বিকাশ ও অনুশীলন, শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, সমাজ, রাষ্ট্র ও তার নিজের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বিদ্যালয় সংগঠন করুন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাসের জন্যে এরূপ সংগঠনের প্রয়োজন নেই। **দ্বিতীয়তঃ**, উপরিউক্ত প্রথম কাজটি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় সংগঠন বিচিত্র ও সমস্যা জড়িত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনায় গৃহ নির্মাণ, সমাজভিত্তিক প্রয়োজনে শিক্ষা সংস্কার ও তার পুনর্গঠন, শিক্ষাকর্ম পরিচালনা ও পরিশাসন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবক, সরকারী শিক্ষা দপ্তর ও বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির সম্পর্ক, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু, সহ-পাঠ্যসূচী নির্ধারণ ও প্রয়োগ, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় ও সংহতি বিধান প্রভৃতির সঙ্গে বিদ্যালয় সংগঠন ব্যাপকভাবে জড়িত। সুতরাং অনুমান করা যায় যে সামগ্রিক বিদ্যালয়-শিক্ষার সার্থক রূপায়ণের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ হলো বিদ্যালয় সংগঠন।

বিদ্যালয় শিক্ষা-ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বিদ্যালয় সংগঠন

---

1. **"Organise the School to benefit the Scholar, to train his faculties, to widen his outlook, to cultivate his mind, to form and strengthen his character, to develop and cultivate aesthetic faculty, to build up his body and give him health and strength, to teach his duty to himself, the community and the state. Organise the school for this end and not to prepare for the Matriculation Examination."—*P. C. Wren***

প্রথম অধ্যায়

বিদ্যালয়গৃহ-পরিবেশ ও সাজসরঞ্জাম

[School Plant-building & Equipment]

[**অধ্যায় পরিচয়ঃ** আমেরিকায় বহুল-ব্যবহৃত 'School Plant' কথাটি কিছু কাল থেকে ভারতেও ব্যবহৃত হচ্ছে। School Plant কথাটি দ্বারা শুধু বিদ্যালয় গৃহটিকে বোঝায় না। বিদ্যালয় গৃহ-পরিবেশ এবং সংলগ্ন প্রয়োজনীয় স্থান ও সাজসরঞ্জাম School Plant-এর অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপক অর্থে পরীক্ষাগার, মিউজিয়াম, ওয়ার্কশপ, গ্রন্থাগার পাঠাগার, ব্যায়ামাগার, খেলার মাঠ, ক্যান্টিন, জলখাবার ঘর, সমবায় বিপণি, পায়খানা ও প্রস্রাবখানা ইত্যাদি সবকিছু বিদ্যালয় গৃহ-পরিবেশ বা School Plant-এর অন্তর্গত। তাই এই অধ্যায়ে উল্লিখিত বিষয়গুলি পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা করা হল।]

১। ঐতিহাসিক পটভূমি (Historical background) :

ঐতিহ্যময় ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। সুদূর অতীতে শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল না। ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কার্যকর ছিল। আবার সে শিক্ষা ছিল জীবন ও সমাজের সঙ্গে একাত্ম। পরোক্ষভাবে সে শিক্ষা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়তো। তবে প্রত্যক্ষ শিক্ষা যেটুকু ছিল তা আনুষ্ঠানিকভাবে তপোবনে গুরুর আশ্রমে পরিবেশন করা হত। গুরু বংশপরম্পরায় এরূপ আশ্রমিক শিক্ষা পরিচালনা করতেন। এক একটা অঞ্চলে শিক্ষাশ্রমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অঞ্চলটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হত। তক্ষশীলা ঠিক এরূপ একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বৌদ্ধযুগে ভিক্ষুসংঘগুলি ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি এক একটি বৌদ্ধ সঙ্ঘ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণতি লাভ করেছিল। প্রাথমিক স্তরে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পরিচালিত হত। কিন্তু ঝড়-ঝঞ্ঝা, রৌদ্র-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতির হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য ক্রমে ক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশাল বিশাল অট্টালিকা গড়ে ওঠে। পাঠাগার,

গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস, মন্দির, উপাসনা গৃহ প্রভৃতি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অঙ্গ ছিল। মুসলমান যুগে সাধারণতঃ মসজিদে ও সংলগ্ন মুক্তপ্রাঙ্গণে মক্তব ও মাদ্রাসা পরিচালিত হলেও পৃথক গৃহপরিবেশে অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। শিক্ষাদানের জন্য মুক্তাঙ্গন যে প্রকৃষ্ট স্থান তা স্বীকার করা সত্ত্বেও এদেশে পৃথক গৃহপবিবেশে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অতীতেও ছিল।

আধুনিক যুগে শিক্ষাদানের জন্য পৃথক গৃহপ্রাঙ্গণের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। যুগের পরিবর্তনের ফলে শিক্ষাদানের বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদির স্বরূপ ও সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে পৃথক গৃহপ্রাঙ্গণ ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদানের কথা চিন্তা করা যায় না।

২। মুক্তাঙ্গন বিদ্যালয় (Open-air Schools) ঃ

ব্রিটিশ শাসনে নতুন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাধাবা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জমকালো বিদ্যালয় গৃহ, তার আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম সমন্বিত নতুন পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু অতীতে মুক্তাঙ্গন বিদ্যালয় পরিচালনা শিক্ষাবিস্তারেব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাই ব্রিটিশ আমলেই স্বদেশী আন্দোলনের চবম পর্যায়ে ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলো। রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন 'আশ্রম বিদ্যালয়' ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারেব একপ একটি দৃষ্টান্ত। ভারতীয় শিক্ষাবিদ্ ও প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের অনেকেই আশ্রমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন কবে দেখালেন যে এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে জমকালো বিদ্যালয় গৃহ ও সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করতে হয় তবে লোকালয় হতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছ পালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা থাকা চাই।" স্বাধীনতার পরেও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ঠিক একই অভিমত ব্যক্ত কবেছেন। কমিশনের মতে 'ভারতের ন্যায় (গ্রীষ্মপ্রধান) দেশে মুক্তাঙ্গন বিদ্যালযকে উৎসাহিত করা কর্তব্য। অন্ততঃ বর্তমান (অর্থনৈতিক) অবস্থায় বিদ্যালয় গৃহ স্থাপনের দারুণ ব্যয় সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের জন্য এ ব্যবস্থা অপরিহার্য।'

আধুনিক যুগে মুক্তাঙ্গন বিদ্যালযেব ধারণা

মুক্তাঙ্গন বিদ্যালয়ের সত্যিই যে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা আছে —এ বিষযে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। আমাদের দেশের জলবায়ু, সামাজিক

ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে **প্রথমতঃ** উল্লেখ করা যায়, আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতল বনচ্ছায়ায় নির্জন পরিবেশে শিক্ষাচর্চা শারীরিক ও মানসিকতার দিক থেকে বিশেষ অনুকূল। **দ্বিতীয়তঃ,** উন্মুক্ত পরিবেশ স্বাস্থ্যশিক্ষার দিক থেকে বিশেষ সুবিধাজনক। **তৃতীয়তঃ,** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের জন্যে বিদ্যালযের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হযে পড়েছে। এ জন্য শিক্ষাখাতে ব্যয় বাডানো বিশেষ প্রযোজন। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে এদেশ অনুন্নত। তাই মুক্তপ্রাঙ্গণ বিদ্যালয় প্রচলনে ব্যয় সংকোচ কবা সম্ভব। **চতুর্থতঃ,** বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মুক্তাঙ্গন বিদ্যালয় অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ কব। যেতে পারে যে, বিকলাঙ্গ শিক্ষার্থী এবং ক্ষযবোগের ন্যায সংক্রামক রোগীদের জন্য মুক্তাঙ্গন বিদ্যালয় অত্যাবশ্যক। কাবণ মুক্ত বায়ু ও সূর্যালোক হল এসব বোগীব পক্ষে নিতান্ত আবশ্যকীয় সম্পদ।[1]

মুক্তাঙ্গন বিদ্যালয়ের সুবিধা

মুক্তাঙ্গন বিদ্যালযের এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আধুনিক শিক্ষার সুবিস্তৃত পদ্ধতি, কৌশল এবং উদ্দেশ্যমূলক প্রযোজনীযতার বিচাবে মুক্তাঙ্গন বিদ্যালয সর্বক্ষেত্রে সুফলদাযী নয। **প্রথমতঃ,** এদেশ গ্রীষ্মপ্রধান হলেও দীর্ঘস্থাযী বর্ষা এবং কনকনে শীতে মুক্তাঙ্গনে বিদ্যালয পরিচালনা করা যায না। মুক্তাঙ্গনে বিদ্যালয পবিচালনা করতে হলে আবহাওয়া ও ঋতু অনুসাবে বাবে বাবে সময তালিকা ও কর্মসূচী পবিবর্তন করতে হয। আধুনিক শিক্ষাধারা এত জটিল যে এরূপ পবিবর্তন সব সময সম্ভব হয না। **দ্বিতীয়তঃ,** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিদ্যালয়েব সংখ্যা এবং ছাত্র-সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেযেছে যে এক একটা শ্রেণীতে ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা কবে। ভারতে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে গাছপালায পবিবেষ্টিত খোলা মাঠের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু মুক্তাঙ্গন বিদ্যালয পবিচালনা মোটেই সম্ভব নয়। **তৃতীয়তঃ,** বিদ্যালযের ল্যাববেটরী, ওযার্কশপ, পাঠাগার, এবং লাইব্রেবীব জন্য পৃথক পৃথক ঘর চাই। বিজ্ঞানেব যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, পুস্তক ও পত্র-পত্রিকাদি,

কতকগুলি অসুবিধা

---

1. "Open air schools are necessary for certain types of handicapped children as well as children effected with tuberculosis and other diseases which required plenty of fresh air."

—Report of the *Secondary* Education Commission—Chap, XIII, Page 156.

টেকনিক্যাল যন্ত্রপাতি মুক্তাঙ্গনে রেখে শিক্ষা দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে এসব বিষয়কে বাদ দিয়ে শিক্ষা দান ও গ্রহণ করার কথাও চিন্তা করা যায় না।

তবে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলি অনুকূল আবহাওয়ায় মুক্তাঙ্গনে পরিচালনা করা সম্ভব। যেমন, কোন সাহিত্যসভা, আলোচনা সভা, কোন উৎসবানুষ্ঠান বা সমাবেশ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ক্লাস, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোটদের ক্লাস—এগুলি মুক্তাঙ্গনে পরিচালনা করা সম্ভব।

আংশিক সুবিধা থাকলেও মুক্তাঙ্গন দুষ্পাপ্য

এরূপ সম্ভাবনার ক্ষেত্রেও স্থান-বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। শহরাঞ্চলে মুক্তাঙ্গনে বিদ্যালয় পরিচালনা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তবে গ্রামাঞ্চলে যেখানে বৃক্ষকুঞ্জে সমাচ্ছন্ন খালি ময়দান সহজলভ্য সেসব স্থানে বিদ্যালয়ের আংশিক কাজকর্ম পরিচালনা করা যায়। আজকাল গ্রাম-বাংলাতেও মুক্তাঙ্গণের অভাব লক্ষ্য করা যায়। তাই আজ গ্রাম, শহর সর্বত্রই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য পৃথক বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

১৩। বিদ্যালয়-গৃহ-পরিবেশের আধুনিক ধারণা ও তাৎপর্য (Modern concept and intent of Shool Plant) :

আমেরিকায় বিদ্যালয়-গৃহ সম্পর্কে সর্বাধিক ব্যবহৃত 'School Plant' শব্দগুচ্ছ কিছুকাল ধরে এদেশের শিক্ষাস্তরে প্রচলিত হয়েছে। 'স্কুল প্লান্ট' শব্দগুচ্ছের

গৃহ-পরিবেশের অর্থ

দ্বারা শুধু বিদ্যালয়ের গৃহখানিকে বোঝায় না। এর অর্থ এত ব্যাপক যে বিদ্যালয় গৃহ, গ্রন্থাগার, পাঠাগার, বিজ্ঞানাগার, ওয়ার্কশপ, সভাগৃহ, বিদ্যালয় সেনিটারী, ব্যায়ামাগার, খেলার মাঠ, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সব কিছুকে একত্রে বোঝায়। এক কথায়, একে 'বিদ্যালয়-গৃহ-পরিবেশ' বলা চলে। 'বিদ্যালয়' শব্দটির মধ্যে 'আলয়' কথাটি সুস্পষ্ট। তাই বিদ্যাচর্চা এবং বিদ্যার আদান-প্রদানের জন্যে পৃথক পরিবেশ প্রয়োজন।

(ক) গৃহ-পরিবেশ এবং (খ) বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যার আদান-প্রদান—এই দুটি বিষয় একত্রে গড়ে তোলে বিদ্যালয় জীবন। সামগ্রিক বিদ্যালয় জীবনকে একটি মানুষের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মানুষের দুটি দিক—একটি শারীরিক

অন্যটি মানসিক। বিদ্যালয় জীবনেরও দুটি দিক। এর শারীরিক দিক হল (ক) গৃহ-পরিবেশ এবং মানসিক দিক হল (খ) বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যার আদান-প্রদান। মানুষের ক্ষেত্রে যেমন মানসিক অবস্থার ভিত্তি হল তার দেহ, তেমনি বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যার আদান-প্রদানের ভিত্তি হল গৃহ-পরিবেশ (School Plant)। বিদ্যালয়-গৃহ-পরিবেশে বিদ্যালয়ের অন্তর্জীবন বা মানসিকতা অভিব্যক্ত হয়।

বিদ্যালয় জীবন ও ব্যক্তিজীবন

বসবাসের জন্য গৃহ, চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, বিচারের জন্য আদালতগৃহ যেমন প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জামে সাজানো থাকে বিদ্যাচর্চার জন্য তেমনি পৃথক গৃহ পরিবেশ ও সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন। মানুষের জীবন প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত। বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ মানুষের মনে পৃথক পৃথক প্রভাব বিস্তার করে। আদালত ন্যায়বিচারের, হাসপাতাল আরোগ্যের এবং বিজ্ঞানাগার গবেষণার উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি বিদ্যালয়গৃহ বিদ্যানুশীলনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষণ-প্রসঙ্গে এরূপ প্রভাবের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বিদ্যানুশীলনের জন্য বিদ্যালয় পরিবেশ

প্রবাদ আছে 'আমরা প্রথমে গৃহ নির্মাণ করি, পরে গৃহ আমাদেরকে গড়ে তোলে'।[1] এ প্রবাদের সত্যতা সামাজিক সভ্য মানুষ মাত্রই অনুধাবন করতে পারেন। যে পরিবারে পারিবারিক গ্রন্থাগার থাকে সে পরিবারের সন্তানরা শিশু কাল থেকেই জ্ঞানার্জনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সুন্দর ও সুসজ্জিত বিদ্যালয়-গৃহ শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষালাভের জন্য অফুরন্ত উৎসাহ ও অদম্য প্রেরণা সঞ্চার করে।[2] বিদ্যালয় সামগ্রিকভাবে হয়ে ওঠে শিক্ষার্থী ও আঞ্চলিক মানুষের স্মারক বা প্রতীক। প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আদর্শ বাস্তবায়িত হয়। গৃহ-পরিবেশের দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুটি হয় শিক্ষারূপ আধ্যাত্মিক জীবনধারার বহিঃপ্রকাশ। এই হল বিদ্যালয় গৃহ-পরিবেশের তাৎপর্যপূর্ণ ভাবধারা।

বিদ্যালয়-গৃহ-পরিবেশের তাৎপর্য

1. 'We first shape the building and then the building shpaes us'
2. তুলনীয়: (a) Buildings are to education as body is to mind"
(b) "A fine building makes a fine school and a poor building a poor one."

৪। বিদ্যালয়-গৃহ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্ণায়ক (Criteria for construction of a school plant) :

প্রাক্ কলেজস্তর পর্যন্ত শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে ভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় আছে ; যেমন প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক উচ্চতর মাধ্যমিক প্রভৃতি। আবার দুটি বা ততোধিক স্তরকে মিলিয়ে একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করা হয়। অবস্থান বিচারে গ্রামে যেমন বিদ্যালয় আছে, তেমনি ছোট-বড় শহর ও শহরতলীতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। যে স্তরেই শিক্ষা বিদ্যালয়ে দেওয়া হোক না কেন, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অথবা স্থাপয়িতাকে বিদ্যালয়-গৃহ-পরিবেশ বিষয়ে কতকগুলি মৌলিক নীতি বা নির্ণায়ক (Criteria) সম্পর্কে বিবেচনা করতে হয়। নীতিগুলি হল (ক) স্থান-নির্বাচন (Site selection), (খ) কার্যকারিতা (Serviceability), (গ) মিতব্যয় (Economy) এবং (ঘ) সৌন্দর্যভিত্তিকতা (Aesthetic aspect)। মূলতঃ এই চারিটি নির্ণায়কের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। নীতিগুলি পরস্পরের সঙ্গে বিশেষভাবে অন্বিত। এখানে নীতিগুলির বিস্তৃত আলোচনা দেওয়া হল :

গৃহস্থাপনের কতকগুলি মৌলিক নীতি

(ক) **বিদ্যালয়-গৃহের জন্য স্থান-নির্বাচন** (Selection of the site for the School Plant) : বিদ্যালয় গৃহের জন্য স্থান-নির্বাচন গ্রাম ও শহরভিত্তিতে দুটি পর্যায়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

গ্রামের স্কুল : গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য স্থান-নির্বাচনপ্রসঙ্গে নিম্নরূপ বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন।

(১) **লোকসংখ্যা ও যাতায়াত ব্যবস্থা :** যে গ্রামে লোকসংখ্যা বেশী এবং যে গ্রাম থেকে পার্শ্ববর্তী গ্রামে সহজে যাতায়াত করা যায় এমন গ্রামকেই বিদ্যালয় গৃহের জন্য নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত।

(২) **উঁচু ও শুষ্ক ভূমি :** বিদ্যালয় গৃহ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচিত জমি হবে উচ্চ এবং শুষ্ক। নদী, জলাশয়, খাল-বিলের কিনারায়, নতুন ভরাট করা জমিতে জলা ভূমিতে স্কুল গৃহ নির্মাণ করা উচিত নয়। এরূপ স্থানে নির্মিত গৃহের মেঝে ও দেওয়াল প্রায় সারা বছর স্যাঁতসেঁতে থাকে। জমি নির্বাচনের সময়

এও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যেন সেখানে বৃষ্টির জল আবদ্ধ হয়ে না থাকে। উঁচু ভূমিতেও গৃহ নির্মাণের সময় জলনিকাশী ব্যবস্থাপনা সুন্দর হওয়া প্রয়োজন।

(৩) **নিকটতম পরিবেশ:** গৃহ নির্মাণের পূর্বে নিকটতম পরিবেশের দিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। গৃহটিকে স্বাস্থ্যসম্মত করার জন্য পানাপুকুর, ঝোপ-জঙ্গল, কবরখানা, হাসপাতাল, শ্মশান, খাটাল বা মৃত গো-মহিষাদি ফেলার স্থান থেকে দূরে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করা কর্তব্য। এছাড়া শিক্ষা-পরিবেশের নির্জনতা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য সাপ্তাহিক হাট, দৈনিক বাজার, সিনেমা ইত্যাদি থেকে দূরে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণের স্থান-নির্বাচন করা কর্তব্য।

(৪) **ভূমির প্রাপ্তব্যতা:** বিদ্যালয় হল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বৌদ্ধিক, সামাজিক ও শারীরিক শিক্ষালাভের কেন্দ্র। বিদ্যালয় আঞ্চলিক সমাজের ভাবী নাগরিক সৃষ্টি করে। তাই প্রযোজনসিদ্ধির অনুকূল গৃহনির্মাণ ও শিক্ষা-চর্চার জন্য ভূমির প্রাপ্তব্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে স্থান নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত। খেলার মাঠ সহ সাধারণ শিক্ষাচর্চার বিদ্যালযের জন্য যথেষ্ট জমি প্রযোজন। আর যেখানে কৃষি শিক্ষা দেওযা হয় তেমন বিদ্যালযের প্রয়োজনে গৃহনির্মাণ, খেলার মাঠ ও কৃষির জন্য অনেক বেশী জমি প্রয়োজন। তবে কৃষির জন্য অবশ্য উঁচু, শুষ্ক ও স্বাস্থ্যানুকূল পরিবেশের প্রযোজন হয় না। বিদ্যালয়ের নিকটে যদি কৃষিক্ষেত্র হয় তবে তত্ত্বগত শিক্ষার সঙ্গে প্রয়োগধর্মী (Practical) শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়। অবশেষে আবাসিক বিদ্যালয়ের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। আধুনিক সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য করে একথা স্পষ্টভাবে বলা চলে যে, ভবিষ্যতে শহরের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি না করে গ্রামে আবাসিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণের জন্য ভূমি ও পরিবেশ নির্বাচনের সময় অধিক পরিমাণ ভূমির প্রাপ্তব্যতার দিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

শহরের বিদ্যালয়-গৃহ: শহরে বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণের জন্য ভূমি ও পরিবেশ নির্বাচন সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। প্রথম ও প্রধান সমস্যা হল উপযুক্ত পরিবেশে ভূমির দুষ্প্রাপ্যতা। কোন ক্রমে এক খণ্ড ভূমি সংগৃহীত হলে প্রয়োজন অনুসারে তার আয়তন বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ, বড় শহরগুলিতে কতকগুলি সমস্যা এড়ানো সম্ভব হয় না; যেমন—হৈ-হট্টোগোল, চেঁচামেচি,

বাস-ট্রাম ও যানবাহনেব শব্দ, ছোটবড় নানা কারখানার ধোঁয়া, ধূলা-বালি, সিনেমা এবং দিবারাত্র হাট-বাজার ও লোক সমাগমের গোলমাল প্রভৃতি।

এত সমস্যা থাকা সত্বেও **শহরে বিদ্যালয় গৃহের ভূমি ও পরিবেশ নির্বাচন** করার সময় কতকগুলি বিষয়ের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। **প্রথমতঃ**, বিদ্যালয়ের জন্য (ক) কোন মিল বা কারখানা অঞ্চল, (খ) হাট-বাজারেব নিকটতম স্থান, (গ) শ্মশান ও গোরস্থান, শহবতলীর আবর্জনা নিক্ষেপ কবার স্থান বর্জন করা কর্তব্য। **দ্বিতীয়তঃ**, পাবিবাবিক গৃহ-পবিবেশের অভ্যন্তবে স্কুলগৃহ স্থাপন না কবাই বাঞ্ছনীয়। **তৃতীয়তঃ**, মদেব কারখানা, মদের দোকান, পতিতালয় ইত্যাদি অবাঞ্ছনীয় কর্মাঞ্চলে বিদ্যালয়-গৃহ প্রতিষ্ঠা না করাই যুক্তিযুক্ত। **অবশেষে** বলা যায়—সিনেমা, থিয়েটারের ন্যায় দৈনন্দিন জনসমাগমের স্থানগুলি বিদ্যালয-গৃহ নির্মাণের স্থানহিসেবে নির্বাচন না কবাই যুক্তিযুক্ত।[1]

বিদ্যালয়-গৃহের সম্প্রসারণশীলতা (Expansibility of the site required): বিদ্যালয-গৃহের জন্য ভূমি ও পবিবেশ নির্বাচনের সময় লক্ষ্য রাখা দবকার, ভবিষ্যতে স্কুলগৃহেব সম্প্রসাবণের প্রযোজনে নতুন খালি জমি যেন সহজলভ্য হয়। গ্রামাঞ্চলে এ সমস্যা আজও খুব বেশী জটিল হয়ে ওঠেনি। তবে শহরাঞ্চলে এ সমস্যা জটিলতম বললেও অত্যুক্তি হয় না। কোন বিদ্যালযে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পঠন-পাঠন হয়। একে উচ্চতব মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত কবার ইচ্ছা থাকলেও জমিব অভাবে উপায় থাকে না। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞানাগার, ওযার্কশপ ইত্যাদির জন্য নতুন গৃহ নির্মাণের জমি প্রয়োজন হয়। শহরে নতুন জমি পাওয়াব আশা নিতান্ত কম। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলেও খালি জমি দখলের জন্য কর্তৃপক্ষকে বহুদিন অপেক্ষা করতে হয়।

শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়। একে অবহেলা করার অর্থ হল জাতীয় জীবনের সমুদয় আশা আকাঙ্ক্ষার মৃত্যুশয্যা রচনা করা। বিদ্যালয়-গৃহ সম্প্রসারণের জন্য ভূমি দখল জাতীয় সমস্যা। সুতরাং এ সম্পর্কে সরকার অনায়াসে অনুকূল আইন প্রণয়ণ করতে পারেন। আইনবলে কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয় সংলগ্ন খালি জমি গৃহসম্প্রসারণের জন্য দখল করতে পারেন।

1. Nothing in the whole of educational programme is more conducive to co-operative attitude among the pupils and a love of school than an attractive and wholesome environment.—*William Yeager.*

গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়সংলগ্ন খালি মাঠ, শহরের পার্ক,ময়দান ইত্যাদি কেউ যাতে দোকান-পাট, কলকারখানা বা বাড়ি করার প্রয়োজনে দখল করতে না পারে সেজন্যে আইন প্রণয়ন করা কর্তব্য। সাধারণতঃ শহরের পার্কগুলিকে বলা হয় 'নগরীর ফুসফুস' (Lungs of the city)। শহরের ও নগরের পার্ক বা একটু খালি জমি শুধু বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর নয়, নগর বা শহরবাসী সকলের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। ইংল্যাণ্ডে ১৯০৬ সালে এবং ১৯১২ সালের সংশোধিত Open Space Act দ্বারা যুক্ত রাজ্যের (U.K.) সর্বত্র পার্ক, খেলার মাঠ, বাগিচা ইত্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। দুঃখের বিষয় এদেশে শহরগুলি ক্রমশঃ গৃহময় হয়ে উঠছে। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন সুপারিশ[1] করেছেন যে সমস্ত ছোটবড় শহরে, মিউনিসিপ্যাল এলাকায়, উন্নত ও জনবহুল গ্রামগুলির খালি জমি, পার্ক, ময়দান, খেলার মাঠ ইত্যাদিকে সংরক্ষণের জন্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য। সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য হল এরূপ জমির পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড গ্রহণ করা। দ্বিতীয় কর্তব্য হল সরকারী অনুমতি ছাড়া এরূপ জমি যেন শিল্প, ব্যবসা বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কেউ ব্যবহার করতে না পারে। যদি দেশের বালক-বালিকা ও যুবকদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে বিবেচিত হয় তাহলে পার্ক, ময়দান, খেলার মাঠ ইত্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করাও অপরিহার্য কর্তব্য।

(খ) কার্যকারিত (Serviceability)**:** বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করা হয়। নির্মিত গৃহে যে শিক্ষাকর্ম পরিচালন করা হয় তা ঐ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যপূর্তির সহায়ক। শিক্ষাকর্ম পরিচালনার সুবিধার্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করা প্রয়োজন—(১) গৃহের প্রকার ও গঠনভঙ্গী (types & designs), (২) ভূমির পরিমাণ, (৩) গাঁথুনি, (৪) গৃহ কত তলা হবে (storeys), (৫) প্রয়োজনীয় কক্ষ ও তাদের অবস্থান, (৬) খেলার মাঠ, (৭) কৃষি বিদ্যালয়ের পৃথক কৃষিক্ষেত্র, (৮) সহজসাধ্য যাতায়াত ব্যবস্থা।

(১) বিদ্যালয়-গৃহের প্রকার ও গঠনভঙ্গী (Types & Designs of the School-building)**:** বিদ্যালয়-গৃহের প্রকার ও গঠনভঙ্গী (types and

1. Secondary Education Commission—R·Chap. XIII, P, 157—158.

designs) এক এক অঞ্চলে, বা দেশে এক এক প্রকার। এই বিচিত্রতার মধ্যে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ-প্রসঙ্গে **নিম্নরূপ বিষয়গুলি সর্বাগ্রে বিচার্য :**

প্রথমতঃ, বিদ্যালয় গৃহের পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বিদ্যালয়-গৃহের উদ্দেশ্য (purpose) সম্পর্কে বিবেচনা করা। বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থী, ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বা প্রবাহের (Streams) বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। টেকনিক্যাল স্কুল, মেডিক্যাল স্কুল, বেসিক স্কুল, সাধারণ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের স্কুলের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। কি উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্থাপন কবা হবে সেটাই হল-পরিকল্পনার প্রাথমিক ও প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার স্থান সংকুলান যেন স্বাভাবিক ও যথেষ্ট হয়। প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যালয় গৃহের সম্প্রসারণ যেন সম্ভব হয়।

তৃতীয়তঃ, দিবাভাগে বিদ্যালয় চলাকালীন প্রতিটি কক্ষে যেন যথেষ্ট আলো পাওয়া যায় এবং সর্বত্র যেন বায়ু চলাচল করতে পারে। সামগ্রিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের বিচারে যথেষ্ট আলো ও মুক্ত বায়ু-প্রবাহ বিদ্যালযের জন্য নিতান্ত অপরিহার্য।

চতুর্থতঃ, ভারত প্রধানতঃ মৌসুমী বায়ুব দেশ। তবে এদেশের ন্যায় জলবায়ু ও আবহাওয়ার বৈচিত্র্য অন্য কোথাও বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং ঝড়ো হাওয়া ও বৃষ্টিপাত, দারুণ ঠাণ্ডা ও তুষারপাত (দার্জিলিং অঞ্চলের ন্যায়) ইত্যাদির হাত থেকে বিদ্যালযের জনসমষ্টিকে রক্ষা করতে পারে এমন গঠনভঙ্গীযুক্ত গৃহ নির্মাণ করা যুক্তিযুক্ত।

দেশের স্থাপত্য কলার উন্নতির ফলে নানা ভঙ্গীবিশিষ্ট বিদ্যালয়-গৃহ স্থাপিত হচ্ছে। **সারিবদ্ধ ভঙ্গীর** (Row-type) **প্রচলন** খুব বেশী লক্ষ্য করা যায়। শ্রেণীকক্ষ, অফিস, শিক্ষকদের জন্য পৃথক কক্ষ, সভাকক্ষ ইত্যাদি সারিবদ্ধভাবে একই ছাদের তলায় সাজানো থাকে। কক্ষের দুদিকেই থাকে ঋজু ঋজু দরজা সরল ও জানালা এবং বারান্দা। সারিবদ্ধ বিদ্যালয়-গৃহ ঠিক ইংরেজী I-এর ন্যায় সরলরেখায় সাজানো থাকবে এমন কোন কথা নেই। গৃহের সামগ্রিক আকৃতি ইংরেজী E, H, L, T, U অক্ষরের ন্যায় হতে পারে। প্রতিটি আকৃতি বিশিষ্ট বিদ্যালয় গৃহের সুবিধা ও অসুবিধা আছে। কোন্ আকৃতি বিশিষ্ট সারিবদ্ধ ভঙ্গীর গৃহ নির্মাণ করা হবে

সারিবদ্ধ ভঙ্গী

সেটা নির্ভর করে (১) জমির পরিমাণ ও আকৃতি, (২) কর্তৃপক্ষ ও নক্‌শা অঙ্কণকারীর অভিরুচি, (৩) বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা, (৪) ভবিষ্যতের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা, (৫) গমনাগমনের সুবিধা, (৬) আলোবাতাস ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির বিবেচনা ইত্যাদির ওপর।

দ্বিতীয় প্রকার ভঙ্গীটিকে বলা যায় **হল-কেন্দ্রিক ভঙ্গী** (Central Hall type)। এ ধরনের গৃহ ইংল্যাণ্ডে খুব বেশী প্রচলিত। এর মাঝখানে থাকে কেন্দ্রীয় সভাকক্ষ এবং তার চারদিকে আয়তাকারে শ্রেণীকক্ষ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কক্ষ সাজানো থাকে। এরূপ গৃহের সুবিধা অনেকগুলি। প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় হলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সহজে সমবেত হয়ে পুনরায় শ্রেণীকক্ষে ফিরে যেতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, হলের একটা দিকে প্রধান শিক্ষকের কক্ষ থাকায় তাঁর পক্ষে তত্ত্বাবধান-কার্য সহজসাধ্য হয়। তৃতীয়তঃ, এরূপ গৃহ নির্মাণের ব্যয় তুলনামূলকভাবে কিছু অল্প হয়। **সুবিধা** যেমন আছে তেমনি **অসুবিধাও** আছে। প্রথমতঃ, এরূপ গৃহে পর্যাপ্ত আলোবাতাস পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, দক্ষিণ প্রান্তের কক্ষগুলি ছাড়া অন্যত্র মুক্ত বায়ু প্রবেশ করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, শ্রেণীকক্ষের পারস্পরিক কোলাহল এবং কক্ষান্তরে গমনাগমনের গোলমাল দূর করা সম্ভব হয় না।

হল-কেন্দ্রিক ভঙ্গী

আমাদের দেশের জলবায়ু অনুসারে কেন্দ্রে হলঘর রাখার পরিবর্তে ছাদ-বিহীন মুক্ত প্রাঙ্গণ রাখাই বাঞ্ছনীয়। এই প্রাঙ্গণের মাঝখানে যদি বট বা অশ্বত্থের ন্যায় বিরাটাকার বৃক্ষ থাকে তাহলে গ্রীষ্মে এই বৃক্ষের ছায়ায় সভা-কক্ষের প্রয়োজন মেটানো যায়। বৃক্ষবিহীন অবস্থায় ত্রিপল দিয়ে এই প্রাঙ্গণে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করাও চলে। এতে গৃহ নির্মাণ ব্যয় সাধ্য হয়। শেষোক্ত ভঙ্গীটিকে পৃথকভাবে বলা চলে **চতুষ্কোণ ভঙ্গী** (quadrangle type)। হল-কেন্দ্রিক ও চতুষ্কোণ ভঙ্গীর বাড়ি গঠন-প্রক্রিয়া ঘন-সন্নিবিষ্ট ও কেন্দ্রানুগ।

তৃতীয় প্রকার গৃহ **স্বস্তিকা** অথবা **ক্রুশ চিহ্নের আকৃতিবিশিষ্ট**। এরূপ গৃহের কেন্দ্রীয় হল ঘরটি থাকে লম্ব ও ভূমি রেখার সংযোগ স্থলে। এই হল ঘরের পাশাপাশি থাকে প্রধান শিক্ষকের কক্ষ। ফলে তাঁর পক্ষে তত্ত্বাবধান করা সহজ হয়ে থাকে। এরূপ বাড়ির দুদিকে বারান্দা ও কুজুকুজু দরজা, জানলা থাকা উচিত।

স্বস্তিকা অথবা ক্রুশাকৃতি

চতুর্থ প্রকার গঠনভঙ্গীকে বলা যায় **বিচ্ছিন্ন ভঙ্গী** (Scattered design)। সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কক্ষে পরিচালিত হয়। কক্ষগুলি বিচ্ছিন্ন হলেও তাদেরকে সারিবদ্ধ করে চতুষ্কোণ, স্বস্তিকা চিহ্ন বা ক্রুশচিহ্ন, অথবা যে কোন ইংরেজী অক্ষরের আকৃতি দেওয়া যেতে পারে। এরূপ বিদ্যালয়ের চারদিকে যদি প্রাচীর দিয়ে একটি প্রধান ফটক রাখা যায় তাহলে সবচেয়ে বেশী সুবিধা হয়। এরূপ বাড়িতে প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, খেলার মাঠ, ফুলের বাগান ইত্যাদি একই প্রাঙ্গণের ভিতর রাখা যায়। কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে গমনা-গমনের জন্য সরু রাস্তার ওপর টিনের ছাদ তৈরি করে রাখা চলে। এর দ্বারা রৌদ্র ও বৃষ্টি এড়ানো যায়। গ্রামাঞ্চলে যেখানে জমি সহজলভ্য সেখানে এরূপ বিদ্যালয় গৃহের পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

বিচ্ছিন্ন ভঙ্গী

(২) **ভূমির পরিমাপ :** যে কোন একটি সেকেণ্ডারী স্কুলের জন্য প্রতি ১০০ জন ছাত্র পিছু ২ একর জমি প্রয়োজন। এই সঙ্গে একটি পৃথক খেলার মাঠ প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড-এর (C A B E) স্কুল বিল্ডিং কমিটি খেলার মাঠের জন্য নিম্নরূপ সুপারিশ করেছেন :

১৬০ জন ছাত্র পিছু	২—৩ একর জমি
৩২০ " " "	৪—৫ " "
৪৮০ " " "	৬—৭ " "

(৩) **গাঁথুনি :** গৃহের গাঁথুনি সম্পর্কে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ, ঘরের ভিত হবে গভীর এবং মজবুত। দ্বিতীয়তঃ, দেওয়ালের প্রস্থ হবে অন্ততঃ ১৪ ইঞ্চি। তবে দোতলা গৃহের একতলা অংশের গাঁথুনি ১৮ ইঞ্চি হওয়া প্রয়োজন। সৌন্দর্য ও মজবুতের দিকে লক্ষ্য রেখে দেওয়ালে প্লাষ্টারিং করা প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, ঘরের মেঝে ধুইয়ে ফেলার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে ও ঝাড়ু দিয়ে ময়লা দূরীকরণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে মেঝে তৈরি করা প্রয়োজন। চতুর্থতঃ, এদেশে টিনের ছাদের পরিবর্তে পাকা ছাদ বিশেষ প্রয়োজন। টিনের ছাদ হলে ভিতর দিয়ে উন্মুক্ত সিলিং দেওয়া প্রয়োজন।

(৪) **গৃহ কত তলা হবে :** বিদ্যালয়ের পক্ষে একতলা গৃহ সর্বাপেক্ষা উত্তম। শহরাঞ্চলে জমির অভাবে একাধিক তলবিশিষ্ট গৃহের প্রয়োজন হয়।

তবে একতলা গৃহের চেয়ে একাধিক তলবিশিষ্ট গৃহ নির্মাণের খরচ কম। একাধিক তলবিশিষ্ট গৃহে ওঠানামা করতে ছেলেদের, বিশেষ করে মেয়েদের খুবই কষ্ট হয়। সেদিক থেকে বিদ্যালয়ের পক্ষে একতলা গৃহ উৎকৃষ্ট।[1]

(৫) প্রয়োজনীয় কক্ষ এবং তাদের অবস্থান (Necessary rooms and their location): বিদ্যালয় গৃহের আকৃতি ও গঠনভঙ্গী আলোচনার পর লক্ষ্য করা প্রযোজন একটি আদর্শ বিদ্যালযে কতগুলি এবং কি কি কক্ষ থাকা উচিত। প্রতিটি বিদ্যালযের শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা নির্ভর করে সেই বিদ্যালযের স্তর (যেমন, প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ইত্যাদি) এবং শিক্ষণীয় বিষযের চরিত্রের (যেমন, সাধারণ শিক্ষা; টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা ইত্যাদি) ওপর। **শ্রেণীকক্ষ ছাড়া একটা বিদ্যালয়ে নিম্নরূপ কক্ষের প্রয়োজনীয়তাও আছে:** (ক) প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, (খ) সহকারী প্রধান শিক্ষকের কক্ষ (যদি এই পদে কাউকে নিয়োগ করা হয়), (গ) বিদ্যালযের অফিস কক্ষ, (ঘ) শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষ, (ঙ) ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক বিশ্রাম কক্ষ (যদি সহ-শিক্ষার ব্যবস্থাপনা থাকে, অন্যথায় একখানি কক্ষ), (চ) দর্শনার্থী ও অভিভাবকদের অপেক্ষালয, (ছ) গ্রন্থাগার সহ পাঠাগার, (জ) ল্যাবরেটরী ও ওয়ার্কশপ, (ঝ) সাধারণ সভাকক্ষ, (ঞ) পানীয় জল ও টিফিন কক্ষ, (ট) সংরক্ষণ-শালা বা গুদামঘর, (ঠ) শিল্প-কলা কক্ষ, (ড) সংগ্রহশালা বা মিউজিয়াম, (ঢ) ব্যাযামাগার, (ণ) সাইকেল ঘর, (ত) পায়খানা ও প্রস্রাবখানা, (থ) প্রধান ফটকের পাশাপাশি ঝাড়ুদার দারোযানদের পৃথক কক্ষ।

কক্ষের অবস্থান: (১) প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, (২) সহকারী প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, (৩) অফিস কক্ষ এবং (৪) দর্শনার্থীদের অপেক্ষালয়—এই চারটি কক্ষ পাশাপাশি রাখা প্রয়োজন। এর দ্বারা অফিস পরিচালনা, শ্রেণীপাঠ, সামগ্রিক শৃঙ্খলার তত্ত্বাবধান এবং অভিভাবক ও দর্শন-প্রার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুবিধা হয়। পরবর্তী অবস্থান হবে (৫) শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষ। দর্শনপ্রার্থী

---

1. **"It is advisable to have the building of one-storey only if at all possible. Land is not usually so dear as to make a one-storey building much more expensive than a two-storied one, and in every way the one-storied building is preferable."**

Ryburn—**The Organisation of Schools—P. 157.**

ও অভিভাবকদের অনেকেই সহ-শিক্ষকদের দর্শনপ্রার্থী হতে পারেন। তাই দর্শনার্থীদের অপেক্ষালয়ের পাশাপাশি শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষটিও থাকবে। তাছাড়া সহ-শিক্ষকদের অফিসের প্রধান ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগও রাখার বিশেষ প্রয়োজন হয়।

প্রসঙ্গতঃ শিক্ষকদের জন্য পৃথক বিশ্রাম কক্ষ বা **কমন রুমের প্রয়োজনীয়তার** বিষয়টি উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত। **প্রথমতঃ,** এখানে শিক্ষকরা একত্র মিলিত হয়ে কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা ও পারস্পরিক ভাব বিনিময় করতে পারেন। **দ্বিতীয়তঃ,** কমনরুমে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের গৃহ-কাজ (Home task) দেখা, শ্রেণীকক্ষের প্রশ্নোত্তর শুদ্ধ করা এবং নিজ নিজ পড়াশুনাও করতে পারেন। **তৃতীয়তঃ,** বিশ্রাম ও অবসর বিনোদের দ্বারা পরবর্তী কর্মসূচী ও কর্তব্য পালনে নতুন উৎসাহ ও উদ্যম সঞ্চার করতে পারেন। **অবশেষে** বলা যায়, পৃথক কমনরুমের ব্যবস্থাপনা দ্বারা শিক্ষকদের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয় যার প্রয়োজন কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না।

শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ কয়েকটি কক্ষের ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে (৬) ছাত্রদের কমনরুম, (৭) ক্যান্টিন, (৮) সাইকেল ঘর (Cycleshed) এবং (৯) পৃথক পায়খানা ও প্রস্রাবখানা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বিদ্যালয়ের আয়তনের ওপর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পায়খানা ও প্রস্রাবখানার সংখ্যা নির্ভর করে। আবার সহশিক্ষার (Co-education) ব্যবস্থাপনায় ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক পায়খানা ও প্রস্রাবখানা রাখার প্রয়োজন আছে। উপরে লিখিত ৬, ৭, ৮ ও ৯ নম্বর কক্ষ শ্রেণীকক্ষ থেকে যাতে একটু দূরে সংস্থাপন করা যায় তার দিকে নজর দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

নিজ চেষ্টায় পঠন-পাঠন, বিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষণ, সহশিক্ষামূলক কর্মসূচী (Co-curricular activities) পরিচালনা ইত্যাদির জন্যে আরও কয়েকটি কক্ষের প্রয়োজন আছে। যেমন, (১০) ল্যাবরেটরী, (১১) ওয়ার্কশপ, (১২) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, (১৩) সংগ্রহশালা (Museum), (১৪) শিল্পকলা কক্ষ (Arts & Crafts room), (১৫) ব্যায়ামাগার (Gymnasium), (১৬) পৃথক সংরক্ষণ কক্ষ প্রভৃতি। বিদ্যালয়ের কর্ম পরিধি সম্প্রসারণের জন্য পৃথক সংরক্ষণ কক্ষের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এরূপ সংরক্ষণ কক্ষে ব্যায়াম,

খেলাধূলার সামগ্রী, এ.সি.সি. বা এন.সি.সি, স্কাউট, শিল্পকলার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, শিক্ষাপ্রদর্শনী ও রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত সামগ্রী এখানে সংরক্ষণ করা যায়। বিত্যালয় গৃহ পরিবেশের একদিকে ১০ থেকে ১৬ নম্বর কক্ষ যাতে সংস্থাপিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। কারণ এসব কক্ষে অনুষ্ঠিত কার্যাবলী অল্পবিস্তর প্রায় একই শ্রেণীর। তাই এদের অবস্থান একদিকে হলে কর্ম পরিচালনার সুবিধা হয়। এসব কক্ষের পাশাপাশি থাকবে—(১৭) বিত্যালয় সমবায় বিপণি এবং (১৮) বিত্যালয় নার্সিং কেন্দ্রের জন্য পৃথক পৃথক কক্ষ। সমবায় বিপণি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-বিষয়ক প্রযোজনীয় সামগ্রী সববরাহ কববে। শ্লেট, পেন্সিল, কালি-কলম, কাগজ ও খাতা-পত্র, পত্র-পত্রিকা ও প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি এখান থেকে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে। বিপণিটি পবিচালিত হবে সমবায় পদ্ধতিতে। সমাজ ও জীবনমুখী শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় একপ সমবায় বিপণি পরিচালনায় উপযোগিতা অনস্বীকার্য। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রতিটি বিত্যালযে মেডিক্যাল ইউনিটেব ব্যবস্থা করা হয়ত সম্ভব নয; কিন্তু একখানি কক্ষ স্বাস্থ্য পবীক্ষা ও আনুষঙ্গিক প্রাথমিক চিকিৎসাব জন্য নির্দিষ্ট বাখা যুক্তিযুক্ত। এখানে প্রযোজনমত প্রাথমিক পবীক্ষা বা চিকিৎসার পব বোগীকে সবকারী চিকিৎসা কেন্দ্রে অথবা স্ব-গৃহে পাঠানো সম্ভব হবে।

অবশেষে বলা যায়, আবাসিক বিত্যালযের জন্য প্রযোজন **সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড**। কারণ সেখানে উল্লিখিত কক্ষ সংবলিত গৃহ ও বিস্তৃত খেলাব মাঠ ছাড়া **শিক্ষকদের পৃথক আবাস কক্ষ** (Staff quarters) এবং **শিক্ষার্থীদের হোষ্টেল** থাকা প্রযোজন।

পায়খানা ও প্রস্রাবাগার (Latrine & lavatory)ঃ মলমূত্র ত্যাগ প্রতিটি মানুষেব অতি স্বাভাবিক ক্রিয়া। বিত্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেব দিনের অধিকাংশ সময অতিবাহিত করতে হয। এক একটা বিত্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। সুতরাং মলমূত্র ত্যাগের ন্যায় স্বাভাবিক কর্মের জন্য বিত্যালয় গৃহ-পরিবেশের এক্তিয়ারে পৃথক পায়খানা ও প্রস্রাবাগার নির্মাণ করা বিত্যালয় সংগঠনের অবশ্য কর্তব্য। সহ শিক্ষার বিত্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক পৃথক পায়খানা ও প্রস্রাবাগার তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। আধুনিক যুগে পাযখানা হবে স্যানিটারী এবং পায়খানা ও প্রস্রাবাগার পাকা গাঁথুনিযুক্ত হবে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিত্যালয়ের উত্তর দিকে এমন স্থানে

পায়খানা ও প্রস্রাবাগার থাকবে যেন এর দুর্গন্ধ দ্বারা শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যহানির কোন সম্ভাবনা না থাকে। তাছাড়া পায়খানা ও প্রস্রাবাগার ধৌত করার জন্য যেমন জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে, তেমনি ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(৬) **খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার** : বিদ্যালয়-গৃহ পরিবেশের একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হল স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যবস্থাপনা। খেলার মাঠ, ব্যায়ামাগার, গৃহাভ্যন্তরীণ খেলাধূলার ব্যবস্থাপনা স্বাস্থ্যশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। তাই প্রতিটি বিদ্যালয়ের সঙ্গে খেলার মাঠ থাকা প্রয়োজন। ব্যায়ামাগার ও গৃহাভ্যন্তরীণ খেলা বিদ্যালয় কক্ষে চলতে পারে কিন্তু ফুটবল, হকি প্রভৃতির জন্য প্রয়োজন হয় বড় ময়দান। গ্রামাঞ্চলে এরূপ খেলার মাঠ সংগ্রহ করা সহজতর কিন্তু শহরে স্কুল সংলগ্ন খেলার মাঠ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নিতান্ত কম। তবে ভলিবল, ব্যাটমিণ্টন প্রভৃতি ছোটোখাটো খেলার জন্য অল্প পরিসর মাঠ হলেই চলে। ছাত্রদের কমনরুমে টেবিল টেনিস, ক্যারম প্রভৃতি খেলা চলতে পারে। কিন্তু ব্যায়ামাগার পৃথক থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৭) **কৃষি বিদ্যালয়ের পৃথক কৃষিক্ষেত্র** : কৃষি বিদ্যালয়ের জন্য অনেক জমি প্রয়োজন। এ ছাড়া পৃথক কৃষি-জমি, গোলাবাড়ী, কৃষি-যন্ত্রাদি সংরক্ষণের গৃহ থাকা আবশ্যক। এসবের জন্য নিশ্চয়ই পৃথক জমি ও গৃহের প্রয়োজন। তত্ত্বগত শিক্ষার (theoretical) সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক (practical) শিক্ষার ব্যবস্থাপনা না থাকলে কৃষি বিদ্যালয়ের কোন উপযোগিতা নেই। সবুজ বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ কৃষি বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন আছে।

(৮) **সহজসাধ্য যাতায়াত ব্যবস্থা** : বিদ্যালয় পরিবেশের কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে, কক্ষ থেকে অফিসে, পরীক্ষাগার থেকে পাঠাগারে যাতায়াতের সহজ-সাধ্য ব্যবস্থা যাতে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ করা কর্তব্য। শ্রেণীকক্ষে একই দরজায় প্রবেশ করা ও বহির্গমনের ব্যবস্থা থাকলে নিশ্চয়ই যাতায়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। গ্রামাঞ্চলে যেখানে বিচ্ছিন্ন গৃহ পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে সেখানে যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রাঙ্গণে রাস্তা ও রাস্তার ওপর টিনের ছাউনি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহলে রৌদ্র বা বৃষ্টির মধ্যেও যাতায়াতের অসুবিধা হবে না। যাতায়াতের সহজ ও সুব্যবস্থা বিদ্যালয় জীবনে সংহতি ও সমন্বয় বিধান করে। উপরন্তু সময়-তালিকায় নির্ধারিত সময়ের অপচয় কম হয়।

(গ) মিতব্যয় (Economy) : আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক বিচারে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণের সময় বিদ্যালয় সংগঠনের মিতব্যয়িতার দিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। ভারত গরীব দেশ। এদেশে বিদ্যালয়-গৃহ তৈরির নির্দিষ্ট মান অক্ষুণ্ণ রাখা কষ্টসাধ্য। তবু আদর্শ বিদ্যালয়ের জন্য গৃহনির্মাণ পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নরূপ বিষয়গুলির দিকে মনোযোগ দেওয়া যুক্তিযুক্ত :

প্রথমতঃ, মুক্তাঙ্গন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ওপর বর্তমানে গুরুত্ব আরোপ করা কর্তব্য। তত্ত্বগত বিষয় শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মুক্তাঙ্গন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠককে উৎসাহিত করা উচিত। কেবলমাত্র ব্যবহারিক অংশের জন্য পরীক্ষাগার, ওয়ার্কশপ, মিউজিয়াম, গ্রন্থাগার ইত্যাদি সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে পৃথক গৃহ প্রাঙ্গণ অবশ্য প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতের আঞ্চলিক জলবায়ুর ওপর ভিত্তি করে হল-কেন্দ্রিক (Central Hall type) বা চতুষ্কোণ ভঙ্গীর (quadrangle type) বাড়ি নির্মাণ করাই যুক্তিযুক্ত।* তাছাড়া বাড়িটি যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও উপযোগ ভিত্তিক হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

তৃতীয়তঃ, ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়-গৃহের ভিত্তি স্থাপন করা কর্তব্য। একসঙ্গে বহু কক্ষবিশিষ্ট গৃহ নির্মাণ করা বেসরকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে আর্থিক সামর্থ্যের বাহিরে। কিন্তু সম্প্রসারণের সুযোগ থাকলে ঐ একই গৃহে গ্রন্থাগার, পাঠাগার, কলা ও শিল্প কক্ষ, ব্যায়ামাগার, মিউজিয়াম, বিজ্ঞান পরীক্ষাগার, ওয়ার্কশপ প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে নির্মাণ করা সম্ভব হবে। একটা আদর্শ সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে এসব কক্ষের উপযোগিতা অসীম। তাই গৃহ পরিকল্পনাকালে ভবিষ্যৎ সম্প্রাসরণের সুযোগ রাখা বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) সৌন্দর্যভিত্তিকতা (Aesthetic Aspect) : বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণের সময় গৃহের সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। সৌন্দর্যই রুচিবোধের সৃষ্টি করে। যে বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাকর্মীরা দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করবে সেখানকার পরিবেশ যদি রুচিসম্মত না হয় তাহলে শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের ন্যায় বৌদ্ধিক ক্রিয়া পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াশীল হতে পারে না। তাই স্থান নির্বাচন, গৃহের গঠন ভঙ্গী, দেওয়াল ও জানালা-দরজার রঙ, রাস্তাঘাট, কক্ষ ও কক্ষাভ্যন্তর ইত্যাদি যাতে রুচি ও সৌন্দর্য সম্মত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা

---

* ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যুক্তিযুক্ত। মনে রাখা উচিত আদর্শ গৃহ-নির্মাণে যে ব্যয় হয় রুচিসম্মত ও সৌন্দর্য মণ্ডিত গৃহ-নির্মাণে তার অতিরিক্ত কিছু ব্যয় হয় না। শুধু গৃহ-নির্মাণ কর্মের সঙ্গে রুচিকর চিন্তাধারা বা সৌন্দর্যবোধের যোগসূত্র থাকলেই যথেষ্ট।[1]

৫। শ্রেণীকক্ষ (Class Room) :

একটা বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা কত হবে সেটা নির্ভর করে **প্রথমতঃ**, বিদ্যালয়ের শিক্ষাস্তরের ওপর। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বা উচ্চতর মাধ্যমিক (বহু প্রবাহবিশিষ্ট) প্রভৃতি নানা স্তরের বিদ্যালয় আছে। আবার প্রতিটি মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রাথমিক (Primary) বিদ্যালয়ের শ্রেণীগুলিও যুক্ত থাকে। সুতরাং বিদ্যালয়টি কোন্ ধরনের বা বিদ্যালয়টি কি উদ্দেশ্যে স্থাপিত—তার ওপর শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা নির্ধারিত হয়। **দ্বিতীয়তঃ**, বর্তমানে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলশ্রুতি স্বরূপ বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এক একটা শ্রেণীতে ক, খ, গ ইত্যাদি বিভাগ (section) থাকে। বিভাগের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের সংখ্যাও বাড়ানোর প্রয়োজন হয়। **তৃতীয়তঃ**, সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে দুই বা ততোধিক ঐচ্ছিক বিষয় (elective subjects) পাঠের ব্যবস্থা থাকলে ঐসব বিষয়ের সংখ্যা (মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কারিগরী ইত্যাদি) অনুসারে শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। সুতরাং এক একটি বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা কত হবে তা আগে থেকে নির্ধারণ করা দুরূহ কর্ম। তবুও বলা যায় পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় বিদ্যালয়ের গঠন-ভঙ্গিমার (type & design) সঙ্গে গৃহ সম্প্রসারণের (expansibility) সুযোগ সংরক্ষণের কথাটি বিবেচনা করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা নির্ধারণের ভিত্তি

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ও শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির প্রয়োজনে বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রসংখ্যার হার ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতে অধিক ছাত্র ভর্তি করা ছাড়াও শ্রেণীগত বিভাগের ('ক' বিভাগ, 'খ' বিভাগ ইত্যাদি) সংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে জাতীয় প্রয়োজনে

---

1. **তুলনীয় : "I have the feeling that while the elimination of ugliness should not involve any expense, the creation of artistic effects can be combined with functional efficiency without necessarily involving extravagance"—*K. G. Saiyiddin.* (as quoted by Sengupta & Sengupta).**

বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো যায় কিন্তু শ্রেণীকক্ষে ছাত্রসংখ্যার একটা নির্দিষ্ট মান থাকা উচিত। অন্যথায় বিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষাচর্চা ব্যাহত হয়। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সৃষ্টি হয় দুস্তর ব্যবধান। শিক্ষক বাধ্য হয়ে শ্রেণীকক্ষে কালক্ষেপণ ও গৃহশিক্ষকতা দ্বারা অধিক উপার্জনে লিপ্ত হয়ে পড়েন। শিক্ষার্থীরাও পরীক্ষাসাগর পেরোবার জন্য অসৎ উপায়ের সন্ধান করে। বিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষা-পরিবেশ সৃষ্টির অন্যতম উপায় হল নির্দিষ্ট ও সম্ভাব্য সংখ্যক ছাত্র ভর্তির বিধি প্রবর্তন করা। প্রতিটি শ্রেণীতে ৩০ থেকে ৪০ জনের বেশী ছাত্র ভর্তি করা উচিত নয়।[1]

শ্রেণীপিছু ছাত্র-সংখ্যার মান নির্ধারণ যুক্তিযুক্ত

প্রতিটি শ্রেণীকক্ষের পরিমাপ নির্ভর করে ছাত্রসংখ্যার ওপর। ছাত্রসংখ্যার নির্দিষ্ট বিধি প্রবর্তিত হলে শ্রেণীকক্ষের পরিমাপ নির্ধারণের কোন অসুবিধা হয় না। কারণ, **আয়তনের বিচারে** অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ধারণা করেন ছাত্রপিছু ১০ বর্গফুট স্থান নির্দিষ্ট করা উচিত।[2] এই ভিত্তিতে প্রতি ৪০টি ছাত্রের শ্রেণীকক্ষের জন্য ৪০ × ১০ = ৪০০ বর্গফুট স্থান প্রযোজন। শ্রেণীকক্ষের মাপ ২০´×২০´ ফুট হতে পারে অথবা দৈর্ঘ্যে একটু বেশী হতে পারে। তবে মনে রাখা উচিত অপ্রশস্ত লম্বা কক্ষের পরিবর্তে বর্গাকার কক্ষই ভাল। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের প্রযোজন মাফিক অনুপাত হল ৪ : ৩। এই প্রসঙ্গে **ঘরের উচ্চতার** দিকেও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। প্রাচীন ভঙ্গীমায় কেন্দ্রীয় হলগুলি ছিল ১৮´ থেকে ২০´ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট। কিন্তু নতুন আধুনিক গৃহগুলি একতলা কক্ষের উচ্চতা ১০´ থেকে ১২´ ফুটের মতো। এই অনুপাতে দোতলা কক্ষের উচ্চতা একটু কম। উচ্চতা সম্পর্কে দুটি প্রযোজনীয় বিষয় মনে রাখা উচিত। **প্রথমতঃ,** অত্যধিক উচ্চতা ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে ; **দ্বিতীয়তঃ,** অতিরিক্ত নীচু কক্ষে আলো-বাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়, উপরন্তু শিক্ষকের কণ্ঠস্বর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এতে শুনে শেখার পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাই বলা হয়, উচ্চতা কোন মতে ১৫ ফুটের অধিক হওয়া উচিত নয়।

শ্রেণীকক্ষের পরিমাপ

বিদ্যালয়-গৃহের দুদিকে বারান্দা এবং প্রতিটি শ্রেণীকক্ষের দুদিকে ঋজু ঋজু দরজা এবং জানালা বসানো বাঞ্ছনীয়। যদি একদিকে বারান্দা থাকে তাহলে

1. "The optimum number that should be admitted to any class should be 30 and the maximum should not exceed 40.—Report of the Secondary Education Commission—P. 158.

2. Report of the Secondary Education Commission—P. 158.

দরজার বিপরীত দিকে জানালা রাখা প্রয়োজন। মেঝের ওপর থেকে ৩½'/৪' উঁচুতে জানালা বসানো যুক্তিসঙ্গত। তাহলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বাইরে আকর্ষিত হবে না। কোন্‌দিকে দরজা ও কোন্‌দিকে জানালা থাকবে সেটা গৃহের ও কক্ষের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দিকে এবং শ্রেণীকক্ষে আলোক ও বায়ু গমনাগমনের সুবিধার ওপর নির্ভর করে। আলোক প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, শ্রেণীকক্ষে পাঠরত শিক্ষার্থীদের বামদিক থেকে আগত আলোর স্রোত সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

যথেষ্ট আলোক ও বায়ু প্রাপ্তির সুযোগ

এতে হাতের বা দেহের ছায়া পড়ে কাজকর্মে অন্তরায় সৃষ্টি করে না। পিছন দিক থেকে আগত আলোতে দেহের ছায়া টেবিলে পড়ে, আবার সামনের দিকের আলোতে চোখ ঝলসে যায় ও কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ডান দিকের আলোতে ছায়া পড়লেও খুব বেশী অসুবিধা সৃষ্টি করে না।[1] সুতরাং ছাত্রদের ডান দিকে ও বাম দিকে দরজা-জানালা থাকা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া যথেষ্ট আলো প্রাপ্তির সুবিধার জন্যে ছাদে বসানো কাঁচের জানালা (Sky-light) ব্যবহার করা যায়। এটা একতলা বাড়িতেই সম্ভব। আবার সিলিং-এর নীচে দেওয়ালেও কাঁচের জানালা বসিয়ে আলোক প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। দূষিত বায়ু দূরীকরণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ভেন্টিলেটর (Ventilator) ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। ভেন্টিলেটর, স্কাই-লাইট, কাঁচের জানালা এবং দেওয়ালের দরজা-জানালা ইত্যাদি শ্রেণীকক্ষ সহ সামগ্রিক স্কুল-গৃহটিকে আলো-বাতাসযুক্ত স্বাস্থ্যপ্রদ করে তোলে—সন্দেহ নেই।

ঘরের দেওয়ালে সাদা রঙ করার রীতি খুব বেশী প্রচলিত। চুনকাম করাও (white wash) যথেষ্ট ব্যয় সাধ্য—সন্দেহ নেই।

দেওয়াল ও দরজা-জানালার রঙ

সাদা রঙ চোখের পক্ষে সম্পূর্ণ ভাল—এটা বলা চলে না। কারণ, এতে অনেক সময় অতিরিক্ত আলো প্রতিফলিত হয়। আবার দেওয়াল খুব তাড়াতাড়ি অপরিষ্কার হয়ে পড়ে। সাদার সঙ্গে ঈষৎ সবুজ রঙ মেশানো চোখের পক্ষে যথেষ্ট উপাদেয়। মোট কথা, দৃষ্টির অন্তরায় না হয় এমন রঙ দেওয়ালে ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। দরজা-জানালার রঙ হবে ঈষৎ হলুদ রঙ মেশানো সবুজ। কারণ এ-রঙ চোখের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক।

---

1. **'The main light should come from the left side in order that there may be no shadow thrown on the work that is being done. Light from behind throws a shadow on the whole work, light from the front is dazzling light from the right side is not so bad, but some shadow is cast." —*Byburn*: The Organisation of Schools. P. 158.**

শ্রেণীকক্ষের কয়েকটি অত্যাবশ্যক আসবাবপত্র (Some essential furniture of class-room) : বিদ্যালয়ের যে অংশে শিক্ষার্থীরা দীর্ঘসময় অতিবাহিত করে সেটি হল শ্রেণীকক্ষ। শ্রেণীকক্ষ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-প্রক্রিয়া পরিচালনার সুবিধার্থে নানা প্রকার আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জামের প্রযোজন হয়। এগুলির মধ্যে (ক) শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য বেঞ্চ বা ডেস্ক, (খ) শিক্ষকের জন্য ডায়াস বা প্লাটফর্ম সহ চেয়ার-টেবিল, (গ) আর শিক্ষণের জন্য ব্লাকবোর্ড, ম্যাপ ষ্ট্যাণ্ড, কাবার্ড (Cup board), শ্রেণী গ্রন্থাগারের সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া (ঘ) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য বাজে কাগজের ঝুড়ি (Waste paper basket) এবং পিকদানী (Spitbox) রাখা যুক্তিযুক্ত।

(ক) শিক্ষার্থীদের ব্যবহৃত বেঞ্চের সংখ্যা কতগুলি হবে সেটা নির্ভর করে ছাত্রসংখ্যার ওপর। প্রতিখানা বেঞ্চ অন্ততঃ ৬´ ফুট লম্বা হবে। এতে নিম্নশ্রেণীর ৫ জন ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে বসতে পারে, আর উচ্চতর শ্রেণীর ৪ জন শিক্ষার্থী বসতে পারে। তাহলে ৪০ জনের জন্য প্রয়োজন হবে ১০ খানি বেঞ্চ। প্রতিটি বেঞ্চে একটি ছাত্র ১´ ৬´´ স্থান দখল করবে। বেঞ্চ দু'প্রকারের হতে পারে। বসার বেঞ্চ ও হাই বেঞ্চ পৃথক পৃথক অথবা দুখানি বেঞ্চ একত্রে জোড়া। বই, খাতা ইত্যাদি রাখার জন্য হাই-বেঞ্চের ছাদের নীচে একটি করে তাক (shelf) রাখা ভাল। তাহলে লেখা ও পড়ার সময় বেঞ্চের ফাঁকা উপরিতলটুকু খুবই কার্যকর হয়। সিট-বেঞ্চ ও হাই-বেঞ্চ জোড়া হলে উভয়ের মাঝে এমন ফাঁক (gap) থাকা দরকার যেন নিকটে টেনে নেওয়ার অথবা দূরে সরাবার খুব বেশী প্রয়োজন না হয়। হাইবেঞ্চের উপরিতল মেঝের সঙ্গে সমতল (flat) অথবা ছাত্রের দিকে একটু ঢালু (slanting) হতে পারে। তবে বেঞ্চগুলি সব একই ধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহলে সুবিধাগত তারতম্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঈর্ষাজনিত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় না। বেঞ্চ ব্যবহারের কতকগুলি **অসুবিধাও** আছে। এতে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে না। হাই-বেঞ্চখানাকে নিকটে টেনে নেওয়ার প্রয়োজন হলেও টানা যায় না। কারণ তাতে অন্যের অসুবিধা হতে পারে। জোড়া বেঞ্চগুলিতে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত উভয় প্রকার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। এতে দূরে সরানো বা নিকটে টেনে নেওয়া —এ দুটির কোনটিই সম্ভব হয় না।

শিক্ষার্থীদের জন্য উঁচু ও নীচু বেঞ্চ

আধুনিক হায়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালযে বেঞ্চের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য পৃথক পৃথক চেযার ও ডেস্ক দেওয়া হয়। চেযারগুলির পশ্চাৎভাগ থাকে কিন্তু হাতল থাকে না। মেরুদণ্ড সোজা করে বসা ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের প্রযোজনে চেয়ারেব পশ্চাৎভাগটিকে লম্ব-ধাঁচে (perpendicular) করা হয়। হাতলবিহীন চেযার শ্রেণীকক্ষে ব্যবহারের পক্ষে উপযোগী। কারণ, এখানে শিক্ষার্থীকে পডা বা লেখাব কাজে অধিকাংশ সময নিমগ্ন থাকতে হয। আবার একপ চেযার স্থানান্তর কবণের পক্ষে সুবিধা জনক। শ্রেণীকক্ষের ডেস্কগুলিব উপরিতল সমতল (flat) অথবা অর্ধঢালু (half slanting) হতে পারে। অনেকে অর্ধ-ঢালু তলের ওপব সহজে লিখতে ও পড়তে পাবেন। তবে এটা অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে। শিক্ষার্থীদেব বই, খাতা রাখাব সুবিধার্থে ডেস্কেব উপবিতলেব ঠিক নীচে একটি করে ড্রযাব রাখা যায। ঢালু তলেব উপরিতলটিকেই কবজার সাহায্যে বাক্সের ঢাকনা রূপে ব্যবহাব করা চলে। ড্রয়ার বা বাক্সের তালাচাবিব ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষার্থীবা স্ব-স্ব সামগ্রী সংরক্ষণের সুবিধা পায।

শিক্ষার্থীদের জন্য ডেস্ক চেয়ার

শিক্ষার্থীদেব প্রযোজন অনুসাবে বেঞ্চ ও ডেস্কের চলতি গঠন-ভঙ্গিমাব কথা বলা হযেছে। এই বেঞ্চ ও ডেস্কগুলি নানা ভঙ্গীর হতে পাবে। বেঞ্চ প্রসঙ্গে **প্রথমতঃ,** বলা যেতে পারে, শিক্ষার্থীদের স্থান নির্দেশ করাব জন্যে সিট বেঞ্চ-এব মাঝে মাঝে পার্টিশন (উচ্চতায় ৮´´) দেওয়া যেতে পারে। আর শ্রমলাঘবের প্রয়োজনে সিট বেঞ্চের পিছনে লম্বভাবে পশ্চাৎভাগ (back side) বাখা যেতে পারে। অনেকে লেখাপডার সময আরাম প্রাপ্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু দেহের কষ্ট মানসিক অসুস্থতা বৃদ্ধি করে, ফলে শিক্ষার্থীর মনোযোগে বিঘ্ন ঘটতে পারে। তাই চেয়ারের পৃষ্ঠদেশের ন্যায় বেঞ্চের পৃষ্ঠদেশ রাখা যুক্তিযুক্ত।

বেঞ্চ ও ডেস্কের গঠন-ভঙ্গীর বৈচিত্র্য

দ্বিতীয়তঃ, ডেস্কের সঙ্গে চেয়ার ব্যবহারের পরিবর্তে পশ্চাৎভাগযুক্ত ৬´ ফুট লম্বা বেঞ্চ ব্যবহার করা যায়। বেঞ্চের সামনে ব্যবহৃত ডেস্কগুলি ছোট করে এক জনের ব্যবহারের উপযোগী অথবা দুজনে ব্যবহার করতে পারে এমন ডেস্কও তৈরি করানো যায়। শ্রেণীকক্ষে যুগ্ম-(double) ডেস্ক ব্যবহার করলে স্থান সংকুলানের সুবিধা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে ডেস্কের উপরিভাগ হবে মসৃণ এবং ড্রয়ারে তালাচাবি দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা যুক্তিযুক্ত।

তৃতীয়তঃ, অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যবহৃত ডেস্ক ও চেয়ার উভয়ের নীচের দিকে যুক্ত থাকে। এসব চেয়ারে হাতল থাকে না বটে কিন্তু লম্বভাবে তৈরি অথবা সামান্য হেলানো পৃষ্ঠদেশ থাকে। ডেস্কের উপবিতল দুভাগে বিভক্ত। এক ভাগ থাকে মেঝের সঙ্গে সমতলে আর দ্বিতীয় অংশটি শিক্ষার্থীর দিকে হেলানো এবং চেয়ারের অর্ধেক অংশ আবৃত করে রাখে। দ্বিতীয় অংশটিকে কবজার সাহায্যে এমনভাবে সাজানো হয় যে প্রয়োজনমত একে উঁচু-নীচু করা যায়। চেয়ার ও ডেস্কের মাঝে প্রবেশ করার সময় এই হেলানো অংশটিকে উঁচু করেই স্থান করে নিতে হয়। এই নীচু অংশটির ওপর কোন কিছু লেখা অথবা কনুই রেখে শিক্ষকের দিকে মনোযোগ দেওয়ার সুবিধা হয়। এরূপ ডেস্ক ও চেয়ার যে ব্যয়বহুল সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।

চতুর্থতঃ, সর্বাধুনিক এক ধরনের লেখার চেয়ারের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এর পৃষ্ঠদেশ সহ একখানি মাত্র চওড়া হাতল (ডানপার্শ্বে) থাকে। এই হাতলের উপর লেখা ও পড়ার সুবিধা হয়। বই ও খাতাপত্র রাখার জন্য চেয়ারের তলায় একটি করে তাক রাখা হয়। চেয়ারের ডান ধারের এই লেখার হাতলটি চওড়া ও একটু সামনের দিকে ঘোরানো থাকে। এরূপ চেয়ারে স্থান সংকুলান হলেও খরচ বেশী। পক্ষান্তরে উচ্চ শ্রেণীতে অথবা কলেজ স্তরে এরূপ চেয়ার ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বিদ্যালয়ের ছোট ছেলেদের পক্ষে এরূপ আধুনিক চেয়ার যথেষ্ট সুবিধার নয়।

শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীদের বেঞ্চ ও ডেস্ক **সাজানো ও বসবার ব্যবস্থাপনার** জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের দিকে নজর রাখা প্রয়োজন। **প্রথমতঃ,** শিক্ষার্থীদের বাম দিক থেকে আগত আলোকরশ্মি যেন কোন উপায়ে ব্যাহত না হয়। **দ্বিতীয়তঃ,** শিক্ষার্থীদের স্ব-স্ব স্থানে গমনাগমনের পথ যেন নির্দিষ্ট থাকে। **তৃতীয়তঃ,** ম্যাপষ্ট্যাণ্ড ও ব্লাকবোর্ডে কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত থাকতে হয়। বসবার স্থান থেকে বেরিয়ে আসার পথটি এমন হবে যেন শিক্ষার্থীরা ব্লাকবোর্ড ও ম্যাপ ষ্ট্যাণ্ডের দিকে সহজে আসতে পারে। **চতুর্থতঃ,** আসন ব্যবস্থা যেন স্বাভাবিকভাবে বায়ু-প্রবাহের অন্তরায় না হয়। **পঞ্চমতঃ,** স্ব-স্ব স্থানে উপবিষ্ট শিক্ষার্থীরা যেন সহজে শিক্ষক, ব্লাকবোর্ড, ম্যাপষ্ট্যাণ্ডটিকে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর করতে পারে।

শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থাপনা

(খ) ডায়াসের ওপর স্থাপিত চেয়ার, টেবিলই হল শিক্ষক কর্তৃক ব্যবহৃত সাধারণ ও অতি প্রযোজনীয় আসবাবপত্র। ডায়াসের উচ্চতা হবে অন্ততঃ এক ফুটের কম নয়। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের ব্যবহৃত চেয়ারটি হবে সাদাসিধে হাতলবিহীন। কারণ এখানে শিক্ষককে সর্বদা কর্মে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাঁর বসার অবকাশ থাকে নিতান্তই কম। তবে যৎকিঞ্চিৎ অবসরে একটু বসার জন্য এরূপ চেয়ারেরই কার্যকারিতা যথেষ্ট। কিন্তু তাঁর টেবিলটি হবে যথেষ্ট মজবুত ও ড্রয়ারযুক্ত। ড্রয়ারে নানা ধরনের শিক্ষোপকরণ যেমন রাখা যায় তেমনি এখানে উপস্থিতির রেকর্ড (Attendance Register), চক, ডাষ্টার ইত্যাদিও রাখা যেতে পারে। টেবিলে ড্রয়ার না থাকলে শ্রেণীকক্ষে পৃথক একটি ঢাকনাযুক্ত শেলফ (Shelf) রাখা যুক্তিযুক্ত। টেবিলের ড্রয়ার বা শেলফ-এ তালা-চাবি ব্যবস্থা থাকবে। এর চাবিটি শিক্ষক নিজে রাখতে পারেন অথবা শ্রেণীর মনিটরের নিকট এটিকে রাখা যেতে পারে। অন্য শিক্ষক যখন ক্লাস নেবেন তখন মনিটর চাবিটি সরবরাহ করবে। তবে চাবিটিকে কিবোর্ডে (Key Board) রাখলে প্রযোজনমত অন্যান্য শিক্ষকও এটিকে ব্যবহার করতে পারেন।

শিক্ষক কর্তৃক ব্যবহৃত আসবাবপত্র

(গ) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ-প্রসঙ্গে অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির মধ্যে ব্লাকবোর্ড, কাবার্ড, ম্যাপষ্ট্যাণ্ড ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব আসবাবপত্র ছাড়া শিক্ষণ-প্রক্রিয়া পরিচালনা করা, শিক্ষোপকরণ ব্যবহার করা এমনকি পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করার ক্ষেত্রেও বিঘ্নের সৃষ্টি হয়।

ব্লাকবোর্ড (Black Board): শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত আসবাবপত্রের মধ্যে ব্লাকবোর্ডের প্রযোজনীয়তা খুব বেশী। ব্লাকবোর্ড কোন শিক্ষোপকরণ নয় কিন্তু শিক্ষার্থীদের প্রযোজনে বোর্ডের ওপর কিছু লিখলে বা অঙ্কন করলে উপকরণরূপে পরিগণিত হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে যা জানাতে চান বা শেখাতে চান তা তিনি বোর্ডে লেখেন বা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করেন। পাঠ্যবিষয়ের ভাববস্তু ব্লাকবোর্ডের ওপর সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিষয়টি বোর্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জানতে পারে। তাই ব্লাকবোর্ড শিক্ষকের কর্মের পরমসহায়ক বন্ধু হিসেবে শ্রেণীকক্ষের অপরিহার্য উপাদান। তাই ব্লাকবোর্ডের ব্যবহার না জানলে সার্থক শিক্ষক হওয়া যায় না।

ব্লাকবোর্ডের প্রকার ভেদ: প্রচলিত ব্লাকবোর্ডের পাঁচটি প্রকার ভেদ লক্ষ্য করা যায়, যথা—(i) দেওয়াল ব্লাকবোর্ড (Wall Black Board),

(ii) তেপায়ার ব্লাকবোর্ড (Easel Black Board), (iii) ফ্রেমের মধ্যে ঘুরন্ত ব্লাকবোর্ড (Rotating Black Board), (iv) ফ্রেমের মধ্যে যুগ্ম ব্লাকবোর্ড (Sliding Double Black Board) এবং (v) গ্রাফ বোর্ড (Graph Board)।

(i) দেওয়াল ব্লাকবোর্ড সাধারণতঃ তিন প্রকারের হতে পারে। (ক) ঘরের দেওয়ালের খানিকটা অংশ মসৃণ করে কালো রঙ করে দেওয়া হয় এবং এটিকেই ব্লাকবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটা হল স্থায়ী (fixed) ব্লাকবোর্ড। এতে খরচ কম হয় বটে কিন্তু প্রয়োজনমত এটাকে ঘোরানো বা উঁচু-নীচু করা যায় না। ফলে এরূপ বোর্ড ব্যবহারে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়কেই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

(খ) ওয়াল ব্লাকবোর্ড কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি আয়তক্ষেত্র বা বর্গাকারের হতে পারে। এ বোর্ড দেওয়ালে বসানো পেরেকের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝোলানো থাকে। দেওয়ালের সমান্তরালে এর অবস্থান। এরূপ বোর্ড তৈরির খরচ কম। এ বোর্ড প্রয়োজনমত স্থানান্তরকরণ করা যায় কিন্তু খানিকটা সময় ও শ্রমসাপেক্ষ। প্রয়োজন অনুসারে উপরের বা নীচের কোন পেরেকে ঝোলাতে গেলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

(গ) দেওয়ালে ঝোলানো কালো কাপড় অথবা রবারের তৈরি এক প্রকার রোলার বোর্ড ব্যবহার করা হয়। এগুলিকে ম্যাপের ন্যায় রোল করে অন্যত্র গুছিয়ে রাখা যায়। ট্রেনিং কলেজে এরূপ বোর্ডের ব্যবহার বেশী লক্ষ্য করা যায়। বাড়ি থেকে শিক্ষকরা এর ওপর ম্যাপ, চিত্র বা ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের দেখাতে পারেন। তাহলে সময়ের সাশ্রয় যেমন হয় তেমনি পড়ানোর অগ্রগতি অব্যাহত থাকে।

(ii) কাঠের তৈরি তেপায়ার ওপর স্থাপিত হেলানো ব্লাকবোর্ডের ব্যবহার কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে। এটাকে স্থাপন করার জন্য শ্রেণীকক্ষে অনেকখানি স্থান প্রয়োজন হয়। একে সহজে স্থানান্তর করা যায় এবং একদিকে লেখার পর বোর্ডটিকে উল্টে দিয়ে অন্যদিকেও লেখা যায়। আবার ব্যবহারের সময় একে কম-বেশী কৌণিক পরিমাপে হেলানো যায়। শ্রেণীকক্ষের সাধারণ কাজের জন্যে এ ধরণের বোর্ডের উপযোগিতা যথেষ্ট আছে।

(iii) কাঠের ফ্রেমের মধ্যে ঘূর্ণায়মান ব্লাকবোর্ডের এক পিঠে লেখা শেষ হলে ঘুরিয়ে অন্য পিঠেও লেখা যায়। তবে তেপায়ায় স্থাপিত হেলানো বোর্ডের

মতো ঘোরানোর পর অপর পিঠের লেখা আর শিক্ষার্থীরা দেখতে পায় না। কাঠের ফ্রেমটিকে একদিকে যেমন স্থানান্তর করা সহজ তেমনি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিগ্রাহ্য করার সুবিধার্থে এটিকে প্রয়োজনীয় কৌণিক মাপে (angle) হেলানোও সম্ভব।

(iv) আবার কাঠের ফ্রেমের মধ্যে ঘূর্ণায়মান বোর্ডের পরিবর্তে যুগ্ম (double) ও উঁচু-নীচু করার উপযোগী (sliding) ব্লাকবোর্ড ব্যবহার করা হয়। এর একখানিতে লেখা শেষ হলে সরিয়ে ওপরে তুলে দেওয়া যায়। তখন নিম্নাংশের বোর্ডে কাজ করা যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ওপরের অংশটিও সহজে দেখতে পায়। এরূপ বোর্ডের ব্যবহার শিক্ষামূলক হলেও বিশেষ ব্যয়বহুল সন্দেহ নেই।

(v) গ্রাফ বোর্ড (Graph Board) উল্লিখিত বোর্ডগুলির গঠন ভঙ্গিমার অনুরূপ হতে পারে। পার্থক্য হল এরূপ বোর্ডের ওপর উলম্ব (vertical) এবং আনুভূমিক (horizental) রেখা টানা থাকে। উভয় প্রকার রেখার দ্বারা বোর্ডের উপরিতলটিকে এক ইঞ্চি (১´´) পরিমাণ বহু বর্গক্ষেত্রে ভাগ করা থাকে। গ্রাফ অনুচিত্র, মানচিত্র ইত্যাদি অঙ্কন করার সময় গ্রাফ বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পরিমাপ সম্বলিত কোন কিছু অঙ্কন করার সময় গ্রাফ বোর্ডের সহযোগিতা ভিন্ন কোন উপায় থাকে না।

শ্রেণীকক্ষে ব্লাকবোর্ডের উপযোগিতা (Importance of the Black Board in the class-instruction)ঃ শ্রেণীকক্ষে ব্লাকবোর্ডের উপযোগিতা হলঃ **(ক) শিক্ষার্থীদের মনযোগ আকর্ষণ**ঃ ব্লাকবোর্ড শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ নিয়ন্ত্রণ করে। শিক্ষক যখন ব্লাকবোর্ডে পাঠ্য বস্তুর সারাংশ বিষয়বস্তুর প্রধান প্রধান শীর্ষগুলি, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি লেখেন ও ব্যাখ্যা করেন তখন শ্রেণী-কক্ষের সকল শিক্ষার্থী বোর্ডের দিকে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে ও শিক্ষকের নির্দেশ পালন করে। এতে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

(খ) উপকরণ ভিত্তিক দৃষ্টান্ত স্থাপনঃ প্রতিটি পাঠ্যবিষয়কে শিক্ষার্থীদের নিকট সুস্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাসহায়ক উপকরণাদির প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিদিন এরূপ শিক্ষাসহায়ক উপকরণ সংগ্রহ করা ও শিক্ষার্থীদের প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষক ব্লাকবোর্ডে উপকরণ অঙ্কন করে বিষয়বস্তুর অনুকূল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে উপকরণ সংগ্রহ করা মোটেই সম্ভব নয়, সে-সব ক্ষেত্রে শিক্ষক বোর্ডে বিষয়ের অনুকূল অনুচিত্র, গ্রাফ, মানচিত্র ইত্যাদি অঙ্কন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মৌসুমি বায়ু প্রবাহের দিক নির্ণয় করার সময় বোর্ডে ভূমণ্ডলের আকৃতির ওপর তীরচিহ্ন দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখানো যায়। ভূগোলের ন্যায় অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পঠন পঠনের সময় ব্লাকবোর্ড ভিন্ন কোন পঠন-পাঠন সার্থক হতে পারে না। তেমনি ইতিহাস, সমাজ শাস্ত্র, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ব্লাকবোর্ডে লিখন ও অঙ্কনের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রয়োজন হয়।

(গ) **মৌখিক পাঠদানের একঘেয়েমি বিনষ্ট করে ঃ** বহুল প্রচলিত শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে মৌখিক পাঠদান পদ্ধতি অন্যতম হলেও এরূপ পাঠদানে শিক্ষার্থীরা সহজে মনোযোগ হারিয়ে ফেলে এবং একঘেয়েমির জন্য শিক্ষকও বিষয়বস্তুর ওপর বিরক্তভাব প্রকাশ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্লাকবোর্ডের কাজ শিক্ষার্থীর মনে উৎসাহ সঞ্চার করতে পারে। শিক্ষক যদি প্রয়োজনীয় শীর্ষগুলি (point) বোর্ডে লেখন, সারাংশ পর্যায়ে ক্রমবিস্তার নীতি অবলম্বন করেন, জটিল ও দুরূহ পাঠ্যাংশের ব্যাখ্যা করেন এবং মূল্যবান কথাগুলি বোর্ডে লেখেন তাহলে শিক্ষার্থীরা মৌখিক পাঠদানের একঘেয়েমিজনিত বিরক্তি ও নিরুৎসাহ বোধ করবে না।

(ঘ) **অনুকরণমূলক শিক্ষণে সুযোগ সৃষ্টি করে ঃ** ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের লিখন ও অঙ্কন শেখানোর সময় শিক্ষক ব্লাকবোর্ডে বিষয়টি লিখতে অথবা অঙ্কন করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা সেটিকে নিজ নিজ খাতায় নকল করতে পারে।

ব্লাকবোর্ড ব্যবহারের রীতি (Rules for proper use of Black-bord) ঃ ব্লাকবোর্ড ব্যবহারের সময় যেসব রীতিগুলি পালন করা কর্তব্য সেগুলি হল ঃ

প্রথমতঃ, ব্লাকবোর্ডকে দেওয়ালের ধারে এমন একটা স্থানে স্থাপন করতে হবে যেন কোন প্রকারে আলোক প্রতিফলিত হয়ে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি নিক্ষেপের অন্তরায় সৃষ্টি না হয়। যেসব শিক্ষার্থীর দূরের কিছু দেখতে অসুবিধা হয় তাদেরকে সামনের দিকে বসতে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ, ব্লাকবোর্ডের শুরুতেই সেটিকে ডাস্টারের সাহায্যে পরিষ্কার করা অথবা প্রতি পিরিয়ডে ব্লাকবোর্ড ব্যবহার করার পর সেটিকে পরিষ্কার ক'রে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয়তঃ, ব্লাকবোর্ডে সাধারণতঃ সাদা চক্ ব্যবহার করা উচিত। তবে বহু বিষয় একত্রে বুঝবার প্রয়োজন হলে রঙিন চকও ব্যবহার করা চলে।

চতুর্থতঃ, ব্লাকবোর্ডের লেখা অক্ষরগুলি হবে গোটা গোটা, সুস্পষ্ট। এর ফলে, শ্রেণীকক্ষের পশ্চাদাংশের শিক্ষার্থীরাও সেটিকে দেখতে, পডতে ও বুঝতে পারবে। ব্লাকবোর্ডে শিক্ষকেব কাজ শিক্ষার্থীদের প্রযোজনে। সুতবাং শিক্ষার্থীরা দেখতে পডতে ও বুঝতে পারলেই শিক্ষকের কাজটি সার্থক হবে।

পঞ্চমতঃ, ব্লাকবোর্ডে লেখা ও অঙ্কন করার সময় অথবা বোর্ডে লিখিত কোন বিষয় ব্যাখ্যা করার সময এমন স্থানে দাঁডিযে লিখতে হবে যেন শিক্ষার্থীবা বোর্ডের অংশটি সম্পূর্ণ দেখতে পায়। লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যে, বোর্ডের বিষযটি যেন শিক্ষকেব দেহের বা দেহাংশের দ্বারা আবৃত না হয়।

ষষ্ঠতঃ, ব্লাকবোর্ডে লেখার সময় কোন কর্কশ শব্দ যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য করা প্রযোজন। এরূপ কর্কশ শব্দ হলে অথবা বারে বারে চক্ অথবা ডাস্টাব হাত থেকে পডে গেলে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষযে মনোযোগ দানে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয।

সপ্তমতঃ, শিক্ষার্থীদের নোট করে নেওযার উপযোগী বিষয বোর্ডে লেখাব পর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে মুছে না দেওয়াই বাঞ্ছনীয। সকল শিক্ষার্থীর কাজ শেষ হলে তখন মুছে দেওয়া যেতে পারে।

অষ্টমতঃ, বোর্ডে লেখার সময় শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য।

অবশেষে বলা যায, ব্লাকবোর্ডের লেখা হবে সুন্দব, সুস্পষ্ট, বড আকারেব এবং নির্ভুল। প্রয়োজনেব অতিরিক্ত কোন কথা বোর্ডে লেখা উচিত নয়। গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলিব নীচে রেখা টেনে দেওযাও বাঞ্ছনীয।

ম্যাপ স্ট্যাণ্ড (Map stand)ঃ শ্রেণীকক্ষের আসবাবপত্রের মধ্যে ম্যাপ স্ট্যাণ্ডের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। দেওয়ালে ম্যাপ, চিত্র, ডাযাগ্রাম, চার্ট ইত্যাদি ঝোলানোর সুবিধা থাকলেও পৃথক ম্যাপ স্ট্যাণ্ড ব্যবহার করা উচিত। কারণ, দেওযালের সমান্তরালে স্থাপিত উপকরণ অনেক সময় দৃষ্টিগ্রাহ্য নাও হতে পারে। ম্যাপ স্ট্যাণ্ডকে প্রয়োজনীয় কৌণিক পরিমাপে হেলানো যায়। তাই এর ওপর স্থাপিত যে কোন উপকরণ সহজে ছাত্রদের দৃষ্টিগ্রাহ্য ক'রে তোলা যায।

তাক্‌যুক্ত আলমারী (Cup boards)ঃ প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে একটি বা দুটি তাকযুক্ত আলমারী রাখার প্রযোজন আছে। এটা পৃথক কাঠের আলমারী

বা দেওয়াল আলমারীও হতে পারে। এর মধ্যে চক, ডাস্টার, রেজিস্টার, বই, সহপাঠ্য পুস্তক, রেফারেন্স পুস্তকাদি, অভিধান ইত্যাদি রাখা যায়। বিষয় কক্ষের (ইতিহাস কক্ষ, সমাজবিদ্যার কক্ষ প্রভৃতি) জন্য এরূপ আলমারীর প্রযোজনীযতা খুব বেশী। বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ের কক্ষে এরূপ তাকযুক্ত আলমারীর প্রযোজনীয়তা সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ বিজ্ঞানের তত্ত্বগত বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক বিষয় শিক্ষণের ও পরীক্ষা (experiment) করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ব্যবহারিক (Practical) বিষয় শিক্ষণের উপযোগী সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য তাকযুক্ত আলমারীই অপরিহার্য।

(ঘ) শ্রেণীকক্ষ তথা বিদ্যালয় গৃহকে স্বাস্থ্যকর রাখার জন্য আরও দু-প্রকারের আসবাবপত্র প্রযোজন। **প্রথমটি হল বাজে কাগজের ঝুড়ি** (Waste Paper basket)। শিক্ষকের টেবিলের পাশে এবং ছাত্রদের প্রবেশ দ্বার ও বহির্গমন দ্বারে একটি বাজে কাগজের ঝুড়ি রাখা কর্তব্য। অত্যধিক সংখ্যায় এরূপ ঝুড়ি ব্যবহার করলে শ্রেণীকক্ষের চেহারা অনেকটা খারাপ দেখায়। তবে যে-কটি ঝুড়ি রাখা হোক না কেন ঝুড়িগুলি রঙিন অথবা চিত্রিত হলে শ্রেণীকক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। বাজে কাগজের টুকরো যেখানে সেখানে না ফেলে এই ঝুড়িতে নিক্ষেপ করলে বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য যেমন, বৃদ্ধি পায় তেমনি কক্ষটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। বিদ্যালয়ে থাকা কালীন এরূপ পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস শিক্ষার্থীর মনে প্রভাব বিস্তার করবে এবং তারা স্ব-স্ব গৃহ প্রাঙ্গণকে ঐরূপ পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করবে।

দ্বিতীয়টি হল শ্রেণীকক্ষের দ্বারদেশের এক প্রান্তে অথবা বারান্দার পাশে **পিকদানী** (Spitbox) **সংস্থাপন করা**। যেখানে সেখানে থুথু না ফেলে শিক্ষার্থীরা পিকদানীতে ফেলতে অভ্যস্ত হবে। পিকদানীর মধ্যে ব্যবহৃত বালি বা কাঠের গুড়া কয়েকদিন পরপর পাল্টে দেওয়া যুক্তিযুক্ত। স্বাস্থ্য শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে পিকদানীর ব্যবহার অপরিহার্য।

৬। বিদ্যালয়-জীবনের সুযোগ-সুবিধা ও সাজ-সরঞ্জাম (School Amenities and Equipments):

বিদ্যালয়ের সমষ্টিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকেন শিক্ষক ও ছাত্র। শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভে সাহায্য করাই শিক্ষকের কাজ। শিক্ষক ও

শিক্ষার্থী উভয়কেই বিদ্যালয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা কর্মে নিয়োজিত থাকতে হয়। বিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক জীবন সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ কর্ম-পরিচালনায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ওঠা-বসা, দাঁড়ানো, চলা-ফেরা, লেখা ও পড়ার সুযোগ-সুবিধার জন্য বিদ্যালয়ের সাজসরঞ্জাম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুযোগ-সুবিধা

সাজসরঞ্জামকে দুটি স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা, বস্তুগত সাজ-সরঞ্জাম (material equipment) এবং অবস্তুগত সাজসরঞ্জাম (immaterial equipment or human equipment)। প্রথমটির অন্তর্ভুক্ত হল বিদ্যালয় গৃহ সহ আসবাবপত্র, শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী, বিষয় শিক্ষণের উপকরণ প্রভৃতি। আর দ্বিতীয়টি হল ভাবগত বিষয়; যেমন—বিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্র-শিক্ষকের আকর্ষণ, পরিবেশগত সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষালাভের অনুকূল আবহাওয়া প্রভৃতি। প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির সম্পর্ক এত নিবিড় যে এদের মধ্যে নির্দিষ্ট সীমারেখা অঙ্কন করা কঠিন। বিদ্যালয়ে যথেষ্ট আসবাবপত্র থাকলেও শিক্ষার্থীর মন আকৃষ্ট হয় না। শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের প্রতিটি ইট-কাঠ পাথরকে আপনার করে নিতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ভাল লাইব্রেরী থাকা সত্ত্বেও ছাত্র প্রয়োজনমত পুস্তকাদি পায় না, অফিস ঘর ভালভাবে সাজানো আছে অথচ বেতন গ্রহণ, কোন সামগ্রী লেনদেন প্রভৃতি কাজে ছাত্রদের হয়রান হতে হয়। সুতরাং বস্তুগত সাজসরঞ্জাম থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাটুকুই শিক্ষার্থীর মন আকর্ষণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে প্রয়োজন হয় কর্মভিত্তিক ও ভাবগত সুযোগ-সুবিধা। এ জন্য প্রয়োজন আত্মোৎসর্গী, শিক্ষকোচিত গুণসম্পন্ন শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক; ডেমনস্ট্রেটর এবং নিষ্ঠাবান পরিশাসক ও প্রগতিশীল সংগঠক। এদেরই আন্তরিক প্রচেষ্টায় মানবিক বা অবস্তুগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হতে পারে ও অনুকূল শিক্ষা-পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে। সুতরাং, বিদ্যালয় পরিবেশে যাতে অবস্তুগত ও বস্তুগত উভয়বিধ সুযোগ সৃষ্টি হয় সেদিকে লক্ষ্য থাকা সামগ্রিক বিদ্যালয় সংগঠনের একান্ত কর্তব্য।

বস্তুগত ও অবস্তুগত সাজ-সরঞ্জাম

আলোচ্য অধ্যায়ের গুরুত্ব বিবেচনায় বস্তুগত সাজসরঞ্জামের বিষয়টি পর পর আলোচনা করা হল:

আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম (furniture & equipment) **:** বাসগৃহ, হাসপাতাল, দোকানপাট, কলকারখানা এবং অফিস-আদালত প্রভৃতির জন্য যেমন বিশেষ বিশেষ আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন, বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্ম পরিচালনার জন্যও তেমনি বিশেষ ধরনের আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন। প্রয়োজনভিত্তিক বিচারে বিদ্যালয়ে নানা ধরনের কক্ষ প্রয়োজন, আবার কক্ষের কর্মবিচারে তেমনি আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জামেরও ভিন্নতা আছে। যেমন,

(১) **প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের কক্ষ :** চেয়ার, টেবিল, আলমারি, এবং তাক (shelves) এগুলি আসবাবপত্র ও অফিসের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম।

(২) অফিস কক্ষ : প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেবিল, চেয়ার, আলমারি, টুল, তাক, লেন-দেনের জন্য কাউন্টার প্রভৃতি।

(৩) দর্শনার্থীদের কক্ষ : বেঞ্চ অথবা চেয়ার, টেবিল বা টুল, স্লিপ প্যাড ইত্যাদি।

(৪) শিক্ষকদের অবসর কক্ষ : প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য পৃথক পৃথক অথবা সকলের জন্য একখানি বড় ড্রয়ারযুক্ত টেবিল, প্রত্যেকের জন্য চেয়ার অথবা দীর্ঘাকৃতির পৃষ্ঠদেশ যুক্ত বেঞ্চ, এক বা একাধিক তাকযুক্ত আলমারি (যার মধ্যে শিক্ষকরা নিজ নিজ পুস্তক, খাতাপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখতে পারেন), রেফারেন্স পুস্তকাদির জন্য কাচের আলমারি ইত্যাদি।

(৫) শিক্ষার্থীদের অবসর কক্ষ : বেঞ্চ, পত্রিকা স্ট্যাণ্ড, বুলেটিন বোর্ড, নোটিশ বোর্ড, অভ্যন্তরীণ খেলার (Indoor games) সামগ্রী, আলমারি, তাক ইত্যাদি।

(৬) **শ্রেণীকক্ষ :** শিক্ষকের জন্য ডায়াসের ওপর স্থাপিত চেয়ার, টেবিল ; শিক্ষার্থীদের জন্য বেঞ্চ, ডেস্ক, চেয়ার, শিক্ষণের জন্য ম্যাপস্ট্যাণ্ড, ব্লাকবোর্ড, তাকযুক্ত আলমারি ইত্যাদি। *

(৭) **বিজ্ঞানাগার, ওয়ার্কশপ, শিল্প-কলাকক্ষ :** বিষয় শিক্ষার (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, শিল্পকলা) প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন আসবাবপত্র, চেয়ার, টেবিল, ব্লাকবোর্ড, আলমারি, তাক ইত্যাদি। †

---

* শ্রেণীকক্ষ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

† ল্যাবরেটরী ও ওয়ার্কশপের বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(৮) সংগ্রহশালা ঃ লম্বাকৃতিবিশিষ্ট টেবিল (সংগৃহীত সামগ্রী সাজিয়ে রাখার জন্য), দেওয়াল আলমারি, পৃথক কাচের আলমারি, টুল ইত্যাদি। তবে স্থায়ী ও সরকারী মিউজিয়ামের ন্যায় বিদ্যালয়-সংগ্রহশালায় প্রকৃত সামগ্রী, প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ, মডেল, নিদর্শন ইত্যাদি সর্বদা টেবিলে সাজিয়ে রাখার প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র প্রদর্শনী উপলক্ষেই টেবিলে সাজানোর প্রয়োজন হয়। অন্য সময় দেওয়াল আলমারি বা সাধারণ কাচের আলমারিতে এগুলি সংরক্ষণ করা উচিত।

(৯) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার ঃ এখানে পুস্তকাদি রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আলমারি, তাক, ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স বক্স, পুস্তক আদান-প্রদানের কাউন্টার ইত্যাদি অত্যাবশ্যক। পাঠাগারে থাকবে লম্বা টেবিল ও পৃষ্ঠদেশযুক্ত লম্বা বেঞ্চ। টেবিলের ওপর থাকবে নীরবতার নির্দেশ সংবলিত কাঠের ফলক। বিদ্যালয় পাঠাগারে স্বাধীনভাবে পুস্তকাদি লেনদেনের জন্য কিছু তাক-যুক্ত বড় আলমারির সারি রাখা যুক্তিযুক্ত।*

(১০) ব্যায়ামাগার ও সংরক্ষণশালা ঃ খেলার সামগ্রী সংরক্ষণের জন্যে তাকযুক্ত আলমারি, দেওয়াল-তাক ইত্যাদি।

(১১) মেডিক্যাল কক্ষ ঃ এখানে প্রাথমিক চিকিৎসার সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় ঔষধ সংরক্ষণের আলমারি, চেয়ার, টেবিল, রোগীর জন্য বেঞ্চ, টুল ও একটি উঁচু শয্যা বিশেষ প্রয়োজন।

(১২) জলখাবারের কক্ষ ঃ এখানে প্রয়োজনীয় থালা-বাসন, গ্লাস, বসবার বেঞ্চ, খাদ্য সংরক্ষণের মিট-সেফ ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা আছে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে অনুধাবন করা যায় যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষাকর্ম পরিচালনার জন্য বহুবিধ আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয়। আসবাবপত্র তৈরী করার সময় যে-সব বিষয় মনে রাখা বিশেষ দরকার তা' হল—

(i) প্রয়োজনীয়তা (Utility) ঃ সামগ্রিক শিক্ষাকর্মের সুবিধার জন্যে বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম তৈরি করা হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ওঠা-বসা, দাঁড়ানো, লেখা-পড়া ও ব্যবহারিক কাজকর্মের জন্য এসবের প্রয়োজন হয়। শিক্ষাকর্মের মধ্যে থাকে ক্ষণিক বিশ্রাম, অবসর বিনোদন, দৈহিক ও

* গ্রন্থাগার ও পাঠাগার শীর্ষক অংশ দ্রষ্টব্য।

মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার অপরিহার্যতা। সুতরাং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে আসাবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম তৈরি করা উচিত।

(ii) **টেক্‌সই ক্ষমতা** (Durability) **এবং সহজ স্থানান্তর যোগ্যতা** (Easy transferablity) ঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্বভাবতঃ চঞ্চল। এখানে তাবা স্থিরভাবে নিয়মমাফিক বসে থাকবে এটা আশা করা নিরর্থক। তাই আসবাবপত্রগুলিকে মজবুত ও টেকসই করে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। আবার পরীক্ষা গ্রহণ, সভা-সমিতি, উৎসব ও আনন্দের অনুষ্ঠান উপলক্ষে আসবাব-পত্রগুলিকে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে বহন ও স্থানান্তরণের প্রয়োজন হয়। তাই আসবাবপত্রগুলি শুধু মজবুত, শক্ত ও টেকসই হলেই চলবে না, এগুলির সহজ বহনযোগ্যতা বা স্থানান্তরযোগ্যতা থাকা প্রয়োজন।

(iii) **গঠন সৌষ্ঠব** (Appearance) **:** আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জামের গঠন সৌষ্ঠব পরিকল্পিত বিদ্যালয় গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক। আসবাবপত্র সহ সামগ্রিক গৃহের সৌন্দর্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মনে স্বাভাবিক আবেদন সৃষ্টি করে। তাই যেমন তেমন করে আসবাবপত্র তৈবি করলে প্রকৃত শিক্ষাপরিবেশ গড়ে উঠতে পারে না। তাই আসবাবপত্রের গঠন সৌষ্ঠবের দিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

৭। পরীক্ষাগার (Laboratory) ঃ

আধুনিক যুগ প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞানেরই যুগ। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ এযুগের লক্ষ্যণীয় বিষয়। এ যুগের সঙ্গে সমতালে চলতে হলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানকে পূর্ণমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে বিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। স্বাধীনতার পর মাধ্যমিক স্তরেব উচ্চতর শ্রেণীতে সাধারণ বিজ্ঞান ও ঐচ্ছিক (elective) বিজ্ঞান পাঠ্যসূচীতে স্থান পেয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান-শিক্ষণ ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত ব্যবহারিক কাজকর্ম আজও প্রাথমিকস্তরে রয়ে গেছে। বিজ্ঞান-শিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হলে বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারের উন্নতি সর্বপ্রথম প্রয়োজন। কারণ, বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারেই বিজ্ঞান শিক্ষার ও বিজ্ঞানের উন্নতির বীজ নিহিত থাকে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানশাখায় সাধারণতঃ তিন/চারটি বিষয় পড়ানো হয়, যথা—পদার্থ বিজ্ঞান (Physics), রসায়ন বিজ্ঞান (Chemistry), অঙ্কশাস্ত্র

এবং জীববিজ্ঞান (Biology)। এর মধ্যে ঐচ্ছিক বিষয় (Elective Subject) হিসেবে যে কোন তিনটি বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করে। শহরের বিদ্যালয়গুলির তুলনায় গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে জীববিজ্ঞান পঠন-পাঠনের সুযোগ কম। সেখানে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরও অভাব। এছাড়া গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত পরীক্ষাগারের অভাবও লক্ষ্য করা যায়।

পরীক্ষাগারের সাজসরঞ্জাম (Equipments of Laboratory)ঃ প্রতিটি রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড পরীক্ষাগারের আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল্‌স, জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন সামগ্রী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সঙ্কলিত পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। এসব পুস্তিকায় পরীক্ষাগারের চেয়ার, টেবিল ইত্যাদির গঠন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং কক্ষের আয়তন সম্পর্কে নানা তথ্য দেওয়া আছে। বিজ্ঞান শিক্ষক ও ডেমনস্ট্রেটর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাক্রমে ঐ পুস্তিকার নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করেন। পরীক্ষাগারের আয়তন, সাজসরঞ্জাম, আসবাবপত্র সম্পর্কে নিম্নরূপ বিষয়গুলি অবশ্য স্মরণীয়ঃ

পদার্থ বিজ্ঞান

(ক) পদার্থ বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারটি হবে যথেষ্ট প্রশস্ত, যেন, বৃহৎ আকারের টেবিলের দুপাশে দাঁড়িয়ে বা বসে শিক্ষার্থীরা যাতে ব্যবহারিক কর্ম (Practical work) সম্পাদন করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(খ) টেবিলের উচ্চতা এমন হবে যাতে ১৫ থেকে ১৭ বছরের শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে এবং প্রয়োজন হলে উঁচু টুলে বসে কাজ করতে পারে। তবে পরীক্ষাগারে বসে কাজ করার সুযোগ নিতান্ত কম।

রসায়ন বিজ্ঞান

(ক) রসায়নশাস্ত্রের ব্যবহারিক কার্য-পরিচালনার জন্যও প্রশস্ত কক্ষ এবং প্রয়োজনীয় টেবিল, টুল রাখা প্রয়োজন। রাসায়নিক দ্রব্যের বোতল রাখার জন্য টেবিলের ওপরে থাকবে তাক (rack)। সহজে ও সুনির্দিষ্ট উপায়ে চিনে নেওয়ার জন্য বোতলের গায়ে লেবেলের ওপর সামগ্রীর নাম লেখা থাকবে।

(খ) রসায়নশাস্ত্রের ব্যবহারিক কাজকর্মের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সামগ্রী হল গ্যাস। সুতরাং কক্ষের বহির্ভাগে গ্যাসপ্লান্ট বসানো থাকবে। সেখান থেকে সংলগ্ন পাইপটিকে টেবিলের ধার দিয়ে এমনভাবে বসানো থাকবে

যেন শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় গ্যাস ব্যবহার করতে পারে। পাইপের ছিদ্র ও গ্যাস নিঃসরণ পরীক্ষার জন্য শিক্ষক বা ডেমনস্ট্রেটর মাঝে মাঝে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

(গ) গ্যাস ছাড়া জল সরবরাহের ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। রসায়ন পরীক্ষাগারে কোন কিছু ধোবার উদ্দেশ্যে পাইপযুক্ত ওয়াশ-বেসিন থাকা একান্ত প্রয়োজন।

জীববিজ্ঞান

(ক) জীববিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে দুদিকে বসে বা দাঁড়িয়ে কাজ করার মতো দীর্ঘ ও চওড়া টেবিল, টেবিলের ওপর র‍্যাক, তলায় ড্রয়ার, পাশে ওয়াশ-বেসিন থাকা অত্যাবশ্যক।

(খ) স্পেসিমেন সংরক্ষণের জন্য কাচের জার, আনুষঙ্গিক উপাদান এবং সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আলমারি রাখা প্রয়োজন।

(গ) স্পেসিমেন (Specimen) কাটার পর খণ্ডিত অংশগুলি বিদূরিত করার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজন। অন্যথায় ঐগুলি পচে গেলে তার দুর্গন্ধে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা থাকে।

সাধারণ প্রয়োজনীয়তা ও সাবধানতা

(ক) পরীক্ষাগারে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, প্রাথমিক চিকিৎসার সুবিধা এবং ব্যবহৃত সামগ্রী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(খ) শিক্ষার্থীদের জন্য 'নির্দেশ সংবলিত' তালিকা রাখা প্রয়োজন। পরীক্ষাগারে প্রবেশ করা, ব্যবহারিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করা এবং পরীক্ষা শেষে বেরিয়ে আসার সময় যেসব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার সেগুলি এই তালিকায় লেখা থাকবে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই নির্দেশ পালন করে তার জন্যে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

(গ) পরীক্ষাগারে এমন অনেক যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম থাকে যেগুলি সদাসর্বদা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। অব্যবহৃত অবস্থায় জিনিসগুলি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই মাঝে মাঝে সেগুলি যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা বা অনুরূপ তদারক করা হয় সেদিকে বিজ্ঞান-শিক্ষক বা ডেমনস্ট্রেটরকে দৃষ্টি দিতে হবে।

অফিস সংক্রান্ত কাজকর্ম

(ক) প্রতিটি পরীক্ষাগারের সঙ্গে একটি করে অফিস কক্ষ থাকা প্রয়োজন। ঐ কক্ষে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক এখানে স্টক-বুক, রেজিস্টার ও প্রয়োজনীয় রেকর্ড-পত্র রাখবেন। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির হিসেব রাখা, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কি কি নষ্ট হল এবং কি কি ক্রয় করা প্রয়োজন ইত্যাদির হিসেব রাখা ও সময়মত ক্রয়েব ব্যবস্থা করা প্রযোজন।

(খ) অফিসের পাশাপাশি থাকবে একটা বই-এর আলমারি। বিজ্ঞান শাখার প্রয়োজনীয় তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক বিষয়ের পুস্তক-পুস্তিকা এখানে রাখা হবে। ব্যবহাবিক কর্ম পরিচালনার সময় প্রয়োজন অনুসারে পুস্তকাদি যাতে সত্বর পাওয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

৮। বিদ্যালয় ওয়ার্কশপ (School Workshop) ঃ

ওয়ার্কশপ কথাটি আধুনিক শিল্প-সভ্যতার অবদান। সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগের নীতিতে আধুনিক শিল্প পবিচালিত হয়। বৃহৎ শিল্প-কাবখানায় দেখা যায় কোন সামগ্রী তৈরির উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিককে ভিন্ন ভিন্ন অংশ তৈবিব কাজে নিয়োগ করা হয়। তাদেব তৈরি অংশগুলিকে সংযোজন কবে অবশেষে পূর্ণাঙ্গ সামগ্রী তৈরি হয়। শিক্ষণক্ষেত্রেও শ্রমবিভাজনের এই নীতি প্রযোগ করাকে ওয়ার্কশপ-প্রক্রিয়া বলা হয়।

ভারতীয় শিক্ষাধারায় ওযার্কশপ-প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ নতুন। প্রকৃতপক্ষে প্রক্রিয়াটি আমেরিকান শিক্ষাবিদ্‌দের মাধ্যমে ভারতে প্রচলিত হয়। Ford Foundation of Education, United States Education Foundation ইত্যাদি সংস্থাকে এই ওয়ার্কশপ-প্রক্রিয়াব সমর্থক বলা যেতে পাবে। পরবর্তীকালে ভারতীয শিক্ষার পুনর্গঠনেব প্রচেষ্টায় ভারতীয শিক্ষাবিদ্‌রা আমেরিকান শিক্ষা সংস্থাগুলির সভ্যদের সঙ্গে মিলিত হন। উভযদেশের শিক্ষাবিদ্‌দের পারস্পরিক যোগাযোগ হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে ভারতে ওয়ার্কশপ রীতির বহুল প্রচলন সম্ভব হয়েছে।

ওয়ার্কশপ প্রক্রিয়াকে প্রধানতঃ দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যথা— **(১) বুদ্ধি-বৃত্তিমূলক ওয়ার্কশপ** (Intellectual Workshop Technique এবং **(২) কায়িক শ্রমমূলক ওয়ার্কশপ-প্রক্রিয়া** (Manual Workshop Technique)।

বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ওয়ার্কশপে কোন সমস্যা পর্যালোচিত হয়। সেখানে সমস্যাটিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে ওয়ার্কশপে ভিন্ন ভিন্ন দল সেগুলি আলোচনা করেন। এইভাবে আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্কের দ্বারা সমস্যার অন্তর্ভুক্ত বিষযগুলির অপ্রয়োজনীয় অংশ পরিত্যাগ করে সারাংশ বা উপযোগভিত্তিক অংশগুলিকে একত্র করা হয়। এইভাবে সমস্যার সমাধান করার ব্যবস্থা কবা হয। বিদ্যালয়-শিক্ষণ পর্যায়ে এরূপ ওয়ার্কশপ-প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। বিদ্যালয় পাঠ্যতালিকায় সমাজবিদ্যা শিক্ষণের জন্য ওযার্কশপ-প্রক্রিয়া বিশেষ সুফলদাযী। বুদ্ধিজনিত ওয়ার্কশপ-প্রক্রিয়াকে সমস্যাপদ্ধতি (Problem Method) বা সেমিনার প্রক্রিযা বলা যেতে পারে। আমেরিকার প্রায় প্রতিটি স্টেটে এই প্রক্রিযা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

এই প্রক্রিয়ায সক্রিয অংশ গ্রহণকারীরা সকলেই সমস্যা সমাধানে তৎপব হন। সকলে স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের মাধ্যমে নেতৃত্ব সুলভ গুণ এবং শৃঙ্খলাব সঙ্গে কাজ করাব অভ্যাস অর্জন করে।

ওযার্কশপ-প্রক্রিয়া দ্বারা কাযিক শ্রমমূলক অর্থও ব্যক্ত হয। ওয়ার্কশপ বলতে সাধারণভাবে কামারশালা, ছুতারমিস্ত্রীর কারখানা ইত্যাদিকে বোঝায। আধুনিক শিক্ষায ক্রাফট (Craft) এবং টেকনিক্যাল শিক্ষার (Technical Education) জন্য নানা বিষয়ের কর্মশালা, সেখানকার যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি ওযার্কশপ-প্রক্রিযার কথা ব্যক্ত করে। যেসব বিদ্যালয়ে ক্রাফট এবং টেক্‌নিক্যাল শিক্ষাধারা গৃহীত সেখানে পৃথক কর্মশালা বা ওয়ার্কশপ নির্মাণ করা বিদ্যালয় সংগঠকের অপরিহার্য কর্ম। কর্মের ধারা অনুসাবে ওয়ার্কশপের নাম ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, যেমন—উড ওয়ার্কশপ, মেটাল ওযার্কশপ, মেসিনশপ ইত্যাদি। কর্মশালা হবে বিদ্যালয় পরিবেশের মধ্যে উন্মুক্ত স্থানে। কক্ষটি হবে উচ্চতায ১৮′ থেকে ২০′ ফুটের মতো। এর এক পাশে থাকবে চিমনি সহ চুল্লী, যেন ধোঁযা বাইরে সহজে বেরিয়ে যেতে পারে। লেদ মেসিনের মতো ভারী যন্ত্রপাতি পাকা মেঝেতে বসানো হবে। অন্যান্য ছোটবড যন্ত্রপাতি রাখার জন্যে কাঠ বা স্টীলের আলমারি এবং দেওয়ালে স্থায়ীভাবে তৈরি তাক (shelves) রাখা প্রয়োজন। কক্ষের প্রশস্ততা নির্ভর করে শিক্ষার বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার ওপর। ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার তত্ত্বগত অংশ শিক্ষাদানের জন্য কর্মশালার একদিকে শ্রেণীকক্ষের সাজসরঞ্জামও রাখা প্রয়োজন। কর্মশালা নির্মাণের সঙ্গে

সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে, যেমন—(১) অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, (২) প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা; (৩) জরুরী প্রয়োজনে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত, (৪) বিশুদ্ধ বায়ু সরবরাহ, আলোকের ব্যবস্থা এবং দূষিত ও গরম বায়ু বহিষ্কারের জন্য ভেন্টিলেটর-এর ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

৯। বিষয়কক্ষ (Subject Room):

বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী অনুসারে শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বিষয় বহুবিধ। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীর মনের প্রকৃত যোগসূত্র রচনা করার উপায় হিসেবে শুধু মৌখিক বক্তৃতা, সারগর্ভ আলোচনা যথেষ্ট নয়। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সারগর্ভ আলোচনা থেকে বিমূর্ত বিষয় অনুধাবন করতে পারে না। পক্ষান্তরে মূর্ত বিষয়কেও বক্তৃতার মাধ্যমে বা মৌখিক বাক্যালাপে পরিবেশন করলে সেটি বিমূর্ত বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়। তাই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিকট যে-কোন পাঠ্যবিষয়কে প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলাই হল সার্থক শিক্ষণের লক্ষণ।

প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিক্ষাই সার্থক

আবার বিষয়-বস্তুকে প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করতে হলে নানাবিধ শিক্ষণ-কৌশলের (Teaching devices) সাহায্য প্রয়োজন হয়। মৌখিক কৌশল (Oral devices) বিষয়কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এর জন্য চাই বস্তুগত কৌশল (Material devices) বা শিক্ষোপকরণ এবং পরিবেশগত কৌশল (Environmental devices)

বিজ্ঞান, কারিগরী, শিল্প ইত্যাদি শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরীক্ষাগার (Laboratory), ওয়ার্কশপ (Workshop), কলা ও শিল্প কক্ষ (Craft room) ইত্যাদি পরিবেশ ও বস্তুগত কৌশল প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে। এখানে শিক্ষার্থীরা তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক উভয়বিধ শিক্ষা-দ্বারা সহজে বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে পারে। কারণ, পরিবেশ ও উপকরণ মিলিতভাবে বিষয়টি শিক্ষার্থীর নিকট প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

ব্যবহারিক বিষয়ের ন্যায় জ্ঞানাশ্রয়ী বিষয়ের জন্য কক্ষ প্রয়োজন

আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা বিজ্ঞান, কারিগরী, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ের মতো জ্ঞানাশ্রয়ী বিষয় শিক্ষার (ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, ভূগোল, অর্থনীতি-পৌরবিজ্ঞান) ক্ষেত্রেও পৃথক পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন বলে অনুভব করছেন। কারণ, প্রথমতঃ, পৃথক কক্ষ বিষয় সম্পর্কে প্রেরণামূলক পরিবেশ (Inspiring

environment) সৃষ্টি করতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ,** যে কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীর জন্য চাই শিক্ষকসহায়ক সামগ্রী। যেমন—ব্লাকবোর্ড, গ্রাফবোর্ড, রেডিও, গ্রামোফোন, এপিডায়াস্কোপ, ম্যাজিক লণ্ঠন, মানচিত্র, গ্লোব, নক্শা, ছবি, চার্ট, গ্রাফ, মডেল, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, প্রকৃতবস্তু সমূহ ইত্যাদি। এসব উপকরণগুলি সংরক্ষণের জন্য পৃথক কক্ষ অত্যাবশ্যক। **তৃতীয়তঃ,** বিষয় শিক্ষার জন্য শিক্ষককে নানা উপকরণ সংগ্রহ করে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করতে হয়। এর জন্য যদি শিক্ষককে কক্ষ হতে কক্ষান্তরে ছোটাছুটি করতে হয় তাহলে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়। এরূপ অসুবিধা দূর করার জন্য পৃথক বিষয়কক্ষের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। **চতুর্থতঃ,** ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীর মনে বিজ্ঞানভিত্তিক চেতনা সঞ্চার করে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর মনে গবেষণামূলক প্রবণতা জাগিয়ে তোলাই বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাদানের লক্ষণ। পৃথক কক্ষের পরিবেশ, শিক্ষোপকরণ, পুস্তকাদি, পত্র-পত্রিকা একত্রে জাগিয়ে তুলবে শিক্ষার্থীর মনে বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও বিজ্ঞানভিত্তিক চেতনা। তাই বিষয়-শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক কক্ষের প্রয়োনীয়তা অনস্বীকার্য।

পৃথক কক্ষের উপযোগিতা

বিষয়-শিক্ষার জন্য পৃথক কক্ষ থাকলেই চলবে না, সেটিকে ব্যবহারের উপযোগী করে সাজাতে হবে। কক্ষটি হবে সাধারণ শ্রেণীকক্ষ অপেক্ষা বৃহদাকারে এবং আলো-বাতাসপূর্ণ। কক্ষের দেওয়ালের তিনদিকে তিনটি ব্লাকবোর্ড থাকবে। শ্রবণ-দর্শন উপকরণ ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। পৃথক পর্দা (Screen) ব্যবহারের অসুবিধা থাকলে সাদা দেওয়ালের একাংশকে মসৃণ করে ঐটুকু স্থায়িভাবে পর্দার পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে। কক্ষের যেদিকে শিক্ষকের বসবার স্থান নির্দিষ্ট হবে সেদিকের দেওয়ালে কয়েকটি দেওয়াল-আলমারি তৈরির উপযুক্ত শেলফ (shelf) রাখা প্রয়োজন। এছাড়া আরও কয়েকটি দেওয়াল-আলমারির ব্যবস্থা রেখে কক্ষটি তৈরি করা উচিত।

ব্যবহারের উপযোগী কক্ষ তৈরী

এবার কক্ষটিকে সুন্দর, পরিপাটি করে সাজানো প্রয়োজন। সাজানোর জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র হল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর চেয়ার, টেবিল, উপকরণাদি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য আলমারি, তাক, ম্যাপর‍্যাক, ম্যাপস্ট্যাণ্ড, বুলেটিন, বোর্ড, গ্যালারী ইত্যাদি। কক্ষের কোন্ কোন্ অংশে ঐ সব আসবাবপত্র রাখা হবে তা

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পাঠ্যদান ও পাঠ গ্রহণের সুবিধার ওপর নির্ভর করে। ব্যক্তিগত, দলগত ও সমষ্টিগত সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে এগুলিকে স্থাপিত (place) করা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকের জন্য নির্দিষ্ট ডেস্ক (Desk) ও চেয়ার যেন চক্রকারে ঘূর্ণায়মান (revolving) হয়। কারণ, তাঁকে ঐ একই স্থানে বসে পরিচালক (administrator)ও শিক্ষক (Instructor) উভয়বিধ কর্ম পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষকের ডেস্কটি তাঁর নিত্য প্রযোজনীয় সামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত থাকবে। ভূচিত্রাবলী (Atlas), অভিধান, মেমোরেণ্ডাম প্যাড, চোষ কাগজ (blotting paper), কলিং বেল, কলমদামী, টেবিল ক্যালেণ্ডার, কাগজচাপা (paper-weight) প্রভৃতি শিক্ষকের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবে একান্ত প্রয়োজন।

১০। গ্রন্থাগার সহ পাঠাগার (Library Cum Reading Room) :

"লাইব্রেরীর মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার ওপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোন পথে অনন্ত সমুদ্র গিয়াছে, কোন পথ অত্যন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোন পথ মানব হৃদয়ের অতল স্পর্শে নামিয়াছে। যে যে দিকে ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছে"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে গ্রন্থাগারের সার্থকতা বিশ্লেষিত। সত্যই লাইব্রেরীর মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে অতীতের ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি। বাহ্যতঃ স্তব্ধ হলেও এই সম্পদ প্রেরণাময়, জীবন্ত ও গতিশীল। এই গ্রন্থাগার আধুনিক শিক্ষার্থীকে ভাবীকালের জন্য ক্রিয়াশীল জীবন গড়তে প্রেরণা দিচ্ছে। পীরেস-এর (*E. A. Pires*) ভাষায় বলা যায়, "গ্রন্থাগার হল কোন সার্থক বিদ্যায়তনের জ্ঞানদীপ্ত স্নায়ুকেন্দ্র, এর শিক্ষাভিত্তিক জীবনধারার প্রাণশক্তি। এ শক্তি শিক্ষার্থীকে শিক্ষালাভে অনুপ্রাণিত করে, আর তাদের প্রাণে জাগিয়ে তোলে অকপট গ্রন্থ প্রীতি।"[1] আজ একথা সর্ববাদীসম্মত যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাগার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যদি শিক্ষাদপ্তর ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভারতের ভাবী নাগরিককে মানুষ করে গড়ে তুলতে চান, শিক্ষা পুনর্গঠনে মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ং

1. **"The library is the intellectual nerve centre of a good school, the hub of its academic life, inspiring students to read and cultivatig in them a sincere of books—*E. A. Pires*.**

সম্পূর্ণ রূপ দিতে চান, তাহলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে গ্রন্থাগার স্থাপন একান্ত অপরিহার্য।[1]

বিদ্যালয় গ্রন্থগারের বর্তমান অবস্থা (Present condition of our School Libraries): মাধ্যমিক কমিশনের মতে বর্তমান বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগার নামের অযোগ্য। এর কারণ বহুবিধ। **প্রথমতঃ**, গ্রন্থাগারগুলির সংগৃহীত পুস্তকগুলি সাধারণতঃ পুরাতন, অপ্রচলিত এবং অযোগ্য। সাধারণতঃ এগুলি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রয়োজনভিত্তিতে নির্বাচিত নয়।

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিককালে ভারতীয় প্রতিটি ভাষায় শিশু সাহিত্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। অথচ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহ করা হয় না বললেও চলে।

তৃতীয়তঃ, অনেক বিদ্যালয়ে পৃথক গ্রন্থাগার থাকে না। সেখানে সংগৃহীত পুস্তকাদি একটা ছোট্ট অস্বাস্থ্যকর ঘরে আলমারিতে অথবা তাকে এলোমেলোভাবে রাখা হয়। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার কক্ষ অপ্রশস্ত এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের নিকট আকর্ষণহীন।

চতুর্থতঃ, বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ পৃথক গ্রন্থগারিক নিয়োগ করা হয় না। কোন কেরাণী শিক্ষকের ওপর আংশিক সময়ের ভিত্তিতে গ্রন্থগারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যার ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয় তিনি হয়ত পুস্তকাদি ভালবাসেন না, না হয় গ্রন্থগার পরিচালন কৌশল সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞান নেই অথবা কৌশল শিখবার চেষ্টা করেন না। তাছাড়া, শিক্ষকরা নিজ নিজ শিক্ষণ-কর্মে ব্যস্ত থাকেন। তাঁদের পক্ষে অন্য কিছু করার অবসর পাওয়া দুঃসাধ্য।

পঞ্চমতঃ, আধুনিক পরীক্ষামুখী শিক্ষার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক এমনকি শিক্ষকরাও শিক্ষার্থীর অতিরিক্ত পুস্তক (extra books) পাঠে উৎসাহিত করেন না। ফলে উপযুক্ত গ্রন্থগার সংগঠিত হয় না।

ষষ্ঠতঃ, সরকারী শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয়ের জন্য কখনও কখনও অনুদান দেওয়া হয়। তখন নতুন পুস্তক ক্রয় করা হলে সেগুলি প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের অফিসের শোভা বৃদ্ধির জন্য কাচের আলমারিতে সংরক্ষিত হয়।

---

1. Report of the Secondary Education Commission—Chap. VII, Page 90

এসব কারণে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন সিদ্ধির উপযোগী গ্রন্থগারের অভাব বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশকে কলুষিত ও নিকৃষ্ট করেছে। বিদ্যালয় গ্রন্থগারের এই অবর্ণনীয় দুর্দশার জন্যে শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, সরকারী শিক্ষা-অধিকর্তা এবং শিক্ষা-পরিশাসকমণ্ডলী সমবেতভাবে দায়ী। বিদ্যালয় গ্রন্থগারের এই দুর্দশার পিছনে **আরও কয়েকটি বিষয়** (Factors) **খুব বেশী ক্রিয়াশীল।** সেগুলি হল—

(ক) পাঠ্যতালিকা (Curriculum)ঃ প্রতিটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়ের ভারে জর্জরিত। পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত বিষয় পড়াশুনার জন্যে অতিরিক্ত সময় শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ পায় না। অনুমোদিত সিলেবাসের অপরিবর্তনীয় সীমার মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই সীমিত থাকতে হয়। অপরিবর্তনীয় অবস্থার মধ্যে গতিশীল শিক্ষণ সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার গতিশীল শিক্ষার উদ্বোধক। কিন্তু যেসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুমোদিত বিষয়ের সীমায় অবরুদ্ধ সেখানে গ্রন্থগারও অবহেলিত।

(খ) গতানুগতিক পরীক্ষা-ব্যবস্থা (Conventional Examination system)ঃ প্রচলিত সাধারণী পরীক্ষার উত্তম ফলশ্রুতি দ্বারা শিক্ষার্থীর স্ব-স্ব কৃতিত্বের দ্বারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অর্জন করে এবং কর্ম-সংস্থানের সুযোগ পায়। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলি সাধারণী পরীক্ষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কারণ, সাধারণী পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা পরিচালিত হয়। সামগ্রিক শিক্ষা থেকে পরীক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর পরীক্ষোত্তীর্ণ হবার উপায় সন্ধান করে। শিক্ষকরাও পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করেন। ফলে, শিক্ষার্থীরা নোটবই, গাইড, শর্টকাট (short cuts), সাজেসশান (suggestion) ইত্যাদি ধরনের পুস্তকাদি-পাঠে উৎসাহী হয়। স্বাধীনভাবে মনীষীদের লেখা বই পড়ার জন্য কোন দিক থেকে কোন উৎসাহ ও প্রেরণা পায় না। যে কোন উপায়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার প্রবণতাই বিদ্যালয়ের গ্রন্থগারের অবনতি ঘটিয়েছে।

(গ) পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন প্রথা (Practice of prescribing Text books)ঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের ওপর নির্ভর করতে হয়। মৌলিক পুস্তকাদি পাঠের জন্য পাঠ্যতালিকায় (Booklist) কোন নির্দেশ থাকে না। অধিকাংশ পাঠ্য পুস্তকগুলিও সার্থক লক্ষণযুক্ত নয়। দ্বিতীয়তঃ, ঐচ্ছিক বিষয়গুলির (optional subjects) ক্ষেত্রে একাধিক পুস্তকের পরিবর্তে

মাত্র একখানি পুস্তক তালিকাভুক্ত করায় শিক্ষার্থীরা একই বিষয়ের অন্যান্য লেখকের পুস্তক পাঠ করে না বা পাঠ করার উৎসাহ পায় না। সুতরাং শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে পুস্তক প্রীতি এবং পাঠ-প্রবণতা অবলুপ্ত হয়। ফলে তারা গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে না।

(ঘ) **পদ্ধতি-প্রয়োগের ত্রুটি** (Defects of Application of methods) : শ্রেণীকক্ষে পাঠ-প্রদানের সময় শিক্ষকরা গতানুগতিক অনুমোদিত সূচী অনুসরণ করেন। সিলেবাসের বহির্ভূত বিষয় পরীক্ষায় পড়ে না; তাই তাঁরা সেগুলি শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করেন না। গ্রন্থানুসারী মৌখিক পদ্ধতি শ্রেণীপাঠের এক প্রকার এবং অপরিহার্য পদ্ধতি হিসেবে গণ্য। ফলে, শ্রেণীকক্ষে অনুবন্ধ নীতি, সমস্যা, প্রকল্প, আবিষ্কার, উৎস-পদ্ধতি, তদারকী পাঠচর্চা, ডাল্টন পরিকল্পনা—ইত্যাদির কোন স্থান নেই অথচ এসব পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে অতিরিক্ত পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠে উৎসাহিত করে এবং গ্রন্থাগারই এ বিষয়ের একমাত্র সহায়ক। এসব কারণে এদেশে গ্রন্থাগারের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়।

বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা* (Needs for School Library) : **(ক) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতির সহায়ক :** শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও মনীষীদের গবেষণার ফলে বহুবিধ প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে, যেমন—প্রকল্প, ডাল্টন প্ল্যান, বাটাভিয়া পরিকল্পনা, ওয়ার্কশপ পদ্ধতি, তদারকী পাঠচর্চা, উৎস-সন্ধান পদ্ধতি প্রভৃতি। এসব প্রগতিশীল পদ্ধতিকে শিক্ষণ-প্রসঙ্গে ফলপ্রসূ করতে হলে উপযুক্ত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালনা করা অপরিহার্য।

(খ) বিদ্যালয়-গ্রন্থাগার স্বয়ং শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে : আধুনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট শ্রেণীশিক্ষা কখনও এরূপ প্রচেষ্টাকে সফল করতে পারে না। এর জন্য শ্রেণীশিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং স্বয়ং শিক্ষাকে (Self-education) সমন্বয় করা প্রয়োজন। স্বয়ং শিক্ষা হল শ্রেণীশিক্ষার পরিপূরক। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্বয়ং শিক্ষার প্রবণতা ও সুযোগ সৃষ্টি করে। তাছাড়া অতিরিক্ত

* এই অংশটি Library Service-এর গুরুত্ব (Importance), উদ্দেশ্য (Purposes), উপযোগিতা (utility) ইত্যাদি কথা ব্যক্ত করে।

পাঠের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করা সর্বদা সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয় না। গ্রন্থাগার তাদের পুস্তক সংগ্রহের আর্থিক অন্তরায় থেকে মুক্তি দেয়।

(গ) গ্রন্থাগার শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন, স্বাধীন চিন্তা-শক্তির বিকাশ ও সহপাঠ্য তালিকাভুক্ত কর্ম-সম্পাদনের সহায়ক: গ্রন্থাগার হল অখণ্ড বিশ্ববিদ্যার সমন্বয়। তাই একে বলা হল জ্ঞানের খনি (Storehouse of knowledge) এবং নতুন শিক্ষার ও চিন্তা বিকাশের শক্তিকেন্দ্র (Power house)। এখানকার বহু যুগের সঞ্চিত জ্ঞানপুঞ্জ শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গী সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি করে। উপরন্তু গ্রন্থাগারের সঞ্চিত তথ্য শিক্ষার্থীকে সহপাঠ্য তালিকাভুক্ত কর্ম (Co-curricular activities) সম্পাদনে উৎসাহী করে। সভা-সমিতিতে আলোচনা, বিতর্ক, বক্তৃতা ইত্যাদিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থী গ্রন্থাগার থেকে প্রযোজনীয় তথ্য ও জ্ঞান অর্জন করতে পারে। শিক্ষার্থীরা এখান থেকেই তাদের সাধারণ জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিত করতে পারে।

(ঘ) গ্রন্থাগার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অবসর বিনোদনের কল্পিত সুযোগ সৃষ্টি করে: পাঠাভ্যাস হল অবসরকালীন হবি (Hobby)। বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীরা যেটুকু অবসর পায় তার বাঞ্ছনীয় ব্যবহারের সুযোগ না থাকায় তারা অবাঞ্ছিত চিন্তা ও কর্মে প্রবৃত্ত হয়। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে অবসর বিনোদনের সুযোগ থাকলে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষায়ও তৎপর হযে ওঠে।

(ঙ) গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কতকগুলি বাঞ্ছিত অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়: গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক নেওয়া-দেওযার সময় শিক্ষার্থীকে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়। পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার (Text book library) থেকে পুস্তক নেওয়া, খাতায় পুস্তক ও নিজের নাম লেখা, আবার সময়মত পুস্তক ফেরৎ দেওয়া ও তাকে (Shelf) সাজিযে-গুছিযে রাখার ভেতর দিয়ে সে নিয়মানুবর্তিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সাজানো-গোছানোর সুষ্ঠু অভ্যাস লাভ করে। গ্রন্থাগারের পাশে থাকে পাঠাগার (reading-room)। সেখানে বসে শিক্ষার্থী পড়াশুনা করতে পারে। এর ভেতর দিয়ে সে নীরব পাঠে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

(চ) গ্রন্থাগারের মাধ্যমে 'গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষার' (Education for democracy) **বাস্তব ও সার্থক রূপায়ণ সম্ভব:** শিক্ষায় গণতন্ত্র

(Democracy in Education) যদি প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষা বাস্তবে সম্ভব হয়ে ওঠে। এই গণতান্ত্রিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হল শিক্ষকের পরোক্ষে অবস্থান, আর শিক্ষার্থীর স্বাধীন ও সক্রিয় প্রচেষ্টা। পাঠাগার সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। তাই এস. কে. কচ্ছার (*S. K. Kochher*)[1] বলেন, শিক্ষায় গণতন্ত্র আর গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষা—এ-দুয়ের পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের পীঠস্থান হল গ্রন্থাগার।

(ছ) গ্রন্থাগার ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিশেষ গুণের বিকাশ সাধিত হয়ঃ পুস্তক নির্বাচন, স্বকীয় প্রচেষ্টায় সমস্যার সমাধান, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা, বিষয়বস্তুর সমালোচনা, বিচার-বিবেচনা প্রভৃতি ক্ষমতা ও কৌশল শিক্ষার্থী সহজে অর্জন করতে পারে। আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস শিক্ষার্থীকে এমন স্তরে উন্নীত করে দেয় যে, সে স্বীয় ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ সাধন করে বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। গ্রন্থাগারই শিক্ষার্থীকে এই অপূর্ব সুযোগ দিতে পারে।

কিভাবে ভাল বিদ্যালয়-গ্রন্থাগার সংগঠন করা যায় **(How to organise a good School-Library)ঃ** শুধু কতকগুলি পুস্তক, পৃথক গৃহ, আলমারি থাকলেই গ্রন্থাগার সংগঠন করা হয় না। সার্থক ও সুফলদায়ী বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য যে শর্তগুলি প্রয়োজন তা' হল—

(ক) **গ্রন্থাগারের অবস্থান ও সাজসরঞ্জাম** (Location and equipments of the Library room)ঃ গ্রন্থাগার বিদ্যালয়গৃহ-পরিবেশের এমন স্থানে স্থাপিত হবে যেন এদিকে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। **কক্ষটি** হবে সুপ্রশস্ত, প্রচুর আলোবাতাসযুক্ত হল ঘরের মতো। দেওয়ালের রঙ হবে চোখের প্রতি তৃপ্তিদায়ক। হল ঘরের একদিকে থাকবে পুস্তক সংরক্ষণের অংশ এবং অন্যদিকে থাকবে পাঠাগারের ব্যবস্থাপনা। কক্ষের মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে দেওয়াই ভাল, তাহলে পাঠকদের চলাফেরার দরুন শব্দ কম হবে। **পাঠাগারের দেওয়ালটি** উপযুক্ত শিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত ফুল-ফলে ও চিত্রে শোভিত হবে। এছাড়া দেশী ও বিদেশী শিক্ষাবিদ মনিষীদের ফ্রেমে আটা চিত্র দ্বারা দেওয়ালের উপরিভাগ সুসজ্জিত করা হবে। গ্রন্থাগারের

1. Library is the agency for experimentation in this 'education for democracy' and 'democracy in education.'

আসবাবপত্র, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, তাক, লেখাপড়ার ডেস্কগুলি শুধু সৌন্দর্য বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরি করলে চলবে না, সেগুলি যেন ব্যবহার ও কাজকর্মের উপযোগী হয়। গ্রন্থাগারের একটি অংশে কিছু আবরণহীন তাক (open shelves) রাখা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় ও স্ব-চেষ্টায় পুস্তক আদান-প্রদানের নিয়ম যেন শিখতে পারে। এছাড়া পুস্তকগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, চেয়ার-বেঞ্চ সাজানো, দেওয়াল সজ্জিতকরণ প্রভৃতি কাজে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। এর দ্বারা তারা গ্রন্থাগারটিকে নিজেদের বলে মনে করতে শিখবে।

(খ) পুস্তক নির্বাচন ও সংগ্রহ (Selection and collection of Books): বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচনের জন্য যোগ্য শিক্ষকদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা কর্তব্য। **কমিটির কাজ হবে** পুস্তক পাঠ ও মতামত প্রকাশ করা, প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা (Catalogues) যাচাই করা ও প্রযোজন হলে প্রকাশকের দোকানে যাওয়া, পুস্তক দেখা ও বিচার করা। **কমিটির দ্বিতীয় দায়িত্ব** হবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর পাঠাভ্যাস বিচার করা এবং কে কোন্ প্রকারের পুস্তক ভালবাসে সেগুলি পরীক্ষা করা। তবে কমিটির এসব কাজে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার্থীর সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের মতে (Chap. VII) **পুস্তক নির্বাচনের নিয়ন্ত্রিত নীতি** হবে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক ও মনস্তাত্ত্বিক আগ্রহ (Natural and Psychological interests)। শিক্ষার্থীদের পড়া উচিত বলে শিক্ষক নিজে যেসব বই পছন্দ করেন সেসব পুস্তক নির্বাচন করলে ভুল করা হবে। কি পড়া উচিত সে সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অলক্ষ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারেন কিন্তু পুস্তক নির্বাচনের নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন না। পুস্তক **নির্বাচনের নীতিকে তিনটি ধারায় শ্রেণীবিভক্ত করা যায়—**

প্রথমতঃ, ছোট্ট শিশুদের জন্য পুস্তক: প্রাঞ্জল ভাষায় গল্পাকারে লিখিত পুস্তকগুলি শিশুপাঠ্যের উপযোগী। শিশুরা রঙিন চিত্র ভালবাসে। চিত্রাবলী, চিত্রে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ধরনের আকর্ষণীয় পুস্তক ছোট্ট শিশুদের জন্য নির্বাচিত করা যুক্তিযুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ, একটু বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য পুস্তক: অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য পুস্তকগুলি হবে: (ক) ভ্রমণ কাহিনী, দুঃসাহসিক অভিযান ও

আবিষ্কারের কাহিনী, রোমাঞ্চকর ঘটনা ইত্যাদি। (খ) দেশ-বিদেশের মনীষীদের জীবনী, আত্মজীবনী ও কর্মের বিবরণ ইত্যাদি। (গ) বিচিত্র ধারার প্রবন্ধ, পাঠ্য হিসেবে গণ্য উপন্যাস ইত্যাদি। (ঘ) পাঠ্য পুস্তক, সদৃশ পুস্তকাদি ও সহ-পাঠ্যপুস্তক। (ঙ) ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের (different subjects) পুস্তকাদি। (চ) মৌলিক ও উৎস-সন্ধানী (Source) পুস্তকাদি। (ছ) এছাড়া ভাষা শিক্ষার উপযোগী অভিধান।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষকদের জন্য পুস্তকঃ শিক্ষকরা শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত উন্নয়ন, আত্মতৃপ্তি ও অতিবিক্ত জ্ঞান্ পিপাসা তৃপ্তির জন্য বিভিন্ন বিষয় ও পত্র-পত্রিকা পাঠ করবেন। শিক্ষকদের পাঠোপযোগী বিষয়গুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(১) শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির উপযোগী পুস্তক, (২) বিষয়-শিক্ষকের বিষয় সম্পর্কিত উচ্চতর শিক্ষার পুস্তকাদি, (৩) বৃত্তিগত উন্নযনের পুস্তকাদি ও আধুনিক পত্র-পত্রিকাদি, (৪) অতিবিক্ত ও সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধির উপযোগী চলতি প্রসঙ্গ ও সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকাদি। **এছাড়া**—

বয়স্কদের জন্য পুস্তকঃ সমাজ সেবার কেন্দ্ররূপে বিদ্যালয়গুলি ক্রমশঃ গুরুত্ব অর্জন করছে। যেসব গ্রামে বা ছোট ছোট শহরে পৃথক কোন সাধারণ গ্রন্থাগার (Public Library) নেই সেখানে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটিই সমাজ-সেবার দৃষ্টিভঙ্গীতে বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ্র রূপে পরিগণিত হবে। সুতরাং বয়স্কদের জ্ঞান ও শিক্ষাগত এবং বৃত্তিগত যোগ্যতা বৃদ্ধির উপযোগী পুস্তকও সংরক্ষণ করা কর্তব্য।

সাধারণতঃ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য নিম্নরূপ চরিত্রের পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্রপত্রিকা নির্বাচন ও সংগৃহীত করা প্রয়োজন। **প্রথমতঃ,** বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুস্তক হবে আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যসিদ্ধির অনুকূল। **দ্বিতীয়তঃ,** শিক্ষার্থীর আনন্দ বর্ধনের ও অবসর সময়ে তৃপ্তি লাভের উপযোগী পুস্তক নির্বাচন ও সংগ্রহ করা যুক্তিযুক্ত। **তৃতীয়তঃ,** পাঠ্যবিষয়ের ঘাটতি পূরণের জন্য উপযুক্ত অভিধান, সূত্রগ্রন্থ (reference book), পাঠ্যপুস্তকসদৃশ পুস্তকাদি সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়। **চতুর্থতঃ,** চলতি প্রসঙ্গের জন্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং সাময়িক পত্রিকা যথাসম্ভব শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই সঙ্গে শিশুদের পাঠোপযোগী পত্রিকাও সংগ্রহ ও সরবরাহ করা

কর্তব্য। **পঞ্চমতঃ,** যেসব উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, উচ্চতর ও আকাঙ্ক্ষিত সামাজিক গুণ বিকাশের সহায়ক তেমন পুস্তকাদিও নির্বাচন করা প্রয়োজন।

(গ) যোগ্য গ্রন্থাগারিক ও তাঁর ভূমিকা (Efficient librarian and his role)ঃ সংগঠন প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারের কক্ষ-সজ্জা, পুস্তক নির্বাচন ও সংগ্রহের পর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হল গ্রন্থাগারের উপযোগ লাভ করা (Efficient library service)। এর জন্য প্রয়োজন হল উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত একজন লাইব্রেরীয়ান বা গ্রন্থাগারিক। কেরাণী বা শিক্ষকের আংশিক সময়ের সেবা থেকে গ্রন্থাগারের প্রকৃত উপযোগ লাভ করা যায় না। এর জন্য একজন পূর্ণ সময়ের জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত ও যোগ্য গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা প্রয়োজন। তাঁর শুধু অফিস পরিচালনা ও রেকর্ড সংরক্ষণে জ্ঞান থাকলে চলবে না। তাঁকে জানতে হবে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রবণতা এবং প্রতিটি পুস্তকের বিষয়বস্তুর প্রতিপাদ্য বিষয়। তাহলে তিনিই শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজন মত পুস্তক নির্বাচন করতে পারবেন। দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থাগারিককে হতে হবে শিক্ষার্থীর পরামর্শদাতা, বন্ধু ও দার্শনিক। তাঁকে জানতে হবে কোন্ কোন পাঠ্যবিষয়ের সূত্রগ্রন্থ ও সহপাঠ্য পুস্তক কি কি? তাঁকে জানতে হবে শিক্ষার্থীর সহপাঠ্যসূচীমূলক কর্মে কি কি পুস্তক-পুস্তিকা প্রয়োজন হয় বা শিক্ষার্থীর বক্তৃতা, আলোচনা, বিতর্কে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য কি কি পুস্তকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। এসব দক্ষতা অর্জনের জন্য গ্রন্থাগারিকের কতকগুলি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক গুণ থাকাও প্রয়োজন—যেমন, (ক) সাধারণ শিক্ষা, (খ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং (গ) বিশেষ বিশেষ কয়েকটি জ্ঞান ও গুণ অর্থাৎ—গ্রন্থাগারিকের আন্তরিকতা, কৌশল, উদ্যম, ধৈর্য, পরিচালন-ক্ষমতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা, ছাত্রদের প্রতি বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি এবং শিশু-মনোবিজ্ঞানে তাঁর যথেষ্ট ব্যবহারিক পাণ্ডিত্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) শিক্ষকদের ভূমিকা (Role of the teachers)ঃ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার সংগঠনে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে শিক্ষকদের যোগসূত্র হবে নিবিড়। শিক্ষকদের পরামর্শ অনুসারে গ্রন্থাগারিককে চলতে হয়। শিক্ষার্থীর আগ্রহ ; প্রবণতা ও অভিরুচি, কোন বিষয় পাঠের জন্য কোন্ কোন্ পুস্তক এবং কিরূপ সহপাঠ্যসূচক কর্মের জন্য কি কি পুস্তক প্রয়োজন —ইত্যাদি বিষয় শিক্ষকরাই গ্রন্থাগারিককে জানাবেন। শিক্ষকদের নির্দেশ ও

পরামর্শ ছাড়া গ্রন্থাগারিক শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারেন না। সুতরাং বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংগঠনে শিক্ষকদের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(৬) **গ্রন্থাগারের বিকেন্দ্রীকরণ** (Decentralisation of Library Service)ঃ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারটিকে সুসংগঠিত ও সুপরিচালনা করতে গেলে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বিকেন্দ্রীকরণ নিতান্ত প্রয়োজন। এর জন্য এমন কতকগুলি বিভাগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন যেন সেগুলি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মের সহায়ক হয়। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সাহায্যার্থে আরও তিনটি গ্রন্থাগার সংগঠন করা যায়—যেমন, (i) **শ্রেণী-গ্রন্থাগার** (ii) **বিষয় গ্রন্থাগার** এবং (iii) **শিক্ষকদের গ্রন্থাগার**—এসব গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন হয় না। শ্রেণী-শিক্ষক ও বিষয়শিক্ষক গ্রন্থাগারিকের অভাব পূরণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষককেও গ্রন্থাগার বিষয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করেন যে, শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্সের সঙ্গে গ্রন্থাগার বিষয়ের একটা অংশ যুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। তাহলে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-গ্রন্থাগারিক (Teacher-librarians) বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিককে যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারবেন। উপরন্তু শ্রেণী-গ্রন্থাগার ও বিষয় গ্রন্থাগারের কাজকর্মও সুষ্ঠুভাবে করতে পারবেন।

(i) **শ্রেণী-গ্রন্থাগার** (Class library)ঃ শ্রেণী-গ্রন্থাগার হল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অতি প্রয়োজনীয় ও সহায়ক একটি অংশ। শ্রেণী গ্রন্থাগারে থাকে শ্রেণীর উপযোগী ও প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি। সাধারণতঃ পাঠ্যতালিকাভূক্ত বিষয় অবলম্বনে বিভিন্ন লেখকের লেখা পুস্তক এবং সমপর্যায়ভূক্ত পুস্তকাদি শ্রেণী-গ্রন্থাগারে রাখা হয়। এরূপ গ্রন্থাগার পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের ওপর আংশিক দায়িত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থাগারটি হল ঐ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিজস্ব। শ্রেণী-গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মাঝে মাঝে পুস্তকগুলি পরিবর্তন করে নতুন পুস্তক সংগ্রহ করা দরকার। তাহলে শিক্ষার্থীরা পুস্তকপাঠে নতুন আগ্রহ ও প্রেরণা লাভ করবে এবং একই প্রকার পুস্তকপাঠের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাবে। পুস্তক পরিবর্তন করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া পুস্তকপাঠে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিক্ষক যদি পুস্তকপাঠে উৎসাহী হন তাহলে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহী হবে।

(ii) বিষয় গ্রন্থাগার (Subject Libraries) **:** শ্রেণী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে যেমন শ্রেণী-গ্রন্থাগার পরিচালনা করা যায় তেমনি বিষয় শিক্ষকের (Subject teacher) তত্ত্বাবধানে বিষয় গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনা করা যায়। বিষয় গ্রন্থাগার সাধারণতঃ বিষয় কক্ষে (Subject room) প্রতিষ্ঠা করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ইতিহাস কক্ষে (History room) ঐতিহাসিক বিষয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করাই যুক্তিযুক্ত। এসব গ্রন্থাগারে থাকবে বিষয়গত পাঠ্যপুস্তক, সূত্র-গ্রন্থ (Reference books), উৎসমূলক গ্রন্থ (Source books), সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থ (Related subjects and allied books) এবং বিষয় শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বিষয়গত প্রয়োজন অনুসারে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকাদি খুঁজে বার করা সময় সাপেক্ষ। বিষয় গ্রন্থাগার মুহূর্তের মধ্যে বিষয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মেটাতে পারে।

শ্রেণী গ্রন্থাগারের ন্যায় বিষয় গ্রন্থাগার পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। বিষয় শিক্ষার্থীরা যেন মনে-প্রাণে গ্রন্থাগার, পুস্তক পত্রপত্রিকা ও সাজসরঞ্জামগুলিকে নিজেদের বলে মনে করতে পারে।

(iii) শিক্ষকদের গ্রন্থাগার (Teachers' Library) **:** শিক্ষকদের শিক্ষামূলক উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য পৃথক একটি কক্ষে প্রযোজনীয় গ্রন্থাদি রাখার ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত। গবেষণায় রত শিক্ষকরা এখানে পড়াশুনা করবেন। এর দ্বারা শিক্ষকদের শিক্ষামূলক কর্মে মর্যাদা দেওয়া হয়। তবে সাধারণ পড়াশুনার জন্য বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পাঠাগারে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অবস্থান করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ শিক্ষকদের স্বকীয় কর্মের দ্বারা শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হবে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মিলিত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষা-পরিবেশ গড়ে উঠবে।

কিভাবে শিক্ষার্থীকে গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহিত করা যায়? (How to encourage students to use School Library) : শিক্ষার্থীকে গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করা যায়। **প্রথমতঃ,** শিক্ষার্থীকে সরাসরি উপদেশ বা নির্দেশ দিয়ে গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি পাঠে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা যায়। কিন্তু এটাকে কতকটা যান্ত্রিক উপায় হিসেবে নির্দেশ করা চলে। কারণ উপদেশ দ্বারা আংশিক উৎসাহিত হলেও

নির্দেশের ফলে শিক্ষার্থীরা বাধ্য হয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহার করে এবং কিছুদিনের মধ্যে আদেশ বা উপদেশ অমান্য করতে শুরু করে।

দ্বিতীয় উপায়টি হল, শিক্ষার্থীর মনে গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রয়োজনবোধ সৃষ্টি করা। উপদেশ বা আদেশের পরিবর্তে প্রয়োজন বোধ সৃষ্টি করতে পারলে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহী হবে। **প্রয়োজনবোধ সৃষ্টির জন্য নিম্নরূপ পথ অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়ঃ**

(১) পাঠদানের সময় শিক্ষকরা আধুনিক প্রগতিশীল পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন, যেমন—ডাল্টন প্লান, তদারকী পাঠচর্চা, সমস্যা পদ্ধতি, উৎস-সন্ধানী পদ্ধতি প্রভৃতি। এসব পদ্ধতি প্রয়োগ এবং তাতে শিক্ষার্থীকে অংশ গ্রহণ করতে হলে অনুমোদিত একখানা পুস্তক যথেষ্ট নয়। এর জন্য শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পড়ার প্রয়োজন হয়।

(২) পদ্ধতি প্রয়োগকে সার্থক করে তুলতে গেলে পাঠপরিচালনার সময় কতকগুলি রীতি (Technique) বা কৌশল (Devices) প্রয়োগ বা ব্যবহার করতে হয়। অতিবিক্ত পঠন-পাঠনে উৎসাহিত করার অনুকূলে এরূপ কয়েকটি রীতি প্রয়োগ করা চলে। যেমন—অনুবন্ধ ও সমন্বয় রীতি, প্রশ্নোত্তর রীতি, ব্যাখ্যা, বর্ণনা, দৃষ্টান্তস্থাপন, গৃহকর্মের নির্দেশ (Home task) প্রভৃতি কৌশল প্রযোগ করা যায়। এরূপ রীতি বা কৌশল প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারে অনুপ্রাণিত হয।

(৩) গ্রন্থাগারের একাংশ শিক্ষার্থীদের প্রবেশ ও পুস্তক ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হয়। বই দেখার জন্য যারা এখানে প্রবেশ করবে তারা ক্রমশঃ বই পড়ার প্রতি উৎসাহিত হবে।

(৪) গ্রন্থাগারের একদিকে বুলেটিন-বোর্ড ও প্রদর্শনী বোর্ড (Displaying case) রাখা প্রয়োজন। সংবাদপত্র থেকে ভাল চিত্র, দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে বুলেটিন বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা কর্তব্য। নতুন পত্র-পত্রিকা বা পুস্তকাদি ক্রয় করার পর অন্ততঃ তিনদিন প্রদর্শনী বোর্ডে রাখা উচিত। এগুলি দেখলে শিক্ষার্থীর মনে ঐগুলি পাঠের স্পৃহা জাগরিত হবে।

(৫) অনেক বিদ্যালয়ের সময় তালিকায় (Time-Table) লাইব্রেরী ব্যবহারের সময় (Library Hour) উল্লেখ করা থাকে। সেই সময়ে শিক্ষার্থীরা গ্রন্থাগারে

যায় ও পড়াশুনা করে। কোন কোন বিদ্যালয়ের পাঠোন্নতি পত্রে,(Progress report) গ্রন্থাগার ব্যবহারের নম্বর উল্লেখ করার ব্যবস্থা থাকে। শিক্ষার্থী শিক্ষাবর্ষে বা কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে গ্রন্থাগারের কতগুলি পুস্তক পাঠ করে তার ডাইরীতে নোট করেছে তার ওপর একটা সংখ্যাগত মান (Scoring) উল্লেখ করা হয়। এর দ্বারা শিক্ষার্থীরা গ্রন্থাগারের অধিক সংখ্যক পুস্তক পাঠের জন্য প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়। এছাড়া মাঝে মাঝে বুক কম্পিটিশন-এর (Book competition) ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর দ্বারা শিক্ষার্থীরা পুস্তকপাঠে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

(৬) দীর্ঘ অবকাশে পড়াশুনার জন্য বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উন্মুক্ত রাখা যায়। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সমাজসেবা ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে দীর্ঘাবকাশে গ্রন্থাগার উন্মুক্ত রাখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বুক-লাভার্স ক্লাব (Book lovers' Club) সংগঠিত করে নতুন সংবাদ সংগ্রহ, নতুন জ্ঞানার্জন ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্প্রসারণের উপায় উদ্ভাবন করা সহজসাধ্য।

(৭) গ্রন্থাগারিক এবং শিক্ষককে গ্রন্থাগার ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের নিকট পরোক্ষে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা কর্তব্য। উপদেশ ও আদেশ অপেক্ষা স্বকীয় দৃষ্টান্ত শিক্ষার্থীকে গ্রন্থাগার ব্যবহারে অধিক অনুপ্রাণিত করে।

১১। সংগ্রহশালা (Museum) :

গ্রীকদিগের সঙ্গীত ও কাব্যের অন্যতম দেবী Muse-এর মন্দিরের কথা কল্পনা করলে সাধনার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। মিউজিয়াম সত্যই মিউজ-এর মন্দির, শিক্ষা ও সাধনার পীঠস্থান। পৃথিবীর সভ্য রাষ্ট্রগুলি এই মিউজিয়ামের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে এবং এজন্যই বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেছে মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা। সংগ্রহশালা আবালবৃদ্ধবনিতার শিক্ষালয় হিসেবে পরিগণিত। দেশ, প্রদেশ, অঞ্চলের অতীত ঐতিহ্য সংরক্ষিত হয় এই সংগ্রহশালায়। একে স্থায়ী প্রদর্শনী বলা চলে। এই সংগ্রহশালা জ্ঞান ও ঐতিহ্যের নিদর্শন। জনগণের সেবায় সে উৎসর্গীকৃত। "পণ্ডিতদের কাছে মিউজিয়াম হল বিদ্যানুশীলন ও গবেষণার জন্য জ্ঞান-ঋদ্ধ কোষাগার, শিক্ষাবিদ আর শিক্ষকদের নিকট মূর্ত শিক্ষা-সহায়ক উপকরণাদির ভাণ্ডার—যা শিক্ষাদান কর্মকে বাস্তবায়িত করে। শিশুদের কাছে এটি বিস্ময় ও

সংগ্রহশালার বৈশিষ্ট্য

কৌতূহল-উদ্দীপক আলোকরশ্মি, আর সাধারণ মানুষের কাছে আনন্দ, পরিতৃপ্তি ও জ্ঞানের উৎস।"

পৃথিবীর বিভিন্ন শিক্ষায় উন্নত দেশ এই সংগ্রহশালাকে জনসাধারণের শিক্ষা ও স্বার্থে নিয়োগ করেছে। সাধারণ গ্রন্থাগার রূপে কানাডা সরকার সংগ্রহশালার দ্বার উন্মুক্ত রাখেন জনশিক্ষা ও সেবায়। ইউরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ দেশে বিদ্যালয়-পাঠক্রমের সঙ্গে সংগ্রহশালা ব্যবহার শিক্ষা-সহায়ক পরিবেশ হিসেবে গৃহীত। সুইডেনের সংগ্রহশালার সঙ্গে পাঠক্রমের এমন যোগসূত্র রচনা করা হয়েছে যে, দক্ষ মিউজিয়াম পরিচালক ও বক্তা শিক্ষার্থীদের রুটিনমাফিক শিক্ষা-সহায়তায় বাধ্য থাকেন। আজকাল পৃথিবীর বহুদেশ এই প্রথা অনুকরণ করতে চলেছে। আনন্দের বিষয় ভারতেও সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ প্রদর্শক ও সুদক্ষ বক্তা নিয়োগ করে পরিদর্শকদের বোঝাবার ব্যবস্থা করেছেন।

সংগ্রহশালা ব্যবহারের বৈদেশিক দৃষ্টান্ত

শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মিউজিয়ামের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় যেসব সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে সেগুলি বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের দেখাতে পারলে তারা মূর্ত শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়। সুদূর অতীত থেকে মানুষ কিভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে বর্তমান সামাজিক স্তরে পৌঁছে গেছে তার নিখুঁত ও বাস্তব জ্ঞান সরবরাহ করে সংগ্রহশালা। কিন্তু ভারতের প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংগ্রহশালা দেখবার সুযোগ পায় না। তাই বিদ্যালয়ে গড়ে তোলা দরকার জাতীয় সংগ্রহশালার প্রতিরূপ।

বিদ্যালয়ে থাকে বিভিন্ন বিষয়-কক্ষ (Subject rooms)। এসব বিষয়-কক্ষে থাকে বিষয়-শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ। বিষয় কথাগুলির সঙ্গে সংগ্রহশালার জন্য একটি নির্দিষ্ট কক্ষ রাখা উচিত। সংগ্রহশালাটি হবে বিষয়-কক্ষগুলির কেন্দ্রীয় ও স্থায়ী প্রদর্শনী বিশেষ। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বিষয়ের ভিন্নতা হিসেবে বিভিন্ন গ্যালারীতে উপকরণাদি সাজিয়ে রাখতে পারেন। শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও অঞ্চল পরিদর্শনের সময় শিক্ষার্থীরা নানাপ্রকার অনুচিত্র, ছবি, মডেল প্রভৃতি সংগ্রহ করতে পারে। মেলা, উৎসব বা সরকারী ও বেসরকারী প্রদর্শনী থেকে নানাপ্রকার সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারে। এগুলিকে সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত করা মোটেই কঠিন সমস্যা নয়। সংগৃহীত সামগ্রীগুলি

সংগ্রহশালা গড়ে তোলার উপায়

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের নির্দেশমত বিষয়-গ্যালারীতে (Subject gallary) সাজিয়ে রাখতে পারে। বিদ্যালয় সংগ্রহশালার উন্নতিকল্পে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক ও আঞ্চলিক শিক্ষানুরাগী সকলেই সক্রিয় সহযোগিতা করলে অল্পদিনে বিদ্যালয় সংগ্রহশালা শিক্ষাসহায়ক হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

সংগ্রহশালার উল্লেখযোগ্য উপযোগিতাগুলি হল ঃ

প্রথমতঃ, নতুন বছরের নতুন শিক্ষার্থীদের নিকট এই সংগ্রহশালা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবে যে, তারা নতুন উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে বিষয় পঠন-পাঠনে ব্রতী হবে।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাকর্ম পরিচালনার সময় শিক্ষকও এই কক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করে পুঁথিগত বিষয়কে প্রাঞ্জল, সুস্পষ্ট ও বাস্তবানুগ করে তুলতে পারেন।

তৃতীয়তঃ, বিদ্যালযের সামগ্রিক শিক্ষা-প্রদর্শনী উপলক্ষে সংগ্রহশালার সামগ্রী হবে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় বস্তু।

চতুর্থতঃ, সংগ্রহশালার উন্নতিকল্পে সক্রিয় সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল কর্মে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ লাভ করবে।

পঞ্চমতঃ, স্থায়ী প্রদর্শনী হিসেবে এই বিদ্যালয়-সংগ্রহশালা প্রতিটি শিক্ষার্থীর নিকট হবে চির আনন্দদাযক, গতিশীল ও প্রাণবন্ত শিক্ষাপরিবেশ সৃষ্টিকারী উপকরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধারণ সংগঠন ও পরিশাসন
(General Organisation and Administration)

অধ্যায় পরিচয়ঃ বর্তমান অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয়বস্তুর নামের সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের (বর্তমান খণ্ড) নামের সাদৃশ্য আছে। শুধু 'পরিশাসন' শব্দটি একটু পার্থক্য ঘোষণা করছে। সংগঠন শব্দটি দ্বারা সামগ্রিকতার বিষয় ব্যক্ত হয়। তাই বর্তমান খণ্ডের সূচনাতে (Introduction) সংগঠন কথাটি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে 'পরিশাসন' বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করা হল। আবার পরিশাসন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-সভা, সময়-তালিকা সমন্বিত বিষয় বিভিন্ন অনুচ্ছেদে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১। বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিশাসন (School Organisation and Administration)ঃ

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এখানে সমাজের প্রয়োজন মেটাতে ভাবী নাগরিকবৃন্দের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যালয়ের মতো আরও বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব উদ্দেশ্যমূলক কর্ম-পরিচালনা করে। যেমন, চিকিৎসালয় রোগমুক্তির ব্যবস্থা করে, কল-কারখানা সামগ্রী উৎপাদন করে, অফিস-আদালত শাসন ও বিচারকর্ম সম্পাদন করে ইত্যাদি। কিন্তু অন্য সব সামাজিক প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করেই বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যধারাকে সার্থক করে তোলেন। যেমন, অনুকূল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উপযুক্ত শিক্ষা লাভের পর একজন চিকিৎসক সেবাকর্মে সাফল্য অর্জন করেন, ইঞ্জিনিয়ার উৎপাদনের ক্ষেত্রে বা নতুন কিছু আবিষ্কারের ক্ষেত্রে স্বীয় যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন। তাহলে বলা যায়, জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য সুশিক্ষার বা সার্থক শিক্ষার প্রয়োজন হয়। বিদ্যালয় হল এরূপ সার্থক শিক্ষালাভের একটি ক্ষেত্র।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব

শিক্ষা অতি ব্যাপক, জটিল ও গতিশীল একটি প্রক্রিয়া। বিচিত্র সমস্যার ভেতর দিয়ে শিক্ষা-প্রক্রিয়া পরিচালিত। এর জন্য মানবিক ও প্রাকৃতিক নানাবিধ কর্মের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়। শিক্ষা সংগঠন বিচিত্র কৌশলে এরূপ জটিল ও সমস্যাসঙ্কুল কর্তব্য সম্পন্ন করে এবং সমাজের প্রয়োজন ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষণ কর্মকে সার্থক করে তোলে। তাই সংগঠন হল শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় (means)। শিক্ষার ন্যায় জটিল ও গতিশীল প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য তাই সুষ্ঠু সংগঠনেব প্রয়োজন আছে।

সংগঠনের প্রয়োজন

'সংগঠন' ও 'পরিশাসন' (Organisation and administration) শব্দ দুটি সাধারণতঃ সম-অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। সংগঠন অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধাবণ থেকে শুরু করে গৃহ নির্মাণ, শিক্ষার্থী সংগ্রহ, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন ও সংগঠন, পঠন-পাঠনেব ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীব শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, বৌদ্ধিক বিকাশ ও বৃদ্ধি, সমাজের প্রযোজন ও চাহিদা অনুসাবে শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা, বিদ্যালয় পরিচালনা প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম সংগঠনের এক্তিয়ারভুক্ত। পক্ষান্তরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সুষ্ঠুভাবে তার পরিচালন প্রক্রিয়াটুকু মাত্র পরিশাসন-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, সংগঠন হল একটি সামগ্রিক বিষয় আর পরিশাসন বা প্রশাসন হল তার একটি অংশ মাত্র।

সংগঠন ও পরিশাসন

পরিশাসন (Administration) শব্দটি দ্বারা আদেশ, নির্দেশ বা অনুজ্ঞাসূচক অর্থ অভিব্যক্ত হয়। শিক্ষা পরিশাসনের ক্ষেত্রে এরূপ ধারণা অনেক বেশী সুস্পষ্ট। সাধারণভাবে পরিশাসন বলতে এমন একটা মেসিনারীকে বুঝি, যার দ্বারা কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়। বিদ্যালয়ের পরিশাসন-প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠানের কাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। সামগ্রিক বিদ্যালয় সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানটি যেন একটি মানবদেহ। এই দেহযন্ত্রের ক্ষুদ্র-বৃহৎ অংশের মধ্যে সংহতি ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সুসমঞ্জস পরিচালনার জন্য প্রশাসন যন্ত্ররূপ হৃদপিণ্ডটি যথাসাধ্য চেষ্টা করে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিশাসন সম্পর্কে নানা অভিমত বা ব্যাখ্যার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। অনেকের মতে শিক্ষা-পরিশাসনের উদ্দেশ্য হল সংগঠন প্রতিষ্ঠানকে পূর্বনির্ধারিত

শিক্ষা-পবিশাসন কি?

লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করা। আবার কোন কোন মহলের ধারণা যে শিক্ষা-পরিশাসন হল একটি সমবায়মূলক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। গণতান্ত্রিক উপায়ে এই প্রক্রিয়া নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ-কৌশল প্রয়োগ করে। গণতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থায় শিক্ষাকর্মীদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ও মহত্ত্ব প্রদানের অধিকার থাকে। এসব বিভিন্ন মত মূলতঃ এই কথাই ব্যক্ত করে যে, শিক্ষা-প্রশাসন হল একটা জীবন্ত ও গতিশীল প্রক্রিয়া। এর কেন্দ্রীয় বা নিয়ন্ত্রিত লক্ষ্য হল (Controlling aim) সজীব, বর্ধিষ্ণু, ক্রমপ্রকাশমান শিশুর সুসমঞ্জস ও সার্বিক উন্নয়ন (All round development)। তাই প্রখ্যাত ইংরেজ পরিশাসক স্যার গ্রাহাম বালফোর (*Sir Graham Balfour*) প্রশাসনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছিলেন যে, যোগ্য শিক্ষার্থীকে সুযোগ্য শিক্ষকের নিকট হতে সার্থক শিক্ষালাভে সমর্থ করাই হল শিক্ষা-প্রশাসনের উদ্দেশ্য। এর জন্য রাষ্ট্রীয় সামর্থ্যের সীমায় এমন অনুকূল পরিবেশ থাকা চাই যেন শিক্ষার্থী তার লব্ধ শিক্ষা দ্বারা সর্বাপেক্ষা লাভবান হতে পারে।"[1] সুতরাং শিক্ষার্থীর শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষক, বিদ্যালয়, পাঠ্যবিষয় ইত্যাদি উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। প্রশাসন ব্যবস্থার ওপর এ-গুরুদায়িত্ব অর্পিত থাকে।

প্রশাসন কথাটি সরকারী অফিস-আদালতের সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে গণ্য হত। বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে কলকারখানা ও অন্যান্য সমাজ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রশাসন বা পরিশাসন শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন—এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। শিক্ষা-প্রশাসন মূলতঃ মানবিক উপাদানের সঙ্গে অন্বিত।

অন্যান্য প্রশাসনের সঙ্গে শিক্ষা প্রশাসনের পার্থক্য

শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আনুষঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় কর্মাদি সম্পন্ন করা শিক্ষা-প্রশাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব। অন্যান্য প্রশাসন ব্যবস্থায় মানুষের দেহ ও মনের সঙ্গে সরাসরি কোন যোগ নেই। দ্বিতীয়তঃ, কলকারখানা ও অফিস-আদালতের প্রশাসন-ব্যবস্থা অনেকখানি স্থিতিশীল ও অপরিবর্তনীয়। পক্ষান্তরে, ব্যক্তির দেহ-মনের বৃদ্ধি ও বিকাশ স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তনশীল। তাই ব্যক্তিবিকাশের সঙ্গে জড়িত শিক্ষাও একটি জীবন্ত ও গতিশীল প্রক্রিয়া।

1. 'To enable the right pupils to receive the right education from the right teahers, at a cost within the means of the state, under conditions which will be enable the pupils best to profit by their learning."

—Administration of Education in India—Page 21.

সুতরাং শিক্ষা প্রশাসন কোন মতে স্থিতিশীল ও অপরিবর্তনীয় (Rigid and static) প্রক্রিয়া হতে পারে না। শিক্ষা-প্রশাসন চলবে প্রচেষ্টা ও ভুল, ভুল ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের (Experimentation) গতিপথে এবং প্রক্রিয়াটি হবে সর্বদা প্রগতিশীল (Progressive)।

ভারতের শিক্ষা-প্রশাসন প্রক্রিয়াকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—বহির্বিভাগীয় (external) এবং আভ্যন্তরীণ (Internal)। এ দেশের বহির্বিভাগীয় শিক্ষা-প্রশাসন বলতে শিক্ষা বিভাগের (Education Department) মাধ্যমে সরকারী নিয়ন্ত্রণকে বোঝায়। আর সহকর্মীদের সহযোগিতায় প্রধান শিক্ষক কর্তৃক বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কর্মসূচীর বাস্তবায়নকে বলা হয় বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ প্রশাসন। শিক্ষা-সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন, প্রাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, পাঠ্যসূচী নির্ধারণ, বিদ্যালয়-গৃহ সংস্থাপন, শিক্ষকদের বেতন ও চাকরির শর্ত নির্ধারণ, শিক্ষার স্তর স্থিরীকরণ ইত্যাদি বহির্বিভাগীয় প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। কোন কোন গণতান্ত্রিক দেশে (দৃষ্টান্ত আমেরিকা) উল্লিখিত কর্মতালিকার অধিকাংশ সমস্যা সমাধানের ভার বিদ্যালয়ের ওপরেই অর্পিত হয়। কারণ, সামাজিক

ভারতের শিক্ষা-প্রশাসন

এবং আঞ্চলিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে বিদ্যালয়ের স্বাধীনতা সর্বদা স্বীকার্য। সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয় তাহলে তার সার্থকতার জন্য বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ প্রশাসন-যন্ত্রের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। সহকারী-শিক্ষক এবং সহ-প্রধান শিক্ষকই আভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা করেন। শিক্ষকরাই শিক্ষার্থীর নিকট সান্নিধ্যে অবস্থান করেন। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ কিভাবে সম্ভব তা শিক্ষকরাই সরাসরি ও সহজে অনুধাবন করতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশে বিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষকদের দায়িত্ব যথেষ্ট সীমিত। পক্ষান্তরে শিক্ষা-প্রশাসনে বহির্বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বহির্বিভাগ শিক্ষার্থী থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। তারা শিক্ষার্থীর চাহিদা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারে না। সার্কুলার মাধ্যমে অনুমোদিত নীতি ঘোষণা দ্বারা বিদ্যালয়ের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করেন। তাই অনেকে দুঃখ করে বলেন, আমাদের শিক্ষা-প্রশাসন শিশুকেন্দ্রিক (Child centered) না হয়ে হয়েছে ফাইল কেন্দ্রিক (File centered)।*

*সিলেবাস অনুসারে এ পুস্তকে বহির্বিভাগীয় প্রশাসন-যন্ত্রের বিস্তৃত আলোচনার কোন সুযোগ নেই। তাই আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হল।

২। বিদ্যালয় প্রশাসন (School Administration) ঃ

বিদ্যালয় প্রশাসন যন্ত্রটি সামগ্রিক বিদ্যালয় সংগঠনের হৃদপিণ্ড স্বরূপ। মানব-দেহে যেমন অঙ্গ-প্রতঙ্গ সহ আভ্যন্তরীণ সূক্ষাতিসূক্ষ যন্ত্রাদির পরিচালনায় হৃদপিণ্ডের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি জটিল ও সমস্যাপূর্ণ বিদ্যালয়-জীবনের প্রাণকেন্দ্র হল এর প্রশাসনব্যবস্থা। প্রশাসনব্যবস্থা বিদ্যালয়-জীবনের বিচিত্র উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় শিক্ষার ওপর দৃষ্টি দেয়। বিদ্যালয় **প্রশাসন-যন্ত্রের কাজ হল ঃ**

(ক) বিদ্যালয়ের শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য কর্মসূচী নির্ধারণ করা।

(খ) নির্ধারিত কর্মসূচী প্রয়োগে শিক্ষার্থী যাতে তার যাবতীয় সম্ভাবনার বিকাশসাধন করে সমাজের আদর্শ ও সক্ষম সভ্য হিসেবে গড়ে উঠতে পারে তার জন্য আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(গ) সার্থক শিক্ষাকর্মের প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের বিচিত্র কর্মধারার মধ্যে সমন্বয়সাধন করে সমস্যা সঙ্কুল জটিলতার সমাধান করা।

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের বা সংগঠনের বস্তুগত, প্রাকৃতিক ও মানবিক সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা। প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম ও গৃহাঙ্গনের চলতি অবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রেখে প্রয়োজন অনুসারে উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

যোগ্য প্রশাসনের লক্ষণ (Criteria of Efficient Administration) ঃ

গণতন্ত্রভিত্তিকতা ঃ দায়িত্ব বণ্টন, সাম্য ও স্বাধীনতা, সহযোগিতা ও সমবায়, ন্যায়বিচার, ব্যক্তিগতকর্মের স্বীকৃতি, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি নীতি দ্বারা গণতান্ত্রিক প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করা যায়। শিক্ষা-প্রশাসন উক্ত গণতান্ত্রিক নীতিগুলি কতখানি বাস্তবায়িত করতে পেরেছে সেটাই হল প্রশাসনিক যোগ্যতা বিচারের প্রাথমিক মানদণ্ড। ভারতের ন্যায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষা-প্রশাসনের গণতন্ত্রভিত্তিকতা অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

যোগ্য মানবিক উপাদান ঃ বিদ্যালয়ের গৃহপ্রকল্প, আসবাবপত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও পরিবেশগত সৌন্দর্য শিক্ষার্থীকে কর্মে উৎসাহিত ও আগ্রহান্বিত

করতে পারে মাত্র। শিক্ষাকর্মের জন্য চাই শিক্ষণ-প্রাপ্ত যোগ্য শিক্ষক, ডেমনষ্ট্রেটর, গ্রন্থাগারিক ইত্যাদি। সংগঠনের মানবিক উপাদানের বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রশাসনিক যোগ্যতার বিচার করা যায় কিন্তু অযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগ দ্বারা প্রশাসনিক অযোগ্যতার পরিচয় দেওয়া হয়।

কার্যকর নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ: প্রশাসনব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের আদেশ, উপদেশ ও নির্দেশের দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে প্রশাসনিক যোগ্যতা, দূরদৃষ্টি, উদ্বোধক প্রেরণা এবং নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত। বিদ্যালয় প্রশাসন যেমন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সুনির্দিষ্ট পথে শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালনা করবে, তেমনি তাদের অবাঞ্ছনীয় কর্মকে নিয়ন্ত্রণও করবে। তাই প্রশাসন যন্ত্রকে অনেকে বিদ্যুতের সঙ্গে তুলনা করেন। তারা বলেন, 'বিদ্যুৎ যেমন আমাদের আলোক দান করে তেমনি সামান্য ভুলের জন্য শক (Shock) দিয়েও থাকে'। প্রশাসনিক প্রক্রিয়া হবে সমাজপ্রগতির সঙ্গে গতিশীল নিয়ন্ত্রক।

সমন্বয় ও সংহতি: বিদ্যালয়ে বহু বিচিত্র কর্মসূচীর নিয়ন্ত্রিত লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ। এই নিয়ন্ত্রিত লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে বিচিত্র কর্মের মধ্যে সমন্বয়সাধন করার প্রয়োজন হয়। বিচিত্র কর্মধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-বর্গের মধ্যে যুবা, মধ্যবয়সী, বৃদ্ধ ইত্যাদি নানা বয়সের ব্যক্তি থাকেন। ব্যক্তি বৈষম্য হেতু তাদের যোগ্যতা ও মানসকিতার মধ্যে যথেষ্ট অসাম্য থাকা স্বাভাবিক। সার্থক শিক্ষা-কর্মের জন্য এসব বৈষম্যের মধ্যে সমন্বয় ও সংহতি বিধান করা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রকৃত লক্ষ্য পথে পরিচালিত করা প্রয়োজন। এরূপ কর্মের দ্বারাই প্রশাসনিক যোগ্যতার মান অভিব্যক্ত হয়।

অর্থসংক্রান্ত কর্মধারা: কোন বিদ্যালয়ের উন্নতি বা অবনতি অনেক-খানি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সচ্ছলতার ওপর নির্ভর করে। যে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সচ্ছলতা যত বেশী সে প্রতিষ্ঠান তত বেশী নতুন নতুন পরিকল্পনা, গবেষণা ও উন্নয়নের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে পারে। তাই আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন করা প্রশাসন যন্ত্রের অন্যতম যোগ্যতার পরিচয়। এর জন্যে প্রশাসন যন্ত্রকে সরকারী-বেসরকারী অনুদান গ্রহণ, ছাত্র-দত্ত বেতন আদায়, চাকরির শর্ত অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মীদের বেতন-প্রদান, বার্ষিক

আয়-ব্যয়ের বাজেট তৈরি ইত্যাদি অর্থসংক্রান্ত কর্মের মাধ্যমে প্রশাসনিক যোগ্যতার পরিচয় দিতে হয়।

বিজ্ঞানসম্মত তথ্য সংগ্রহ ও বিবরণসংরক্ষণ: বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বহুবিধ নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হয়, যেমন—ভর্তির বই, বিজ্ঞপ্তির বই, পরিদর্শন বই, নানা প্রকারের ছুটির তালিকা, অর্থ-সংক্রান্ত বিবরণ, শিক্ষা-পরিচালন সংক্রান্ত বিবরণ, আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম সংক্রান্ত বিবরণ, সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের সঙ্গে পত্র-বিনিময় ইত্যাদি। এসব বিবরণে বিদ্যালয়ের চিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নির্ভুল ও সত্য তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের দ্বারা বিদ্যালয়ের প্রশাসন-যন্ত্রের যোগ্যতা প্রকাশ পায়।

বিদ্যালয়গৃহ ও গৃহ-সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহার: বিদ্যালয়গৃহ, সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাব পত্রের যথাযথ ব্যবহারের ভেতর দিয়ে প্রশাসন-যন্ত্রের রুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহ ও আসবাবপত্রের ক্ষয়ক্ষতির হিসেব, প্রয়োজনীয় মেরামত, প্রয়োজনীয় নতুন সামগ্রী ক্রয়, ও তত্ত্বাবধান এবং সংরক্ষিত সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করাই যোগ্য প্রশাসন-যন্ত্রের কাজ।

শিক্ষা ও মূল্যায়ন: সুষ্ঠু শিক্ষণ-প্রক্রিয়া পরিচালনা করা যেমন প্রশাসন-যন্ত্রের কাজ, তেমনি শিক্ষণ-প্রক্রিয়া ও কর্মসূচীর যথাযথ মূল্যায়নের ব্যবস্থা করাও প্রশাসন-যন্ত্রের অন্যতম কাজ। কারণ শিক্ষণ-কর্মের মূল্যায়ন দ্বারাই শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। যে উদ্দেশ্যে শিক্ষা-কর্ম শুরু করা হয়—তার ফলশ্রুতি বিচারের দ্বারা প্রশাসন-যন্ত্রের যোগ্যতার বিচার করা সহজসাধ্য।

বিদ্যালয় প্রশাসন একটি সজীব গতিশীল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া কোন নির্দিষ্ট নীতি বা নিয়মের সীমায় সীমিত নয়। তেমনি আবার প্রশাসন-কর্মের পরিধিও সুবিস্তৃত। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কর্মই বিদ্যালয় প্রশাসন-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। সার্থক ও সুষ্ঠু কর্মের দ্বারাই প্রশাসনিক যোগ্যতা বিচার করা হয়।

স্বৈরতান্ত্রিক বিদ্যালয় প্রশাসন (Autocratic School-Administration):

স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রশাসকের ন্যায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা-সম্পন্ন শাসনকর্তা হতে পারেন। স্বৈরতান্ত্রিক বিদ্যালয় প্রশাসনে প্রধান শিক্ষক

হলেন সর্বময় কর্তা। তাঁর আদেশই হল অবশ্য পালনীয় আইন। অধীনস্থ সকলকেই সে আদেশ মেনে চলতে হয়। এরূপ প্রশাসনে প্রধান শিক্ষক হলেন সর্বদর্শী ও সর্বজ্ঞ। ভাল হোক বা মন্দ হোক, অন্যের মতামতের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে স্বেচ্ছাচারী প্রধান শিক্ষক স্বীয় বিচার-বুদ্ধিকে শেষ কথা হিসেবে গ্রহণ করেন। বিদ্যালয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে এরূপ স্বৈরতান্ত্রিকতা কোন মতেই কাম্য নয়। শিক্ষা হল শিক্ষার্থীর আপনসত্ত্বাব প্রকাশ, বিকাশ ও বৃদ্ধি। শিক্ষার্থী বা সমাজের ভাল-মন্দের কথা না ভেবে বা অন্যের মতামতের অপেক্ষা না রেখে প্রধান শিক্ষকের স্বার্থগত ও প্রভুত্বব্যঞ্জক কথা যেখানে শেষ নির্দেশ হিসেবে গণ্য করা হয় সেখানে শিক্ষাব অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাই স্বৈরতান্ত্রিক বিদ্যালয় প্রশাসন কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

স্বৈরতান্ত্রিক প্রশাসন

কিন্তু আর এক বিশেষ চরিত্রের স্বৈরতান্ত্রিক প্রশাসন থাকতে পারে। সেখানে প্রশাসন স্বীয় স্বার্থের দ্বারা তাড়িত না হয়ে জনকল্যাণের স্বার্থে স্বৈরাচারী হন। এরূপ প্রশাসনকে বলা হয় হিতৈষী স্বৈরতন্ত্র (benevolent despotism)। প্রশাসককে বলা যেতে পারে হিতৈষী স্বেচ্ছাচারী (benevolent despot)। ইতিহাসে এরূপ প্রশাসক অবহেলিত হন নি। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এরূপ প্রশাসক পূর্বে ছিলেন, আজও আছেন। অনেক প্রধান শিক্ষক থাকেন যাঁরা বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, হিতৈষী ও যথেষ্ট অভিজ্ঞ। তাঁরা আত্মবিশ্বাস সহকারে স্বীয় বিচার-বিবেচনার ওপর নির্ভব করতে পারেন। তাঁদের গুণাবলী, যোগ্যতা ও দক্ষতা এত বেশী যে অন্যে সহজেই তাঁদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন এবং তাঁদের দ্বারা পরিচালিত সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিনা বাধায় সম্পাদন করেন। তবে, এরূপ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, জ্ঞানী ও গুণী প্রধান শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্ত কম। কম হলেও তাঁরা সর্বদাই আদর্শস্থানীয়। হিতৈষী অথচ স্বৈরাচারী প্রধান শিক্ষকের প্রশাসনে অনেকগুলি **সুযোগ-সুবিধাও** আছে, সেগুলি হল :

হিতৈষী স্বৈরতান্ত্রিকতা

প্রথমতঃ, এরূপ প্রশাসনে যথাসম্ভব শীঘ্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। **দ্বিতীয়তঃ,** গণতান্ত্রিক প্রশাসনে যে ধরনের হিংসা-দ্বেষ, ঝগড়া-ঝাটি কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এখানে তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। **তৃতীয়তঃ,** বিদ্যালয়

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে প্রশ্নাতীত আনুগত্য লাভ করা যায়। **চতুর্থতঃ,** এরূপ প্রশাসনে ন্যায় বিচার, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সার্থক কর্মের স্বীকৃতি, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা সহজতর। বিদ্যালয় ও সমাজের প্রকৃত মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গুণী প্রধান শিক্ষক যদি স্ব-ইচ্ছায় বিদ্যালয় প্রশাসন পরিচালনা করেন তাহলে সকলেই সেরূপ কর্তৃত্বের নিকট নতি স্বীকার করেন।

হিতৈষী স্বেচ্ছাচারী প্রশাসনের সুবিধা

কিন্তু সাধারণতঃ লক্ষ্য করা যায় যে, স্বেচ্ছাচারী প্রশাসক যতই হিতৈষী হন না কেন, তাঁর ক্ষমতা লিপ্সা ক্রমশঃ বেড়েই চলতে থাকে। ক্ষমতা-লিপ্সা এমনই একটা পিপাসা যে তা ক্রমশঃ প্রশাসককে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্য প্রণোদিত করে এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনস্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিস্বার্থ বড় হতে থাকে। ফলে (১) হিতৈষী প্রধান শিক্ষকের জনপ্রিয়তা কমে যায়। (২) সহকর্মী, শিক্ষার্থী, অভিভাবকদের মধ্যে ক্রমশঃ অসন্তুষ্টি জমে উঠতে থাকে। (৩) বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কর্মীরা ক্রমশঃ স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করতে থাকেন। (৪) শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক— সকলের মধ্যে তখন দল, উপদল ইত্যাদি সংগঠিত হয়। এদের মধ্যে কোন দল অতিরিক্ত সুবিধার আশায় প্রধান শিক্ষকের পক্ষ সমর্থন করেন; আবার কোন দল বিপক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে থাকেন এবং শেষ পরিণতিস্বরূপ বিদ্যালয়ে শিক্ষা-পরিবেশের অন্তিম শয্যা রচিত হয়। সুতরাং একটা **নির্দিষ্ট সময় সীমার বাইরে স্বৈরতন্ত্রী প্রশাসন চলতে পারে না।** এরূপ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য গণতান্ত্রিক বিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি জনমত সংগঠিত হতে থাকে।

হিতৈষী স্বেচ্ছাচারী প্রশাসনের পরিণতি

গণতান্ত্রিক বিদ্যালয় প্রশাসন (Democratic School Administration):

যে-কোন দেশের সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করে সে-দেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি। বিদ্যালয় এরূপ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও লক্ষ্যকে সার্থক করাই হল বিদ্যালয়-প্রশাসনের অপরিহার্য কর্তব্য। ভারত পৃথিবীর একটি বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এদেশের বিদ্যালয় প্রশাসনে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিফলিত হবে—এটাই বাঞ্ছনীয়। মূলতঃ, শাসন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণকেই গণতান্ত্রিক শাসন বোঝায়। গণতান্ত্রিক

প্রশাসনে **প্রথমতঃ**, ব্যক্তির ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়া হয়। **দ্বিতীয়তঃ**, এখানে সামাজিক ও ধর্মীয় ভেদাভেদ বিচার করা হয় না। বরং সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা এখানে অপাঙক্তেয় এবং সকল . সভ্যই সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে বিবেচিত। **তৃতীয়তঃ**, গণতান্ত্রিক প্রশাসনে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের খেয়ালপনা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অনুচিত বা অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পায় না।

উপরোক্ত গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিদ্যালয় প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য নীতিগুলি হল ঃ

সমতার নীতি ঃ গণতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী প্রশাসক অধীনস্থ কর্মচারীদের সহকর্মী (Co-worker) হিসেবে মর্যাদা দেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডেমনষ্ট্রেটর, কারণিক, গ্রন্থাগারিক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে সমমর্যাদাসম্পন্ন সহকর্মী হিসেবে গ্রহণ করা ও তাদের সঙ্গে যথাযথ ব্যবহার করা বিদ্যালয় প্রশাসকের অবশ্য কর্তব্য।

দায়িত্ব বণ্টনের নীতি ঃ বিদ্যালয় সংগঠনের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভাল-মন্দের জন্য প্রধান শিক্ষক দায়ী থাকেন। তবুও গণতান্ত্রিক ধারায় বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব সহকর্মীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। এমনকি গণতান্ত্রিক পরিচালন-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মতামত এবং সক্রিয় সহযোগিতাও গ্রহণ করা যায়। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের এরূপ স্বায়ত্বশাসন গণতান্ত্রিক কর্মধারার বহিঃপ্রকাশ

ন্যায়-বিচারের নীতি ঃ গণতান্ত্রিক বিদ্যালয় প্রশাসনের মূলমন্ত্র হল ন্যায়-বিচার। এরূপ প্রশাসন কখনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি অতিরিক্ত বা অনুচিত কৃপা প্রদর্শন করে না। এরূপ ব্যবস্থায় আইন বা নিয়মের নিকট সকলেই সমান ও ন্যায়-বিচারের অধিকারী। সর্বজনীন মঙ্গলের দিকে লক্ষ রেখে এখানে নীতি নির্ধারিত হয়। সে-নীতি আবার সমমর্যাদায় সকলের ওপর প্রযোজ্য।

ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্মের স্বীকৃতি ঃ কোন প্রশংসনীয় কর্ম, আন্তরিক প্রচেষ্টা বা বাঞ্ছনীয় গুণ ও দক্ষতার জন্য স্বীকৃতি জানানোই হল গণতান্ত্রিক প্রশাসনের অবশ্য কর্তব্য কর্ম। এর দ্বারা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বাঞ্ছিত কর্মে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা যায়। স্বীকৃতি জানালে উৎসাহিত হন না এমন

ব্যক্তিই বিরল।* আবার এর দ্বারা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং গণতান্ত্রিক প্রশাসনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মীদের আন্তরিক ও শুভ প্রচেষ্টায় স্বীকৃতি জানানো অবশ্য কর্তব্য।

স্বাধীনতার নীতি : শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে স্বাধীনভাবে স্বীয় উদ্যোগে শিক্ষা-প্রচেষ্টা প্রয়োগের সুযোগ পেলে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে পারেন। পক্ষান্তরে শিক্ষার্থীকেও স্বাধীনভাবে শিক্ষালাভে উদ্বোধিত করা প্রয়োজন। অন্যথায় মনোবিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকে অস্বীকার করা হয়। তাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই আন্তরিক ও শুভ প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা প্রদান করা গণতান্ত্রিক প্রশাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

সমন্বয় ও সহযোগিতার নীতি : শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার বিচিত্র কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব জাগাতে না পারলে শিক্ষা-কর্মের উদ্দেশ্য সফল হয় না। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্য কর্মবৈষম্য থাকা স্বাভাবিক। তাই এই বৈষম্যের মধ্যে সমন্বয় (Co-ordination সাধন করা প্রয়োজন। তবেই বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্রতম সমষ্টি জীবন ধারার ভেতর দিয়ে শিক্ষর্থীরা বাস্তব সমাজ পরিবেশে জীবনধারণের উপযোগিতা লাভ করবে। তাই গণতান্ত্রিক প্রশাসনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, আঞ্চলিক অধিবাসী ইত্যাদি সকলের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করা হয়।

নেতৃত্বের নীতি : শিক্ষা-পরিশাসক হলেন বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-বর্গের নেতা। সুতরাং তাকে নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত হতে হবে। শুধু আদেশ করলেই নেতৃত্ব দেওয়া যায় না। আদেশ বা নির্দেশ দানের কৌশল এমন হবে যেন সহকর্মী ও শিক্ষার্থীরা হৃষ্টচিত্তে আগ্রহ সহকারে তা পালন করেন। এর জন্যে প্রশাসককে ব্যক্তিগত ও যৌথ মনস্তত্ত্ব অনুধাবনের চেষ্টা করতে হবে। তাঁকে যেমন অন্যের প্রস্তাব বা পরামর্শ আন্তরিকতার সঙ্গে শুনতে হবে তেমনি সঠিক হলে বিষয়টিকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করতে হবে।

* তুলনীয় : "Nothing will more encourage a man or a woman, a boy or a girl to a greater effort than an encouraging recognition of good work done, or sincere effort made, or good qualities shown."—*Ryburn.*

মানবিক সম্পর্কের নীতি: গণতান্ত্রিক বিদ্যালয় প্রশাসনতত্ত্ব মানবিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং মানবিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয়। প্রশাসক সর্বদা শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন। মানবোচিত কর্ম, চিন্তা ও বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হলে প্রশাসন-প্রক্রিয়ার মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবধারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমরা স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের অধিবাসী। গণতান্ত্রিক ভাবধারাকে জাগ্রত করাই আমাদের জাতীয় জীবনের প্রাথমিক আদর্শ। শিক্ষা-প্রশাসন ও শিক্ষণ-পদ্ধতিতে যদি গণতান্ত্রিক ভাবধারা সম্প্রসারিত হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় জীবনে বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

বিদ্যালয়-প্রশাসনের পরিধি (Scope of School Administration):

সার্থক শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্যে বিদ্যালয়-প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপযুক্ত উপায়ে সংগঠিত ও পরিচালিত না হলে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তার পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। তাই বিদ্যালয-প্রশাসনের ক্ষেত্র ও পরিধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক।

বিদ্যালয়-প্রশাসনের দুটি উপাদান বিদ্যমান, যথা—(১) মানবিক উপাদান (Human element) এবং (২) বস্তুগত উপাদান (Material element)। দুটি উপাদানের মধ্যে মানবিক উপাদানের গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ, মানবিক উপাদান বস্তুগত উপাদানগুলির সহায়তায় শিশুর সর্ব্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস বিকাশের দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করে এবং প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য ও নীতিকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে।

মানবিক উপাদান: মানবিক উপাদানগুলির মধ্যে **প্রথমতঃ**, প্রধান শিক্ষকের পদবৈশিষ্ট্য, শিক্ষাগত, বৃত্তিগত ও প্রশাসনিক যোগ্যতা আনুষঙ্গিক প্রশাসনিক উপাদানগুলির কেন্দ্রীয় বিষয়। **দ্বিতীয়তঃ**, প্রধান শিক্ষকের পরই শিক্ষকবৃন্দের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যক্ষ শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের সঙ্গে শিক্ষকরাই জড়িত। পরিচালক সমিতি এবং শিক্ষক সভায় (Teacher's Council) গৃহীত নীতি প্রধান শিক্ষক মূলতঃ শিক্ষকদের সক্রিয় সহযোগিতায় বাস্তবায়িত করতে পারেন। **তৃতীয়তঃ**, বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে পরিচালক সমিতি (Managing Committee) কর্তৃক নীতি নির্ধারিত হয়। সেই নীতি প্রধান শিক্ষক সহকর্মীদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।

সুতরাং বিদ্যালয়-প্রশাসনে পরিচালক সমিতির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। **চতুর্থতঃ,** শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন ও সুসমঞ্জস বিকাশের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বিদ্যালয়ের পরিচালন-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর ভূমিকাকে যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়। তাই লক্ষ্য করা যায়, আধুনিক শিক্ষা-প্রশাসনে শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বহু ক্ষেত্রে স্বীকৃত। **পঞ্চমতঃ,** বিদ্যালয়-প্রশাসনে অভিভাক ও আঞ্চলিক অধিবাসীদের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিদ্যালয় একটি বৃহত্তম সমাজ-জীবনের **প্রতিকৃতি** বা সদৃশ সংস্করণ। তাই বিদ্যালয়ের সঙ্গে আঞ্চলিক সমাজের সম্পর্ক অতি নিবিড। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিধান, আর্থিক অনুদান সংগ্রহ, সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি প্রভৃতি সম্পর্কে অভিভাবক ও আঞ্চলিক জনসমাজ বিদ্যালয়-প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত। **ষষ্ঠতঃ,** রাষ্ট্রীয় শিক্ষাবিভাগ বিদ্যালয় জীবনের ওপর বিভিন্ন উপায়ে প্রভাব বিস্তার করে। সরকারী পরিদর্শকের মাধ্যমে শিক্ষাবিভাগ (Education Department), শিক্ষা পর্ষদ প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে বিদ্যালয়-প্রশাসনের যোগ-সূত্র স্থাপিত হয়। সুতরাং শিক্ষা বিভাগীয় ব্যক্তিবর্গও বিদ্যালয়-প্রশাসনের সঙ্গে অন্বিত মানবিক উপাদান হিসেবে পরিগণিত।

বস্তুগত উপাদান: বিদ্যালয়ের প্রশাসন-ব্যবস্থার বস্তুগত উপাদান বহুবিধ। বিদ্যালয় গৃহ, সাজসরঞ্জাম, আসবাবপত্র, শিক্ষণ-ব্যবস্থাপনা, পাঠক্রম (curriculum), সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী (Co-curricular activities) সংগঠন, শৃঙ্খলা বিধানের ব্যবস্থাপনা, মূল্যায়ন ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই বস্তুগত ও কর্মভিত্তিক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে যেসব উপাদান প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তার মধ্যে সময়-তালিকা (Time table), শৃঙ্খলা বিধান, বিদ্যালয় পরিদর্শন, পাঠক্রমিক কার্যাবলী (Curricular activities) সংগঠন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রধান শিক্ষক (Headmaster):

'বিদ্যালয়' শব্দটি বিচিত্র উপাদানের সমন্বয়ের ওপর একটি সামগ্রীক মনোভাব ব্যক্ত করে। সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে পরিচালক সমিতি, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পাঠ্যবিষয়, অভিভাবক, স্থানীয় পরিবেশ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেখানে বৈচিত্র্য আছে সেখানেই

প্রয়োজন হয় সমন্বয় ও ঐক্য বিধানের প্রচেষ্টা। ঐক্য, সমন্বয় ও পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া বিদ্যালয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য অর্থাৎ শিক্ষার্থীর শিক্ষা সার্থক রূপ গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু কে সেই কর্ণধার? যিনি বিদ্যালয় জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন ক'রে উপাদানগুলিকে সক্রিয়, সুসমঞ্জস ও গতিশীল করে তুলতে পারেন, তিনি হলেন প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষকই হলেন প্রকৃত সমন্বয়-সাধক। তিনি ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, পাঠ্যবিষয়, পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া, পরিচালক সমিতি ও সরকারী শিক্ষা-দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সাংগঠনিক উপাদানের মধ্যে সমতাভিত্তিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করেন। তাঁরই প্রচেষ্টা, সামর্থ্য, দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের যাদুমন্ত্রে সংগঠনের মৌলিক সুরটি (Tone) ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি সমাজ-জীবনে ঐক্যতান সৃষ্টি করে। সুতরাং প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্বের গুরুত্ব সীমাহীন।

প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা

অনেকে প্রধান শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ পদবৈশিষ্ট্যকে জাহাজের ক্যাপটেন, ঘড়ির প্রধান স্প্রিং, গাড়ীর এঞ্জিন ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করেন।[1] বাস্তবতঃ এ উপমা আংশিক সত্য। কারণ, বিদ্যালয় পরিচালিত হয় প্রধান শিক্ষকের নির্দেশে। এখানকার যাবতীয় কাজকর্ম, রীতি-নীতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, লক্ষ্য ও আদর্শ ইত্যাদির জন্য তিনিই দায়ী। কিন্তু বিদ্যালয় আর যানবাহন বা কারখানা পরিচালনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে। যানবাহন পরিচালনার জন্য যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, সামগ্রী উৎপাদন এবং হিসেব-নিকাশের জন্য অফিস পরিচালনা ইত্যাদির সঙ্গে মানুষ তৈরির জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা কখনও এককথা হতে পারে না। শেষোক্ত বিষয়টির ক্ষেত্রে মানসিকতা ও মানবিকতার প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী। নির্দিষ্ট নিয়মে যন্ত্র চালালেই সামগ্রী তৈরি হবে, ক্যাপটেনের নির্দেশ বলে নাবিকের কলা-কৌশলে জাহাজ চলবে কিন্তু প্রধান শিক্ষকের হুকুম অনুসারে শ্রেণী পরিচালনা করলেই শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করতে পারে না। শিক্ষালাভ করা ও জ্ঞানার্জনে সাহায্য

প্রধান শিক্ষকের পদবৈশিষ্ট্য

1. 'What the mainspring is to the watch, the fly-wheel to the machine, or the engines to the steamship, the head master is to the School,"

—P. C. Wren.

করা—এ দুটি ক্ষেত্রেই মানসিক অবস্থাই হল বড় কথা।[1] মানসিক অবস্থার সঙ্গে যন্ত্রের কোন প্রকার তুলনাই চলে না। মানসিক অবস্থার ওপর যেসব মানবিক উপাদান প্রভাব বিস্তার করে সেই সব উপাদানকে সক্রিয় ও সংবেদনশীল ক'রে পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারলেই বিদ্যালয় পরিচালনা সম্ভব। তাই বলা হয় বিদ্যালয় প্রশাসন এক প্রকার কলা (Art)। এই কলা-কৌশল সম্পূর্ণ মানবিক, তাই এটা জটিল ও সমস্যাসূচক। বিদ্যালয় প্রশাসনরূপ কলাকৌশল প্রয়োগের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের। এদিক থেকে প্রধান শিক্ষকের পদটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—একথা অস্বীকার করা যায় না।

প্রধান শিক্ষকের কার্যাবলী (Functions of a Headmaster) **:** বিদ্যালয় জীবনে প্রধান শিক্ষকের অস্তিত্বকে সৌরমণ্ডলের সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা চলে। প্রধান শিক্ষককে কেন্দ্র করেই যেন গ্রহ-উপগ্রহরূপ সংশ্লিষ্ট মানবিক উপাদান স্ব-স্ব কর্মসূচী পালন করেন। বিদ্যালয় সংগঠনের যাবতীয় শক্তির উৎস হলেন প্রধান শিক্ষক। সুতরাং, তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য বহুবিধ। আলোচনার সুবিধার্থে প্রধান শিক্ষকের কার্যাবলীকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(১) শিক্ষণ (Teaching), (২) পরিশাসন (Administration), (৩) তত্ত্বাবধান (Supervision), (৪) সমন্বয় (Co-ordination)।

(১) শিক্ষণ (Teaching) **:** প্রধান শিক্ষক মূলতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পরে তিনি হলেন শিক্ষকদের প্রধান ; তাই তিনি প্রধান শিক্ষক। সুতরাং শিক্ষক হিসেবে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভাল শিক্ষাদানের দক্ষতা যে কোন শিক্ষকের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। প্রধান শিক্ষককে প্রথমেই এই মর্যাদার অধিকারী হতে হবে। তাঁর শিক্ষণ-দক্ষতা বিদ্যালয়ের সামগ্রিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এর দ্বারা প্রধান শিক্ষকের প্রতি সহ-শিক্ষকদের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষণ-কর্ম পরিচালনা সহজতর হয়। তাই প্রশাসন সংক্রান্ত কর্মের মাঝে প্রধান শিক্ষক যতদূর সম্ভব পাঠদানে আত্মনিয়োগ করবেন এটাই বাঞ্ছনীয়। সপ্তাহের প্রায় চল্লিশটি ক্লাশের মধ্যে অন্ততঃ কুড়িটি ক্লাশ প্রধান শিক্ষকের কর্মসূচীর তালিকাভুক্ত হবে। তবে যে সব

1. তুলনীয় : 'The School no doubt Purchases a teacher's time and compels him to stay inside the class in lieu of the salary it pays, but it can neither buy his initiative nor his interest.

Dr. L. Mukherjee—The Art of Teaching Successfully, P. 106.

বিষয় তিনি পড়াবেন সেসব বিষয়ে তিনি যে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হবেন—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রধান শিক্ষকের পড়ানোর বিষয় হবে প্রধানতঃ ইংরেজী এবং আর যে কোন একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় (যেমন ইতিহাস, অর্থনীতি-পৌরবিজ্ঞান ইত্যাদি) হলে ভাল হয়। বিদ্যালয়ের উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীতে প্রধান শিক্ষকের ক্লাশ ধার্য করাই বাঞ্ছনীয়। এর দ্বারা সাধারণ পরীক্ষায় (Public Examination) শিক্ষার্থীদের সাফল্যের দায়িত্ব যেমন তিনি পালন করতে পারেন, তেমনি অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর নিকট সান্নিধ্যে আসতে পারেন। উপরন্তু বিদ্যালয়ের উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন এই তিনটি শ্রেণীর শিক্ষণের সঙ্গে যোগসূত্র থাকাব ফলে সামগ্রিক বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার ওপর তিনি সহজে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারবেন। শিক্ষণের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের এরূপ যোগসূত্র থাকার ফলে যেসব সুবিধা সৃষ্টি হয় তা হল—

(ক) প্রধান শিক্ষক কর্তৃক গৃহীত শ্রেণী-শিক্ষণের রীতি ও পদ্ধতি সহ-শিক্ষকদের নিকট আদর্শ পাঠ (Model lesson) রূপে পরিগণিত হতে পারে।

(খ) সহ-শিক্ষকরা শ্রেণী-শিক্ষণে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হন সেগুলি সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক সহজে অবহিত হতে পারেন ও অসুবিধা দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পাবেন।

(গ) প্রধান শিক্ষকের শিক্ষণ-কর্ম শিক্ষণ ও প্রশাসন-কর্মের ব্যবধান দূরীভূত করতে পাবে।

(ঘ) শিক্ষণের দ্বারা প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীব মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে প্রশাসক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক অপেক্ষা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক অনেক বেশী হৃদ্যতাপূর্ণ।

(২) পরিশাসন বা **প্রশাসন** (Administration): বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও পরিচালনার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের ওপর ন্যস্ত থাকে। এর জন্য তাঁকে যথেষ্ট অভিজ্ঞ, সুচতুর ও উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী হতে হয়। প্রশাসন ও পরিচালনার জন্য প্রধান শিক্ষককে মোটামুটি যেসব কর্মসূচী অনুসরণ করতে হয় সেগুলি হল—

শিক্ষাকর্ম পরিচালনা: দৈনন্দিন শিক্ষাকর্ম পরিচালনার জন্য প্রধান শিক্ষককে সহকর্মী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উপস্থিতির হিসেব রাখা অনুপস্থিত শিক্ষকের স্থানে অন্য কোন শিক্ষক নিয়োগ; সহকর্মীদের মধ্যে কর্মবণ্টন;

শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হিসেব গ্রহণ; শ্রেণীকক্ষ ও সামগ্রিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধন; নতুন নীতি সম্পর্কে শিক্ষকদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ; মূল্যায়ন ব্যবস্থার কর্মসূচী প্রণয়ন ও আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ; বিদ্যালয়ে শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি করা; শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের কাজের তদারকী করা; সহ-শিক্ষামূলক কর্মসূচী সংগঠন ও পরিচালন; সভা-সমিতি, আলোচনা; বিতর্ক সভার অয়োজন ইত্যাদি কর্ম-পরিচালনা করা। এছাড়া সহকর্মীদের শিক্ষণ-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা; বিদ্যালয়ের সামগ্রিক রিপোর্ট তৈরি করা, সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহ, ক্রয়, মেরামত, সংরক্ষণ ও শ্রেণীকক্ষের প্রয়োগে তা ব্যবস্থা করা—ইত্যাদি সম্পাদন করতে হয়।

অফিস-সংক্রান্ত প্রশাসন প্রক্রিয়া : দক্ষ কারণিকের সাহায্যে বিদ্যালয়ের অফিস-সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করা হয়। কিন্তু প্রশাসক হিসেবে প্রধান শিক্ষক অফিসের যাবতীয় কর্মের জন্য দায়ী। অফিসের নথিপত্র বিদ্যালয়-জীবনের আলেখ্য। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যালয়ের নথিপত্র জনসাধারণের নিকট যে কোন মুহূর্তে তুলে ধরা যায়। এক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য প্রধান শিক্ষককে বহুবিধ গুণ ও দক্ষতার অধিকারী হতে হয়। যেমন—(১) অফিসের খাতাপত্র, নানা ধরনের রেকর্ড ও হিসেব-নিকেশ সংরক্ষণে প্রধান শিক্ষক দক্ষ হলে অফিসটি স্বাভাবিকভাবে সাজানো-গোছানো থাকবে। (২) রেকর্ড ও নথিপত্রে যাতে নির্ভুল ও সত্য তথ্যপূর্ণ হয় সেদিকে প্রধান শিক্ষকেই নজর রাখতে হয়। ভুল তথ্যকে সংশোধন করে রাখতে হবে। এর প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর থাকবে। (৩) বিদ্যালয়ের রেকর্ডপত্রে পাতার নম্বর বসানো, স্থায়ী রেকর্ডে কালি দিয়ে লেখা, দিন পঞ্জিকা ও লগ-বই (Log book) ব্যবহার করা ইত্যাদি অফিস-সংক্রান্ত কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। (৪) প্রধান শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল আর্থিক প্রশাসন প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে পালন করা। অর্থসংগ্রহ, ব্যাঙ্ক বা পোষ্ট অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ, ছাত্র-দত্ত বেতন আদায়, শিক্ষকদের বেতন দেওয়া, তাঁদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, গ্রাচুইটি ইত্যাদি হিসেব রাখা, সরকারী অনুদান গ্রহণ, হিসেবপত্র পরীক্ষা (audit) করানো প্রভৃতি কর্মে প্রধান শিক্ষককেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। তাই এসব বিষয়ে তাঁকে যথেষ্ট পারদর্শী হতে হয়। (৫) ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের কোয়ার্টার, বিদ্যালয় গৃহ মেরামত, সম্প্রসারণ, বিদ্যালয়ের সাজসরঞ্জাম, আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত ইত্যাদি নানা

বিষয়ের হিসেব-নিকাশ ও অর্থ-সংক্রান্ত কার্যাবলী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বাধীন। (৬) প্রশাসন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পত্র-বিনিময় সংক্রান্ত দায়িত্ব। সরকারী শিক্ষাবিভাগ, ইনসপেক্টর অফিস, সামাজিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সঙ্গে নানা বিষয়ে পত্র-বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। এর জন্য ক্রমিক নম্বরযুক্ত ফাইল ব্যববার, সেগুলিকে সা জিয়ে রাখার ব্যবস্থাপনা প্রধান শিক্ষকের বিশেষ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

(৩) **তত্ত্বাবধান** (Supervision)ঃ ইংরেজী 'Supervision' শব্দটির মধ্যে দুটি অংশ লক্ষ্য করা যায়। যথা—'Super' এবং 'vision'; তাই কথাটির মৌলিক অর্থ হল ওপর থেকে লক্ষ্য করা। অর্থাৎ কমিটি সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না এটা লক্ষ্য করাই হল তত্ত্বাবধান করা। প্রাসঙ্গিক নীতিগুলি হল—

প্রথমতঃ, শিক্ষণ-প্রসঙ্গে তত্ত্বাবধায়কের কাজ হল শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে সামগ্রিক-ভাবে লক্ষ্য করা এবং প্রক্রিয়ার সঠিকতা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করা। স্বকীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় তত্ত্বাবধায়ক হলেন শ্রেষ্ঠতর গুণী ব্যক্তি। তিনি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী। তাই তিনি তত্ত্বাবধায়ক বা উপদর্শক (overseer)।

দ্বিতীয়তঃ, তত্ত্বাবধায়ক কখনও বিনাশকারী সমালোচক (Destructive critic) হতে পারেন না; তিনি হবেন সহকর্মীদের ত্রুটি নিবারণের (Preventive helper) সহায়ক। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় শিক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য। সেখানে শিক্ষকরাই প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা-কর্মে নিয়োজিত। বহুবিধ গুণ না থাকলে সার্থক শিক্ষক হওয়া যায় না। কিন্তু শিক্ষকরা মানুষ—তাই তাদের ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। নবাগত শিক্ষকদের ভুলের পরিমাণ অনেক বেশী হতে পারে। তাই তত্ত্বাবধায়কের কর্তব্য হল তাদের ভুল ধরা ও ভুল সংশোধনের জন্য সহযোগিতা ও পরামর্শ দান করা। তত্ত্বাবধায়ককে বলা হয় গঠনমূলক সহায়ক (Constructive helper)।

তৃতীয়তঃ, তত্ত্বাবধায়ককে শুধু ত্রুটি নিবারণ বা গঠনমূলক সহায়ক হিসেবে তদারকী প্রক্রিয়া পরিচালনা করলে চলবে না, তাকে হতে হবে সৃজনধর্মী-তত্ত্বাবধায়ক (Creative Supervisor)। যেমন, সহকর্মীদের ভুল ধরা যায় এবং ভুল সংশোধনের জন্য আদেশ বা নির্দেশ দান করা যায়। আদেশ বা নির্দেশ কখনও অন্যের উদ্যোগশীলতা (Initiative) এবং সৃজনশীলতা(Creativity)-কে

সঞ্জীবিত করতে পারে না। আবার ত্রুটি সংশোধনের জন্য সহকর্মীকে নানা ধরনের ইঙ্গিতও (Suggestion) দেওয়া যেতে পারে। সহকর্মী সেই প্রস্তাব অনুসারে নিজের ত্রুটি সংশোধন করে স্বীয় শিক্ষণ যোগ্যতার উন্নতি করতে পারেন। কিন্তু অনুকরণ অথবা আদেশ পালনের মধ্যে সৃজন-ধর্মিতা থাকতে পারে না। শিক্ষকদের মৌলিক কর্মের সঙ্গে সৃজনশীলতা অন্বিত। তাই তত্ত্বাবধায়কের কাজ হল সহকর্মীদের মধ্যে মৌলিক সৃষ্টিধর্মী কর্মে উৎসাহিত করা। এর জন্য সময় তালিকায় নির্ধারিত ও নিয়মাবলীর সীমায় সীমিত কর্ম থেকে শিক্ষককে মুক্তি দিতে হবে। শিক্ষককে মৌলিক চিন্তা ও কর্মের বাস্তবায়নে উৎসাহিত করা এবং অনুকূল সুযোগ সৃষ্টি করাই হল সৃষ্টিমূলক তত্ত্বাবধানের বৈশিষ্ট্য।

অবশেষে বলা যায়, তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া হল অনুপ্রেরণার উৎস। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাকর্মী ও অধস্তন কর্মচারিবৃন্দের কাছে তত্ত্বাবধায়ক হবেন বন্ধু, বিজ্ঞ দার্শনিক ও পরিচালক। সকলেই তাঁর কাছে আসবেন বন্ধু মনোভাব নিয়ে, তাঁর গুণবত্তা ও বিদ্যাবত্তার ওপর আস্থা রেখে সকলেই তাঁর উপদেশ শুনবেন, তাঁর নির্দেশ নির্ভুল, তাই সকলেই তাঁর দ্বারা পরিচালিত হতে চাইবেন। এর ফলে তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া হবে বিদ্যালয় জীবনে সকলের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস—এর মধ্যেই নিহিত আছে তত্ত্বাবধানের তাৎপর্য।

প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধনের দায়িত্ব মূলতঃ সুষ্ঠু প্রশাসন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর সামগ্রিক তত্ত্বাবধান ক্রিয়াকে আমরা মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি, যথা—(১) শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মঙ্গল (Welfare of teacher and taught), (২) শিক্ষা-প্রক্রিয়া তদারক (Supervision of teaching), (৩) মূল্যায়ন কর্মসূচী তত্ত্বাবধান (Supervision of Evaluation work) এবং (৪) বিদ্যালয়ের গৃহ পরিবেশ, নিবন্ধীকরণ ও হিসেব তত্ত্বাবধান (Supervision of school plant, registration work and account)

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মঙ্গল: শ্রেণীকক্ষে, বিদ্যালয় পরিবেশে, এমন কি সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থীর মঙ্গল সম্পর্কে তত্ত্বাবধান করা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব। বিদ্যালয় স্থাপিত হয় শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্যে। এখানে তারা যে বাঁচার কৌশল (Art of living) শিক্ষালাভ করে সেই কৌশল বাস্তবায়িত হয় সমাজের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে। তাই বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীর

বিকাশ কিভাবে হয় সেটা যেমন প্রধান শিক্ষককে তদারক করতে হয় তেমনি সমাজের বাস্তব পরিবেশে সেই লব্ধ শিক্ষাকে তারা বাস্তবায়িত করতে পারছে কিনা সেটাও তাঁর লক্ষ্য করার বিষয়। বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, অসুস্থতায় চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রধান শিক্ষকের পক্ষ থেকে লক্ষ্য করার বিষয়। এছাড়া হোস্টেল-পরিবেশে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসম্মত বসবাসের ও পড়াশুনার ব্যবস্থা, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে তদারক করার জন্য হোস্টেল পরিচালককে (Superintendent) যথাযথ পরামর্শ দেওয়াও প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য।

শিক্ষক-সহকর্মীদের কোয়ার্টার সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা, গৃহ পরিবেশের অভাব-অভিযোগ, পারিবারিক শুভ-অশুভ ইত্যাদি বিষয়ে প্রধান শিক্ষককেই খোঁজ-খবর নিয়ে তাঁদের সুযোগ-সুবিধার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করতে হয়। সহ-কর্মীদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অভিযোগ—ইত্যাদির সঙ্গে একাত্ম হওয়া প্রধান শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য কর্ম।

শিক্ষণ-প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান: বিদ্যালয়ের বিচিত্র কর্মের কেন্দ্রীয় বিষয় হয় শিক্ষণ-প্রক্রিয়া। শিক্ষকরা শেখান আর শিক্ষার্থীরা শেখে অথবা শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভে শিক্ষক সাহায্য করেন—এটাই মূলতঃ শিক্ষণ-প্রক্রিয়া। শিক্ষণের জন্যই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তাই কিভাবে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে এ বিষয়ের ওপর প্রধান শিক্ষককে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। শ্রেণীকক্ষে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক পাঠদানের সময় শিক্ষক কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হন, কি কি বিষয়ে অসুবিধা অনুভব করেন, শিক্ষক সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ ও উপকরণ ব্যবহার করেছেন কি না ইত্যাদি বিষয় তদারক করা প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য। শুধু তদারক করলেই চলবে না, শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অসুবিধা দূরীভূত করে সুযোগ-সৃষ্টির জন্য প্রধান শিক্ষককেই অগ্রসর হতে হবে। তিনিই সহকর্মীকে পরামর্শ দেবেন, শ্রেণীতে পাঠদান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন, উপকরণ ব্যবহারে প্রগতিশীল পন্থার নির্দেশ দেবেন। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিকট 'শিক্ষক' এবং সহকর্মীদের নিকট অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য 'প্রধান' মাত্র। তাই সহ-কর্মীকে আদেশ বা উপদেশ দেওয়ার পরিবর্তে সাজেস্‌শান দিতে পারেন। অবশ্য এরূপ সাজেস্‌শান শিক্ষার্থীদের সামনে না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। অফিসে

সহকর্মীকে ডেকে তিনি ত্রুটিপূর্ণ বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন। মনে রাখা উচিত, প্রধান শিক্ষকের পক্ষ থেকে সহকর্মীকে সাজেসশান দেওয়া তখনই সার্থক হবে যখন সহকর্মী অফিস কক্ষ থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে কর্তব্য পালনে তৎপর হবেন। শিক্ষকদের প্রতি আচরণে প্রধান শিক্ষক হবেন বন্ধুভাবাপন্ন ও সহানুভূতিশীল সহকর্মী এবং মনে করবেন তাঁরা সকলেই সমমর্যাদাসম্পন্ন—একই পরিবারের পরিজন।

প্রধান শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান দায়িত্ব শুধু শ্রেণীকক্ষে ও অফিসে সীমিত রাখলে চলে না। বর্তমান বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে শিক্ষণীয়-বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তত্ত্বগত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এটা শুধু বিজ্ঞান, কারিগরী, ক্রাফ্ট-এর ক্ষেত্রে নয় মানবিক বিষয়ের ক্ষেত্রেও ব্যবহারিক বিষয় প্রবর্তন করা হচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্র এখন চার দেওয়ালের সীমায় আবদ্ধ নয়। পরীক্ষাগার, পাঠাগার, কর্মশালা, কলাকক্ষ, শিল্পকক্ষ, ব্যায়ামাগার, খেলার মাঠ, কৃষিক্ষেত্র (কৃষিবিদ্যালয়ের জন্য) প্রভৃতি বিভিন্ন কক্ষে বা স্থানে বিচিত্র ধারায় শিক্ষাকর্ম বিদ্যমান। প্রধান শিক্ষক স্বীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিক্ষাধারা (Streams) তদারক করবেন ও শিক্ষাকর্মে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন—এটাই সর্বজনকাম্য।

(গ) মূল্যায়ন কর্মসূচী তত্ত্বাবধান : শিক্ষণ আর মূল্যায়ন ব্যবস্থার সম্পর্ক অতি নিবিড। মূল্যায়ন ছাড়া শিক্ষণের প্রগতি অনুধাবন করা যায় না। তাই শিক্ষণ-ব্যবস্থা তদারক করার সঙ্গে সঙ্গে **মূল্যায়ন ব্যবস্থাও তত্ত্বাবধান** করা প্রধান শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য। **এর জন্য প্রথমতঃ** প্রধান শিক্ষক নিজে যেমন শিক্ষার্থীদের গৃহে পাঠচর্চার খাতা (Home task), শ্রেণীর কাজ (Class assignment) ইত্যাদি সময়মত পরীক্ষা করবেন তেমনি সহকর্মীরা শিক্ষার্থীদের খাতাপত্র পরীক্ষা করে দিচ্ছেন কি না—তাও লক্ষ্য রাখবেন।

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক শিক্ষায় শুধু প্রান্তিক (terminal) বা বার্ষিক (annual) পরীক্ষার পরিবর্তে সারা বৎসরব্যাপী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। তাই লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মান, পরীক্ষা কক্ষের তত্ত্বাবধান, ফলাফলের পুস্তকে প্রতিটি শিক্ষার্থীর নম্বর-সংরক্ষণ—ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তদারক করা প্রধান শিক্ষকের অপরিহার্য কর্ম।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীদের প্রগতি পত্র (Progress report), সর্বাত্মক পরিচয় লিপি (Cumulative record card), বিশেষ বিশেষ পাঠোন্নতিসূচক লেখচিত্র (graph) প্রভৃতি যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধান কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

(ঘ) বিদ্যালয়গৃহ-পরিবেশ, নিবন্ধীকরণ ও হিসাব তত্ত্বাবধান:
প্রথমতঃ, বিদ্যালয়গৃহ-পরিবেশ শিক্ষা-পরিবেশের দেহ-কাঠামো স্বরূপ। দেহটিকে স্বাস্থ্যসম্মত করে তুলতে পারলে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির পরিচালনাকে সহজতর করা সম্ভব। তাই বিদ্যালয় গৃহ-পরিবেশের সম্প্রসারণ, ক্ষয়-ক্ষতির মেরামত, প্রয়োজনীয় কক্ষ সংগঠন ও সাজসজ্জা ইত্যাদি বিষয় তদারক করা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব। দৈনন্দিন শিক্ষাকর্ম পরিচালনা এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাকর্মীদেব প্রযোজনীয় সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে এ পরিবেশটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত করে তোলার ব্যবস্থা করা প্রধান শিক্ষকেব কর্তব্য। তাই পরিবেশ তত্ত্বাবধান করা তাঁর দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয় অফিসটি হল বিদ্যালয় জীবনের হৃদপিণ্ড স্বরূপ। এই অফিস পরিচালনার জন্য করণিকের কর্মের তদারক কবা, নিজে কাজ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক করণিকের অভাবে দক্ষ শিক্ষকের ওপব অফিসের আংশিক দায়িত্ব-অর্পণ করা, দৈনন্দিন আর্থিক হিসাব পরীক্ষা (check) করা প্রধান শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মের দায়িত্ব শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মীর ওপর যেমন ভাবেই অর্পণ করা হোক না কেন কর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতিব জন্মে প্রধান শিক্ষকই দায়ী হবেন। সুতরাং শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক, করণিক, ডেমনষ্ট্রেটর, দরওয়ান, ঝাড়ুদার ইত্যাদি সকলের কর্মের যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও তদারক করা প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য।

(৪) সংযোগ ও সমন্বয় (Contact and Co-ordination) **:** শিক্ষার্থীব সমাজভিত্তিক সর্বাঙ্গীন বিকাশকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়-জীবনে প্রবাহিত হয বিচিত্র কর্মস্রোত। এই কর্মস্রোতে মুখ্যতঃ দুটি উপাদান ক্রিয়াশীল—যথা, মানবিক উপাদান এবং বস্তুভিত্তিক উপাদান। প্রথমটি ভিন্ন দ্বিতীয়টি নির্জীব ও অচল। তাই প্রথমটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত হওয়া ও যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

মানবিক উপাদান প্রধানতঃ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারী, পরিচালক সমিতির সভ্যবৃন্দ, অভিভাবক, আঞ্চলিক অধিবাসী ও শিক্ষাদপ্তরের কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে সীমিত। মানবিক উপাদানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল বৈষম্য ও মতবিরোধ। উপরোক্ত প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর যেমন গোষ্ঠীগত মত ও আদর্শ আছে, তেমনি আবার গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত মত ও আদর্শ আছে। আবার বর্তমানে রাজনীতির প্রভাব বিদ্যালয়ের মানবিক উপাদানের মধ্যে অনেক বেশী বৈষম্য ও স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছে। ফলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, পরিচালক সমিতির সভ্যবৃন্দের মধ্যে আদর্শ ও মতবিরোধ চরম অবস্থায় পরিণত হতে চলেছে। আদর্শগত দ্বন্দ্ব প্রকট হলে মানবিক স্তর পেরিয়ে অমানুষিক স্তরে পৌছাতে পারে। তাই বিদ্যালয়ের কর্ণধার হিসেবে প্রধান শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য হল মানবিক উপাদানের বিচিত্র ধারার সঙ্গে সংযোগ ও সমন্বয় স্থাপন করা। এক্ষণে সংযোগ স্থাপনের বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করব :

(ক) **সহশিক্ষকদের সঙ্গে সংযোগ** : প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য হল সহ-শিক্ষকদের শিক্ষাগত সামর্থ্য, বৃত্তিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত হওয়া এবং প্রত্যেকের সামর্থ্য ও দক্ষতা অনুসারে কর্ম বণ্টন করা। সহকর্মীদের মধ্যে খেয়ালী, আবেগ প্রবণ, সূক্ষ্ম সংবেদনশীল, কল্পনাপ্রবণ, উৎসাহী, যুবা, বৃদ্ধ, শিক্ষণ-প্রাপ্ত নন এমন বিচিত্র ধরনের ব্যক্তি থাকেন। এরূপ ব্যক্তি-বৈষম্যেব মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রধান শিক্ষক শিক্ষামূলক, সহশিক্ষামূলক ও পরিশাসন সম্পর্কিত কর্মে সহশিক্ষকদের গুণাবলীর সুষ্ঠু প্রয়োগ করেন।

শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে

দায়িত্ব ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা গণতান্ত্রিক প্রশাসনের মূল নীতি। প্রধান শিক্ষক তাঁর দায়িত্বকে সহকর্মীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারেন। বিদ্যালয়ে ক্রীড়া বিভাগ, আলোচনা ও বিতর্ক বিভাগ, সাহিত্য ও পত্রিকা বিভাগ, প্রদর্শনী বিভাগ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ বিভাগ ইত্যাদি থাকে। সকল বিভাগের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের ওপর ন্যস্ত। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে তিনি নিজে প্রতিটি বিভাগের শীর্ষে অবস্থান না করে প্রবীন শিক্ষকদের ওপর এক একটা বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করে দেবেন ; আবার পরিদর্শন সংক্রান্ত দায়িত্ব সহকর্মীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়াও যুক্তিযুক্ত।

দায়িত্ব ও ক্ষমতার বণ্টন

যেমন—পরীক্ষা তত্ত্বাবধান, পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, প্রার্থনা সভা পরিচালনা, হোস্টেল তদারক, খেলাধূলার ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপারে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য শিক্ষকদের ওপর ক্ষমতা প্রদান করা নীতিগতভাবে ভাল কাজ।

বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ, শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রযোগ প্রভৃতি বিষয়ে নতুন কিছু করার সময় সহকর্মীদের পরামর্শ গ্রহণ করা প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য। নিয়োগপত্র প্রদানের পর প্রত্যেক শিক্ষকের সামাজিক ও শিক্ষা সম্পর্কিত পটভূমি এবং তার ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রত্যেক প্রধান শিক্ষকের প্রাথমিক কাজ। শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সমস্যা, শিক্ষণ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ, প্রধান শিক্ষক সহ প্রত্যেকের কর্মের গঠনমূলক সমালোচনা, সার্থক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার স্বীকৃতি প্রদান —ইত্যাদি বিষয় ষ্টাফ মিটিং-এ আলোচনা করে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে বাঞ্ছনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। প্রধান শিক্ষকেব সঙ্গে সহকর্মীদের যোগসূত্র রক্ষাব প্রয়োজনে এবং শিক্ষকদের কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মাসে অন্ততঃ একটি কবে ষ্টাফ মিটিং ডাকা বাঞ্ছনীয়। ষ্টাফ মিটিং-এর দ্বারা যে সুফল লাভ করা যায় তা হল—

ষ্টাফ মিটিং

(i) নতুন শিক্ষককে তার কর্মে সাহায্য করা যায়।

(ii) শিক্ষকদের সাধারণ সমস্যার সমাধান করা যায়।

(iii) সরকাবের নির্দেশনামা অথবা পরিচালক সমিতির সিদ্ধান্তগুলিকে আলোচনার দ্বারা সুস্পষ্ট করে সকলকে সে সম্বন্ধে অবগত কবানো যায়।

(iv) মিটিং-এ আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষকদের শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা বৃদ্ধির উপায় যেমন নির্ধারণ করা যায় তেমনি নব নব শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের উপায় নির্ধারণ করাও সম্ভব হয়।

(v) বিদ্যালয়ের সময়-তালিকা সংগঠন, নতুন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ, মূল্যায়নের কর্মসূচী নির্ধারণ, অতিরিক্ত কর্মভিত্তিক পাঠ্যসূচী নির্ধারণ—ইত্যাদি বিষয় ষ্টাফ মিটিং-এর মাধ্যমে করাই যুক্তিযুক্ত।

(vi) শিক্ষকদের সামাজিক জীবনধারার উন্নয়ন, শিক্ষকদের সঙ্গে অভিভাবকদের সম্পর্ক ও তার উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করা যায়।

(খ) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংযোগ ঃ প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্মেব সাফল্যের প্রধান সূত্র হল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র। যদি কোন প্রধান শিক্ষক ভাবেন যে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মেলামেশা করা তাঁর সম্মানের পরিপন্থী

তাহলে তিনি ভুল করবেন। কারণ বিদ্যালয়ের মানবিক উপাদান থেকে নিজেকে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখার মধ্যে সম্মান বা মর্যাদার কোন স্থান নেই। প্রকৃত সম্মান বা আত্মমর্যাদা স্বকীয় কর্মধারার মাধ্যমে জনগণের দ্বারাই সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীব জন্য বিদ্যালয়, শিক্ষার্থীদের জন্যই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। সুতরাং শিক্ষার্থীব সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের যোগসূত্র যত ঘনিষ্ঠ হবে ততই তিনি তাঁর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বচনাব উপায় হল—(i) শ্রেণীকক্ষে যত বেশী সম্ভব ক্লাশ নেওযা, (ii) শিক্ষার্থীদের সভা, সমিতি ও অনুষ্ঠানে সক্রিয় সহযোগিতা কবা, (iii) শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধা, সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ ইত্যাদিব খোঁজ-খবর সংগ্রহ করা, (vi) শিক্ষার্থীকে তাঁব নিকট আসা-যাওযার সুযোগ দেওযা, (v) তাদের নানা সমস্যা সমাধানের আন্তরিক চেষ্টা করা—ইত্যাদি। প্রধান শিক্ষক যত বেশী তাঁর কক্ষ পবিত্যাগ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিশতে পারবেন এবং নিজে তাদের প্রতিটি কর্ম পরিচালনা কবতে পারবেন ততই প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন তিনি অনাযাসে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী ও অশিক্ষক কর্মচারীদের আদর্শগত মতবিরোধ, আকস্মিক সংঘর্ষ, বিবাদ-বিসংবাদ ইত্যাদি মীমাংসা কবতে সক্ষম হবেন।

(গ) অভিভাবক ও আঞ্চলিক জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ: বিদ্যালয় হল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আঞ্চলিক সমাজ থেকে আগত শিক্ষার্থীদের সমাজের উপযোগী শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বিদ্যালয় হল সমাজের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। সমাজ থেকে দূরে শিক্ষার্থীদের রেখে সামাজিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সমাজ পরিবেশ এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করা প্রধান শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য। বিভিন্ন উপায়ে প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয় ও সমাজ পরিবেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। সেগুলি হল—

প্রথমতঃ, প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে বছরে একাধিক শিক্ষক-অভিভাবক দিবস পালন করতে পারেন। এরূপ অনুষ্ঠানে শিক্ষক ও অভিভাবক একত্রে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর উন্নতি-অবনতি, পাঠে অগ্রসরতা-অনগ্রসরতা, শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে শিক্ষাক্ষেত্রে

উন্নতি বিধানের জন্য নতুন পথের সন্ধান করতে পারেন। এর মাধ্যমে শিক্ষক ও অভিভাবকের পারস্পরিক মতবিনিময় দ্বারা যে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব বা আদর্শগত সংঘাতের অবসান ঘটানো সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত যে কোন অনুষ্ঠান, উৎসব বা অনুরূপ ক্ষেত্রে অভিভাবকসহ আঞ্চলিক জনসাধারণকে নিমন্ত্রণ করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণ, সাহিত্য সভা, পূজা-পার্বণ, মনীষীদের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষ দিবস পালন ইত্যাদি প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় আঞ্চলিক জনসাধারণকে নিমন্ত্রণ করা যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ, বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সমস্যার জন্য অভিভাবকের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সমস্যার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক যদি সর্বদা অভিভাবককে আমন্ত্রণ করেন তাহলে সহজে বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

চতুর্থতঃ, আধুনিক শিক্ষা-পুনর্গঠনে বিদ্যালয়কে সমাজ উন্নয়নের কেন্দ্র (Centre of community development) হিসেবে পরিগণিত করা হয়। আঞ্চলিক জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য যদি বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের একাংশ উন্মুক্ত রাখা যায় অথবা দীর্ঘ অবকাশে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে স্থানীয় জনসাধারণ ও বিদ্যালয় কর্মীদের মধ্যে সহজে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হবে। আজকাল কর্মশিক্ষা ও সমাজসেবার সূচী অনুসারে কোন কোন বিদ্যালয় নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এরূপ প্রচেষ্টাও ঈপ্সিত কর্মের এবং বিদ্যালয় ও আঞ্চলিক জনসাধারণের মধ্যে যোগসূত্র রচনার বিশেষ অনুকূল ব্যবস্থা—তাতে সন্দেহ নেই।

(ঘ) পরিচালক সমিতির সঙ্গে যোগসূত্র ঃ এদেশে বিদ্যালয় প্রশাসনে পরিচালক সমিতি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। পরিচালক সমিতিতে সাধারণতঃ অভিভাবকদের প্রতিনিধি, শিক্ষকদের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ্, সরকারী প্রতিনিধি ইত্যাদি নানা স্তরের ব্যক্তি থাকেন। সমিতিতে প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে স্থায়ী সভ্য। তিনি সমিতির বিভিন্ন নির্দেশকে কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করেন। বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিকে নিয়ে পরিচালক সমিতি গঠিত হয়। তাই সমিতির সভ্যদের ব্যক্তিগত, দলগত আদর্শ ও মতবিরোধ বিদ্যালয় পরিচালন কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এরূপ বিরোধ প্রকট হলে বিদ্যালয় জীবনে

নানা সংঘাত উপস্থিত হয়। কারণ বিরোধের প্রভাব শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, প্রতিবেশী সকলের ওপর প্রতিফলিত হয়। তাই পরিচালক সমিতির সঙ্গে বিভিন্ন মানবিক উপাদানের যোগসূত্র রচনা করা ও পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রধান শিক্ষকের অপরিহার্য কর্তব্য। এর জন্যে নিম্নরূপ উপায়গুলি অবলম্বন করা যেতে পারে:

(i) প্রধান শিক্ষককে সর্বদা নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

(ii) সমিতির নির্বাচনের সময় যাতে বিদ্যালয়ের উন্নয়নকল্পে যোগ্যতম ব্যক্তি নির্বাচিত হন সেদিকে সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(iii) আধুনিক রাজনীতিগত বৈষম্য যাতে বিদ্যালয় জীবনকে কলুষিত করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

(iv) পরিচালক সমিতির সভ্যদের যতদূর সম্ভব বিদ্যালয়ের উন্নয়নকল্পে সক্রিয় হওয়ার জন্য কর্ম সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এর জন্যে নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে তার বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

(v) বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাতে স্ব-স্ব কর্তব্য পালনে তৎপর হন এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ও ব্যক্তিত্বে যাতে বাহ্যিক সমালোচনার উর্ধ্বে থাকতে পারেন তার জন্যে উৎসাহিত করতে হবে।

(vi) পরিচালকমণ্ডলীর সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়গুলি যথাসময়ে সরকারী শিক্ষাবিভাগ এবং শিক্ষাপর্ষদের কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

(vii) অবশেষে বলা যায়, প্রধান শিক্ষকের উপস্থিত বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, সাধারণ জ্ঞান, সত্বর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি গুণাবলী যে কোন প্রকার বিরোধ যেমন মীমাংসা করতে পারে, তেমনি বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় ও সংহতি সাধন করতে পারে।

(ঙ) সরকারী দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ : ভারতের শিক্ষা-পরিশাসন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ সরকারাধীন করা যেমন হয়নি ; তেমনি বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থাও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তাই সরকারী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বিদ্যালয়গুলির ওপর বলবৎ করা হয়। গৃহনির্মাণ, গৃহ-সম্প্রসারণ, পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ ও অনুমোদন, শিক্ষকদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও চাকরির শর্ত নির্ধারণ ইত্যাদি বিদ্যালয়সংক্রান্ত অনেক কিছুই সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই প্রধান শিক্ষককে সরকারের শিক্ষা দপ্তর (Education Department), শিক্ষা অধিকার (Education

Directorate), মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (Board of Secondary Education), স্কুল বোর্ড (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে), পরিদর্শকের অফিস (Inspector, Inspectress Office) ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। এসব দায়িত্ব তিনি দক্ষ শিক্ষকের ওপর অংশতঃ অর্পণ করতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ব্যবস্থায় অধিক মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

(চ) **অন্যান্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ** : শিক্ষার সম্প্রসারণের ফলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এক-একটা অঞ্চলে জনবসতির ওপর ভিত্তি করে একাধিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। একটা বিশেষ বিদ্যালয়ের মানবিক উপাদানের মধ্যে যেমন বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় তেমনি ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক বিদ্যালয়ের মধ্যে আদর্শগত মতবিরোধ থাকতে পারে। তাই বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রধান শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য। আবার সামগ্রীক ও সমাজভিত্তিক শিক্ষা-প্রক্রিয়া সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন (isolated) হয়ে বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে সম্ভব হতে পারে না। এর জন্যে পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা কর্তব্য। আঞ্চলিক যে-কোন প্রধান শিক্ষক এই দায়িত্ব ভার নানা উপায়ে সম্পন্ন করতে পারেন। **প্রথমতঃ** (ক) বিদ্যালয়ের কোন উৎসব অনুষ্ঠানে পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়কে আমন্ত্রণ করা, (খ) পরস্পরের মধ্যে ক্রীড়ামূলক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা, (গ) আঞ্চলিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক সমিতি, ছাত্র সমিতি এবং কর্মচারী সমিতির সহিত যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক পার্শ্ববর্তী অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করতে পারেন। এরূপ যোগাযোগের দ্বারা ঐসব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা আঞ্চলিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারেন। **দ্বিতীয়তঃ**, কোন প্রকার অন্যায় দেখা গেলে তার বিরুদ্ধে সকলেই একত্রে প্রতিবাদ জানাতে ও প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারেন। **তৃতীয়তঃ**, শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষার্থীকে দোষমুক্তির অনুকূল শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করতে পারেন। অবশেষে বলা যায়, বিদ্যালয়গুলির-মধ্যে যোগাযোগ থাকলে একের বিপদে অন্যের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করা সম্ভব হয়।

আদর্শ প্রধান শিক্ষকের গুণাবলী (Qualifications of an Ideal Headmaster) :

প্রধান শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব ও কর্তব্যের বিচারে তিনি হবেন বহুবিধ বাঞ্ছিত গুণের অধিকারী। কি কি গুণ প্রধান শিক্ষকের জন্য অপরিহার্য—সে সম্পর্কে মন্তব্য করার পূর্বে ভেবে দেখা দরকার যে প্রধান শিক্ষকের মৌলিক ভূমিকা কি। প্রধান শিক্ষক প্রধানতঃ শিক্ষক; পরে তিনি শিক্ষকদের মধ্যে প্রধান—তাই তিনি প্রধান শিক্ষক। তাহলে প্রধান শিক্ষকের মূলতঃ **দুটি ভূমিকা** বিদ্যমান, যথা—(১) **শিক্ষক হিসেবে তাঁর ভূমিকা** এবং (২) **বিদ্যালয় প্রধান হিসেবে সংগঠক, পরিচালক ও প্রশাসকের ভূমিকা।** শেষোক্ত বিষয়টিকে **এককথায় নেতৃত্ব প্রদানের ভূমিকা-রূপে** অভিহিত করা যায়। প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয় ও আঞ্চলিক সমাজ-জীবনের নেতা। তাঁকে সমাজের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে হয়। বিদ্যালয় পরিচালনা বলতে শিক্ষণ, প্রশাসন, তত্ত্বাবধান, সমন্বয় প্রভৃতি সবকিছুর পরিচালনা বোঝায়।

শিক্ষক হিসেবে প্রধান শিক্ষকের কতকগুলি অপরিহার্য গুণ থাকা প্রয়োজন।* সে গুণগুলি মূলতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত, যথা—(i) শিক্ষাগত গুণ (Academic qualification), (ii) বৃত্তিগতগুণ (Professional qualification) এবং (iii) চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব (Character and personality)।

(i) শিক্ষাগত গুণ বা যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়গুলি অন্ততঃ যে কোন একটিতে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে হবে। **দ্বিতীয়তঃ,** তাঁর সাধারণ শিক্ষার ভিত্তি (background of liberal education) হবে সুদৃঢ়। **তৃতীয়তঃ,** সাম্প্রতিক সমস্যার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় থাকবে। **চতুর্থতঃ,** একাধারে তাঁকে যেমন পত্র-পত্রিকা পাঠক হতে হবে, তেমনি তিনি যে বিষয়গুলি পড়ান সেগুলি সম্পর্কে তাঁকে আধুনিকতম জ্ঞানের (up-to-date knowledge) অধিকারী হতে হবে।

উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত সহ শিক্ষকদের তুলনায় প্রধান শিক্ষকের বিদ্যাবত্তা (scholarship) হবে অনেক বেশী গভীর ও সুবিস্তৃত। তবেই তিনি প্রতিনিধিত্ব-মূলক (representative) প্রশাসনে দক্ষ শিক্ষকদের শ্রদ্ধাভাজন হবেন ও তাঁর অভিভাবন ও নির্দেশ সহকর্মীদের মধ্যে আনুগত্যের মনোভাব সৃষ্টি করবে।

* পরবর্তী অনুচ্ছেদে আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী দ্রষ্টব্য।

(ii) পেশাগত যোগ্যতাপর্যায়ে **প্রধান শিক্ষককে নানা গুণের অধিকারী হতে হবে।** তাঁর পেশাগত প্রবণতা, পেশাগত শিক্ষণের গভীরতা, শিক্ষাবিষয়ক আধুনিক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা পাঠের প্রবণতা এবং যোগ্যতা উন্নয়নের প্রয়াস হবে সহকর্মীদের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত ও আদর্শস্থানীয়। কারণ তিনি যে শুধু সহকর্মীদের শিক্ষণ কর্মের তদারক করবেন তা নয়, প্রয়োজন হলে তাকে আধুনিক প্রগতিশীল পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে তাঁদের শিক্ষণ যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

(iii) চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের **প্রথম উপাদান হল** দেহগত বৈশিষ্ট্য (physical aspects)। প্রধান শিক্ষকের স্বাস্থ্য ; দৈহিক সৌষ্ঠব, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি হবে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উর্ধে। এছাড়া পোশাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা ও জীবনের সুখ-সুবিধা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁকে সদা সচেতন হতে হবে। কারণ এগুলি হল চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের উপরিতলগত বৈশিষ্ট্য।

চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের **দ্বিতীয় উপাদান হল** তাঁর নিষ্ক্রিয় গুণাবলী (Passive Virtues)। তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব (friendly attitude), সহানুভূতি ও পারস্পরিক বুঝাপড়া (sympathy and understanding) ; আন্তরিকতা, কৌশল, সততা, আত্মসংযম ও আত্ম-বিশ্লেষণের মনোভাব, আশাবাদিতা, উদ্যম, ধৈর্য প্রভৃতি গুণাবলী হবে বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টান্ত স্থল।

চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের **তৃতীয় উপাদান হল** প্রধান শিক্ষকের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা (executive abilities)। এটা হল তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিতান্ত অপরিহার্য উপাদান। প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয় ও আঞ্চলিক সমাজ-জীবনের মধ্যমণি। বিচিত্র সমস্যার মধ্যে তাঁকে শিক্ষণ, প্রশাসন, পরিদর্শন সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করতে হয়। সুতরাং কার্যনির্বাহী ক্ষমতা ব্যতীত তিনি এসব কর্মে সফলকাম হতে পারেন না। আবার কার্যনির্বাহী ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা (Self-confidence and self-reliance), শ্রমশীলতা (Industry), উদ্যমশীলতা (Initiative), পরিচালন, সংগঠন ও প্রশাসনিক দক্ষতা (directive, organising, and administrative ability), মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ও উপায়াদি উদ্ভাবনে তৎপরতা (Adapt-ability and resourcefulness) ইত্যাদি প্রধান শিক্ষকের অপরিহার্য গুণ। সার্থক ও সফল কার্য নির্বাহের জন্য অপরিহার্য **আরও কয়েককটি ব্যবহারিক গুণ হল :**

প্রতিভূসুলভ মনোভাব : বিদ্যালয়ের সংগঠন ও পরিচালনার জন্য প্রধান শিক্ষককে হতে হবে গণতান্ত্রিক বিদ্যালয় পরিশাসনের নেতা। গণতান্ত্রিক প্রশাসনের মূল নীতি হল প্রশাসকের কর্তৃত্বকে যতদূর সম্ভব পরোক্ষভাবে রাখা। বিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব তাঁর হাতে, তিনিই বিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা—এই ভাব যদি প্রশাসকের মনে উদিত হয় তাহলে প্রধান শিক্ষক প্রভুত্বব্যঞ্জক ক্ষমতার গর্বে স্বশাসনেব মূল নীতি থেকে বিচ্যুত হবেন। প্রধান শিক্ষককে মনে করতে হবে তিনি অন্য সকলের পক্ষ থেকে বিদ্যালয় পরিচালনার অতিরিক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছেন। তিনি বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বর্গের প্রতিনিধি। প্রতিভূ সুলভ মনোভাব ও ব্যবহারের দ্বারা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মচারী সকলের মন জয় করা সম্ভব। এর দ্বারা সকলকেই স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনে আগ্রহী ও উদ্যমশীল করে তোলা যায়।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী : যে কোন প্রশাসন-ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী প্রশাসকেব অপরিহার্য গুণ। প্রশাসকের যত গুণই থাকুক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব থাকলে যে কোন প্রশাসক স্বীয় দাযিত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হবেন—এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তাই বিদ্যালয় সংগঠক, পরিচালক ও প্রশাসক হিসেবে প্রধান শিক্ষক নিশ্চয়ই পক্ষপাতশূন্য হবেন একথা বলাই বাহুল্য।

গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী : গণতান্ত্রিক ভারতের নাগরিকরা হবে গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন। 'গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষা' (Education for democracy) ব্যবস্থার প্রধান শিক্ষক এমন ভাবধারা প্রবর্তন করেন যেন 'শিক্ষায় গণতন্ত্র' (democracy in education) প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই প্রধান শিক্ষকেব গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হতে হবে।*

বাগ্মিতা : বাগ্মিতা প্রধান শিক্ষকের অপরিহার্য গুণ। তিনি কেবল শিক্ষকদের প্রধান নন, বিদ্যালয় ও আঞ্চলিক সমাজেরও প্রধান। তিনি সামাজিক ভাবধারা বিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয়ের ভাবধারা সমাজে উপস্থাপন করে শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করবেন। তাই তাঁকে বিদ্যালয় ও সমাজের নানা সমস্যা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট উপস্থাপিত করতে হয়। সুতরাং বক্তব্য রাখার জন্য প্রকাশভঙ্গী হবে সুস্পষ্ট, যুক্তিপূর্ণ ও মনোগ্রাহী। এর জন্য প্রধান শিক্ষককে বাগ্মী হতে হবে।

* পূর্বাংশে গণতান্ত্রিক নীতি দ্রষ্টব্য।

স্ব-আচরণের মাধ্যমে শেখাবার প্রবণতা ঃ প্রধান শিক্ষক শিক্ষকোচিত আচরণের দ্বারা সহকর্মী, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ, সময়ানুবর্তিতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মসংযম, সংবেদনশীলতা, জ্ঞানার্জনকরা ও জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা—ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবহারিক গুণ ও দক্ষতা প্রকাশে সাহায্য করবেন। মনে রাখা উচিত, আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ ইত্যাদির দ্বারা কোন কর্ম সম্পাদিত হয় না। 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখানর' দ্বারা স্বাভাবিক শিক্ষাদান করা ও পরকে নিজের অনুবর্তী করা সম্ভব হয়। এরূপ আচরণই সুপরিচালকের পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য গুণ।

৪। শিক্ষক (Teacher) ঃ

শিক্ষকতায় উদ্দেশ্য (The motive for teaching profession) ঃ চিকিৎসা, কারিগরী, ইঞ্জিনীয়ারীং, কৃষি ইত্যাদির ন্যায় শিক্ষকতা একটি পেশা। যে কোন পেশা অবলম্বনের সময় মানুষ সাধারণতঃ দুটো দিক থেকে অনুপ্রাণিত হয়—(ক) **একটি অর্থ নৈতিক প্রবণতা,** (খ) **অন্যটি ভাবপ্রবণতার দিক। প্রথমটির মাধ্যমে** তিনি চান অর্থ ও সম্পদ—যার দ্বারা সাংসারিক জীবনে একদিকে যেমন সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করা যায়, অন্যদিকে তেমনি তার সদ্ব্যবহারের দ্বারা জীবনে সম্মান, গৌরব ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করা যায়। **দ্বিতীয়টির দ্বারা** তিনি চান সেবা ও আত্মনিয়োগ। যাঁরা দ্বিতীয়টির দ্বারা অনুপ্রাণিত হন তাঁরা পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধির দিকে অধিক মনোযোগী নন। ফলে, উৎসর্গীকৃত জীবন যাপনে তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

শিক্ষকতার ক্ষেত্রে অর্থলাভের আশা দুরাশা মাত্র। শিক্ষাজীবন উৎসর্গীকৃত —কর্মে সফলতাই এ ক্ষেত্রে একমাত্র বড় কথা। ব্যবহারিক জগতে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি এই বিমূর্ত ভাবপ্রবণতা পোষণ করেন। তাই শিক্ষকতায় যাঁরা আসেন তাঁদের অধিকাংশই এটাকে ভবিষ্যৎ জীবনে আর্থিক লাভজনক অন্য কোন উন্নততর কার্যসংগ্রহের একটা ধাপ (Stepping ground) বলে মনে করেন। সুযোগ পেলেই তাঁরা পেশান্তরে চলে যান। অবশ্য আধুনিক বেকার সমস্যার যুগে অনেকের ভাগ্যে সে সুযোগ আসে না। ফলে তাঁরা শেষ পর্যন্ত শিক্ষকতায় জীবন অতিবাহিত করেন। আবার একদল শিক্ষক থাকেন যাঁরা উৎসর্গীকৃত প্রাণ ও অর্থলাভ—কোনটিই পছন্দ করেন না। তাঁরা শিক্ষকতা কর্ম গ্রহণ করেন স্বল্প শ্রমজনিত সুযোগ, অবকাশ ও আরাম

উপভোগের জন্য। শেষপর্যন্ত তাঁদের এ আশা পূর্ণ না হলে কর্ম ত্যাগ করেন অথবা ব্যর্থ জীবনের বাকি দিনগুলি নিরাশায় কাটিয়ে দেন। এ শ্রেণীর শিক্ষকদের কাছ থেকে সমাজ কিছুই আশা করতে পারে না। কেননা অর্থলিপ্সু ও আরামপ্রিয় ব্যক্তির দ্বারা শিক্ষাকর্ম পরিচালিত হতে পারে না। শিক্ষকতাব জন্য চাই আত্মোৎসর্গী প্রেরণা।

ব্যবহারিক জগতে আত্মোৎসর্গী প্রেরণা যতই থাকুক না কেন, শিক্ষকদের আর্থিক সচ্ছলতা অতি প্রয়োজনীয় ও একান্ত বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকতা কর্মের গুরুত্বকে স্বীকার করে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে শিক্ষকের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত প্রযোজন। এভাবে জাতির সামগ্রিক প্রচেষ্টায় শিক্ষকের আত্মোৎসর্গী মনোভাবকে জাগিয়ে তুলতে হবে ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে হবে। যারা শিক্ষকতা করেন না তারা হয়ত জানেন না যে, বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কাজের পর শিক্ষককে যথেষ্ট পড়াশুনা, শিক্ষার্থীদের লিখিত কর্মের মূল্যায়ন, পবের দিনেব কর্মসূচী বিষয়ে প্রস্তুতি, বিদ্যালয়ের কর্মতালিকার বহির্ভূত কাজকর্ম, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও চলতি প্রসঙ্গ পাঠের দ্বারা অর্জিত জ্ঞানের সমৃদ্ধি—ইত্যাদি নানাবিধ কর্মে লিপ্ত থাকতে হয়। এসব কাজ শিক্ষকের পেশাভিত্তিক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এ কাজেব জন্য তাঁর একমাত্র পুবস্কার শিক্ষার্থীর সাফল্য ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ। যিনি ফলশ্রুতিস্বরূপ এই মানসিক তৃপ্তির আশায় শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন তিনিই প্রকৃত শিক্ষক। সমাজ এরূপ যোগ্য শিক্ষকেব সংখ্যাধিক্য কামনা কবে।

শিক্ষকতাবৃত্তির গুরুত্ব (Importance of teaching profession): এই মুহূর্তে যেসব ছাত্রছাত্রীর বয়স ৫ থেকে ১৭ বছর তারা সবাই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে এরাই উচ্চতর সাধাবণ শিক্ষা, বৃত্তিশিক্ষা, বা সংসারের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থীরাই কয়েক বছরপর দেশের নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। এদের রাষ্ট্রের সুনাগরিক ও সমাজেব সভ্য হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ভার শিক্ষকদের ওপর ন্যস্ত—এক কথায় বলা যায়, দেশের ভবিষ্যৎ সুনাগরিক তৈরির ভার শিক্ষকদের ওপরেই ন্যস্ত। তাই শিক্ষাবিদ্, রাজনীতিবিদ্, রাষ্ট্রপরিচালক, সমাজবিদ—সকলেই আজ একথা বিশ্বাস করেন যে ভারতের

শিক্ষা-বিষয়ক, সামাজিক[1] এমনকি রাজনৈতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকরাই হলেন জাতির সংগঠক ও স্রষ্টা, জাতীয় জীবন-পথের দিশারী। বস্তুতঃ, বিদ্যালয়, গ্রাম, নগর, রাষ্ট্র—এমনকি সমগ্র মানব জাতির ভবিষ্যৎ শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রচয়িতারা স্বীকার করেছেন যে[2] শিক্ষকরাই হলেন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যমণি (pivot)। দেশের শিক্ষার মৌলিক পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের সময় একথার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষককে অবহেলা করে বিরাট বিরাট অট্টালিকা, মূল্যবান সাজসরঞ্জাম, আসবাবপত্র, ত্রুটিহীন পাঠ্যসূচী কোন উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে পারে না। শিক্ষার্থীর অভ্যাস, রুচি, আচার-আচরণ ও সর্বোপরি চরিত্রের বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন সাধনে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাই সর্বজন স্বীকৃত।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলেন, আমাদের আলোচ্য শিক্ষা পুনর্গঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল শিক্ষক। শিক্ষকের ব্যক্তিগতযোগ্যতা, শিক্ষাগত গুণ, বৃত্তিগত শিক্ষণ এবং বিদ্যালয় ও সমাজে তাঁর প্রভাবই আমাদের আলোচ্য বিষয়। শিক্ষকের কাজের ওপরই বিদ্যালয়ের খ্যাতি এবং সমাজ জীবনের ওপর তাঁর প্রভাব সর্বদা নির্ভর করে। শিক্ষার্থীর জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও বৃদ্ধির দায়িত্ব অর্পিত হয় শিক্ষকের ওপর। স্যার জন এ্যাডামের (*Sir John Adams*) ভাষায় শিক্ষকই 'মানুষ স্রষ্টা' (maker of man) তাই 'শিক্ষকই হলেন প্রকৃত ইতিহাস স্রষ্টা'।[3]

শিক্ষকের কাজ (Functions of a teacher): অতীতের গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা আজ লুপ্তপ্রায়। সে শিক্ষা ছিল শিক্ষককেন্দ্রিক (Teacher centred), শিক্ষকই ছিলেন সকল কর্তৃত্বের অধিকারী। নির্দিষ্ট পুস্তক পড়িয়ে বা শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা দিয়ে শিক্ষক তার কর্তব্য ও দায়িত্ব শেষ করতেন।

1. তুলনীয়: 'It is the teacher about whom the whole educational system rotates.'—*Anonymous.*

2. "The most important factor in the contemplated educational reconstruction is the teacher—his personal qualities, his academic qualifications, his professional training and the place that he occupies in the school as well as in the community. The reputation of the school and its influence on the life of the community invariably depends on the kind of teachers working in it."—S.E.C. P. 126.

3. "The teacher is the real maker of history"—*H. G. Wells*

শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর যেমন কোন সম্পর্ক ছিল না তেমনি শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীরও কোন বাস্তব যোগসূত্র স্থাপিত হত না।

আজ শিক্ষকের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছে কিন্তু পক্ষান্তরে তাঁর **দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্র এবং পরিধি হয়েছে অনেক বেশী ব্যপক ও গভীর।** আজ শিক্ষক শুধু পুঁথিগত বিষয় পরিবেশন করেই তাঁর কর্তব্য শেষ করতে পারেন না। তাঁকে দেখতে হয় শিক্ষার্থী নবলব্ধ বিষয়টুকু অনুধাবন করতে পারছে কিনা এবং এর দ্বারা তার আচার-আচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আসছে কিনা। এছাড়া তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হয় নবলব্ধ জ্ঞান শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনে কোন সাহায্য করছে কিনা। তাই শিক্ষার্থীর জীবন সম্ভাবনার ক্রমবিকাশে সর্বদা সক্রিয় সহযোগী হওয়াই কৃতী শিক্ষকের অপরিহার্য কর্তব্য।

শিক্ষকের মৌলিক কর্তব্য

আধুনিক শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করা যায় মনস্তত্ত্বভিত্তিক, যুক্তিভিত্তিক, ও প্রগতিশীল শিক্ষণ-পদ্ধতির মাধ্যমে। এর জন্যে শিক্ষকের বিষয়বস্তুর ওপর জ্ঞানের গভীরতা যথেষ্ট নয়, তাঁকে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, শিশু-মনস্তত্ত্ব ও প্রগতিশীল **শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের ওপর যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে হয়।** বলা বাহুল্য, একাজ যথেষ্ট শ্রমসাপেক্ষ ও এর জন্য শিক্ষকের আন্তরিকতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সমাজ-জীবন ও সমাজ প্রগতিতে শিক্ষকের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। সুতরাং শিক্ষকের একটি **কাজ হল শিক্ষাকে সমাজমুখী করে তোলা।** ডিউই (*John Dewey*) শিক্ষাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সমাজ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেই শিক্ষা বা সামাজিক প্রক্রিয়া পরিচালনা করে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী যাতে সামাজিক আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়, বৃহত্তর সমাজে সে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে এবং আপন ব্যক্তিত্বের সাহায্যে নব নব সৃষ্টি দ্বারা সে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে—এসব ব্যাপারে শিক্ষার্থীকে সমাজের উপযুক্ত সভ্য হিসেবে গড়ে তোলা শিক্ষকের কর্তব্য। তাই এ কাজ সম্পাদনের জন্য শিক্ষক বিদ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলবেন ও শিক্ষার্থীর সমাজমুখী জীবন-বিকাশের সহায়ক হবেন।

সমাজমুখী শিক্ষা প্রবর্তনে সহায়তা করা

অতীতের সীমিত পাঠ্যসূচীর তত্ত্বগত জ্ঞান শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাই এক সময় পাঠ্যসূচীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সহ পাঠ্য-সূচীর কার্যক্রম (Co-curricular Activities)। বর্তমানে এই কার্যক্রম আবশ্যিকরূপে স্বীকৃত। সুতরাং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকাশের পথ খুঁজে পায় তার **জন্য শিক্ষককেই পাঠ্যসূচীর কার্যক্রম অনুসরণ করতে হয়**। তাই পার্সিভাল রেন (*Percival wren*) শিক্ষককে শিক্ষার্থীর বন্ধু দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক বলে অভিহিত করেছেন।[1] শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্মুখে কেবল কতগুলি তথ্যের উৎস হবেন না অথবা বিরাট পাণ্ডিত্য নিয়ে একটি চলমান বিশ্বকোষ রূপে অভিহিত হবেন না। শিক্ষক শিশুর সহযোগী হয়ে তার সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করবেন, তার জীবন দর্শন গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন, তাকে বিপথ-গামী হতে দেবেন না।

সহ-পাঠক্রম অনুসরণ করা

শিক্ষা হল শিশু-উদ্যান পরিচালনা। যেভাবে মাছ সাঁতার শেখে, পাখী উড়তে শেখে, প্রাণী দৌড়াতে শেখে, সেভাবেই শিশু মানুষ হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করবে।[2] সপ্তদশ শতাব্দীর ইতালীয় শিক্ষাবিদ্ কমেনিয়াসের (*Comenius*) এই শাশ্বত বাণীকে অনুসরণ করেই ফ্রয়েবেল বিদ্যালয়কে একটি শিশু-উদ্যানের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন—শিশুরা কোমল চারাগাছ, আর **শিক্ষক হলেন উদ্যান পরিচালক**। ফ্রয়েবেল শিক্ষককে বলেছেন সদাশয় তত্ত্বাবধায়ক (benevolent superintendent)। তিনি সত্যিই শিশুর স্বাভাবিক জীবন বিকাশের সহায়ক। তিনি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে শিশুর সম্ভাবনাময় জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশে পবিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।[3] স্বামী বিবেকানন্দের কথায় বলা যায়, 'তিনিই

শিক্ষক শিশু-উদ্যান পরিচালক

1. লক্ষ্যনীয়: "The teacher is not merely the fountain of facts, the walking encyclopaedia, and the universal provider of useful and useless information to the young, but their guide, philosopher and friend, the skilled builder of their character, trainer of their bodies, and developer of their in intellects."—*Wren*

"The teacher's part in the process of instruction is that of a guide, director, or superintendent of the operations by which the pupil teaches himself."—*Payne*

2. লক্ষ্যনীয়: 'Education is child-gardening. It should come to children as swimming to fish, flying to birds and running to animals.'—(*Comenius*)

3. The educator should be called, not a teacher, but a gardener. —*Froebel*

সুশিক্ষক যিনি শিক্ষার্থীদের স্তরে নেমে আসতে পারেন এবং তাঁর নিজের আত্মার বাণী শিক্ষার্থীদের মর্মস্থলে পৌঁছে দিতে পারেন এবং তাদের অন্তরটিকে নিজের অন্তর দিয়ে লক্ষ্য করতে পারেন।[1]

শিক্ষণই শিক্ষকের একমাত্র কর্ম নয়, তাঁকে অংশতঃ প্রশাসনিক কর্মসম্পাদনে দক্ষতা অর্জন করতে হয়। শ্রেণীর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে **প্রথমতঃ** শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন ও মাসিক উপস্থিতির হার সম্পর্কে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হয়। মাসান্তে ছাত্রদের নাম পরবর্তী মাসের ছাত্র নিবন্ধন খাতায় (Attendance Register) তুলতে হয়। **দ্বিতীয়তঃ**, শ্রেণীশিক্ষককে চলতি মাসের শেষ অথবা পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে বেতন সংগ্রহ করতে হয়। আদায়ীকৃত বেতনের জন্য শিক্ষার্থীকে যেমন প্রাপ্তি স্বীকারের বিল দিতে হয় তেমনি আবার ঐ টাকা বিদ্যালয় অফিসে জমা করে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। **তৃতীয়তঃ**, বিজ্ঞান, কারিগরী ইত্যাদির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে স্টক বুক যথাযথ রাখা (Maintain), হারানো-প্রাপ্তির হিসাব সংরক্ষণ করা, নূতন সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। **চতুর্থতঃ**, খেলাধূলা এবং সহ-পাঠক্রমিক কর্মসূচীর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে ষ্টক রেজিষ্টার, উপস্থিতির রেজিষ্টার সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয়। **পঞ্চমতঃ**, গ্রন্থাগারিকের অভাবে কোন কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষককেই গ্রন্থাগারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। **ষষ্ঠতঃ**, প্রত্যেক শিক্ষককেই দৈনন্দিন শ্রেণীপাঠ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পাঠ-পরিকল্পনা রচনা করতে হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের পাঠ-পরিকল্পনার ন্যায় বিস্তারিত দীর্ঘাকার পরিকল্পনা না করলেও চলে।

অংশতঃ প্রশাসনিক দায়িত্ব শিক্ষকের দায়িত্ব

শিক্ষকের আন্তব্যক্তি-সম্পর্ক (Interpersonal Relations of the Teacher): প্রধান শিক্ষকের ন্যায় সহ-শিক্ষককেও নিষ্কলঙ্ক জীবনের প্রতীক হতে হবে, যেন শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পারে। বিষয়-জ্ঞানে তিনি হবেন সর্বাধুনিক এবং অন্যের সঙ্গে আচার-আচরণে তাঁকে হতে হবে পক্ষপাতশূন্য। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বন্ধন হবে বিশ্বাস আনুগত্যের ধারায়। কারণ, প্রধান শিক্ষকই হলেন সহ-শিক্ষকের প্রশাসনিক সম্পর্কের মাধ্যম। বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি এবং সরকারী পরিদর্শন

1. লক্ষ্যনীয়: "A true teacher is one who can immediately come down to the level of the students. and transfer his soul to the student's soul and see through and understand through his mind."—*Swami Vivekananda*

সংস্থার (Inspectorate) সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। একমাত্র প্রধান শিক্ষকের অমার্জনীয় অপরাধমূলক কর্ম ছাড়া তাঁকে অতিক্রম করে সরকারী সংস্থার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা সহ-শিক্ষকের উচিত নয়। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সহ-শিক্ষকের সম্পর্ক হবে নম্র, ভদ্র ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। এর অর্থ এই নয় যে, প্রধান শিক্ষকের অন্যায় অবিচার মেনে নিতে হবে। কারণ, নীরবে অপরাধ বা অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করাও অপরাধমূলক কাজ।

শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবকদের সম্পর্ক হবে মধুর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। গৃহে ও বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীর শিক্ষা ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলে। তাই অভিভাবক ও শিক্ষক উভয়ই শিক্ষার্থীর মঙ্গলের জন্য দায়ী। সুতরাং শিক্ষার্থী সম্পর্কিত কর্তব্যে শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতা সর্বজনকাম্য। দুঃখের বিষয় প্রাইভেট পড়ানোর সূত্র অবলম্বনে শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ধারা আজ সর্বাধিক প্রচলিত। প্রক্রিয়াটি যে বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিশেষ অন্তরায়, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সহকর্মীদের সঙ্গে শিক্ষক সর্বদা বন্ধুভাবাপন্ন ও সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করবেন। কারণ, শিক্ষকদের ভেতরকার হিংসা-দ্বেষ ছাত্র সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং ক্রমশঃ বিদ্যালয় থেকে স্বাস্থ্যকর শিক্ষা-পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। অথচ শিক্ষকদের পারস্পরিক সহযোগিতা ভিন্ন বিদ্যালয়ের সামগ্রিক শিক্ষার ক্রমোন্নতি সম্ভব নয়।

শিক্ষক সমিতি: প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পৃথক সমিতি যেমন থাকা দরকার, তেমনি অঞ্চল বা রাজ্যব্যাপী বৃহত্তর সমিতির সভ্য হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করা প্রত্যেক শিক্ষকের কর্তব্য। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-সমিতির সভায় পারস্পরিক সুবিধা-অসুবিধার কথা আলোচনা করা উচিত এবং বিদ্যালয়ের ও শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতিকল্পে সকলের আত্মনিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত। শিক্ষকদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করার মূল দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের। তবে এ বিষয়ে প্রবীণ (Senior) শিক্ষকদের দায়িত্বও নিতান্ত কম নয়।

আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী (Qualifications of an ideal teacher): সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে একজন আদর্শ নাগরিক যে সকল গুণের অধিকারী হবেন একজন শিক্ষকের সেসব গুণ থাকবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই

সাধারণ গুণ ছাড়া বিশেষ পেশা বা বৃত্তিতে কর্মী নিয়োগের সময় বিশেষ সম্ভাবনা ও যোগ্যতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষকতাও একটি বিশেষ বৃত্তি; সুতরাং শিক্ষকতা বৃত্তিটিও একটা বিশেষ দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এ বৃত্তির ফলশ্রুতি বিদ্যালয় পরিবেশে বা শিক্ষকের ব্যর্থতার আত্মগ্লানিতে সীমিত নয়। শিক্ষকতা কর্মের পরিধি শিক্ষার্থী তথা ভবিষ্যৎ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পরিব্যাপ্ত। তাঁর কর্মক্ষেত্র ক্রমবর্ধিষ্ণু মানব সন্তানের সম্ভাবনাময় জীবনবিকাশের সঙ্গে অন্বিত। শিক্ষক স্থির ও জড়বস্তু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন না—জীবন্ত ও সম্ভাবনাময় মানব-শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের দায়িত্ব অর্পিত হয় শিক্ষকের ওপর। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে যে বিষয়বস্তু শেখান শিক্ষার্থী তাই শেখে এবং ক্রমে ক্রমে শিক্ষকের জীবনাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই বলা হয় 'শিক্ষক' শব্দটি 'প্রভাব' শব্দের নামান্তর মাত্র।[1] শিক্ষকতা বৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তির প্রভাব শিক্ষার্থীর মাধ্যমে সমগ্র সমাজ ও জাতীয় জীবনে বিস্তৃত হয়, এই বৃত্তিতে তাই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে নিযোগ করা যায় না।[2] জাতির মেরুদণ্ড যে শিক্ষক, যাকে অতীত ইতিহাসের রক্ষক আর ভাবী সমাজের স্রষ্টা হিসেবে গৌরবান্বিত করা হয়, তিনি যে বহু বাঞ্ছিত গুণের অধিকারী হবেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিক্ষকের কোন্ কোন্ গুণ তাঁর শিক্ষাদান কর্মের সহায়ক, কি কি গুণের প্রভাব শিক্ষার্থীর জীবনকে সার্থক করে তুলবে—তা নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। আমেরিকার ডক্টর এফ. এল. ক্লাপ (*Dr. F. L. Clapp*) এ সম্পর্কে গবেষণা করে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষকের **দশটি অপরিহার্য গুণের** কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হলঃ (১) ভাষণ দক্ষতা (Address), (২) ব্যক্তিগত চেহারা (Personal appearance), (৩) আশাবাদিতা (Optimism), (৪) গাম্ভীর্য (Reserve), (৫) উৎসাহ (Enthusiasm), (৬) মানসিক সততা (Fairness of mind), (৭) আন্তরিকতা (Sincerity), (৮) সহানুভূতি (Sympathy), (৯) জীবনীশক্তি (Vitality), এবং (১০) বিদ্যাবত্তা (Scholarship)।

অধ্যাপক ব্যগলি এবং কিথ্ (Prof. *Bagly* and *Keith*) উক্ত দশটি গুণের সঙ্গে আরও তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন—(১) কৌশল (Tact),

---

1. 'Teacher' is essentially another name for 'influence'.
2. 'No bad man can be a good teacher.'—*Anonymous.*

(২) সুমিষ্ট স্বর (Good voice) এবং (৩) নেতৃত্বের কৌশল (Capacity for leadership)।

অধ্যাপক বসিং (*Prof. Bossing*) আরও দুটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন—(১) রহস্য প্রিয়তা (sense of humour) এবং (২) শিক্ষার্থীদের প্রতি বন্ধুভাব (Friendliness towards pupils)। এছাড়া আরও অনেক মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ গবেষকরা শিক্ষকের অপরিহার্য গুণাবলীর তালিকা আমাদের নিকট উপস্থিত করেছেন। এসব গুণাবলী আমরা তিনটি অংশে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি, যথা—(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা (Academic qualification), (খ) বৃত্তিগত বা পেশাগত যোগ্যতা (Professional qualification) এবং (গ) ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র (Personality and Character)।

(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা (Acadamic qualification): যথাযথ, কার্যকর ও সার্থক কর্ম-সম্পাদনার জন্য বিদ্যালয়ের যে-কোন শিক্ষককে যে-কোন একটি বা দুটি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। যে বিষয় পড়ানোর জন্য শিক্ষককে নিয়োগ করা হবে অন্ততঃ সে বিষয়ে শিক্ষককে উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া চাই (অন্ততঃ সম্মানস্তরের মান অথবা স্নাতকোত্তর মান)। প্রাইমারী বা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য স্নাতক উপাধি প্রাপ্ত শিক্ষক হলে ভাল হয়। তবে শিক্ষককে সর্বদা স্বীয় বিষয়ের আধুনিকতম জ্ঞান (Up-to-date knowledge) অর্জন করতে হবে। এর জন্য সর্বদা তাকে স্বীয় বিষয়ের অনুকূল ও সহায়ক বিষয়াদি পড়াশুনা করতে হয়।

শিক্ষাকে অভিজ্ঞতামুখী ও জীবনকেন্দ্রিক করার দিকে প্রবণতা সৃষ্টি হওয়ায় শিক্ষার্থী আজ আর শ্রেণীকক্ষের নীরব শ্রোতা নয়। শিক্ষার্থী এখন পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। তাই অনেকে মনে করেন, শিক্ষক যদি শুধু পরিচালন কর্মে দক্ষ হন তাহালেই যথেষ্ট। শিক্ষার্থীকে সাহায্য করার জন্য কতকগুলি পাঠ্যপুস্তকের নামের সঙ্গে পরিচয়, আর কর্মসূচী প্রণয়নের দক্ষতা থাকলেই শিক্ষকতা কর্মে যোগ্যতা অর্জন করা যায়। "We are teaching pupils, not subject matter"—এই মতের সমর্থক অনেকে মনে করেন যে, শিক্ষকের বিষয়বস্তুর ওপর গভীর পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নেই। পাণ্ডিত্য থাকলে বরং শিক্ষক তা প্রকাশ করার জন্য উদগ্রীব হবেন। ফলে শিক্ষার্থী হবে অকর্মণ্য নীরব শ্রোতা; পুঁথিগত বিদ্যার দিকেই তার প্রবণতা

সৃষ্টি হবে অধিক। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। অজ্ঞ অথবা সবজান্তার পক্ষে শিক্ষকতা করা অসম্ভব। জানবার ইচ্ছা বা শেখাবার ইচ্ছাই জানাতে বা শেখাতে পারে।[1] জ্ঞানের গভীরতার মাধ্যমে শিক্ষক হতে পারেন শিক্ষার্থীর পরিচালক, দার্শনিক ও বন্ধু। পশুচারণে পরিচালককে তৃণের সন্ধান রাখতে হয়, সৈনিক পরিচালনায় যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হতে হয়। তেমনি শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর খবরাখবর না রেখে শিক্ষক হওয়া শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়, অসম্ভবও বটে। সুতরাং শিক্ষকের প্রথম প্রয়োজন বিষয়গত পাণ্ডিত্য অর্জন। প্রকৃত শিক্ষক শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষকতা-বৃত্তি গ্রহণ করেন, শিশুর সঙ্গে তিনিও শিক্ষার্থী, তাই শিক্ষকতা তার কাছে আনন্দদায়ক ব্যাপার।[2]

(খ) বৃত্তিগত বা পেশাগত যোগ্যতা (Professional qualifications) **:** বিষয় সম্পর্কে অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষককে শিক্ষকতায় অকৃতকার্য হতে দেখা যায়। কোন বিষয় সম্পর্কে জানা এক জিনিস, আর পড়ানো অন্য জিনিস। মূলতঃ, পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও শিক্ষণ পদ্ধতিতে অপটুতাই এই বিফলতার অন্যতম কারণ। অনেকে বলেন, কবিদের মতো প্রকৃত শিক্ষক জন্মগ্রহণ করেন, তাকে তৈরি করা যায় না।[3] কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। চেষ্টার দ্বারা নানাবিধ কৌশল ও দক্ষতা অর্জন করা যায়। শিক্ষকোচিত গুণ স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান আছে এমন শিক্ষকের সংখ্যা অতি নগণ্য। অথচ দেশব্যাপী শিক্ষা সম্প্রসারণের ফলে শিক্ষায়তনের সংখ্যা যেমন বেড়ে গেছে তেমনি শিক্ষকের সংখ্যাও বাড়াবার প্রয়োজন হয়েছে। তাহলে আজন্ম দক্ষ শিক্ষকের (Born tercher) অপেক্ষায় থাকা আর সম্ভব নয়। শিক্ষককে তৈরি করে নিতেই হবে। তাই শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক-শিক্ষণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।[4]

কি পড়াতে হবে (What to teach) এবং কেমন করে পড়াতে হবে (How to teach)—দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষককে এ দুটি বিষয়ের ওপর পাণ্ডিত্য অর্জন

1. তুলনায়: "You cannot pour out of your vessel except that you have put into it and if a teacher is poor and shallow from whithin, if there is no sparkling within him he cannot quicken the mind .."

—Prof. *Humaynn Kabir.*

2. "Education to those who give their lives to it is a joyous adventure just because the teacher is ever a learner,"

3. 'A Teacher is born and not made.'—*Anonymous*

4. All teachers should go through a course of Training'—*Mulcaster.*

করতে হয়। এই সঙ্গে যাকে পড়াতে হবে (Whom to teach) তাকে সঠিকভাবে জানতে হয়। তাই রাইবার্ন (*Ryburn*) বলেন, সার্থক শিক্ষক নিশ্চয়ই শিশু, পাঠ্যবিষয় এবং পদ্ধতির ওপর সমান আগ্রহশীল হবেন। ব্যক্তিগত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক শিশু-মনস্তত্ত্ব, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষণ-পদ্ধতিস ম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। এই ব্যবহারিক জ্ঞান-অর্জন করা শিক্ষকের অপরিহার্য কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে যেভাবে ও যতটুকু শিক্ষণ সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞানার্জনে শিক্ষককে সাহায্য করা হয় সেটুকু মাত্র প্রস্তুতি পর্ব। এর প্রকৃত ব্যবহারিক পর্ব শুরু হয় বিদ্যালযের বাস্তব পরিবেশে। তাই শিক্ষণ সম্পর্কে অভিজ্ঞান পত্র প্রাপ্তির পর শিক্ষককে সর্বদা কৌতুহলী গবেষক হতে হবে। নতুন নতুন পদ্ধতি প্রযোগ করে শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে তুলতে হবে। এছাড়া আধুনিক যুগে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে অন্যান্য সার্থক শিক্ষকের গবেষণার ফলশ্রুতি এবং সাম্প্রতিক শিক্ষা-সমস্যার বিষয় জানতে হবে ও নবলব্ধ জ্ঞানকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষকতা ক্রমশঃ যান্ত্রিকতায পরিণত হবে। তাই শিক্ষকের যে-সব গুণের অধিকারী হওয়া উচিত তা হল—

(ক) পেশাগত প্রবণতা, (খ) শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা পাঠের প্রবল আগ্রহ, (গ) যোগ্যতা উন্নয়নের একান্ত প্রযাস, (ঘ) আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের ও শিক্ষার্থীর সম্ভাবনা বিকাশের অফুরন্ত আগ্রহ।

(গ) ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র (Personality and Character): সার্থক শিক্ষাকর্মের জন্য শিক্ষকের পক্ষে তৃতীয় অপরিহার্য বিষয় হল তাঁর ব্যক্তিত্ব। বহু মনস্তাত্ত্বিক উপাদান সহযোগে এই ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, আর সমাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এই ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে। ডক্টর ব্যালার্ড (*Dr. Ballard*) বিশ্বাস করেন যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি (intellect) অপেক্ষা চরিত্রের (character) সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। আবার ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অর্জিত অভ্যাস (acquired habits) অপেক্ষা স্বাভাবিক প্রবণতার (natural gifts) সঙ্গে অধিকতর অন্বিত। ব্যক্তিত্বের মূলে থাকে সহজাত প্রবণতা। এই সহজাত প্রবণতা বা গুণাবলীকে একজন চেষ্টা করে কতটুকু পরিবর্তন করতে পারে তা বিতর্কমূলক প্রশ্ন। কিন্তু দেখা গেছে শিক্ষার সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির রূপ বিবর্তিত হয়। ব্যক্তিত্ব শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক। ব্যক্তিত্বের

উপাদানগুলির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সুযোগ এখানে নেই। শুধু ব্যক্তিত্বের যে বিশেষ বিশেষ অংশ শিক্ষকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন সেটুকুই আমাদের বিবেচ্য। এই প্রয়োজনীয় অংশটুকুকে আমরা মোট তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি, যথা—(১) দেহগত বিষয় (Physical aspects), (২) নিষ্ক্রিয় গুণাবলী (Passive virtues) এবং (৩) কার্যনির্বাহী সক্ষমতা (Executive abilities)।

(১) দেহগত বিষয় (Physical aspects) : শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের **প্রথম উপাদান হল** তাঁর আঙ্গিক চেহারা। এটাকে কোন মতে অগ্রাহ্য করা যায় না। কারণ, শারীরিক গঠন মানুষের মনের ওপর প্রথম প্রভাব (impression) সৃষ্টি করে। এজন্য কথায় বলে, 'আগে দর্শনধারী, পরে গুণ বিচারী।' শুধু দৈহিক সৌষ্ঠব বা ভঙ্গিমার জন্যেই সুদর্শন হওয়া যায় না, এর জন্যে প্রয়োজন হয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ, বাঞ্ছনীয় আদবকায়দা, ভাব প্রকাশের আভিজাত্য ও ভঙ্গিমা, ভাষার সুস্পষ্টতা ও বিশুদ্ধতা ইত্যাদি। তাই শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে শিক্ষকের প্রাথমিক সম্পদ হল তার দৈহিক সৌষ্ঠব।

দৈহিক সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য

ব্যক্তিত্বের জন্য দেহগত বিষয়ে **দ্বিতীয় উপাদান হল স্বাস্থ্য।** শিক্ষক নীরোগ শারীরিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ শারীরিক সুস্থতার ওপর মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভরশীল। শিক্ষকের যতকিছু গুণ ও সামর্থ্য সবই তাঁর শারীরিক সুস্থতার জন্যে সম্ভব। শারীরিক স্বাস্থ্য মূলতঃ উদ্যমশীলতা, সজীবতা, শ্রমশীলতা ইত্যাদি গুণ বিকাশের সহায়ক।

শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি শিক্ষককে মানসিক স্বাস্থ্যের (Mental health) অধিকারী হতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা মানসিক ভাবসাম্য (equlibrium) এবং প্রক্ষোভমূলক সুস্থিতি (emotional stability) বুঝি। মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী শিক্ষক সরল ও সাধারণ জীবন ধারণের মধ্য দিয়ে উচ্চতর চিন্তায় দক্ষ হতে পারেন ; শ্রেণীকক্ষে ও সামাজিক পরিবেশে আপন প্রফুল্লতা দ্বারা সকলকেই মুগ্ধ করতে পারেন। শিক্ষকের হতাশা ও দুশ্চিন্তা, মনমরাভাব শিক্ষার্থীর ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শিক্ষকের ধৈর্য, সহনশীলতা, মনোমুগ্ধকর আচার-আচরণ ইত্যাদি সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ। সুতরাং শিক্ষকের পক্ষে মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া অপরিহার্য গুণ।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

দেহগত বিষয়ের **তৃতীয় উপাদান হল শ্রুতিমধুর ও সুস্পষ্ট** কণ্ঠস্বর (Good voice)। শিক্ষকের উচ্চারণ হবে সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ। কর্কশ স্বরযুক্ত শিক্ষক কখনও শিক্ষকতায় সাফল্য অর্জন করতে পারেন না। কারণ, এরূপ স্বর শিক্ষার্থীর মনে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করে, মনোযোগ আকর্ষণে বিঘ্ন ঘটায়। তাই প্রয়োজন হলে শিক্ষককেও সঙ্গীতজ্ঞের ন্যায় স্বর-সাধনা করতে হয়। অন্যথায় শিক্ষকতা বৃত্তি ত্যাগ করে অন্য যে কোন পেশা গ্রহণ করা উচিত।

(২) নিষ্ক্রিয় গুণাবলী (Passive Virtues) : শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের দ্বিতীয় অপরিহার্য উপাদান হল তাঁর নিষ্ক্রিয় গুণাবলী। এই গুণের দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীর মানসরাজ্যে এমন প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে এবং স্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন যে বিদ্যালয় পরিত্যাগের পরেও, এমনকি আজীবন শিক্ষার্থী পূজনীয় শিক্ষককে ভুলতে পারে না। তাই নিষ্ক্রিয় গুণাবলীকে শিক্ষকের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী নৈতিক গুণ (moral qualities) হিসেবে অভিহিত করতে পারি। শিক্ষকের প্রয়োজনীয় নিষ্ক্রিয় গুণাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও **অপরিহার্য গুণগুলো হল :**

(i) ধৈর্য ও সহনশীলতা : শিক্ষককে অনেক সময় শিক্ষা-পরিবেশে নানা সমস্যা বা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। তাই তাঁকে ধৈর্য সহকারে ও আত্মসংযমী হয়ে সেসব সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়।

(ii) আশাবাদিতা : প্রতিকূল পরিবেশে অবদমিত না হয়ে আশা বজায় রাখা শিক্ষকের কর্তব্য। শিক্ষকের আশাবাদিতা দ্বারা শিক্ষার্থীও প্রভাবিত হবে ও স্ব-স্ব কর্মে সাফল্য লাভের জন্য অধিক উৎসাহী হবে।

(iii) স্নেহ-প্রীতি ও সহানুভূতি : অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদের জীবন বিকাশের দায়িত্ব শিক্ষকের ওপর অর্পিত। তিনি অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদের স্নেহ ও প্রীতির চোখে দেখবেন, তাদের সুবিধা-অসুবিধা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন—এটাই সর্বজনকাম্য। কঠোর শাসন ও রূঢ়তার দ্বারা শিক্ষার্থীর মনকে জয় করা যায় না। তাদের মন জয় করতে না পারলে শিক্ষার সঙ্গে মনের সংযোগ স্থাপন করা কোনক্রমে সম্ভব নয়; স্নেহ-প্রীতি, সহানুভূতি ও ভালবাসার মাধ্যমে শিশুহৃদয় জয় করা সহজসাধ্য।

(iv) বন্ধুবাৎসল্য : শিক্ষার্থীকে আপন করে নেওয়ার উপায় হল তাদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব পোষণ করা। এরূপ মনোভাবের দ্বারা ছাত্রদের সঙ্গে

যেমন মেলামেশা করা সহজ তেমনি তাদের সুবিধা-অসুবিধা বুঝে সঠিক পথে পরিচালনা করাও সহজ।

(v) **আন্তরিকতা, সততা ও সরলতা :** শিক্ষকের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সরাসরি শিক্ষার্থীর মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই শিক্ষককে হতে হবে সুসংহত চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি। কপট ও ভণ্ড শিক্ষককে কেউ বিশ্বাস করে না। শিক্ষকের ওপর বিশ্বাস হারানোর অর্থ পাঠ্যবিষয়বস্তু ও শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার ওপর বীতশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হওয়া। শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষার্থী যদি প্রভাবিত না হয়, যদি শিক্ষার্থী তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে প্রণোদিত না হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা কোনক্রমে সফল হতে পারে না। তাই শিক্ষকের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব হবে সুসমন্বিত ও সুসংহত।

(৩) **কার্যনির্বাহী সক্ষমতা** (Executive abilities): শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় তৃতীয় উপাদান হল তার কার্যনির্বাহী ক্ষমতা। কার্যনিবাহী ক্ষমতার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হল **নেতৃত্বদানের ক্ষমতা।** শিক্ষক হবেন প্রথম শ্রেণীর নেতা। তাঁকে বিদ্যালয়ে, শ্রেণীকক্ষে, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে, সমাজে নেতৃত্ব দিতে হবে। নেতৃত্ব সুলভ কর্ম সম্পাদনের জন্য শিক্ষকের যেসব আনুষঙ্গিক গুণ থাকা প্রয়োজন সেগুলো হল :

(i) **শিক্ষাদান কর্মে আগ্রহ :** শিক্ষকের কার্যনির্বাহী ক্ষমতার প্রথম লক্ষণ স্বকর্মে আগ্রহ। বাধ্য হয়ে যিনি শিক্ষকতা কর্ম গ্রহণ করেন তাঁর স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যে অস্বস্তি ও অসন্তোষ লক্ষ্য করা যায়। তাই কার্যনির্বাহের সার্থকতার জন্য প্রথম প্রয়োজন তার কর্মে আগ্রহ।

(ii) **আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা ও আত্মসমালোচনা :** কর্মে আগ্রহ থাকলে স্বাভাবিকভাবে আত্মবিশ্বাস কার্যকর হয়ে উঠতে পারে। নেতৃত্বদানের জন্য শিক্ষককে আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হতে হবে। এই বিশ্বাসেব ফলেই শিক্ষকের মনে আসবে আত্মনির্ভরতা। আত্মনির্ভর ব্যক্তি অন্যের সাহায্যের প্রতীক্ষা না করেই স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, মানুষ মাত্রেরই কাজে ত্রুটি থাকতে পারে। শিক্ষকের কর্মেও ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা পদে পদে। শিক্ষকের কর্মের ত্রুটি থাকার অর্থ শিশু-জীবন থেকে শুরু করে সামগ্রিক সমাজ-জীবনকে ত্রুটিপূর্ণ করে তোলার ব্যবস্থা করা। তাই আত্মসমালোচনা

শিক্ষকের একান্ত প্রয়োজন। স্বীয় কৃতকর্মের দোষত্রুটি সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে শিক্ষকের কর্ম এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবন অনেক বেশী সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠবে।

(iii) **সমবেদনা, কৌশল ও সামঞ্জস্যকরণের ক্ষমতা ঃ** শিক্ষার্থীদের পরিচালন পরিপ্রেক্ষিতে সমবেদনা, কৌশল ও সামঞ্জস্যকরণের ক্ষমতা শিক্ষকের মধ্যে থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। এর দ্বারা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক মধুর হয়ে ওঠে। সমবেদনা অর্থে শুধু দয়া-ধর্ম নয়। সমবেদনার দ্বারা পরিচালক ও অনুসরণকারীর পারস্পরিক বুঝাপড়াকেও (Understanding) বুঝায়। কৌশল শুধু চতুরতা নয়, কৌশল হল সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা। শুধু চালাকির দ্বারা মানুষের মন জয় করা যায় না, এর সঙ্গে বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতারও প্রয়োজন হয়। এর দ্বারা আবার প্রতিকূল পরিবেশ ও সমস্যাপূর্ণ বিষয়েব মধ্যে নিজ কর্মের সামঞ্জস্যবিধান করা যায়।

(iv) **উদ্যমশীলতা ঃ** প্রকৃত নেতাকে অন্যের সাহায্য ব্যতীত যে কোন প্রয়োজনীয় কর্মে উদ্যোগী হতে হয়। অনেকে পরিকল্পনা করতে পারেন কিন্তু পরিকল্পিত বিষয়ের বাস্তব রূপায়ণে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে নেতাকে হতে হবে পরিশ্রমী, সংগঠক ও পরিচালক।

(v) **সময়ানুবর্তিতা ও সমদর্শিতা ঃ** বিদ্যালয় পরিচালিত হয় সময়-তালিকার কার্যসূচী অনুসারে। নেতৃত্ব দিতে হলে শিক্ষকের সময়ানুবর্তী হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় কর্মপরিচালনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ,** নেতৃত্বসুলভ গুণের একটি আনুষঙ্গিক উপাদান হল সমদর্শিতা। পক্ষপাত শূন্য নেতৃত্বের দ্বারা শিক্ষক তাঁর সহকর্মী, শিক্ষার্থী, অভিভাবক— সকলের শ্রদ্ধাভাজন হতে পারেন।

(vi) **বাগ্মিতা ঃ** নেতৃত্ব প্রদানের অন্যতম উপাদান হল বক্তৃতাদানের যোগ্যতা। এ গুণটি শিক্ষকতা কর্মের অপূর্ব সহায়ক। মনস্তত্ত্বসম্মত এবং যুক্তিপূর্ণ বিষয়ের অবতারণার জন্য সুস্পষ্ট এবং দরদী ভাব ও ভাষায় বক্তৃতা-দানের যোগ্যতা থাকলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে শিক্ষার্থী, সহকর্মী, অভিভাবক সকলেরই মন জয় করা ও প্রভাব বিস্তার করা সহজসাধ্য হয়। আধুনিক শিক্ষাদান প্রক্রিয়া—কাজ ও কথার মাধ্যমে গতিশীল হয়ে উঠেছে। কাজ ও কথার যে-কোন একটির অভাবে শিক্ষক ব্যর্থ হবে—এবিষয়ে

সন্দেহের অবকাশ নেই। উল্লিখিত গুণ ছাড়াও শিক্ষককে মৌলিক কর্মে দক্ষ, মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মসম্পাদনের প্রচেষ্টা ও অন্যান্য সামাজিক গুণের অধিকারী হতে হয়। এক কথায়, শিক্ষককে হতে হবে অফুরন্ত গুণের অধিকারী। এ প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা প্রযোজন, শিক্ষক মূলতঃ মানুষ। সমাজের আরও পাঁচ জনের ন্যায় তাঁরও কিছু কিছু ত্রুটি থাকবে। এ কথা সকল সময় স্মরণ করা দরকার যে, শিক্ষক শিক্ষার্থীকে যা কিছু শেখাতে চান তা যেন তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনে সম্পাদন করে শিক্ষার্থীদের নিকট দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। কথা ও কাজ এক হলে শিক্ষকের প্রভাব আদর্শ নাগরিক তৈরির সহায়ক হবে।

যোগ্যতার উন্নয়ন (Development of efficiency)ঃ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতে শিক্ষা পুনর্গঠনের পরিপেক্ষিতে শিক্ষকের যোগ্যতার উন্নযন একান্ত কাম্য। পূর্বোক্ত আলোচনায় শিক্ষকেব প্রয়োজনীয গুণাবলীর দিকগুলি আলোচিত হযেছে। শিক্ষক স্বীয় যোগ্যতা ও গুণাবলীর উন্নতির জন্য নিজেই সচেতন ও সচেষ্ট হতে পারেন। স্বীয চেষ্টাই এই উন্নতির একমাত্র উপায়। শিক্ষণ মহাবিদ্যালযে পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির চেষ্টা কবা হয কিন্তু সে প্রচেষ্টার ক্ষেত্র-পরিধি ও সময় অতি সীমিত। সবকাবী প্রচেষ্টায় শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালযের কর্মক্ষেত্রকে আবও প্রসারিত ও কর্মমুখীন করা প্রযোজন। শিক্ষককে যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করা ও শিক্ষাকে বাস্তবকর্ম অভিমুখী করা যথেষ্ট সমস্যাবহুল। শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে এব বাস্তব রূপায়ণের অপেক্ষা না বেখে, শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য শিক্ষককে সচেষ্ট হয়ে স্বীয় যোগ্যতার উন্নয়নে প্রবৃত্ত হতে হবে। যোগ্যতা পরিমাপক ও নির্ধারকের একখানি-সূচী নিম্নে প্রদত্ত হল। এই সূচীটিকে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালযে অধ্যাপকরা শিক্ষকদের যোগ্যতাব উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারেন; আবার বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কালে সহকর্মীদের এই সূচী অনুসারে স্বীয় যোগ্যতা বিচাবের জন্য অনুবোধ ও নিযোগ কবতে পাবেন।

শিক্ষকের যোগ্যতা নির্ধারক সূচী* (Rating Sheet for Teachers) :

বিষয় Items	অতি উত্তম Ex-cellent	উত্তম Good	গড় Ave-rage	স্বল Po
(ক) বিদ্যাবত্তা (Scholarship) :				
(১) বিষয়গত বিদ্যার গভীরতা (Sound knowledge of Subject taught)।				
(২) সাধারণ শিক্ষার ভিত্তি (Background of liberal education)।				
(৩) সাম্প্রতিক সমস্যার সঙ্গে পরিচয় (Acquaintance with problems of present day life)।				
(৪) পত্র-পত্রিকা পাঠক (Reader of Newspaper and Magazines)।				
(৫) পাঠ্যবিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থ পাঠক (Reader of books on subject taught)।				
(খ) পেশাগত পটভূমি (Professional background) :				
(১) পেশাগত প্রবণতা (Professional attitude)।				
(২) পেশাগত শিক্ষণের গভীরতা (Sound Professional training)।				
(৩) শিক্ষাবিষয়ক পত্রিকা পাঠক (Reader of Educational Magazines)।				
(৪) শিক্ষা সংক্রান্ত গ্রন্থের পাঠক (Reader of Professional books)।				
(৫) যোগ্যতা উন্নয়নের প্রয়াস (Desire for improvement)।				

* Teaching the Social Studies in Secondary Schools—*Bining and Bining*, P 20

বিষয় Items	অতি উত্তম Ex-cellent	উত্তম Good	গড় Ave-rage	স্বল্পতা P১
(গ) ব্যক্তিত্ব (Personality) ঃ				
A. শারীরিক বৈশিষ্ট্য (Physical aspects) ঃ				
(১) ব্যক্তির চেহারা (Personal appearance)।				
(২) জীবনের সুখ-সুবিধা সংক্রান্ত ব্যাপারে সচেনতা (Recognition of the amenities of life)।				
(৩) কণ্ঠস্বর (Quality of voice)।				
(৪) ভাষা (Language)।				
(৫) স্বাস্থ্য (Health)।				
B. নিষ্ক্রিয় গুণাবলী (Passive Virtues) ঃ				
(১) বন্ধুত্ব (Friendliness)।				
(২) সহানুভূতি ও বোধ (Sympathy and Understanding)।				
(৩) আন্তরিকতা (Sincerity)।				
(৪) কৌশল (Tact)।				
(৫) সততা (Fairness)।				
(৬) আত্মসংযম (Self-control)।				
(৭) আশাবাদিতা (Optimism)।				
(৮) উৎসাহ (Enthusiasm)।				
(৯) ধৈর্য (Patience)।				
C. কার্যনির্বাহী ক্ষমতা (Executive abilities) ঃ				
(১) আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা (Self-confidence and self-reliance)।				
(২) উদ্যমশীলতা (Initiative)।				
(৩) গ্রহণ-ক্ষমতা ও সম্পদ-সম্ভাবনা (Adaptability and resourcefulness)।				

বিষয় Items	অতি উত্তম Excellent	উত্তম Good	গড় Average	স্বল্পতা Poor
(৪) সাংগঠনিক ক্ষমতা (Organizing ability)।				
(৫) পরিচালন ক্ষমতা (Directive ability)।				
(৬) শ্রম (Industry)।				
(ঘ) শ্রেণী-পরিচালন পদ্ধতি (Class-room Procedure) :				
(১) পাঠটীকার সঠিক লক্ষ্য (Clear-cut aims for lesson)।				
(২) পাঠ্যসূচী ও পাঠটীকায় লক্ষ্যের সম্পর্ক (Aims of lesson in relation with aims of topic of course)।				
(৩) সুষ্ঠু বিষয়বস্তু পাঠ্যরূপে নির্বাচন (Materials of subject well selected for teaching)।				
(৪) শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিষয়বস্তু বিন্যাসের সুষ্ঠুতা (Materials of subject well organised for teaching)।				
(৫) শিক্ষালাভে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ (Pupils well motivated for study)।				
(৬) সযত্নে পরিকল্পিত কর্মারোপ (Carefully planned assignment)।				
(৭) লক্ষ্যের অনুকূলে গৃহীত বিভিন্ন পদ্ধতি (Variety of methods used to accomplish aims)।				
(৮) প্রশ্ন-সংক্রান্ত নৈপুণ্য (Skillful questioning)।				
(৯) শ্রেণী-পরিচালন যোগ্যতা (Ability to hold the class)।				

বিষয় Items	অতি উত্তম Excellent	উত্তম Good	গড় Average	স্বল্পতা Poor
(১০) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতির পরিমাণ (Recognition of individual differences)।				
(১১) কর্মসূচী পালনে যোগ্যতা (Efficiency in routine work)।				
(১২) শ্রেণীতে লক্ষ্য সম্পাদনের যোগ্যতা (Ability to accomplish aims in class)।				
(১৩) বিষয়-পরিবেশন যোগ্যতা (Ability in clear presentation of subject)।				

৫। সময়-তালিকা (Time-Table) :

সময়-তালিকা হল বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচীর সময়ানুপাতিক বণ্টন-তালিকা। এটাকে বিদ্যালয়ের কর্ম-নির্দেশক চার্ট বলা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়-তালিকা (curriculum), প্রতিটি বিষয়ের পাঠ্যসূচী (syllbus), নির্দিষ্ট শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিচালনার নির্দিষ্ট সময়, বিভিন্ন শ্রেণী ও বিষয়কক্ষ, আবশ্যিক পাঠক্রমিক কর্মসূচী (curricular activities) ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সময়সূচী নির্দেশ করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষক কোন্ কক্ষে, কোন্ দিন কতটুকু সময়, কোন্ বিষয় পড়াবেন বা কোন্ শিক্ষাকর্ম কতটুকু সময়ে সম্পাদন করবেন তার দৈনন্দিন হিসেব সহ সেটা সপ্তাহের জন্য নির্দিষ্ট করা থাকে এই সময় তালিকায়। তাই একে বলা হয় 'বিদ্যালয় কর্মসূচী' বা প্রতিষ্ঠানের হৃদপিণ্ড। হৃদপিণ্ডের প্রক্রিয়া সারা দেহের কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। বিদ্যালয় সময়সূচীও তেমনি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক।[1]

সময়-তালিকার প্রকার ভেদ (Types of Time-Table) :

বিদ্যালয়ের বিচিত্র কর্ম সম্পাদনা সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নানা ধরনের সময় তালিকা ব্যবহার করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সময়-তালিকাগুলি হল :

(ক) একত্রিত সময়-তালিকা (Consolidated Time-Table)ঃ এরূপ সময়-তালিকায় শিক্ষক ও শ্রেণীর কর্মসূচী একত্রে সন্নিবেশিত হয়। এতে প্রথমতঃ, সাপ্তাহিক দিনগুলির জন্য প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিটি পাঠ্যবিষয়ের শিক্ষণ-কর্ম বণ্টন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, এতে কোন্ শিক্ষক, কোন্ ঘণ্টায় (period), কোন্ শ্রেণীতে, কোন্ বিষয় পড়াবেন তাও নির্দেশ করা থাকে। ছোট ছোট বিদ্যালয়ে এরূপ একখানি একত্রিত সময়-তালিকা যথেষ্ট কার্যকর হয়। বহুমুখী ও বৃহদাকারের বিদ্যালয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের সময়-তালিকা ব্যবহার করা হয়।

(খ) শ্রেণীভিত্তিক সময়-তালিকাঃ এরূপ সময়-তালিকা এক একটি শ্রেণীর জন্য তৈরি করা হয়। শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত ও নির্ধারিত পাঠ্য-তালিকার প্রতিটি বিষয়ের কোন্ অংশ কোন্ কোন্ দিনের কোন্ কোন্ ঘণ্টায় পড়ানো হবে তার নির্দেশ থাকে শ্রেণীভিত্তিক সময়-তালিকায়। এর মধ্যে শিক্ষাগত (academic) ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের (curricular activites) উল্লেখ থাকাও বাঞ্ছনীয়। এরূপ সময়-তালিকা প্রতিটি শ্রেণীতে যেমন স্থাপন করা যায় তেমনি সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য একখানি সাধারণ বোর্ডের ওপর স্থাপন করা যায়।

(গ) শিক্ষকভিত্তিক সময়-তালিকা (Teacher-wise Time-Table)ঃ এরূপ সময়-তালিকায় প্রত্যেক শিক্ষকের দৈনন্দিন সময়সূচী সহ সারা সপ্তাহের কর্মসূচী নির্দেশ করা থাকে। শিক্ষকভিত্তিক সময়-তালিকা শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষে ও প্রধান শিক্ষকের কক্ষে সংস্থাপন করা হয়। সাধারণতঃ এরূপ সময়-তালিকা বৃহদাকারের হবে তাতে সন্দেহ নেই। অনেক বিদ্যালয়ে সময় তালিকা নিয়ন্ত্রণ করেন সহকারী প্রধান শিক্ষক। তাই তাঁর কক্ষেও ঐ সময় তালিকার একটা কপি রাখা হয়।

(ঘ) অন্যান্যঃ উল্লিখিত সময়-তালিকা ছাড়াও প্রথমতঃ, শ্রেণীশিক্ষক ব্যবস্থায় (Class teacher System) শ্রেণীশিক্ষক নিজের শ্রেণীর জন্য পৃথক সময়-তালিকা রচনা করেন। দ্বিতীয়তঃ, বিষয়-শিক্ষক ব্যবস্থায় (Subject teacher system) শিক্ষক তাঁর বিষয়ের পঠন-পাঠনের জন্য নিজের কক্ষে পৃথক সময়-তালিকা (Home-task time-table) রচনা করে শিক্ষার্থীর গৃহে পাঠানুশীলন পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়।

সময়-তালিকা রচনার নীতি (Principles underlying the construction of Time-table) : সময়-তালিকা হল বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ঘড়ি (Second clock)। হৃদযন্ত্রের ন্যায় সামগ্রিক সংগঠনের কর্মভিত্তিক সময়সূচী এই সময়-তালিকা দ্বারা ঘোষিত হয়। সময়-তালিকা প্রণয়নের সময় বহু নীতির বিষয় স্মরণ রাখতে হয়। তাই রচয়িতার ব্যক্তিগত শ্রম, নিপুণতা, বুদ্ধি ইত্যাদি সময়তালিকায় অভিব্যক্ত হয়। এটা একটা সময় সাপেক্ষ কর্মও বটে। সময়তালিকা প্রণয়নের সময় যেসব নীতির কথা স্মরণ রাখতে হয় সেগুলি হল :

(১) **প্রয়োজনীয়তার নীতি** (Principles of need) : নানা উদ্দেশ্যের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। **শিক্ষার্থী-বিচারে** বালকদের বিদ্যালয় ও মেয়েদের পৃথক পৃথক বিদ্যালয় যেমন থাকতে পারে তেমনি বালক ও বালিকা উভয়ের জন্য সহ-শিক্ষামূলক বিদ্যালয় থাকতে পারে। **স্থান-বিচারে** নগর ও শহরের বিদ্যালয় এবং গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয় হতে পারে। **প্রশাসনিক বিচারে** সরকারী বিদ্যালয়, বেসরকারী বিদ্যালয়, মিশনারী বিদ্যালয় ইত্যাদি। তেমনি আবার **শিক্ষার স্তর-বিচারে** প্রাথমিক, মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, উচ্চ বা উচ্চতর মাধ্যমিক, দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়, দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়, বহুমুখী বিদ্যালয় ইত্যাদি। এরূপ বিদ্যালয়ের প্রকারভেদের পশ্চাতে উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের পার্থক্য থাকে। আবার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের পার্থক্য থাকলে কর্মসূচীরও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সময়-তালিকা প্রণয়নের সময় রচয়িতাকে প্রয়োজনীয়তার পার্থক্যের নীতি স্মরণ করেই কর্ম সম্পাদনা করতে হয়।

(২) **সময় ধার্যের নীতি** (Principle of time allotment) : শিক্ষাকর্ম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত বা প্রাপ্ত সময়টুকু সম্পর্কে সচেতন না হয়ে সময় তালিকা রচনা করা যায় না। বিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত মোট সময়ের ওপর নির্ভর করে প্রতিটি বিষয়ের জন্য সময়ের অনুপাত নির্ধারণ করতে হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিদ্যালয়ের জন্য মোট সময় নির্ধারিত হয়। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারিত মোট সময়েরও পরিবর্তন হতে পারে। আবার একটা বিদ্যালয় নিম্নশ্রেণী অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীগুলির জন্য বেশী সময় প্রয়োজন হয়। তাই উচ্চশ্রেণীর মোট সময় অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর জন্য মোট সময়ের পরিমাণ কম হবে। প্রচলিত

বিদ্যালয়ের মোট সময়

প্রথায় দেখা যায় বিদ্যালয়ের জন্য মোট সময় ধরা হয় ৫ঘণ্টা (১১টা থেকে ৪টা)। নিম্নশ্রেণীগুলিকে এক পিরিয়ড আগেই অর্থাৎ ৩টার সময় ছুটি দেওয়া হয়।

এবার টিফিনের সময়টুকু হাতে রেখে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সময় বণ্টন করা প্রয়োজন। সময় বণ্টনের সময় পাঠ্যবিষয়ের গুরুত্ব, জটিলতা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। যেমন, ইংরেজী বিদেশী ভাষা এবং তার ব্যাকরণ (grammar), অনুবাদ (Translation) ইত্যাদি অনেকগুলি অংশ আছে। সুতরাং ইংরেজীর জন্যে অধিক সময় প্রয়োজন। তেমনি আবার

এক একটা পিরিয়ডের জন্য মোট সময়

বিষয়ে জটিলতা বা বিষয়ের দুরূহতার জন্য পিরিয়ডের ব্যাপ্তিকাল কম বেশী হতে পারে। যেমন, অঙ্কশাস্ত্র একাধারে জটিল, অন্যদিকে তার আবার তিনটি অংশ—গণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত। সুতরাং অঙ্কশাস্ত্রের জন্য বেশী সময় প্রয়োজন। সর্বাধুনিক পাঠক্রমে কর্মশিক্ষা, শারীর শিক্ষা, সমাজসেবাকে আবশ্যিক করা হয়েছে। এর জন্যে সপ্তাহের কয়েকটি দিন ও ছুটির পর সময় ধার্য করার প্রয়োজন। সুতরাং আদর্শ ও প্রয়োজনভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ধার্য সময়ের ব্যাপ্তিকাল কমবেশী হতে পারে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়। কারণ একই পিরিয়ডে সকল শ্রেণীতে একই বিষয় পড়ানো হবে এটা কল্পনা করা যায় না। তাই মাঝামাঝি ব্যাপ্তিকাল সর্বত্র গৃহীত। সাধারণতঃ ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট এক একটা তাই মাঝামাঝি পিরিয়ডের ব্যাপ্তিকাল ধরা হয়। টিফিনের পর এই সময়ের পরিমাণ কমিয়ে ৩৫ থেকে ৪০ মিনিটের মধ্যে রাখাই যুক্তিযুক্ত।

বিদ্যালয়ের সময়ের ব্যাপ্তিকাল যদি ৫ ঘণ্টা হয় তাহলে ৩০ মিনিট সময়কে বিরতি হিসেবে ধার্য করলে বাকি ৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিটকে ৭টি অংশে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে ৪০ মিনিটের ৫টি পিরিয়ড এবং ৩৫ মিনিটের ২টি পিরিয়ড হিসেবে

পিরিয়ড

রুটিন করা সম্ভব। অনেকে ৩০ মিনিট বিরতির সময়টুকুকে তিনটি অংশে ভাগ করেন, যথা—৫ মিনিটের দুটি স্বল্পস্থায়ী বিরতি এবং ২০ মিনিটের একটি মধ্যাহ্ন কালীন দীর্ঘ বিরতি।

দ্বাদশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীগুলির জন্য অনুমোদিত বিষয় পঠন-পাঠন ৫ ঘণ্টায় সম্ভব হয় না। তাই অনেক স্কুল ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত মোট ৬ ঘণ্টা

শ্রেণী-পঠনের মোট সময় ধার্য করে। এর দ্বারা একটা পিরিয়ড যেমন বেড়ে যায়, তেমনি অন্যান্য পিরিয়ডের সময়ও একটু বেড়ে যায়। বাড়তি পিরিয়ডটিকে বিজ্ঞান, কারিগরি প্রভৃতির ব্যবহারিক ক্লাশ (Practical class) বা প্রয়োজনীয় ঐচ্ছিক বিষয়ের (Elective subject) ক্লাশ বাড়ানো যায়। তবে বিদ্যালয়ের মোট সময় বৃদ্ধি করে উপযুক্ত টিফিনের ব্যবস্থা থাকাই যুক্তিযুক্ত।

বিদ্যালয়ের সময়কে দীর্ঘায়িত করার প্রবণতা ও যুক্তি

(৩) **অবসন্নতা প্রসঙ্গ** (Incidence of Fatigue): সময়-তালিকা রচনায় অবসন্নতা বিষয়টি নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কারণ, দুরূহ ও জটিল পাঠ্য বিষয়গুলি শিক্ষণের সময় শিক্ষার্থীদের অধিক মনোযোগ প্রদানের প্রয়োজন হয়। ফলে তাদের মনের ওপর স্বাভাবিকভাবে চাপ সৃষ্টি হয় ও সহজে চিন্তাশক্তি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই সময়-তালিকায় দুরূহ বিষয়গুলিকে সন্নিবেশ করার নীতিগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষায় দেখা গেছে বিদ্যালয় শুরুর কিছুক্ষণ পর থেকে শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্লান্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে মাঝে বিরতির (tiffin) জন্য ক্রমাগত ক্লান্তি বৃদ্ধির পথে একটু ছেদ পড়ে। বিদ্যালয়ের মোট সময়কে বিরতির পূর্বে ও পরে বা সকাল ও বিকাল এই দুটি অংশে ভাগ করা যায়। সকালের নির্দিষ্ট অংশ বিকালের অনুরূপ (Corresponding) অংশ অপেক্ষা সর্বদা শিক্ষানুকূল। বিকালের শুরু অপেক্ষা সকালের শুরু, বিকালের মধ্যভাগ অপেক্ষা সকালের মধ্যভাগ, বিকালের শেষ অপেক্ষা সকালের শেষ অনেক শিক্ষানুকূল। কিন্তু সকালের শেষ অংশ অপেক্ষা বিকালের প্রথমাংশ তত বেশী ক্লান্তিকর নয়। সকালে বিদ্যালয়ের শুরু থেকে বিরতি পর্যন্ত ক্লান্তি একটানা বেড়ে চলে। বিরতির সময় একটু ছেদ পড়ে বটে কিন্তু বিকেলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আবার একটানা ক্লান্তি বেড়ে চলে। অবসন্নতার প্রক্রিয়ার সঙ্গে কর্মক্ষমতার সম্পর্ককে আমরা তিনটি স্তরে ভাগ করে নিতে পারি ; যথা—

(১) তাপিত করার স্তর (Warming up stage)

(২) পূর্ণকর্মের স্তর (Full working stage)

(৩) পতনের স্তর (Falling off stage)

বিজ্ঞানের স্থিতি-জড়তার (Inertia of rest) নীতি অনুসারে বিশ্রাম অবস্থা মানসিক অবস্থার অনুরূপ অবস্থায় থেকে যেতে চায়। তাই সকালের

প্রথম পিরিয়ডে শিক্ষার্থীর মনকে কর্মসম্পাদনের অনুকূলে একটু গরম করে নেওয়া হয় (warming up stage)। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিরিয়ডে কর্মশক্তি পরিপূর্ণ উপায়ে কর্মসম্পাদন করে (Full working stage)। এরপর মানসিক অবসন্নতা কর্মশক্তিকে হ্রাস করে (Falling off stage)। তখন বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। বিশ্রামের জন্য খুব বেশী সময় ব্যয় না করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, এর দ্বারা স্থিতি জড়তা কর্মশক্তিকে হ্রাস করবে। বিকালে পুনরায় ক্লান্তি বাড়তে থাকে এবং কর্মশক্তিকে এখানেও তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়।

একই উপায়ে সপ্তাহের দিনগুলির মধ্যে ক্লান্তি, বৃদ্ধি ও কর্মশক্তি প্রযোগের তিনটি স্তর পাওয়া যায়। সোমবার তাপিত করার দিন, মঙ্গল-বুধ-বৃহস্পতি পূর্ণ কর্ম-প্রয়োগের দিন এবং শুক্র-শনি কর্মশক্তি হ্রাসের দিন হিসেবে গণ্য।

সময়ঘটিত ক্লান্তি বিষয়টির সঙ্গে বিষযঘটিত ক্লান্তির সামঞ্জস্যবিধান করে সময়-তালিকা তৈরি করা প্রয়োজন। বিষয়ঘটিত ক্লান্তিভাবটি বিষয়ের দুরূহতা ও জটিলতা থেকে উদ্ভূত হয়। যেমন—অঙ্কশাস্ত্র, ইংরেজী, ভারতীয ভাষা, বিজ্ঞান ইত্যাদি বেশী ক্লান্তিকর। সুতরাং এ বিষযগুলি সকালের দ্বিতীয় ও তৃতীয পিরিয়ড এবং বিকালের দ্বিতীয় পিরিয়ডে সন্নিবেশ করা ভাল। ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়গুলিকে সকালের চতুর্থ পিরিয়ড এবং বিকালের প্রথম অথবা তৃতীয় পিরিয়ডে সন্নিবেশ করা যুক্তিযুক্ত।

সপ্তাহের দিনগুলির মধ্যে বিষয় সন্নিবেশ করার সময় ক্লান্তিমান অনুসারে সাজানো যুক্তিযুক্ত। সোমবারকে চলতি কথায় বলা হয় 'ঝিমানোর দিন' আর শনিবারকে বলা হয় 'পালাবার দিন'। সুতরাং মঙ্গল-বুধ-বৃহস্পতিবারে ক্লান্তিমান বিষয়গুলিকে সংস্থাপিত করা উচিত।

(৪) **বৈচিত্র্যের নীতি** (Principle of Variety): বৈচিত্র্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মনকে সতেজ ও কর্মচঞ্চল করে তোলে। তাই সময়-তালিকা রচনার সময় এই বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। বৈচিত্র্য বিধানের জন্য যে সব বিষয়ের দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করতে হয় সেগুলি হল:

(ক) বিজ্ঞান, কৃষি, কারিগরী ইত্যাদি বিষয়ের ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য পরপর দুটি পিরিয়ড একত্রে নেওয়া যেতে পারে।

(খ) সারাদিন যাতে কোন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের একই কক্ষে বসতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা যুক্তিযুক্ত।

(গ) একই শিক্ষককে যাতে পর পর একই শ্রেণীতে পড়াতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

(ঘ) যেসব বিষয়ের জন্য, সপ্তাহে দুটি বা তিনটি পিরিয়ড পড়ালে চলে সেসব বিষয়কে একদিন অন্তর সময়-তালিকায় সন্নিবেশ করা অত্যাবশ্যক।

(ঙ) একঘেয়েমি এড়াবার জন্যে একই বিষয় পরপর পিরিয়ডে সন্নিবেশ না করাই যুক্তিযুক্ত। যেমন, গণিত ও জ্যামিতি, ভারতের ইতিহাস ও বিশ্বের ইতিহাস ইত্যাদিকে একটি পিরিযডের পরই অন্যটিতে না বসিয়ে ভিন্ন ভি দিনে এবং দূরত্ব রেখে ভিন্ন ভিন্ন পিরিয়ডে সন্নিবেশ করা উচিত।

(চ) বৈচিত্র্য বিধানের জন্য একটি বিষয়কে টুকরো-টুকরো করে বিভিন্ন শিক্ষকের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত নয়। একজন শিক্ষকের ওপর একটি শ্রেণীব একটি বিষয়ের পরিপূর্ণ দায়িত্ব প্রদানের দিকে লক্ষ্য রেখে সময়-তালিকা বচনা করা যুক্তিযুক্ত।

(৫) **সমবণ্টনের নীতি** (Principle of equitable distribution): শ্রমবিভাজনের নীতি অনুসারে শিক্ষণ কর্ম ও আবশ্যিক শিক্ষামূলক কর্মসূচীকে শিক্ষকদের যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়া যুক্তিযুক্ত। অসম বণ্টনের ফলশ্রুতি হল হতাশা, হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি। এসব শিক্ষা-প্রগতির দুবধিগম্য অন্তরায়। সময় তালিকা রচনার সময় সমবণ্টনের নীতি সর্বদা বিবেচ্য বিষয়।

(৬) **অবকাশ ধার্যের নীতি** (Principle of leisure period): প্রতিদিনেব কর্মের মাঝে শিক্ষকদের অবকাশ যাপনের ব্যবস্থা থাকা যুক্তিযুক্ত। বিদ্যালযের মধ্যাহ্ন বিরতির সঙ্গে এরূপ অবকাশ গ্রহণের একটু পার্থক্য আছে। মধ্যাহ্ন বিরতির সময় শিক্ষক কোন কর্মে ব্যস্ত না হযে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে পাবেন। পক্ষান্তরে লিজার পিরিয়ডে শিক্ষক যেমন বিশ্রাম নিতে পারেন তেমনি ব্যক্তিগত কাজ, পরবর্তী পাঠনার প্রস্তুতি, শিক্ষোপকরণ ব্যবহারের জন্য প্রস্তুতি, শিক্ষার্থীদের গৃহের অনুশীলন (Home task) ও শ্রেণীর কাজ (Class task) ইত্যাদি পরীক্ষা ও সংশোধন করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। বিজ্ঞান শিক্ষকদের পরীক্ষাগারে ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজনে এবং ক্লাশের শেষে সাজসরঞ্জাম গোছানোর প্রয়োজনে লিজার পিরিয়ডের ব্যবস্থা থাকা যুক্তিযুক্ত।

(৭) গৃহ পরিবেশ ও সাজসরঞ্জামের সঙ্গে সামঞ্জস্যের নীতি (Principles of adjustment according to Building and equipment) : সময় তালিকা হবে গৃহের স্থানের সঙ্কুলান ও সাজসরঞ্জামের প্রাপ্তব্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা, কক্ষসংখ্যা, ছাত্র সংখ্যা, বিষয় কক্ষের সংখ্যা, সাজসরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের সংখ্যা ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সময়-তালিকা রচনা করতে হয়।

সময়-তালিকার নমনীয়তা ও অনমনীয়তা (Flexibility and rigidity of Time-Table) : শিক্ষা হল একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। এরূপ শিক্ষা প্রগতিশীল আধুনিক পদ্ধতি প্রযোগে বাস্তবায়িত হয়। বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয় সময়-তালিকার নির্দিষ্ট ধারায়। প্রগতিশীল সজীব শিক্ষণ-প্রক্রিয়া পরিচালনায় সময়সূচী হবে নমনীয় (flexible) এবং পরিবর্তনশীল। একই ধরনের সময়-তালিকা চিরকালের জন্য স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। পাঠ্যতালিকা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা, বিদ্যালয় কক্ষ ও সাজসরঞ্জামের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সময়-তালিকা পরিবর্তন করে প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা কর্তব্য। অন্যথায় বিদ্যালয়-জীবনটাই যান্ত্রিক ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে।[1] বর্তমানে কর্মশিক্ষা, শারীর শিক্ষা ও সমাজসেবা আবশ্যিক হওয়ায় সময়-তালিকায় নমনীয়তা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

আধুনিক যুগে অনেকেই সময়-তালিকা সম্পূর্ণ বাতিল করার পক্ষপাতী। তারা বলেন শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে যদি শিক্ষা হয়, তাহলে দেখা যায় শিক্ষার্থীর মধ্যে রয়েছে বৈষম্য। ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-অভিরুচি, গ্রহণ-ক্ষমতা, প্রবণতা ইত্যাদিতে শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষার্থীর দুস্তর ব্যবধান রয়েছে। স্বাধীনতা থাকলে শিক্ষার্থী তার ইচ্ছা, অভিরুচি ও প্রবণতা অনুসারে ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ করতে পারে আবার নাও করতে পারে। কাজ করতে করতে এক এক জনের এক এক সময় ক্লান্তি বা অবসন্নতা আসতে পারে। আবার দেখা যায় যাদের কাছে অঙ্কশাস্ত্র সহজ, তাদের কাছে এ বিষয়টি মোটেই ক্লান্তিদায়ক ও দুরূহ নয়। অপরিবর্তনীয় সময়-তালিকায় শিক্ষার্থী বা শিক্ষকের কোন স্বাধীনতা থাকে না। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ যেমন আরম্ভ করতে হয় তেমনি

---

1. তুলনীয় : "A time table rigid in construction and mechanical in its operation will reduce a school to a static lifeless skeleton."

পুনরায় সময় ঘোষিত হলেই কাজ শেষ করতে হয়। এখানে ইচ্ছা, অনিচ্ছা, রুচি-অভিরুচি, আগ্রহ-প্রবণতার কোন সম্পর্ক নেই। তাই আধুনিক অনেক শিক্ষাবিদ্ সময়-তালিকাকে একেবারে উচ্ছেদ করার পক্ষপাতী। তাই ডাল্টন পরিকল্পনা (*Dalton Plan*), প্রকল্প পদ্ধতি (project method), তদারকী পাঠচর্চা (Supervised study) ইত্যাদি শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় সময়-তালিকার প্রয়োজন হয় না অথবা বাঁধাধরা সময়সূচী অনুসারে এসব পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না। তাই অপরিবর্তনীয় সময়-তালিকার পরিবর্তে অনেক প্রগতিশীল বিদ্যালয় নানা ধরনের কর্মসূচীর নির্দেশ দেয়। সেগুলি হল:

প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও আগ্রহকে কেন্দ্র করে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর সমবায়ে কতকগুলি একক (unit) তৈরি করা হয়। **দ্বিতীয়তঃ,** ব্যবহারিক কাজকর্মের জন্য এসব বিদ্যালয়ে দীর্ঘব্যাপ্তিকাল সহ কয়েকটি পিরিয়ড রচনা করা হয়। **তৃতীয়তঃ,** কতকগুলি পিরিয়ড থাকে যার জন্যে কোন কর্ম নির্দেশ করা থাকে না। শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিরুচি অনুসারে স্ব-স্ব কর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারে। **চতুর্থতঃ,** শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের অভিরুচি ও আগ্রহকে কেন্দ্র করে যে-কোন শিক্ষাদান প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে পারেন অথবা শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে পারেন।

তবে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় সময়-তালিকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সময়ানুবর্তিতার সঙ্গে নিয়মমাফিক কাজ করার উপায় নির্দেশ করে সময়-তালিকা। তবে সম্পূর্ণ অনমনীয় সময়-তালিকা কোন মতে কাম্য নয়। ছাত্র, শ্রেণী, শিক্ষক, পাঠ্যতালিকা ইত্যাদির সংখ্যাগত ও গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাতে সময়-তালিকাকে পরিবর্তন করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রগতিশীল আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় অপরিহার্য কর্তব্য।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়ের নতুন পাঠক্রমকে উপযুক্ত উপায়ে সময়-তালিকায় সন্নিবেশ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ যে আদর্শ সময়-তালিকা প্রচার করেছেন তার নমুনা এখানে প্রদান করা হল।

TABLE—(1)

Total Number of Periods Per Week Required to cover the Syllabus

Class	1st Language	2nd Language	3rd Language	Mathematics	Sciences (Physical and Life)	History	Geography	Work Education etc	Addl. Subject	Total :
X	6	4	3	4	8	3	3	4	3	38
IX	6	4	3	4	8	3	3	3	3	37
VIII	6	4	3	4	6	3	3	4	—	33
VII	6	4	3	4	6	3	3	4	—	33
VI	5	4	—	4	4	3	3	4	—	27

Class—	Number of periods required to cover the entire syllabus :
X	38 × 27 = 1026 periods (all sub.)
IX	37 × 27 = 999 do
VIII	33 × 27 = 891 do
VII	33 × 27 = 891 do
VI	27 × 27 = 729 do

According to the Board's Circular no. 13/67 dated 22 8.76. instructional days in schools should be 200 days including Saturdays which are half-holidays with instructional work of 1000 hours per year. But calculational below has been made on the basis of 160 days (roughly 27 weeks per year).

TABLE—(II)
Numper of Periods Required in a Year to cover the New Syllabus.

SUBJECTS	CLASSES				
	X	IX	VIII	VII	VI
1st Language	162	162	162	162	135
2nd Language	108	108	108	108	108
3rd Language	81	81	81	81	—
Mathematics	108	108	108	108	108
Sciences	216	216	162	162	108
History	81	81	81	81	81
Geogragphy	81	81	81	81	81
Work Education etc.	108	81	108	108	108
Additional sub. on optional basis	81	81			

The working periods mentioned in the table have been calculated on the basis of 160 working days. The number of teaching periods as shown in the table is the minimum requirement to cover the syllabus. The Heads of institutions may allocate the additional number of teaching periods available out of 39 periods per week to subjects according to the requirement.

সময়-তালিকার মূল্য (Value of time-table) : (১) সময়-তালিকা তৈরি হয় শ্রম ও সময় বিভাজনের নীতি অনুসরণ করে। সুতরাং সময়-তালিকার পরিকল্পনায় সময় ও শ্রমের অপব্যয় যেমন হয় না তেমনি অসম বণ্টনের দ্বারা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। সময়-তালিকা শিক্ষকদের মনে দায়িত্বশীলতা জাগিয়ে দেয়। কোন্ সময় কোন্ শ্রেণীতে কি কি বিষয় পড়াতে

হবে বা কোন্ ধরনের শিক্ষাকর্মে আত্মনিয়োগ করতে হবে তা শিক্ষকরা বুঝতে পারেন।

(২) সময়-তালিকা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে। সময়-তালিকার মাধ্যমে উভয়েই কোন্ সময় কোন্ কাজ করতে হবে তা জানতে পারেন। এর দ্বারা কর্মে অনুরাগ সৃষ্টি হয়। নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত কর্ম সম্পাদন করতে না পারায় উভয়ের মধ্যে অপরাধ বোধ জেগে ওঠে। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ক্রমশঃ নিয়মানুবর্তী ও সময়ানুবর্তী হওয়ার প্রয়াস পায়। এ প্রয়াসের দ্বারা তাদের নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পায়।

(৩) সময়-তালিকা রচনার সময়, বিষয়বস্তুর দুরূহতা, জটিলতা, পরীক্ষার গুরুত্ব, বাস্তব প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাই পাঠ্যবিষয়গুলির ক্লান্তিমান (fatigue co-efficient) অনুসারে সময়-তালিকা সন্নিবেশ করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা ক্লান্তির হ্রাস-বৃদ্ধি ও বিষয়ের ক্লান্তিকর অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি পাঠ্যবিষয় ও সহশিক্ষামূলক কর্মে সর্বদা নিয়োজিত থাকতে পারে। সুতরাং সময়-তালিকা অনুসরণ করার সময় ব্যক্তিগত রুচি, প্রবণতা ইত্যাদির কোন প্রশ্ন ওঠে না।

(৪) সময়-তালিকা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সর্বদা কর্মে নিয়োজিত রাখে। পূর্ব-পরিকল্পিত হওয়ায় শিক্ষকরা অনুমোদিত পাঠ্যবিষয় কিভাবে কত দিনে শেষ করা যাবে সেদিকে মনোযোগ দিতে পারেন। সময়-তালিকা প্রতিষ্ঠানের কর্ম-জীবনে যেমন নিয়মানুবর্তিতা নিয়ে আসে তেমনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলার মনোভাব গড়ে তোলে। কারণ সময়-তালিকার দ্বারা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই পরের দিনের কর্ম-সম্পর্কে পূর্ব থেকেই চিন্তা করার সুযোগ পান। ফলে শিক্ষাকর্মকে গতিশীল ও লক্ষ্যমুখী করার সুবিধা হয়।

(৫) সময়-তালিকা পূর্ব-পরিকল্পিত সময়সূচী মাত্র। তাই পরিকল্পনা করার সময় যোগ্য শিক্ষককে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষাকর্ম পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পিরিয়ডের সময়-তালিকায় সন্নিবেশ করা যায়। সময়-তালিকার মনস্তাত্ত্বিক মূল্য নিতান্ত কম নয়। কারণ বিষয়ের ক্লান্তিকরতা, সময়ের ক্লান্তিকরতা, বৈচিত্র্য, পরিবর্তনশীলতা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রেখে তবেই সময়-তালিকা রচিত হয়। তাই সময়-তালিকার মাধ্যমে পরিচালিত বিদ্যালয়ের কর্মজীবনে শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের প্রক্রিয়া অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

আন্তঃসম্পর্ক ও পরিশাসন
(Inter-relationship and Administration)

অধ্যায় পরিচয়ঃ আলোচ্য অধ্যায়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে নেই। তবে যেসব বিষয় এখানে উল্লেখ করা আছে সেগুলি পরিশাসন প্রসঙ্গে আন্তঃসম্পর্কের কথাই ঘোষণা করে। মাতাপিতা-শিক্ষক সহযোগিতা (Parents-teacher co-operation), শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক (Pupil-teacher relationship), বিদ্যালয় পরিদর্শন (School Inspection) ইত্যাদি বিদ্যালয় প্রশাসনের প্রাসঙ্গিক বিষয়। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাকে শিক্ষণে কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করে। তাই উল্লিখিত বিষয়গুলি পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হল।

১। মাতাপিতা-শিক্ষক সহযোগিতা (Parents-Teacher Co-operation)ঃ

সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা (Need for co-operation)ঃ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীর শিক্ষায় নিয়োজিত থাকেন শিক্ষক, আর গৃহ পরিবেশে একই শিক্ষার্থীর লালন-পালন ও আনুষঙ্গিক শিক্ষার দায়িত্ব নেন মাতাপিতা বা অভিভাবক। বিদ্যালয়ে শিক্ষক হলেন শিক্ষার্থীর 'মাতাপিতা স্থানীয়' (loco-parents) এবং গৃহে মাতাপিতা বা অভিভাবক হলেন 'শিক্ষক-সদৃশ'। শিক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকের প্রচেষ্টা যদি-সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে তার শিক্ষা সম্পূর্ণতার দিকে গতিশীল হতে পারে। কারণঃ

(১) শৈশবে শিশু তার মাতাপিতাকে কেন্দ্র করেই আপন গণ্ডী রচনা করে। সে অতি অনুকরণপ্রিয়—তার গৃহ-পরিজনদের আচার-আচরণ সে অনুকরণ করে—গৃহই তার প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্র। গৃহ পরিবেশে মাতাপিতাই তাকে নিরাপত্তা দান করেছেন। তাই শিশুমনের ওপর মাতা-পিতার প্রভাব অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী। কাজেই শিশুর শিক্ষাকে যদি সার্থক করে তুলতে হয় তাহলে শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মাতাপিতা ও শিক্ষকের সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

(২) আধুনিক শিক্ষানীতিতে 'শিক্ষা' শব্দটি অতি ব্যাপক অর্থে গৃহীত। বিদ্যালয়ে তথ্যমূলক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে এ-শিক্ষা সমাপ্ত হয় না। পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের শিক্ষাই হল প্রকৃত শিক্ষা এবং এটি একটি অবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার প্রবাহ। বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় এর একটি অংশ মাত্র সমাপ্ত হয়। বাকি অংশ পড়ে থাকে মাতাপিতা, পরিবার ও সমাজের ভূমিকার মধ্যে। শিক্ষার্থীর মাতাপিতার মাধ্যমে সমগ্র পরিবার ও সমাজের সঙ্গে শিক্ষা-প্রক্রিয়া গতিশীল হয়ে ওঠে। তাই শিক্ষাবিদ্‌রা শিক্ষক ও মাতাপিতার ভূমিকার মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতা রচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

(৩) আবাসিক বিদ্যালয় ছাড়া প্রতিটি দেশের শতকরা ৯১টি বিদ্যালয় দিবাকালীন। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা অতিবাহিত করে। বাকি ১৭ থেকে ১৯ ঘণ্টা তারা গৃহ-পরিবেশে মাতাপিতার সঙ্গে কাটিয়ে দেয়। তাহলে শিক্ষার্থী শিক্ষক অপেক্ষা মাতাপিতার সান্নিধ্যে অধিক সময় থাকে। সুতরাং শিক্ষক অপেক্ষা মাতাপিতাই শিক্ষার্থীকে ভালভাবে জানেন। শিক্ষার্থীর রুচি-অভিরুচি, সহজাত প্রবৃত্তি, আচার-আচরণ, প্রেরণা ও প্রবণতা মাতাপিতার কাছে সুস্পষ্ট। অথচ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর উল্লিখিত বিষয়গুলি জেনেই শিক্ষককে শিক্ষাদানে অগ্রসর হতে হয়। সুতরাং শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ জানতে গেলে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর মাতাপিতার সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করতে হয়। অন্যথায় শিক্ষাদানে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

(৪) শিক্ষার্থীর শিক্ষা তার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ওপর নির্ভর করে। আবার তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার জন্য পরিবারের দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। বিশেষতঃ মানসিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে গৃহ-পরিবেশের প্রভাব খুব বেশী লক্ষ্য করা যায়। যে-কোন প্রকার অসুস্থতা প্রতিরোধ করা যেমন প্রয়োজন তেমনি রোগমুক্তির জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। এসব ব্যাপারে শিক্ষক ও মাতাপিতার পক্ষ থেকে যৌথ কর্মসূচী অনুসরণ করা দরকার। তাই শিক্ষক ও মাতাপিতার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

(৫) বিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয় ও সহ-পাঠ্যসূচীর কর্মের মাধ্যমে সামাজিক প্রয়োজন-ভিত্তিক বহু বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। বাঞ্ছনীয় গুণ বিকাশ, সু-অভ্যাস গঠন, স্বাস্থ্যপালন—ইত্যাদিও বিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার্থী পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলিতে যদি গৃহ পরিবেশে অনুশীলন করে তবেই আনুষ্ঠানিক

শিক্ষা পূর্ণতার দিকে গতিশীল হবে। শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব গৃহ-পরিবেশে এসব বিষয় কিভাবে কতটুকু অনুসরণ ও অনুশীলন করে তা শিক্ষককে একান্তভাবে জানতে হয়। পক্ষান্তরে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর পাঠোন্নতি কিভাবে কতটুকু হল সে সম্পর্কে মাতাপিতাকে অবহিত হতে হয়। শিক্ষক ও মাতাপিতার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা শিক্ষার্থী সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপায়ে জানবার সুযোগ সৃষ্টি করে।

তাহলে শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে সার্থক করতে হলে শিক্ষক ও মাতাপিতার মধ্যে নিগূঢ় যোগসূত্র রচনা করা ও তাঁদের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতার সূত্র সৃষ্টি করা শিক্ষক তথা বিদ্যালয়ের অপরিহার্য কর্তব্য।

সহযোগিতার সমস্যা (Problem of co-operation): বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাতাপিতার মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতার সূত্র রচনার **প্রথম ও প্রধান অন্তরায়** হল এদেশের নিরক্ষরতা। আমাদের দেশে মাতাপিতার মধ্যে শতকরা ৮০ জনই নিরক্ষর। তাঁরা শিশু প্রতিপালন, শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে শুধু অক্ষম নন, উদাসীনও। এজন্য শিক্ষা সংস্কার করা মনে করেন, শিশুর শিক্ষা-সমস্যা অপেক্ষা তার মাতাপিতার নিরক্ষরতা সমস্যা অধিকতর প্রকট। তাই বয়স্ক শিক্ষা (adult education) শিশু-শিক্ষার একটি শর্ত। তাদের নিরক্ষরতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দারিদ্র, ব্যাধি, সামাজিক গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও শিশু-শ্রমের (chlid labour) অস্তিত্ব। এগুলি দীর্ঘদিন শিক্ষক ও মাতাপিতার মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার পথে এবং শিশু-শিক্ষার সার্থক রূপায়ণে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয় অন্তরায় হল শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে **স্বাতন্ত্র্য বোধের অস্তিত্ব**। **একদিকে** শিক্ষকরা মনে করেন, তাঁরা জ্ঞানে-গুণে সাধারণ অশিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত অভিভাবকদের অপেক্ষা উন্নত স্তরের মানুষ। শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যাপারে অভিভাবকদের কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। **অন্যদিকে** অভিভাবকরা মনে করেন শিক্ষকরা গুণে ও পাণ্ডিত্যে স্বতন্ত্র বা উন্নত শ্রেণীর মানুষ। তাঁদের ওপর সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে তারা নিশ্চিন্ত। সন্তানদের পাঠোন্নতি সম্পর্কে কোন খোঁজখবর তারা রাখেন না বা এ সম্পর্কে নিজেদের কোন ভূমিকা আছে বলে মনে করেন না। সন্তানদের প্রয়োজনীয় পুস্তক, খাতা-পেন্সিল সরবরাহ করে অধিকাংশ অভিভাবক দায়িত্ব শেষ করেন।

শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার **তৃতীয় অন্তরায় হল শিক্ষার পরীক্ষাধর্মিতা।** শিক্ষার্থীর ব্যক্তি ও সমাজসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ আজ শিক্ষার লক্ষ্যবস্তু না হয়ে পরীক্ষা পাসই হয়ে পড়েছে শিক্ষার লক্ষ্য। পরীক্ষাই যদি লক্ষ্য হয় তাহলে অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার কোন প্রয়োজন থাকে না। বিত্তশালী অভিভাবক টাকা দিয়ে শিক্ষকের সেবা (Service) ক্রয় করেন। শিক্ষক প্রাইভেট পড়ানোর মাধ্যমে দু-পয়সা উপার্জনের চেষ্টা করেন। এর দ্বারা শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা-সাগর পার করার ওপর গুরুত্বই কেবলমাত্র আরোপ করা হয়।

অবশেষে বলা যায়, **শিক্ষকের নেতৃত্ব সুলভ ব্যক্তিত্বের অবনতি** শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থী বিক্ষুব্ধ। অভিভাবক শিক্ষার্থীর সামনে শিক্ষকের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে তৃপ্তি বোধ করেন। সন্তানের পাঠোন্নতি সম্পর্কে আশানুরূপ সাফল্যের অভাবে অনেকে শিক্ষক সহ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। এটা শিক্ষকের নেতৃত্বদানের ক্ষমতা ও গুণের অভাব ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এসব বিড়ম্বিত অবস্থার অবসান ঘটানো সম্ভব। শিক্ষার্থীর মাতাপিতা বা অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের মঙ্গল কামনা নিশ্চয়ই করেন। তাদের সন্তানের ব্যক্তিত্ব ও সমাজসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ হোক—এটা তাদের আন্তরিক কামনা। তাই মাতাপিতা বা অভিভাবকের সহযোগিতার জন্য যদি কোন পক্ষ থেকে আহ্বান আসে তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই সে আহ্বানে সাড়া দেবেন। এখন প্রশ্ন হল, কে বা কারা তাদের আহ্বান জানাবেন? উত্তরে বলা যায়, মাতাপিতা ও অভিভাবকে আহ্বান জানানো এবং তাদের সহযোগিতাকে সক্রিয় করার নৈতিক এবং অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য শিক্ষকের তথা বিদ্যালয়ের। কি কি উপায়ে মাতাপিতার সহযোগিতা (Parental co-operation) লাভ করা যায় বিদ্যালয়কেই তার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।

মাতাপিতার সহযোগিতা অর্জনের উপায় (How to secure Parental Co-operation)* : শিক্ষার্থীর মঙ্গলার্থে গৃহ-পরিবেশ ও বিদ্যালয়-পরিবেশের ব্যবধান দূর করা ও শিক্ষক মাতাপিতার সক্রিয় সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার

---

* Means of co-operation between the home and school.

প্রয়োজনীয়তার কথা সর্বজনস্বীকৃত। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা নানা উপায়ে গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগসূত্র রচনার বিষয়টি চিন্তা করেছেন। এরূপ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আলোচনা করা হল :

(১) বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি (Managing Committee)**:** বিদ্যালযের পরিচালক সমিতিতে মাতাপিতা বা অভিভাবকদের একাধিক নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকেন। নির্বাচনের পূর্বে বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করার জন্য প্রতিনিধিরা চেষ্টা করেন। তবুও প্রতিনিধির মাধ্যমে বিদ্যালয ও গৃহের যোগাযোগ সার্থক হয না। কারণ গ্রাম বা শহরের সাধারণ অভিভাবকরা বিদ্যালযের শিক্ষকদেব সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন না।

(২) বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে মাতাপিতাকে আমন্ত্রণ (Invitation to Parents in School's function)**:** প্রতি বছর বিদ্যালযে নানা ধরনের অনুষ্ঠান পালন করা হয, যেমন—রবীন্দ্র জয়ন্তী, নেতাজী দিবস, স্বাধীনতা-দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস, মনীষীদের শতবর্ষ, পুরস্কার বিতরণী সভা, বার্ষিক ক্রীডানুষ্ঠান ইত্যাদি। এরূপ প্রতিটি অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাতাপিতা বা অভিভাবকদের সাদব আমন্ত্রণ কবা বাঞ্ছনীয। এর দ্বারা শিক্ষক ও মাতাপিতার মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয।

(৩) মাতাপিতার নিকট বিবরণ পেশ (Reporting to the parents)**:** নানা উপায়ে মাতাপিতাকে তাঁদেব সন্তানেরশিক্ষা-উন্নযন ও বিদ্যালয় পরিবেশে কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা যায। **প্রথমতঃ,** আনুষ্ঠানিক বিবরণের দ্বাবা সন্তানেব শারীরিক, মানসিক অবস্থা, মূল্যাযনেব ফলশ্রুতি, বিদ্যালযের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, সহপাঠ্যসূচীতে শিক্ষার্থীর সাফল্য ইত্যাদি বিষয মাতাপিতাকে জানানো যায এবং সন্তানের মঙ্গলার্থে তাদেব পরামর্শ গ্রহণ করা যায। **দ্বিতীয়তঃ,** শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীব মঙ্গলার্থে তাব মাতার বা পিতার সঙ্গে পত্রালাপ কবতে পারেন। **তৃতীয়তঃ,** শিক্ষার্থী তার নিজের অভিরুচি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেরণা ও প্রবণতা, মূল্যাযনের ফলশ্রুতি ইত্যাদি সম্পর্কে যাতে মাতাপিতাকে পত্র লেখে তার জন্য শিক্ষক তাকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করতে পাবেন।

(৪) যোগাযোগের জন্য শিক্ষক নিয়োগ (Appointment of visiting teacher)**:** গৃহ-পরিবেশ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে যোগসূত্র রচনার জন্য

পৃথক শিক্ষক নিয়োগ করা অথবা নিয়োজিত শিক্ষকদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা বাঞ্ছনীয়। সাক্ষাৎকারী শিক্ষক শিশুর মাতাপিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী সম্পর্কে চলতি (up-to-date) সংবাদ সরবরাহ করবেন এবং গৃহ-পরিবেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন। এছাড়া শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় কর্মসূচী ও গৃহকর্মসূচীর মধ্যে যথাসাধ্য সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করবেন ও শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কর্মধারা সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করবেন। এইভাবে সাক্ষাৎকারী শিক্ষক বিদ্যালয় ও গৃহের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রচনা করতে পারেন।

(৫) মাতাপিতা শিক্ষক সংঘ (Parents-Teacher Association) ঃ বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীর মঙ্গলার্থে মাতাপিতা ও শিক্ষক সংঘ একটি কার্যকর সংস্থা। পৃথিবীর শিক্ষোন্নত দেশগুলিতে এরূপ সংস্থা নানা উপায়ে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে স্থাপিত হয়েছে 'The Home and School Association.' আমেরিকায় জাতীয় পর্যায়ে স্থাপিত হয়েছে—'National Congress of parents and Teachers' নামক সংস্থা। গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ আমেরিকার নাগরিকরা দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষাসংস্থার সঙ্গে জাতীয় বৃহত্তম সংস্থার যোগসূত্র স্থাপন করে সামগ্রিক শিক্ষোন্নয়নের চেষ্টা করে চলেছেন। এরূপ একটি সংস্থার চেষ্টায় মাদ্রাজের বিদ্যালয়-জীবনের অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। তাই মাতাপিতা ও শিক্ষকদের সংঘ দেশব্যাপী সর্বত্র গড়ে উঠুক এটা সর্বজনকাম্য এবং বাঞ্ছনীয়।

(ক) সংঘের সংগঠন (Organisation of the Association) ঃ গণতান্ত্রিক উপায়ে এই সংঘের সংগঠন হওয়া উচিত। সংঘের **সভ্যদের দুটি অংশ থাকবে**—(১) শিক্ষকরা হবেন স্থায়ী সভ্য এবং (২) মাতাপিতা বা অভিভাবকরা হবেন অস্থায়ী সভ্য। যতদিন সন্তানসন্ততি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী থাকবে ততদিন তাদের মাতাপিতা বা অভিভাবকরা সংঘের সভ্য হিসেবে গণ্য হবেন।

প্রথমতঃ, সংঘের কার্যকরী সমিতির **সভাপতি** হবেন প্রধান শিক্ষক অথবা কোন গণ্যমান্য প্রতিনিধিস্থানীয় অভিভাবক। সংঘের সাধারণ সভায় সভাপতিকে নির্বাচন করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সংঘের **সহ-সভাপতি থাকবেন দু-জন**—একজন শিক্ষক এবং আর একজন অভিভাবক। প্রয়োজন হলে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে সহ-সভাপতি নির্বাচন করা যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ, **দু-জন যুগ্ম-সম্পাদক** (Joint Secretary) এবং **দু-জন সহকারী যুগ্ম-সম্পাদক** (Asstt. Joint Secretary) সংঘ পরিচালনা করবেন। উভয় ক্ষেত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে একজন শিক্ষক ও আর একজন অভিভাবককে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। সংঘের আর্থিক দিক তত্ত্বাবধানের জন্য থাকবেন একজন তহবিল রক্ষক (Treasurer)।

সংঘের অফিস স্থাপিত হবে বিদ্যালয়ের যে-কোন একটি কক্ষে। অফিসের আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম, খাতাপত্র, শীলমোহর ইত্যাদি পৃথক হবে। সংঘের টাকাপয়সা থাকবে পোস্ট অফিসে অথবা নিকটবর্তী কোন ব্যাঙ্কে। বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক বিষয় ও উপস্থিত সমস্যাদি আলোচনার জন্য মাসে একবার কার্যকরী সমিতির মিটিং বসলে ভাল হয়।

(খ) সংঘের কার্য (Functions of the Association) : মাতা-পিতা, শিক্ষক সংঘগৃহ ও বিদ্যালয়-পরিবেশের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র রচনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য হল বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর মঙ্গলের জন্য শিক্ষক ও মাতা-পিতার প্রচেষ্টার মধ্যে সহযোগিতা-মূলক কর্মকে সক্রিয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা। সুতরাং সংঘের প্রাসঙ্গিক ও উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী হল :

(i) শিক্ষণের উন্নয়ন : শিক্ষকের শিক্ষণ সম্পর্কিত নানা সমস্যা থাকতে পারে। আবার বিদ্যালয়ের প্রদত্ত পাঠ শিক্ষার্থীদের স্ব-স্ব গৃহে অনুশীলন করতে হয়। সেখানেও নানা সমস্যা থাকতে পারে। অভিভাবক-শিক্ষক সংঘ শিক্ষা সম্পর্কিত এসব সমস্যার সমাধানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন।

(ii) শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা : বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা নানা প্রকৃতির হতে পারে। কারণ বিদ্যালয় হল একটি ছোটখাটো সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এখানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কারণিক, গ্রন্থাগারিক, অভিভাবক, আঞ্চলিক অধিবাসী ইত্যাদি বহু দলের (group) কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়। ব্যক্তিবৈষম্য ও দলীয় বৈষম্যের জন্য চিন্তা ও কর্মের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। এরূপ শিক্ষক-শিক্ষক, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবক, অভিভাবক-পরিচালক ইত্যাদি ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত মতবিরোধে অভিভাবক-শিক্ষক সংঘ সুষ্ঠু পরামর্শ দিতে পারেন। **দ্বিতীয়তঃ**, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তিবৈষম্যের জন্যে যেমন ঝগড়া-ঝাটি হতে পারে তেমনি তাদের মধ্যে অপসঙ্গতি সম্পন্ন (Maladjusted), সমস্যামূলক শিশু (Problem child), অপরাধপ্রবণ শিশু

(Delinquent child) ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের শিক্ষার্থী থাকার জন্য বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে এই সংঘ শৃঙ্খলা সংরক্ষণের অনুকূল উপায় উদ্ভাবন করে শিক্ষক ও অভিভাবকদের পরামর্শ দিতে পারেন।

(iii) দরিদ্র শিক্ষার্থীর সাহায্য ঃ শিক্ষার্থীদের অনেকেই দারিদ্রের দ্বারা প্রপীড়িত হয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। অনেকে কোন প্রকারে পড়াশুনো করে, কিন্তু প্রয়োজনীয় পুস্তক, খাতাপত্র, কালিকলম সংগ্রহ করতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে অভিভাবক-শিক্ষক সংঘ অর্থ সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারেন।

(iv) স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ঃ শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার মৌলিক দায়িত্ব অভিভাবকের। কিন্তু এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিতান্ত কম নয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যচর্চা, স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গঠন, রোগ প্রতিরোধ ও রোগমুক্তির জন্য স্বাস্থ্যকর্মসূচীর মাধ্যমে চিকিৎসার ব্যবস্থা, মধ্যাহ্নকালীন জলযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর প্রতিটি ক্ষেত্রে অভিভাবক-শিক্ষক সংস্থা কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনে সক্রিয় সহযোগিতা দিতে পারেন।

(v) উন্নীতকরণ, বৃত্তিনির্ধারণ ও ভাবী শিক্ষা-পরিকল্পনায় সহায়তা ঃ শিক্ষার্থীর উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীতকরণ, শিক্ষান্তে পেশা বা বৃত্তি নির্ধারণে অথবা উচ্চতর শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও carrier-master-এর সিদ্ধান্ত সর্বাগ্রে বিবেচ্য। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে অভিভাবকের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের মতভেদ জনিত বিরোধ সৃষ্টি হওয়াও স্বাভাবিক। অনেক সময় এরূপ বিরোধ শিক্ষা-পরিবেশের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। এসব ক্ষেত্রে অভিভাবক শিক্ষক সংঘ অধিবেশনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এবং প্রধান শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে পারেন।

(vi) বিশেষ দিবস পালন ঃ বিদ্যালয় ও গৃহকে পরস্পরের সান্নিধ্যে নিয়ে আসার জন্য বা অভিভাবক ও শিক্ষকদের সক্রিয় সহযোগিতাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আলোচ্য সংস্থা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের ব্যবস্থা করতে পারেন। এরূপ অনুষ্ঠানগুলি হল মাতাপিতা দিবস (Parents' Day), মাতৃ দিবস (Mothers' Day), শিক্ষার্থী দিবস (Students' Day), শিক্ষক দিবস (Teachers' Day) প্রভৃতি। অতি নিষ্ঠার সঙ্গে এসব 'দিবস' পালনের জন্য সংঘ যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে।

বিশেষ দিবস পালনের অনুকূল কর্মসূচীকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—শিক্ষা-সংক্রান্ত (Academic) এবং আমোদ-প্রমোদ (Entertainment)। **কর্মসূচীর প্রথমাংশে,** বিদ্যালয়ের বিবিধ সমস্যা, যেমন—শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যা, শিক্ষার উন্নয়নমূলক সমস্যা ইত্যাদি আলোচনা করা যেতে পারে। এর দ্বারা শিক্ষক ও অভিভাবকরা বিদ্যালয়, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা সম্পর্কে অনেক অজানা বিষয় অবগত হতে পারেন এবং বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর মঙ্গলার্থে ফলপ্রসূ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। কর্মসূচীর দ্বিতীয়াংশে খেলাধূলা, কুচকাওয়াজ প্রদর্শন, শিক্ষাপ্রদর্শনী, আবৃত্তি, নৃত্য, গীত, অভিনয় প্রভৃতির আয়োজন করা যুক্তিযুক্ত। তবে শিক্ষার্থীরা যাতে অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখাও বিদ্যালয়ের কর্তব্য। অভিভাবকবৃন্দ তাদের সন্তানদের কার্যকলাপের দ্বারা অনাবিল তৃপ্তি লাভ করবেন—এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

(ছ) শিক্ষা-সমাবেশ : অভিভাবক-শিক্ষক সংঘ বিদ্যালয় পরিবেশে মাঝে মাঝে শিক্ষা-সমাবেশের (Educational Conference) ব্যবস্থা করতে পারেন। এখানে আমন্ত্রিত হবেন শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, শিল্পী, সাহিত্যিক প্রভৃতি। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যেমন—শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক বা মাতাপিতা, আঞ্চলিক জনসাধারণ এই সমাবেশে যোগদান করে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষা প্রসারে জাতীয় লক্ষ্য, শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য অবগত হবেন।

এসব কর্মসূচী পালনের দ্বারা সংঘ বিদ্যালয় ও গৃহের ব্যবধান হ্রাস করতে পারেন এবং মাতাপিতা ও শিক্ষকদের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। শুধু তাই নয়, এর দ্বারা বিদ্যালয় নিজে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে একটা সুসংগঠিত ক্ষুদ্রতম সমাজে পরিণত হবে এবং সামাজিক জীবনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগসূত্র রচিত হবে। এছাড়া জনসাধারণ বিশেষ করে অভিভাবকবৃন্দ বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর মঙ্গলার্থে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন; আর গৃহপরিবেশ ও সমাজের সমস্যা বিদ্যালয়ে অনুশীলিত হবে। ফলে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের অভিজ্ঞতা সমাজে ছড়িয়ে পড়বে। আর শিক্ষার্থীদের সামাজিক দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে, বাস্তব জগতের সঙ্গে তাদের পরিচিতি ঘটবে এবং বিদ্যালয় স্থানীয় সমাজের কেন্দ্র হিসেবে পরিণতি লাভ করবে। তবে এর জন্যে অভিভাবক-শিক্ষক সংস্থাকে অনেক বেশী সক্রিয় হতে হবে। মাধ্যমিক

শিক্ষা কমিশনের[1] মতে, শুধু মাত্র পুরস্কার বিতরণী সভায়, অভিভাবক দিবসে বা বছরে দু-একবার মাতাপিতাকে আমন্ত্রণ করলে চলবে না। সংস্কার কর্মসূচীকে অনেক বেশী সম্প্রসারিত করতে হবে।

২। শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক (Pupil-teacher relationship) :

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিদ্যালয় শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা সাধারণতঃ চারটি উপাদানের সন্ধান পাই, যথা—শিক্ষার্থী, শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষামূলক পরিবেশ ও শিক্ষক। উপাদানগুলির মধ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক মূলতঃ মানবিক উপাদানের শ্রেণীভুক্ত। শিক্ষার্থী শেখে ও শিক্ষক শেখান অথবা শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভে সাহায্য করেন। শিক্ষালাভ করা ও শিক্ষালাভে সাহায্য করার ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে একটা শিক্ষা-পরিবেশ। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই মানুষ, তাই তাদের কার্যাবলীর ভেতর দিয়ে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটা প্রকৃতপক্ষে মানবিক সম্পর্ক। সুতরাং শিক্ষা-পরিবেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সংগঠিত সম্পর্কটুকু সম্পূর্ণ মানবিক—এবিষয়ে সন্দেহ নেই। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটি আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের মৌলিক ভিত্তি স্বরূপ।

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষার্থীই হল কেন্দ্রীয় বিষয়। শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা ও গ্রহণ-ক্ষমতা অনুসারে শিক্ষাদানের রীতি সর্বজনস্বীকৃত। তাহলে শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীকে জানবেন ও চিনবেন। তারপর প্রয়োজন অনুসারে তিনি বিষয়বস্তু পরিবেশন করবেন। শিক্ষার্থীকে জানতে বা চিনতে হলে তার সঙ্গে শিক্ষকের সম্পর্ক হবে নিবিড় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। এই নিবিড়তার মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠবে একটা মানসিক সম্বন্ধ। এই মানসিক সম্বন্ধ আবার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগিয়ে তোলে মানবিকতা বোধ ও গণতান্ত্রিক সচেতনতা।

অতীতের গতানুগতিক শিক্ষাধারায় এরূপ চেতনার অভাব লক্ষ্য করা যায়। তখন শিক্ষক ছিলেন প্রভু; আর তাঁর পরিবেশিত বিষয়বস্তু ছিল অবশ্যগ্রাহ্য। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ছিল বিরাট শূন্যতা। শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত বিষয় শিক্ষার্থীকে বাধ্য হয়ে শিখতে হত। শিক্ষার্থীর অভিরুচি, আগ্রহ, প্রবণতা, গ্রহণ-ক্ষমতা বিচার করে শিক্ষাদানের রীতি তখন প্রচলিত ছিল না। তাই সেই

1. S, E. C ; P. 179, Chap. XV.

শিক্ষা জীবনবোধের দ্বারা সঞ্জীবিত হত না। তখন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক গড়ে উঠত, আর শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের দ্বারা দাতা গ্রহীতার মনোভাব সৃষ্টি হত। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষক-শিক্ষার্থীর এরূপ সম্পর্ক স্বীকার করে না।

বাস্তবিকপক্ষে শিক্ষক হলেন বিদ্যালয়ে মাতাপিতার প্রতিকল্প(Substitute) ব্যক্তি। ল্যাটিন ভাষায় ব্যবহৃত Loco Parentis শব্দদ্বয় এই কথার প্রতিধ্বনি করে। তাই বলা হয়, মাতাপিতার মানসিকতা থাকলে তিনিই প্রকৃত শিক্ষকরূপে অভিহিত হতে পারেন। বিদ্যালয়ে আগমনের পূর্বে শিশু মাতাপিতার স্নেহে গৃহ-পরিবেশে অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে। এর পর শুরু হয় বিদ্যালয়-পরিবেশ শিক্ষকের সস্নেহ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। সম্পূর্ণ ভিন্নতর অবস্থার সৃষ্টি হলে শিক্ষার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। তাই বিদ্যালয়ে গৃহের ন্যায় অনুরূপ পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার আর শিক্ষক-শিক্ষিকাকে মাতাপিতার ন্যায় সন্তান দরদী হতে হবে। তাহলে শিক্ষা তার আপন পথ ধরে এগিয়ে যাবে। প্রকৃত পেশাগত প্রবণতা নিয়ে যাঁরা শিক্ষকতায় যোগদান করেন এবং যাঁদের মধ্যে শিক্ষকোচিত গুণ বিদ্যমান তাঁরা সহজে এবং স্বাভাবিক-ভাবে শিক্ষার্থীর মন জয় করতে পারেন। শিক্ষার্থীরাও শিক্ষককে শ্রদ্ধা-ভক্তির মায়াজালে আবদ্ধ করে। এর দ্বারা পরস্পরের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য মানসিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। এ সম্বন্ধ শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদানের পরম সহায়ক—এসম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

বাস্তব শিক্ষা-পরিবেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্ক ভালমন্দ বিচারের ভিত্তিতে সুস্পষ্ট হতে দেখা যায়। শিক্ষার্থীরা কোন শিক্ষক ভাল আর কোন্ শিক্ষক মন্দ তা সহজে বিচার করতে পারে। কোন কোন শিক্ষকের পাঠ-দানের সময় শিক্ষার্থীরা অধৈর্য হয়ে পড়ে; আবার কোন কোন শিক্ষকের আগমনের জন্য তারা শ্রেণীকক্ষে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান থাকে। শিক্ষকোচিত গুণসম্পন্ন দরদী শিক্ষকের কথা শিক্ষার্থীরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভুলতে পারে না। এরূপ শিক্ষকের সান্নিধ্যে শিক্ষার্থীর জীবন ধন্য হয়ে ওঠে। আবার এরূপ শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে ও সমাজের সর্বত্র সমানভাবে শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেন।

দরদী শিক্ষক তাঁর বিদ্যাবত্তা, পেশাগত যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা পরি-চালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সার্থক নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। তাই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ককে বলা হয় নেতা ও অনুসরণকারীর সম্পর্ক। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে

যখন আদানপ্রদানের ভেতর দিয়ে মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সেটা গণতান্ত্রিক চেতনা দ্বারা সমৃদ্ধ হয় তখনই শিক্ষকের নেতৃত্ব কার্যকর হয়।

আজকাল শিক্ষক তাঁর নেতৃত্বসুলভ যোগ্যতা হারাতে বসেছেন। তাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধুর সম্পর্ক এখন তিক্ততায় পরিণত হচ্ছে। এর জন্যে অপরিণত বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীকে দায়ী করা যায় না। শিক্ষক ও সমাজব্যবস্থা এর জন্যে মূলতঃ দায়ী। তাই শিক্ষকের পক্ষ থেকে নেতৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রযোজন। এ কাজে সফলতার জন্য তাঁকে সমাজে অভিভাবকের কাছে ফিরে যেতে হবে। শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের একটা অংশ অতিবাহিত হয় সমাজে অভিভাবক ও পরিজনদের মধ্যে; অন্য অংশ অতিবাহিত হয় বিদ্যালয় পরিবেশে। তাই অভিভাবক ও শিক্ষক উভয়কে যুক্তভাবে সক্রিয় সহযোগিতার দ্বারা শিক্ষার্থীর শিক্ষায় সহায়তা করতে হবে। তবেই শিক্ষকের নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মাতাপিতা ও অভিভাবক অপেক্ষা শিক্ষকের কর্ম অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গৃহ-পরিবেশের শিক্ষা শিক্ষার্থীকে শুধু বাঁচিয়ে রাখে আর শিক্ষকের কাছ থেকে পায় সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার পথের নির্দেশ।

৬। বিদ্যালয় পরিদর্শন (School Inspection):

ইংল্যাণ্ডের ধারায় এদেশে ব্রিটিশ আমলেই শিক্ষাক্ষেত্রে পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরিদর্শন (Inspection) ও পরিদর্শক (Inspector) শব্দ দুটির সঙ্গে যে ভীতি-মনস্তত্ত্বের (Fear Psychology) দুঃখজনক ইতিহাস জড়িয়ে আছে সেটা প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ডেরই অবদান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংল্যাণ্ডে পরীক্ষার ফলের ওপর ভিত্তি করে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে আর্থিক অনুদান (Payment of grant by results) দেওয়া হত। বিদ্যালয় পরিদর্শকরাই সেসব পরীক্ষার ব্যবস্থা করতেন। তাঁদের কর্তৃত্ব ছিল অপ্রতিহত। তখন ব্রিটিশের সঙ্গে ভারতবাসীর ছিল শাসক-শাসিতের সম্পর্ক। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র বিদ্যালয় পরিদর্শকদের ক্ষমতাকে সাম্রাজ্যের স্বার্থে প্রয়োগ করার জন্য উৎসাহিত করতেন। পরিদর্শকরা সর্বদা বিদ্যালয়ের ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেন। তাঁদের কাছে পরিচালক সমিতির সভ্য, প্রধান শিক্ষক ও সহ-শিক্ষকরা ছিলেন আমলাতন্ত্রের সেবক, নিম্নতন কর্মচারী মাত্র। পরিদর্শনের সংবাদ শুনলে বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হত। দিবারাত্র চলত নথিপত্রের লুকোচুরি, তথ্যের কারচুপি, ত্রুটি থেকে রক্ষার অপ্রতিহত প্রচেষ্টা। পরিদর্শকের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হত

তোষামোদের পালা। প্রকৃতপক্ষে পরিদর্শক ছিলেন ঘৃণা ও ভয়ের উৎস। তাই তাঁকে এড়ানোই ছিল বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একান্ত প্রচেষ্টা। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে তাঁকে আহ্বান করার প্রবণতা ছিল না। বরং তিনি চলে গেলে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন। এই ছিল ব্রিটিশ আমলের বিদ্যালয় পরিদর্শন ও পরিদর্শকের বিড়ম্বিত চিত্র।

বর্তমানে এদেশে বিদ্যালয় প্রশাসনের দুটি ধারা বিদ্যমান—একটি আভ্যন্তরীণ (Internal), অন্যটি বহির্বিভাগীয় (external)। আভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালক সমিতি, প্রধান শিক্ষক ও সহকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। বহির্বিভাগীয় প্রশাসন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা হল রাজ্য সরকারের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। তাই রাজ্য সরকারের শিক্ষাবিভাগ (State Education Department) কর্তৃক রাজ্যের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়।

রাজ্যের শিক্ষা প্রশাসনে শিক্ষামন্ত্রীর স্থান সর্বোচ্চে। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের দুটি ভাগ—একদিকে আছেন সচিব ও সচিবালয় (Secretariate) এবং অন্যদিকে আছেন শিক্ষা-অধিকর্তা ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ (Directorate)। মন্ত্রিসভায় শিক্ষা-মন্ত্রীকে শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ের সংব্যাখ্যানে সাহায্য করেন সচিব ও সচিবালয়। অন্যদিকে শিক্ষানীতির বাস্তব রূপায়ণে সাহায্য করেন শিক্ষা-অধিকর্তা (D.P.I.)। শিক্ষা-অধিকর্তা বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দ্বারা রাজ্য সরকারের সকল প্রকার শিক্ষা বিভাগীয় কার্য পরিচালনা করেন। বিদ্যালয়স্তরের যোগাযোগ সংরক্ষিত হয় প্রধান পরিদর্শকদের Chief Inspector/Inspectress) সাহায্যে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান পরিদর্শক (Chief Inspector for Primary Education) এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য আছেন মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান পরিদর্শক (Chief Inspector for Secondary Education)।[1]

প্রধান পরিদর্শকরা জিলা স্কুলসমূহের পরিদর্শকদের (D. I. of Schools) দ্বারা জিলার শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করেন। জিলা স্কুলসমূহের পরিদর্শক একদিকে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে, অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনিই জিলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি এবং পদাধিকার বলে ঐ বোর্ডের সচিব (Ex-officio Secretary)।

---

1. এছাড়া আছেন—**Chief Inspector for Social Education, Chief Inspector for Physical Education, Chief Inspector for Technical Education, Chief Inspector for Anglo-Indian Schools etc.**

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শন ও উন্নয়নে জিলা স্কুল পরিদর্শককে সাহায্য করেন সহকারী জিলা স্কুল পরিদর্শক (A. D. I. of Schools) এবং সহকারী পরিদর্শক (Asstt. Inspector of Schools)।

প্রাথমিক ও বুনিয়াদী বিদ্যালয় পরিদর্শন ও উন্নয়নে সাহায্য করেন তাঁর অধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহের অবর-পরিদর্শক (Sub-Inspector of Schools), উপ-সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (Dy-asstt. Inspector of Schools) প্রভৃতি। মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য একই ধারায় মহিলা পরিদর্শকদের (Inspectresses) অফিস বিদ্যমান। এই হল সারা ভারতের বিদ্যালয় পরিদর্শক বিভাগের (Inspectorate) সাধারণ চিত্র।

পরিদর্শন ব্যবস্থার ত্রুটি (Defects in the present System of inspection): সার্থক পরিদর্শন-প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হল শিক্ষককে বাঁধাধরা কর্মতালিকা থেকে মুক্তি দেওয়া, তাঁর মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা এবং তাঁকে স্বকর্মে উদ্যোগী ও আগ্রহশীল করে তোলা। কিন্তু প্রচলিত পরিদর্শন প্রথা খুব বেশী ত্রুটিপূর্ণ। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের[1] মতে আমাদের দেশের বিদ্যালয় পরিদর্শন প্রথার ত্রুটিগুলি হল: (১) বর্তমানে পরিদর্শন ক্রিয়া সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত উদাসীনভাবে সম্পাদিত হয়। (২) পরিদর্শনের জন্য যেটুকু সময় ব্যয় হয় তা এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য যথেষ্ট নয়। পরিদর্শকরা সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের হিসাবপত্র, সময়-তালিকা এবং প্রশাসন প্রক্রিয়ার দিকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে সময় কাটিয়ে দেন। কিন্তু শিক্ষকদের শিক্ষণ-প্রক্রিয়া পরিদর্শন করা ও তাঁদের অসুবিধা দূরীকরণের অনুকূলপরামর্শ দান ইত্যাদির দিকে পরিদর্শকরা গুরুত্ব আরোপ করেন না। ফলে শিক্ষার দিকটা (Academic side) সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়।

(৩) আবার এক এক জন পরিদর্শকের এক্তিয়ারে বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং পারস্পরিক দূরত্ব এত বেশী যে প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং তাঁদের সমস্যার সমাধান করা তাঁর পক্ষে মোটেই সহজ-সাধ্য নয়।

(৪) প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয় পরিদর্শক হলেন বিদ্যালয়ের 'বন্ধু, দার্শনিক ও পরিচালক'। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি অনুদার সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট পরিদর্শন সম্পূর্ণ বিদ্বেষ বা

1. S. E. C.—Page 149 Chap. XIII.

বিরক্তিকর (resentment) না হলেও অমঙ্গল আশঙ্কার (Apprehension) বিষয়রূপে প্রতীয়মান হয়। রাইবার্নের[1] মতে "বিদ্যালয় পরিদর্শক চরম স্বৈরতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করেন। যদিও তাঁর ইচ্ছা সঠিক আইন নয় তবুও বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক পরিদর্শকের ইচ্ছাকে আইনরূপে মর্যাদা দেন।"

(৫) পরিদর্শকরা আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব ও তার বিজ্ঞানভিত্তিক প্রয়োগের দিক থেকে ব্যবহারিক অংশের সঙ্গে পরিচিত নন। গবেষণামূলক কর্মে রত শিক্ষক বা শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁদের কোন যোগসূত্র থাকে না। অফিসের ফাইল-পত্রের মধ্যে তাঁদের কর্মক্ষেত্র সীমিত। তাই বলা হয় "শিক্ষা পরিশাসন শিশুকেন্দ্রিক না হয়ে বাস্তবক্ষেত্রে হয়ে পড়েছে ফাইলকেন্দ্রিক"।[2] তত্ত্বাবধানমূলক (Supervisory) কর্মকে অবহেলা করে প্রশাসনিক (Administrative) কর্মের ওপর অধিক গুরুত্ব অর্পণ করাই পরিদর্শন ব্যবস্থার অমার্জনীয় ত্রুটি।

(৬) শিক্ষার পুনর্গঠন পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নতুন ব্যবহারিক বিষয়, যেমন—কলা, শিল্প, সঙ্গীত, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, কারিগরী প্রভৃতি পাঠ্যবস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। পরিদর্শকরা এসব বিষয়ে মোটেই অভিজ্ঞ নন। সুতরাং এরূপ পরিদর্শকদের দ্বারা শিক্ষার পুনর্গঠন-ক্রিয়া ফলপ্রসূ হতে পারে না।

(৭) শিক্ষা কমিশন[3] (১৯৬৪-৬৬) জিলা পরিদর্শন ব্যবস্থার তিনটি দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, বিদ্যালয়ের সংখ্যার তুলনায় পরিদর্শকদের সংখ্যা নিতান্ত কম (inadequency of number)। দ্বিতীয়তঃ, বেতন হারের স্বল্পতা হেতু তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের ব্যক্তিবর্গ (comparatively poor quality of personnel) পরিদর্শন বিভাগে নিয়োজিত হন। তৃতীয়তঃ, পরিদর্শকদের মধ্যে বিশেষজ্ঞের অভাব লক্ষ্য করা যায়, কারণ অধিকাংশ অফিসারই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত (generalists)।

পরিদর্শকের কর্তব্য (Duties of Inspectors) : বিদ্যালয় পরিদর্শকের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে দুটি স্তরে ভাগ করা যায়, যথা—প্রশাসনিক (Administrative) এবং শিক্ষাগত (Academic)। পরিদর্শকের প্রশাসনিক কর্তব্যগুলি

---

1. "The inspector holds an extremely autocratic position, where, if his will is not exactly law, it is so nearer to it that for all practical intents and purposes the teacher and headmaster regard it as such."

2. Unfortunately our educational administration today instead of being 'child centered' is tending towards becoming only 'file centred'. *Dr.—Diwekar.*

3. Report of the Education Commission, Page 262, 10-37 (3).

বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। এ ব্যাপারে পরিদর্শকরা বছরে অন্ততঃ একবার বিদ্যালয়ের নথিপত্র, হিসাব-নিকাশ, অফিস সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিদর্শন করতে পারেন। তবে এসব দায়িত্ব পালনে তাঁকে সাহায্য করার জন্য থাকবেন যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন সহকর্মী। কারণ, বর্তমানে বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার বিদ্যালয়গুলি এক স্তরের নয়, সেখানেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং পরিদর্শককে যোগ্যতার সঙ্গে প্রশাসনিক কর্ম সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট সময় যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন সহকর্মী।

পরিদর্শকের দ্বিতীয় কর্তব্য হল বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত দিকটি পরিদর্শন করা। এ কাজে বেশী সময় ব্যয় করা পরিদর্শকের অপরিহার্য কর্তব্য। আধুনিক শিক্ষায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও স্তরগত বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে বিবিধ বিষয় বিদ্যালয়স্তরের পাঠ্যহিসেবে অনুমোদিত। প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষণ-পদ্ধতি, নীতি ও কৌশল এবং উপকরণ ব্যবহারে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। তাই একজনের পক্ষে, তিনি যতই শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ হন, বিচিত্র বিষয়ের শিক্ষণ প্রক্রিয়া পরিদর্শন করা ও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক শিক্ষকের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা মোটেই সম্ভব নয়। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করেন যে, বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের প্যানেল করা প্রয়োজন। পরিদর্শক হবেন এই দলের চেয়ারম্যান। প্রতি তিন বছরে একবার পরিদর্শক বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় প্রতিটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে পারেন। কমিশন সুপারিশ করেন যে, প্রধান শিক্ষকদের ভেতর থেকে তিনজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে এরূপ দল গঠন করা যেতে পারে। তাঁরা ক্রমাগত তিনদিন ধরে এক একটা বিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন। তাঁরা প্রধান শিক্ষক ও সহ-শিক্ষকদের সঙ্গে বিদ্যালয়-জীবনের বিবিধ বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবেন। গ্রন্থাগার ও পরীক্ষাগারের সুযোগ-সুবিধা, পাঠক্রম (curriculum), সহ-পাঠক্রমিক কর্মসূচী, ছুটির দিনের সদ্‌ব্যবহার এবং আনুসঙ্গিক শিক্ষাকর্ম হবে তাদের আলোচ্য ও পরিদর্শনের বিষয়। উল্লেখ করা যায় যে, বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ কোন কিছু গোপন না রেখে আলোচনা করাই বাঞ্ছনীয়। এর ফলে পরিদর্শক বিদ্যালয়ের মঙ্গলার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ পাবেন।[1]

1. S E. C ; Chap. XIII, Page 150

শিক্ষা কমিশন[1] মনে করেন যে, প্রশাসনিক (Administrative) এবং তদারকী (Supervisory)—উভয় প্রকার কর্ম একই অফিসারের দায়িত্বাধীন হওয়ায় শেষোক্তটি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ প্রশাসনিক কর্মের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে সেটাই অগ্রাধিকার পায়। তাই কমিশন সুপারিশ করেন যে, পৃথক পৃথক ব্যক্তির ওপর প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান কর্মের দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত। জিলা পরিদর্শকের ওপর থাকবে প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং জিলা শিক্ষা অফিসার (Disirict Education Officer) এবং তার সহকর্মীদের ওপর ন্যস্ত হবে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব। তবে পরিদর্শনের উক্ত দুটি শাখার মধ্যে থাকবে নিবিড় সম্পর্ক। প্রয়োজন বোধে জিলা শিক্ষা অফিসারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ তিনিই বিশেষজ্ঞদের নিয়ে শিক্ষণের উন্নয়ন, শিক্ষকদের পরিচালন ও পরামর্শ দান, তাদের বৃত্তিগত যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষণ ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয় সম্প্রসারণ কৃত্যক (Extension Service)-এর ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয় তত্ত্বাবধান করবেন।

পরিদর্শনের উদ্দেশ্য (Aims of Inspection): জাতির সামগ্রীক উন্নতি শিক্ষার উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সামগ্রীক শিক্ষার উন্নয়নের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের ওপর ন্যস্ত। রাজ্য সরকার শিক্ষা-বিভাগীয় পরিদর্শন ব্যবস্থার (Inspectorate) মাধ্যমে এ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন। পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণের (report) ওপর ভিত্তি করে বিদ্যালয়গুলিকে যেমন অনুমোদন (recognition) দেওয়া হয়; তেমনি সরকারী ও বেসরকারী সকল প্রকার বিদ্যালয়কে যে-কোন ভিত্তিতে (deficit grant, lump grant) আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করা হয়। তাহলে পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা যায়—

প্রথমতঃ, সরকার উপযুক্ত শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমে নির্ধারিত জাতীয় লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে যে মহান দায়িত্ব হাতে নিয়েছেন পরিদর্শন-প্রক্রিয়া সে দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনে সহায়তা করে।

দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়গুলি জাতীয় দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছে এবং দায়িত্ব পালনে বিদ্যালয়গুলির অভাব-অভিযোগও কি কি এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাত হওয়া এবং অনুকূল উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথাযথ পরামর্শ ও নির্দেশ দান করা পরিদর্শনের উদ্দেশ্য।

1. E. C.; Page 264-265.

তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকেন শিক্ষক-সমাজ। তাঁদের শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের ওপর শিক্ষার্থীর শিক্ষা এবং জাতীয় লক্ষ্যের সাফল্য নির্ভর করে। তাই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হল শিক্ষকমণ্ডলীর যোগ্যতা ও গুণাবলীর উন্নয়ন এবং তাদের অভাব-অভিযোগ দূরীভূত করে আত্মোৎসর্গী কর্মে সক্রিয় সহযোগিতা করা। তাই শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট পরিদর্শন হল ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্মোন্নয়নের সহায়ক।

চতুর্থতঃ, শিক্ষার উন্নতিকল্পে সরাসরি শিক্ষকরা যুক্ত থাকলেও পরোক্ষভাবে অভিভাবক, স্থানীয় জনসাধারণ, সমাজসেবক, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ প্রভৃতি সকলেই শিক্ষার্থীর শিক্ষার সঙ্গে জড়িত। এক কথায়, বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থা (agency) সাহায্য করতে পারেন। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হল বিদ্যালয়ের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গ এবং সংস্থাদির মধ্যে সমন্বয় ও সংহতি বিধান করে সামগ্রীক শিক্ষোন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা।

অতীতে পরিদর্শকরা কর্তৃত্ব (authority) প্রয়োগে তৎপর থাকতেন। তখন পরিদর্শনের সঙ্গে ভীতি ও সন্ত্রাস মিশ্রিত ছিল। আজও পরিদর্শকদের যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করা হয়, কিন্তু ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব প্রয়োগের ভাবধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। নতুন ভাবধারায় পরিদর্শকরা বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যই কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন। পরিদর্শন প্রসঙ্গে কর্তৃত্ব প্রয়োগ তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন অধীনস্থ সকলের সক্রিয় সহযোগিতা সহজে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাভ করা যায়। তাছাড়া, বাঞ্ছনীয় পরিদর্শন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক কর্ম অপেক্ষা শিক্ষামূলক কর্মের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভারতের প্রচলিত শিক্ষাপরিদর্শনে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়।

এছাড়া, বিদ্যালয়ের ত্রুটি খুঁজে বের করার জন্য অতীতে পরিদর্শন প্রক্রিয়া পরিচালিত হত। বর্তমানে পরিদর্শনের প্রকৃত স্বরূপ হল বিদ্যালয়ের ত্রুটির সন্ধান করা, ত্রুটি দূর করার ব্যবস্থা করা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সমস্যাবলীর সুষ্ঠ সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করা। এর জন্য পরিদর্শককে ধৈর্য সহকারে আঞ্চলিক পরিবেশ লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

সুতরাং পরিদর্শন-প্রক্রিয়া আজ আর বিদ্যালয়ের চারি দেওয়ালের সীমায় সীমিত নয়। বিদ্যালয় সমাজ আজ জাতির সেবায় উৎসর্গীকৃত। তাই সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক অতি নিবিড়। এই সম্পর্ককে সুদৃঢ় ও ফলপ্রসূ করার জন্য বিদ্যালয় পরিদর্শন-প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়।

আদর্শ পরিদর্শক নির্বাচন (Selection of an ideal Inspector) : আমাদের জাতীয় জীবনে শিক্ষোন্নয়নের মেরুদণ্ড হল বিদ্যালয় পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান।[1] তাই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পরিদর্শক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত। তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতির ফলে শিক্ষাব্যবস্থা যেমন নির্জীব হয়ে পড়তে পারে তেমনি তাঁর উপযুক্ততা শিক্ষার সজীবতা দান করতে পারে। কোন কোন শিক্ষাবিদের মতে শিক্ষকের কর্মে বাধা সৃষ্টি করা, তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা, দুর্বল করা এবং পরীক্ষা করাই পরিদর্শকের কাজ নয়। বরং তাদেরকে শিক্ষণ দেওয়া, শিক্ষালাভে উদ্বোধিত করা, তাঁদের মনে সাহস সঞ্চার করা এবং তাঁদেরকে বিশ্বাস করা আদর্শ পরিদর্শকের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু এ কর্তব্য পালন করতে হলে পরিদর্শককে অশেষ গুণের অধিকারী হতে হবে। অন্যথায় এই কঠিন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই—

প্রথমতঃ, পরিদর্শক হবেন শিক্ষা সম্পর্কে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। আধুনিক শিক্ষার উন্নয়ন, শিক্ষার দর্শন ও তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁকে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। শুধু বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল, নথিপত্র, পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা পরিদর্শন করলে চলবে না। জাতীয় ও সমাজ-জীবনের ক্ষেত্রে সামগ্রীক শিক্ষার উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সার্বিক প্রগতিসাধনের সুষ্ঠ ব্যবস্থা করতে হবে।[2]

দ্বিতীয়তঃ, পরিদর্শককে হতে হবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও আত্মবিশ্বাসে অটল। অতি সাধারণ সমস্যায় তাকে ধৈর্য হারালে চলবে না। তাকে হতে হবে ধীর, স্থির, চিন্তাশীল ও সুবিচারক। কারণ, শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় লক্ষ্যকে সার্থক করার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পরিদর্শকের হাতেই ন্যস্ত।

তৃতীয়তঃ, আধুনিক শিক্ষার পুনর্গঠনের যুগে নতুন আদর্শ, নতুন চিন্তাধারা শিক্ষা-সংস্কারের কাজকে ত্বরান্বিত করছে। শিক্ষা নিজেই একটি জীবন্ত গতিশীল প্রক্রিয়া। সুতরাং, শিক্ষার উন্নয়ন ও সংস্কারের দায়িত্ব যাঁর বা যাঁদের ওপর ন্যস্ত তাঁদেরকে হতে হবে সার্থক পরিকল্পনা রচয়িতা, পরীক্ষণে (experimentation) বিশেষজ্ঞ ও প্রগতিশীল চিন্তা ও কর্মে দক্ষ।

---

1. "Supervision is, in a sense, the backbone of educational improvement.„—E. O. P., 264. 10 44.

2. "In the first place it is necessary for an inspector to be a man of some educational vision with a wide knowledge of modern developments in education and in the philosophy of education.„—*Ryburn*,

চতুর্থতঃ, পরিদর্শককে সৃজনশীল চিন্তা ও কর্মে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। তিনি কেবল বিদ্যালয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচক হবেন তা নয়, তাঁকে মঙ্গলকর কর্মের স্বীকৃতি জানিয়ে কর্মীকে প্রশংসাও করতে হবে। বিদ্যালয়ের সমস্যা নিরসনের ব্যবস্থা করে শিক্ষাকর্মকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা ও ক্ষমতা পরিদর্শকের অপরিহার্য গুণ।

পঞ্চমতঃ, পরিদর্শক হবেন সাংগঠনিক কর্মে সু-অভিজ্ঞ। কারণ, শিক্ষকদের শিক্ষাগত, বৃত্তিগত ও ব্যক্তিত্বের উন্নয়নকল্পে পরিদর্শককে রিফ্রেসার কোর্স (refresher courses), আলোচনা চক্র, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সভা-সমিতি, গোলটেবিল বৈঠক প্রভৃতি সংগঠন করতে হয়। তাই পরিদর্শককে হতে হবে যোগ্য ও সার্থক সংগঠক।

ষষ্ঠতঃ, পরিদর্শককে বিদ্যালয়-পাঠ্যভুক্ত যাবতীয় বিষয়ের ওপর মোটামুটি জ্ঞান এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে হবে। তাছাড়া তাঁকে জানতে হবে একাধিক ভাষা, এর দ্বারা তিনি যে-কোন মাধ্যমযুক্ত (medium of Instruction) বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন।

সপ্তমতঃ, বিদ্যালয় পরিদর্শককে হতে হবে সমন্বয় ও সংযোগ সাধনে সু-অভিজ্ঞ ব্যক্তি। কারণ, সরকারী শিক্ষাদপ্তর, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ, স্কুল বোর্ড, বিদ্যালয় ও সামাজিক সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করার দায়িত্ব ও কর্তব্য তাঁর ওপর ন্যস্ত। প্রশাসনিক যোগাযোগ ও সমন্বয় ছাড়াও শিক্ষাগত সমন্বয়ের দায়িত্বও পরিদর্শককে পালন করতে হয়। পরিদর্শনের সময় কোন বিশেষ বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-প্রক্রিয়া প্রগতিশীল মনে হলে তিনি অন্যান্য বিদ্যালয়ে অনুরূপ প্রক্রিয়া প্রচলন করার ব্যবস্থা করতে পারেন। এর দ্বারা শুভ ও প্রগতিশীল প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

অবশেষে বলা যায়, পরিদর্শককে হতে হবে শিক্ষা-কর্মের নেতা। তাই তিনি হবেন নেতৃত্বসুলভ বিবিধ গুণের অধিকারী। কর্মে উদ্যোগ ও আন্তরিকতা, স্বহস্তে কর্ম-পরিকল্পনা ও সম্পাদনের সক্ষমতা; ব্যবহারে সহানুভূতি সহধর্মিতা ও নিরপেক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসংযম, প্রগতিশীল প্রস্তাব গ্রহণের মনোভাব, প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, বিদ্যাবত্তা ও বিদ্যোৎসাহিতা প্রভৃতি অপরিহার্য নেতৃত্ব- সুলভ গুণে পরিদর্শক হবেন সকলের আদর্শস্থানীয়।

আমাদের দেশে পরিদর্শক নিয়োগের ব্যাপারে কর্মপ্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করা হয় কিন্তু অভিজ্ঞতা ও উল্লিখিত গুণাবলীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। আবার একবার পরিদর্শক হিসেবে নিয়োজিত হলে সে ব্যক্তি অবসর গ্রহণের কাল পর্যন্ত ঐ পদে (প্রমোশন সহ) বহাল থাকেন। মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন মনে করেন, পরিদর্শকের পদপ্রার্থীকে অনার্স অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ধারী হতে হবে এবং শিক্ষকতায় দশ বছরের অভিজ্ঞ অথবা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে অন্ততঃ তিন বছরের অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ঐ পদে নিযুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত। উপরন্তু, সরাসরি পরিদর্শক নিয়োগের জন্য নিম্নরূপ ব্যক্তিদের ভেতর থেকে নির্বাচন করা যেতে পারে :

(i) শিক্ষকতায় দশ বছরের অভিজ্ঞ।

(ii) উচ্চতর বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক।

(iii) শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যাপক।

উপরিউক্ত ব্যক্তিদের ভেতর থেকে তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য পরিদর্শক নির্বাচন ও নিয়োগ করা উচিত। নির্ধারিত বছরান্তে তাঁরা স্ব-স্ব পদে ফিরে যাবেন। প্রথম স্তরে (in the initial stage) অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ জনকে এইভাবে নিয়োগ করা কর্তব্য। এর দ্বারা শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা পরিদর্শন সম্পর্কে প্রযোজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন এবং পরিদর্শকও বিদ্যালয়ের সমস্যাবলীর সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে স্ব-স্ব অভিজ্ঞতাকে শিক্ষোন্নয়নে প্রয়োগ করতে পারবেন। শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার এই আদান-প্রদান সামগ্রিক শিক্ষোন্নয়নের পরম সহায়ক— এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

একই পদে বহাল থাকতে থাকতে কর্মে যেমন একঘেয়েমি সৃষ্টি হয় তেমনি শিক্ষা সম্পর্কিত নতুন নতুন তত্ত্ব, আবিষ্কার ও গবেষণা সম্পর্কে পরিচিতিও কমে আসতে থাকে। শিক্ষাকে প্রগতিশীল ও সজীব রাখার প্রয়োজনে শিক্ষা-কমিশন (১৯৬৪-৬৬) শিক্ষাবিভাগীয় পদস্থ কর্মচারীদের জন্য আন্তঃবৃত্তি-শিক্ষণের (in-service training) ব্যবস্থাপনার কথাও উল্লেখ করেছেন।

———

চতুর্থ অধ্যায়

সহ-পাঠ্যসূচী সংগঠন[1]

(Organisation of Co-curricular Activities)

অধ্যায় পরিচয় : পাঠ্যসূচীর পাশাপাশি সহ-পাঠ্যসূচীর পরিকল্পনা ও সংগঠনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা জড়িত। কারণ, সহ-পাঠ্যসূচীর কর্মক্রমকে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে গেলে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার প্রয়োজন। অন্যথায় বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। তাই শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা, শৃঙ্খলা, নির্দেশ ইত্যাদির সঙ্গে শিক্ষার্থীর স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গটিকেও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হল। কারণ সংগঠিত ছাত্র সংস্থার সহায়তা ছাড়া সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।]

১। সহ-পাঠ্যসূচী (Co-curricular Activities) :

অভিধানিক অর্থে পাঠ্যসূচী হল কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য শিক্ষার্থীদের উপযোগী পঠিতব্য বিষয়; কিন্তু এটা পাঠ্যসূচীর গতানুগতিক সংকীর্ণ অর্থ। নব্য শিক্ষাতত্ত্বে পাঠ্যসূচীকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়। পার্সিনান (*T. P. Nunn*) পাঠ্যসূচীর ব্যাপক অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, শিক্ষার বিষয়বস্তু ও জীবন অভিন্ন। পাঠ্যসূচীর মধ্যে জীবনের আদর্শ প্রতিফলিত হওয়া চাই। প্রতিটি শিক্ষা পরিকল্পনা মূলতঃ বাস্তব দর্শন এবং অনিবার্যভাবে তা জীবনের প্রতিটি ঘটনাকে স্পর্শ করে। তাহলে পাঠ্যবিষয় কাজকর্ম, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যা কিছু শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় জীবনকে সংগঠিত করে তার সবকিছুর সমষ্টিকে পাঠ্যসূচী হিসেবে অভিহিত করা যায়। এককথায় বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থী যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আহরণ করে পাঠ্যসূচী হল তারই সমষ্টিমাত্র। এ অর্থে পাঠ্যসূচীকে পূর্ণাঙ্গভাবে পরিকল্পনা করা যায় না। কারণ, মানুষের ব্যক্তিত্ব বা শিক্ষার্থীর জীবন পরিকল্পিত পাঠ্য সূচীর সীমায় ব্যাপ্ত নয়। পাঠ্যসূচীর সীমা ছাড়িয়ে অজস্র ধারায় সে তার প্রকাশ খোঁজে। তাই পরিকল্পিত পাঠ্যসূচীর সঙ্গে প্রয়োজনারূপ সহ-পাঠ্যসূচীর সংগঠন ও প্রবর্তন প্রয়োজন।

---

1. 'The curriculam may be defined as the totality of subject matter, activities and experiences, which constitues a pupil's school life. —*Anoymous.*

সহ-পাঠ্যসূচী (Co-curricular Activities) শব্দটি আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে ব্যবহৃত হচ্ছে। গতানুগতিক বা প্রাচীন শিক্ষাতত্ত্বে এটিকে পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত (Extra-curricular Activities) বিষয় হিসেবে গণ্য করা হত। খেলাধূলা, নৃত্যগীত, সমাজসেবা ও অন্যান্য কর্মমূলক প্রচেষ্টাকে শিক্ষার্থীর জীবনে মূল্যহীন বলে বিবেচনা করা হত। কারণ গতানুগতিক পাঠ্যসূচী ছিল পুস্তককেন্দ্রিক, বুদ্ধিগত অনুশীলনই সেখানে প্রাধান্য লাভ করত। পুস্তক অধ্যয়ন এবং শিক্ষকের বক্তৃতা শ্রবণই সেদিনকার পাঠ্যসূচী অনুসরণের সূত্র ছিল। কর্ম-অভিজ্ঞতা, সমাজসেবা, আনন্দানুষ্ঠান, খেলাধূলা ইত্যাদি কর্মকেন্দ্রিক বিষয়গুলিকে পাঠ্যসূচী থেকে দূরে নির্বাসিত করার মূলে যে-সব **ভ্রান্তধারণা ক্রিয়াশীল ছিল**। তা হল—

প্রথমতঃ, প্রাচীন গ্রীসের প্লেটো অ্যারিস্টটলের দর্শন, প্রাচীন ভারতের উপনিষদ ইত্যাদিতে লক্ষ্য করা যায়—সে যুগে দেহ ও ইহজগৎ সম্পর্কে কোন গুরুত্ব দেওয়া হত না। বস্তুজগৎ, বৈষয়িক কার্যাদি ছিল মায়া বা সত্তাহীন অস্তিত্ব মাত্র। একমাত্র চেতনা বা ভাবকে (Idea) সত্য বলে মেনে নেওয়ার প্রবণতা ছিল বেশী। তাই মানসিক শৃঙ্খলা ও বুদ্ধি চর্চাকেই ইহজগৎ এবং পরজগতের একমাত্র মুক্তির উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, বর্তমানের গতানুগতিক শিক্ষাধারা ব্রিটিশ আমলেই প্রবর্তিত হয়। সে যুগে কারণিক তৈরির উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসকদের অন্যতম শিক্ষানীতি। শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর তথা দেশবাসীর সার্বিক উন্নয়ন নীতিবহির্ভূত বিষয় ছিল। দেহ ও ইহজগতের প্রতি প্রাচীন ঔদাসীন্য ব্রিটিশ শিক্ষানীতির পথ ধরেই আধুনিক শিক্ষায় পরিণতি লাভ করেছে।

গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর জীবনে সকল প্রকার সক্রিয়তা, পরিশ্রম ও কর্মবৃত্তিকে অবহেলা করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে কর্মবৃত্তি সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রকাশ এবং বুদ্ধিচর্চা ও মানসিক শৃঙ্খলা সম্বন্ধে অর্থহীন আভিজাত্যপূর্ণ মনোভাব পোষণ করা শিক্ষিত সমাজের রুচি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এক সময় ছিল যখন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা, কলা ও শিল্পভিত্তিক কাজ, সমাজসেবা প্রভৃতি কোন কিছুকেই বিদ্যালয়ে উৎসাহ দেওয়া হত না। এমনকি খেলাধূলাকে সময়ের অপব্যবহার বলে গণ্য করা হত।

কালক্রমে শিক্ষা সম্বন্ধে মৌলিক চিন্তা ধারার পরিবর্তন ঘটল। দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলনের ফলে শিক্ষাকে আজ আমরা সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করি

না। শিক্ষা ব্যাপক অর্থে জীবনের সঙ্গে সমব্যাপক। শুধু মনের অনুশীলন নয়, দেহের অনুশীলনও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হল। অতএব শিক্ষা শুধু পাঠ্যসূচীতে (Curriculum) সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না—জীবনের সর্বস্তরে শিক্ষার স্পর্শ থাকা চাই। তাই পাঠ্যসূচী বহির্ভূত (Extra-curricular) কার্যাবলী পাঠ্যসূচীর সঙ্গে স্বীকৃতি পেল। তবে তাকে খুব বেশী মর্যাদা দেওয়া হল না। ইংরেজী Extra শব্দটি থেকে একথা সুস্পষ্ট।

দেহকে বাদ দিয়ে মনের অস্তিত্ব ও উৎকর্ষসাধন সম্ভব নয়। তাই মানসিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ক্ষমতা ও সামর্থ্যের অনুশীলন প্রয়োজন। দেহ ও মন নিয়েই সামগ্রিক ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে। সুতরাং মূল পাঠ্যসূচীর সঙ্গে খেলাধূলা, নৃত্যগীত, আনন্দানুষ্ঠান, সমাজসেবা প্রভৃতি পাঠ্যসূচী বহির্ভূত কার্যাবলীও শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে পরিগণিত হল। কিন্তু পাঠ্য-বহির্ভূত কাজকর্মের ওপর বিদ্যালয়ের ঔদাসীন্য ছিল খুব বেশী। তাই পাঠ্যসূচী বহির্ভূত এই সব কাজকর্মের তত্ত্বাবধান বা পরিচালনার (guidance) সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ছিল না।

স্বাধীন ভারতে এই চিন্তা ও কর্মধারার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশেও শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তাধারার মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। শিক্ষা আজ আর চিরাচরিত প্রথায় শিক্ষক প্রদত্ত পুঁথিগত বিষয় নয়।[1] শিক্ষা হল শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ (all-round development)। নব্য শিক্ষাতত্ত্ব স্বীকার করে যে, যখন কোন ছাত্র বিদ্যালয়ে আসে সে তখন তার দেহ, মন, আচার-আচরণ, সমাজ ও বৃত্তিসম্পর্কে চিন্তাধারা ইত্যাদি সবকিছুকে নিয়ে আসে। এসবের যথাযথ বিকাশ সে চায়। কিন্তু তার চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, প্রবণতা, শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক বিকাশ শুধু পাঠ্যসূচী দ্বারা বা তত্ত্বাবধানহীন বহিঃপাঠ্যসূচী দ্বারা সম্ভব নয়। শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে যেমন পাঠ্যসূচী অনুসারে পাঠদান করতে হবে তেমনি কক্ষের বাইরে পাঠ্যসূচী বহির্ভূত কার্যাবলীও তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করতে হবে। তাই ডঃ রাধাকৃষ্ণান

---

1. তুলনীয় : **Education is no longer 'treated as something stored up in text books, certified by tradition, guaranteed by teachers, meant to be taken by children willy nilly in uniform fashion.' As quoted by *Prof. K. K. Mukherjee* : in New Education and its Aspects.**

বলেন, "শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীর আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনার বিকাশ সাধন করা ও বাস্তব ক্ষেত্রে তার ব্যবহারিক প্রয়োগে সাহায্য করা।"[1] তাই আজ আর পাঠ্যসূচী বহির্ভূত কার্যাবলী (Extra-Curricular Activities) অবহেলা করলে চলবে না। পাঠ্যসূচীর (Curriculum) সঙ্গে তাকে সমমর্যাদায় ভূষিত করতে হবে; পাঠ্যসূচীর পরিপূরক হিসেবে তাকে বিবেচনা করাও বাঞ্ছনীয়। তাই পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত কার্যাবলী হবে **সহ-পাঠ্যসূচক কার্যাবলী** (Co-Curricular Activities)। সহ-পাঠ্যসূচক কার্যাবলী হল শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বিশেষ। "আমাদের কল্পনায় বিদ্যালয় শুধু কতকগুলি অনুমোদিত তথ্য সরবরাহকারী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান নয়; বিদ্যালয় হল জীবন্ত (Living) ও প্রাণচঞ্চল (Organic) সম্প্রদায় বিশেষ, যার প্রাথমিক কর্তব্য হল শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা; আর সে শিক্ষাকে বলা যেতে পারে জীবনধারণের সদয় কৌশল ('gracious art of living')। এরূপ বিদ্যালয়ের কাজ হবে ছাত্রদের একটি উপযুক্ত, আনন্দদায়ক এবং প্রেষণা-সঞ্চারক পরিবেশ প্রদান করা—যে পরিবেশে শিক্ষার্থীর বহুমুখী আগ্রহ নানা সুখকর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রকাশিত হবে।[2] এরূপ শিক্ষা সহ-পাঠ্যসূচীর কর্মধারা ভিন্ন সম্ভব নয়।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর ন্যায় সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যক্রমকে (Co-Curriculur Activities) সকল বিদ্যালয়ের জন্য সমান ভাবে পূর্বনির্ধারিত করা যায় না। আঞ্চলিক অবস্থা ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে এরূপ কার্যক্রম সংগঠিত করতে হয়। মনে রাখা প্রয়োজন, সংগঠিত সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যক্রম সাধারণ পাঠ্যসূচীর পরিপূরকরূপে শিক্ষার্থীদের নিকট ফলপ্রসূ হয়। বিদ্যালয়ের আর্থিক ও অন্যান্য সঙ্গতি এবং শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুসারে নিম্নে কতকগুলি তালিকা দেওয়া হল। এরূপ তালিকা থেকে বিশেষ বিশেষ কার্যাবলী নির্বাচন করা যেতে পারে।

(ক) **দৈহিক কার্যাবলী** (Physical Activities):

(১) সকলপ্রকার খেলাধূলা (Games and Sports)

(২) ব্যায়াম ও মল্লক্রীড়া (Exercises and Gymnastics)

(৩) সমবেত ড্রিল (Mass-drill) ও শরীর চর্চা (P. T.)

(৪) সাঁতার (Swimming)

---

1. "The function of the teacher is to draw out the inner splendour of the student and to prove his practical utility to the world."

2. S. E. Commission—Page 175.

(৫) নৌচালনা (Rowing)

(৬) এন. সি. সি. ; এ. সি. সি. (N. C. C. ; A. C. C.)

(৭) বাগান করা (Gardening)

(৮) যোগ ব্যায়াম (Yoga exercises)

(খ) বৌদ্ধিক কার্যাবলী (Intellectual Activities) :

(১) সাহিত্য সভা, বিতর্ক সভা, আলোচনাচক্র, সেমিনার

(২) পাঠচক্র, পাঠ্যবিষয় সংসদ

(৩) বক্তৃতা, আবৃত্তি

(৪) গল্পবলা, গল্পলেখা, প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা

(৫) বিদ্যালয়-পত্রিকা প্রকাশ

(৬) দেওয়াল পত্রিকা, বুলেটিন বোর্ডে সংবাদ সরবরাহ

(গ) সাংস্কৃতিক এবং বিনোদনমূলক কার্যাবলী (Cultural and Recreational Activities) :

(১) অভিনয় ও নাট্যানুষ্ঠান

(২) সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান

(৩) উৎসব, অনুষ্ঠান, জাতীয় দিবস পালন, মনীষীদের জন্মবার্ষিকী প্রতিপালন, শিক্ষক দিবস, অভিভাবক দিবস, মাতৃ দিবস, ছাত্র দিবস পালন ইত্যাদি।

(৪) যাদুঘর ও প্রদর্শনী সংক্রান্ত কার্যাবলী

(৫) আর্ট ক্লাব, ছবি আঁকা, পেন্টিং, পুতুল তৈরি, ফটো তোলা (Creative hobbies)।

(৬) ছবি সংগ্রহ, ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ, পাখির পালক সংগ্রহ, যাদুঘরে সংরক্ষণের উপযোগী সামগ্রী সংগ্রহ (Collective hobbies)।

(ঘ) সমাজসেবা মূলক কার্যাবলী (Social Activities) :

(১) সেণ্টজন অ্যাম্বুল্যান্স, জুনিযার রেডক্রস

(২) নার্সিং শিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা সংরক্ষণ সংঘ, মহামারী প্রতিরোধ সমিতি

(৩) বন্যাত্রাণ, দুর্ভিক্ষ ত্রাণ সমিতি

(৪) অগ্নিনির্বাপক সমিতি

(৫) স্কাউট, ব্রতচারী, গার্ল-গাইড ইত্যাদি

(৬) বিশেষ অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক দল

(৭) নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি।

(ঙ) **পৌর-শিক্ষণ কার্যাবলী** (Civic Training Activities):

(১) ছাত্র সংসদ (Students' Council) এবং বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন উপসমিতি (Sub-Committee); যেমন—আচরণ বিধি (Code of conduct) প্রণয়ন সমিতি, বিচার পরিষদ, পাঠ্যপুস্তক, সহপাঠ্য পুস্তক সমিতি প্রভৃতি।

(২) ছাত্র সমবায় সমিতি, বিদ্যালয় ব্যাঙ্ক ইত্যাদি

(৩) সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সমিতি।

***সহ-পাঠ্যসূচী সংগঠনের বাধা** (Drawbacks in Organising Co-curricular activities): সহ-পাঠ্যমূলক কার্যাবলী শিক্ষার্থীর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় এদেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই সহ-পাঠ্যসূচীর ওপর আগ্রহ প্রকাশ করেন না।

শিক্ষকদের অনাগ্রহের কারণ:

প্রথমতঃ, শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ে চাকরি করেন অর্থ-উপার্জনের জন্য। তাই পড়ানো ছাড়া অতিরিক্ত কাজের জন্য তাঁরা অর্থ-প্রাপ্তির (Allowances) আশা রাখেন। এজন্য এ. সি. সি বা এন. সি. সি কাজের জন্য শিক্ষকরা অতিরিক্ত এ্যালাউন্স পান, কিন্তু এরূপ অন্য কোন কাজের জন্য অন্যান্য শিক্ষকরা কোন আর্থিক মূল্য পান না। সুতরাং সহ-পাঠ্যসূচীর অন্যান্য কার্যাবলী স্বাভাবিক-ভাবে অবহেলিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সহ-পাঠ্যসূচক কর্মসূচীর জন্য শিক্ষকদের পৃথক কোন বৃত্তিগত শিক্ষণ দেওয়া হয় না। এ. সি. সি বা এন. সি. সি. এবং খেলার শিক্ষক ভিন্ন অন্য কোন শিক্ষক উপযুক্ত শিক্ষণ-প্রাপ্ত না হওয়ায় তাঁরা এরূপ কর্মে প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বন করতে পারেন না।

তৃতীয়তঃ, সহ-পাঠ্যসূচক কর্মসূচী যে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন এ সম্পর্কে অনেক শিক্ষক তত্ত্বগত শিক্ষার মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু মনে প্রাণে তাঁরা বিষয়টিকে বাস্তবায়িত করার মানসিকতা অর্জন করেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকরা আজও রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বাবধি যে অবস্থা ছিল তাই এখানে বিবৃত হল।

নতুন কোন ভাবধারাকে পরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণের দ্বারা গবেষণা করতে তাঁরা চান না।

চতুর্থতঃ, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ পরীক্ষামুখী। সাধারণী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীকে পাস করানোই সুনাম অর্জনের ও অর্থ উপার্জনের উপায় বলে শিক্ষকরা মনে করেন। তাই সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে অবহেলিত হয়। কারণ এই কর্মসূচী পরীক্ষা-পাসে কোনরূপ সাহায্য করে না।

পঞ্চমতঃ, অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যের গর্বে নিজেদেরকে উন্নত শ্রেণীর বলে মনে করেন। স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রখরতার জন্য তাঁরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিশে সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যক্রম সংগঠন করতে পারেন না।

শিক্ষার্থীদের অনাগ্রহের কারণ ঃ

প্রথমতঃ, শিক্ষার পরীক্ষামুখিনতা শিক্ষার্থীর মনেও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। তারা শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়ের নিকট থেকে পরীক্ষা-পাসের গুরুত্বের কথা শোনে। তাই সহ-পাঠ্যসূচীর কর্মে তাদের আগ্রহ থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, সহ-পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত কর্মধারা বিদ্যালয়ের সময়-তালিকার (Time-Table) অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের পর কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ক্লান্ত শিক্ষার্থীরা তখন গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য আকুল হয়ে পড়ে। তাই সকলের পক্ষে এসব কর্মসূচী অনুসরণ করার সময় ধৈর্য, আগ্রহ আর থাকে না।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মনে বহুদিন যাবৎ একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছে যে, সহ-পাঠমূলক কার্যাবলী শিক্ষার্থীর আসল পাঠে মন-সংযোগে (Concentration of mind) বিঘ্ন ঘটায়। তাই বিদ্যালয়ে এরূপ কর্মসূচী পালন করা আবশ্যিকরূপে গণ্য না হয়ে আজও ঐচ্ছিক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা সহ-পাঠ্যসূচীর কর্মে আদৌ আগ্রহ প্রকাশ করে না।

চতুর্থতঃ, সহ-পাঠ্যসূচীতে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের এবং অভিজ্ঞ সংগঠকের অভাবে বিদ্যালয়ে সঠিকভাবে কর্মসূচী পালনের ব্যবস্থা থাকে না। তাই শিক্ষার্থীরাও এসব কর্মে উৎসাহ পায় না।

পঞ্চমতঃ, দারিদ্র্য এদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর অভিশাপ স্বরূপ। এটা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও সত্য। বিদ্যালয় আর্থিক কারণেই সহ-পাঠ্যসূচীর যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে না। অন্যদিকে

শিক্ষার্থীরা গৃহে যথেষ্ট পরিশ্রম করে মাতাপিতার আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য সাহায্য করে। এজন্য সহ-পাঠ্যমূলক কর্মসূচী পালনে তাদের আগ্রহ থাকে না।

সহ-পাঠ্যসূচীর পরিকল্পনাকে কার্যকর করার কয়েকটি অপরিহার্য শর্ত (Some of the essentials of an effective Programme of Co-curricular Activities) **:** সহ-পাঠ্যসূচীর প্রয়োজন ও মূল্য আজ সর্বজন-স্বীকৃত। কিন্তু তবুও সহ-পাঠ্যসূচীর পরিকল্পনা প্রায় বিদ্যালয়েই সার্থক হচ্ছে না। তার প্রধান কারণ, সহ-পাঠমূলক কার্যাবলী অনেক ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিতভাবে গৃহীত হয় না। সহ-পাঠমূলক কর্মকে কিভাবে বিদ্যালয়ে কার্যকর করে তোলা যায় সে সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

প্রথমতঃ, সহ-পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করার পূর্বে বিদ্যালয়ের অবস্থান বিবেচনা করা কর্তব্য। শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত সহ-পাঠ্যসূচী গ্রাম বা শহরতলীর বিদ্যালয়ের সহ-পাঠ্যসূচী থেকে পৃথক হবে। বিদ্যালয়ের অবস্থান অনুযায়ী সমাজ-সেবার সুযোগ, আর্থিক সঙ্গতি, যোগ্য শিক্ষক-প্রাপ্তির সুযোগ, শিক্ষার্থীদের চাহিদা ইত্যাদির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, সহ-পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের জন্য প্রশস্ত কক্ষ, ব্যায়ামাগার, খেলার মাঠ, শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসন পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ, মিউজিয়াম, প্রদর্শনী-সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি প্রয়োজন। এছাড়া প্রয়োজন বিদ্যালয়ের আর্থিক স্বচ্ছলতা। বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও আর্থিক সঙ্গতি সম্পর্কিত পার্থক্যের জন্য সহ-পাঠ্যসূচী প্রবর্তনে নিশ্চয়ই পার্থক্য থাকবে। তাই সহ-পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের পূর্বে এসব বিষয় বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ, সহ-পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের অন্যতম শর্ত হল আঞ্চলিক ও পারিবারিক প্রভাব এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদা সম্পর্কে যথাযথ অবহিত হওয়া। বিদ্যালয় একটি বৃহত্তর সমাজ জীবনের ক্ষুদ্রতম প্রতিরূপ। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের তৈরি করে দেওয়াই বিদ্যালয়ের কর্তব্য। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীর চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। আবার আঞ্চলিক পেশা শিক্ষার্থীদের চাহিদার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, উদ্যান রচনা, শিল্পমূলক কাজ, কৃষি সমবায় ইত্যাদি গ্রামাঞ্চলের ছাত্রদের আগ্রহ সঞ্চার করে। কিন্তু শহরের শিক্ষার্থীদের ওপর এসবের আবেদন বিশেষ কিছু নেই। সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের পারিবারিক সংস্কার, আর্থিক অবস্থা,

সামাজিক মান ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হতে হয়। তাহলে সহ-পাঠ্যসূচী নির্ধারণে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং আঞ্চলিক সমর্থন লাভ করা সহজসাধ্য হবে।

চতুর্থতঃ, সহ-পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের আত্মশাসন বা আত্মনির্দেশনার সুযোগ প্রদান করা এবং তাদের সুপ্ত সম্ভাবনা ও মেধা উন্মোচিত করা। কিন্তু এ উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে হলে কর্মসূচীতে শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের স্বাধীনতা থাকা কর্তব্য। তাই সহ-পাঠ্যসূচীর পরিকল্পনায়, উদ্যোগে, কর্ম-সম্পাদনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাতে অংশ গ্রহণ করে সেদিকে নজর রাখা কর্তব্য। তাহলে তারা সৃষ্টিমূলক কর্মে ক্রমশঃ আত্মসংযমী ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠবে। তাই বাধ্যতামূলক সহ-পাঠ্যসূচী প্রবর্তনে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য।

পঞ্চমতঃ, সহ-পাঠ্যসূচী ব্যক্তিবৈষম্য অনুসারে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনে সহায়তা করে। তাই সহ-পাঠ্যসূচীর মধ্যে যাতে বৈচিত্র্য থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের ছাত্র কিংবা ধনী, দরিদ্র, ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারীর সন্তানদের মধ্যে পার্থক্য বিবেচনায় বিদ্যালয় পরিচালনা করা যায় না। একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরিবেশের নানা শ্রেণীর শিক্ষার্থী পড়াশুনা করে। সহ-পাঠ্যসূচীতে বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনশীলতা থাকলে শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব চাহিদা ও অভিরুচি অনুসারে কর্মে অংশ গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া একই কর্মসূচী বারবার পালিত হলে কর্মে একঘেয়েমি এসে যায়, তাই বৈচিত্র্যসহ কর্মসূচীর পরিবর্তনশীলতা প্রয়োজন।

ষষ্ঠতঃ, সহ-পাঠ্যসূচীকে সার্থক করতে হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের আগ্রহ, বুদ্ধি-বিবেচনা, নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা ও সহ-পাঠক্রমে শিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যিনি যে কর্মে দক্ষ বা আগ্রহী নন তাঁকে সে কর্মের দায়িত্ব দিলে পরিকল্পিত আয়োজন ব্যর্থ হতে বাধ্য। এদেশের বিদ্যালয়গুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব। তাই আবশ্যিক পাঠ্যসূচীই এখানে অসমাপ্ত রয়ে যায়। সুতরাং সহ-পাঠ্যসূচী অবহেলিত হয়ে ক্রমে অতিরিক্ত পাঠ্যসূচী (Extra-curricular Activities) নামে অখ্যাত হতে বাধ্য। তবে প্রধান শিক্ষক যদি পদমর্যাদার অনুকূল গুণে, জ্ঞানে ও সামর্থ্যে প্রকৃতই প্রধান হন তাহলে ঐ-সব বিদ্যালয়ে সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যক্রম কখনও অবহেলিত হয় না।

সপ্তমতঃ, সহ-পাঠক্রমিক কার্যসূচীর উন্নয়ন ও সার্থকতার উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি অপরিহার্য নীতি পালন করা বিদ্যালয়ের অবশ্য কর্তব্য। সেগুলি হল :

(ক) সহ-পাঠ্যসূচীর পরিকল্পনা বিদ্যালয়ের সময়ের (during school time) মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এগুলিকে যতদূর সম্ভব সময়-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তাহলে শিক্ষার্থীদের মনের কাছে এটির গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়।

(খ) সহজ ও সরল কর্মসূচীর ভেতর দিয়ে ক্রমশঃ জটিল ও কঠিন কর্মসূচীর পরিকল্পনা করা যুক্তিযুক্ত।

(গ) সহ-পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে কোন কর্ম শুরু করলে তার শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনক্রমে বিরত হওয়া বা কর্মকে বাতিল করা মোটেই উচিত নয়। এর দ্বারা কর্মের গুরুত্ব ক্রমশঃ কমে যায়।

(ঘ) বিদ্যালয়ে গৃহীত সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যক্রম সম্পর্কে যথাযথ বিবরণ (record) সংরক্ষণ করা একান্ত কর্তব্য।

(ঙ) সহ-পাঠ্যসূচীর সার্থকতার জন্য যতটুকু সম্ভব অর্থ সংগ্রহ করা কর্তব্য। তবে আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে সহ-পাঠ্যসূচীর পরিকল্পনা গ্রহণ করাও বিদ্যালয়ের কর্তব্য।

(চ) জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থী যাতে কার্যসূচীতে অংশ গ্রহণের সমসুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

(ছ) সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যক্রমকে সার্থক করার জন্য প্রত্যেক শিক্ষককে কোন-না-কোন কর্মে অংশ গ্রহণের যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়। দক্ষ, যোগ্য ও উদ্যোগী শিক্ষক, ছাত্র সকলকেই তাঁদের কর্মের স্বীকৃতি প্রদান করা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অপরিহার্য কর্তব্য।

অবশেষে বলা যায়, শিক্ষক এবং বিশেষভাবে প্রধান শিক্ষক সহ-পাঠ্যসূচী প্রবর্তনে মননশীলতা, বিচক্ষণতা, আন্তরিকতা ও সুস্থির বিবেচনার পরিচয় দেবেন। জনসাধারণের মনে প্রভাব বিস্তার করা বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা চরিতার্থ করা বা ঊর্ধ্বতন সরকারী কর্তৃপক্ষকে নিছক কাজ দেখিয়ে অনুমোদন ও অনুদান আদায়ের জন্য সহ-পাঠ্যসূচী দু-একটি কার্যক্রম প্রবর্তনের চেষ্টার দ্বারা সহ-পাঠ্যসূচীর মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। মনে রাখা প্রয়োজন, শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মাধ্যমেই সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক মঙ্গল সাধন সহ-পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের বাস্তব উদ্দেশ্য। তাই এই উদ্দেশ্যে যাতে সহ-পাঠ্যসূচী নিয়ন্ত্রিত হয় সেদিকে যথাসাধ্য চেষ্টা করা বিদ্যালয়ের মৌলিক কর্তব্য।

সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর উপযোগিতা (Utility of Co-curricular activities)ঃ আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে সহ-পাঠ্যসূচী শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত। তাই পাঠ্যসূচীর (Curriculum) সঙ্গে সহ-পাঠ্যসূচীকে (Co-curriculun) সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর উপযোগিতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে যেসব যুক্তি দেখানো হয় সেগুলি হল ঃ

(ক) সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যক্রম বিত্তালয় পাঠ্যসূচীর পরিপূরক। ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিত্তা, অর্থনীতি-পৌরবিজ্ঞান, ভাষা প্রভৃতি শিক্ষার সহায়ক হিসেবে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অভিনয়, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, উপকরণ সংগ্রহ, মিউজিয়াম সংগঠন প্রভৃতি ইতিহাসের সঙ্গে সরাসরি অন্বিত। ভ্রমণ সর্বদা ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিপূরক। শিক্ষার্থীদেব স্বায়ত্তশাসন, বিধানসভা, পার্লামেণ্ট পরিদর্শন, সভা-সমিতি পরিচালনা প্রত্যক্ষভাবে পৌরনীতি শিক্ষার সহায়ক। সাহিত্যমূলক কায, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, বিতর্ক, সাহিত্য সভা, আলোচনা চক্র, সেমিনার প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্য-পাঠেব পরিপূরক।

(খ) সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যক্রম শারীরিক স্বাস্থ্য সংগঠন ও দৈহিক সামর্থ বিকাশে সাহায্য করে। সাধারণ কথায় বলা হয় 'স্বাস্থ্যই সম্পদ,' 'স্বাস্থ্যই সকল সুখেব ভিত্তি' ইত্যাদি। স্বাস্থ্যশিক্ষার ওপর শারীরিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে। আবার স্বাস্থ্যশিক্ষার সঙ্গে আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিভাগীয খেলাধূলা, শরীর চর্চা, ব্যায়াম, এন. সি. সি., এ. সি. সি. প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে জডিত। এছাডা উত্থান রচনা, শিবির সংস্থাপন, ভ্রমণ প্রভৃতি কর্মমুখীন শিক্ষা-প্রচেষ্টার সঙ্গে অঙ্গসঞ্চালন সম্ভব। তাই বলা হয় সহ-পাঠ্যসূচক কার্যাবলী শিক্ষা স্বাস্থ্যোন্নয়নের সহায়ক।

আধুনিক ভারতে শারীর শিক্ষার গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, 'আজকের ভারতের প্রয়োজন ভাগবত গীতা নয়—ফুটবলের মাঠ'।[1] তাই রাইবার্ন ভারতের শিক্ষায় শারীর শিক্ষার (Physical Education) সাধারণ দর্শনকে অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছেন। কারণ নব্য শিক্ষাতত্ত্বে

1. "What India needs today is not the Bhagwat Geeta but the football field."—*Vivakananda*

শারীর শিক্ষার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে এবং এর গুরুত্ব আজ সর্বজনস্বীকৃত।[2] কারণ, মানসিক প্রক্রিয়ার সহজ ও সুনির্দিষ্ট প্রযোগের জন্য শারীরিক সংগঠনকে সুস্থ ও সবল করা প্রয়োজন।[3] স্বাধীন রাষ্ট্রে তরুণদের স্বাস্থ্যোন্নয়ন একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। এযুগে সাধারণ মানের শারীর শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হলে ভয়াবহ ফলাফল অবধারিত।[4] শারীর শিক্ষা শুধু দেহ ও মনের শিক্ষা দেয় তা নয়, বরং সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে এ শিক্ষা যথেষ্ট সাহায্য করে। (এই পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

(গ) সহ-পাঠ্যসূচক কার্যাবলী প্রাক্ষোভিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও সহজাত প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। স্বায়ত্তশাসন, সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচী, অভিনয় ইত্যাদি শিক্ষার্থীদেব অবাঞ্ছনীয় কর্ম থেকে বিরত করে। চিত্রাঙ্কন, শিল্পকর্ম, হবি-মূলক কার্যাবলী, সাহিত্য ও সংস্কৃতি মূলক কার্যাদি শিক্ষার্থীব মানসিক চিন্তা ও কর্মকে বাঞ্ছনীয় পথে নিয়ন্ত্রণ করে। এসব কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীব শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক বিকাশ ও বৃদ্ধি সহজসাধ্য হয়। 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা'—এ প্রবাদের সঙ্গে সকলেই পরিচিত। শিক্ষার্থীদের যদি সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যাবলীর মধ্যে সর্বদা নিযোজিত রাখা যায় তাহালে তাদেব উদ্যম, উৎসাহ, প্রেরণা ইত্যাদি প্রাক্ষোভিক বৃত্তিগুলি সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে বাঞ্ছনীয় পথে পরিচালিত হবে। তার মানসিক স্তবে ভাবসংহতি (emotional integration) স্থাপিত হবে। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থী হয়ে উঠবে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আদর্শ মানুস।

(ঘ) সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যাবলী শিক্ষার্থীর সামাজিক সত্তার বিকাশ সাধনের সহায়ক। সমাজের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ হল বিদ্যালয়। এখানে শিক্ষার্থীরা সমাজ-জীবনের উপযোগী আচার-আচরণ, মনোভাব ও সমস্যা সমাধানের গুণাবলী অর্জন করে। সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যাবলী পরিচালিত হয় সমষ্টিগত বা

---

2. "We need in Indian education a general philosophy of physical education. We need a conception of education in which physical education takes its rightful place and in which its vital importance is recognised."—*Ryburn*

3. "It is the sound constitution of the body that makes the operation of mind easy and certain."—*Rousseau*

4. "The physical welfare of the youth of the country should be one of the main concerns of the state and any departure from the normal standards of physical well-being at this period of life may have serious consequences."—S. E. C, Page 111.

যৌথ প্রচেষ্টায়। তাই এরূপ কর্মের দ্বারা শিক্ষার্থীর সমবায় ও সহযোগিতা, পরমত সহিষ্ণুতা, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের মনোভাব, নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলাবোধ প্রভৃতি সমাজ-জীবনে যেসব গুণ ও দক্ষতা অপরিহার্য সেগুলি বিদ্যালয়-জীবনে তারা শিক্ষালাভ করে। সহ-পাঠ্যসূচীর মাধ্যমেই শিক্ষার্থী বাস্তব জগতের সংস্পর্শে আসে—বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। তার ব্যক্তি-কেন্দ্রিক চাহিদা ও অনুভূতি সামাজিক স্তরে উন্নীত হয়।

(ঙ) সহ-পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীকে পৌরনীতি পালনে দক্ষ করে তোলে। আজকের শিক্ষার্থী হবে আগামী দিনের নাগরিক। তাই নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীকে যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করা বিদ্যালয়ের কর্তব্য। সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যাবলী শিক্ষার্থীকে এরূপ যোগ্যতা-অর্জনে সহায়তা করে। ছাত্র-সংসদ, ছাত্র-সমবায় বিপণি, বিদ্যালয় ব্যাঙ্ক ইত্যাদি পরিচালনা; সভা-সমিতি, সেমিনার, বিতর্ক সভা, আলোচনা চক্র পরিচালনা, শিক্ষা-প্রদর্শনী, শিক্ষাভ্রমণ, মিউজিয়াম ইত্যাদি পরিকল্পনা ও পরিচালনা শিক্ষার্থীকে সুনাগরিকের দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে। সহ-পাঠ্যসূচীর পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর ভূমিকা সক্রিয় হয়। ফলে তারা গণতান্ত্রিক উপায়ে কর্ম-সম্পাদনার সুযোগ পায়। এর দ্বারা তারা পৌরনীতি পালনের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। আধুনিক শিক্ষা তাই সহ-পাঠ্যসূচীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

(চ) সহ-পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীকে নেতৃত্বের শিক্ষণ-লাভে সাহায্য করে। সহ-পাঠ্যসূচীর পরিকল্পনায় ও সম্পাদনে শিক্ষার্থীর ভূমিকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। শিক্ষক এখানে পরিচালক ও পরামর্শদাতা মাত্র। তাই শিক্ষার্থী কর্ম-পরিকল্পনায় ও সম্পাদনে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলি স্বচেষ্টায় সমাধানও করে। ফলে, তাদের চিন্তাশক্তি, উদ্যোগ, মৌলিকত্ব, উপায়াদি উদ্ভাবনে তৎপরতা বা দক্ষতা (resourcefulness), বিচার-বিশ্লেষণ শক্তি, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মসংযম ইত্যাদি যেসব কার্যনির্বাহী গুণ (executive ability) নেতৃত্ব প্রদানের পরম সহায়ক সেগুলি বিকাশ লাভ করে। সহ-পাঠ্যসূচক কার্যাবলীর মধ্যে শিক্ষার্থীর সংগঠনী শক্তি ও প্রতিকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে সংগ্রামী মনোভাব জাগ্রত হয় এবং সে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করার প্রয়াস পায়। এরই ফলে পরিণত বয়সে সে সমাজের নেতৃত্ব প্রদানের দক্ষতা ও অধিকার লাভ করে।

(ছ) সহ-পাঠ্যসূচী আকাঙ্খিত অবসর বিনোদনে ও আনন্দ উপভোগের উপায় নির্ধারণ করে। গতানুগতিক শিক্ষার একটা বড় ত্রুটি হল, এখানে 'অবসর যাপনের উপযোগী শিক্ষার' (Education for leisure) ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সহ-পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীকে অবসর যাপনের সময় এমন তৃপ্তিদায়ক কর্মে নিয়োজিত (engaged) রাখে যে তারা একদিকে যেমন আনন্দ উপভোগ করে, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষালাভ করে। চিত্রাঙ্কন, পুতুল তৈরি, ছবি তোলা, ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ, উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে যে আনন্দস্রোত লুকিয়ে আছে তা কোন বিদ্যালয় শিক্ষক বা অভিভাবক অস্বীকার করতে পারেন না। সহ-পাঠ্যসূচীর কর্মধারাকে শিক্ষা ও শৃঙ্খলার ভিটামিন ট্যাবলেট হিসেবে কল্পনা করা যায়। আনন্দ ও প্রেরণার সঙ্গে শিক্ষণ ও পরিচালনা মিশিয়ে এই ট্যাবলেট তৈরি হয়। সুতরাং এরূপ কর্মধারা শিক্ষার্থীর জীবন-বিকাশের সহায়ক। সহ-পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীর জীবনে বৈচিত্র্য আনে। কারণ, একঘেয়ে গতানুগতিক পাঠ্যসূচীর মধ্যে সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যক্রম আনন্দদায়ক, আকর্ষণীয়, ক্লান্তি বিদারক এবং শিক্ষাগ্রহণে উদ্দীপনা সঞ্চারক।

সহ-পাঠ্যসূচীতে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of the Teachers in Co-curricular Activities) : সহ-পাঠ্যসূচীর পরিকল্পনায় ও সম্পাদনায় শিক্ষার্থীর পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ নীতিগতভাবে স্বীকৃত। এ ব্যাপারে শিক্ষকের অংশগ্রহণের ভূমিকা খুবই সীমিত হয়ে পড়ে। শিক্ষক হলেন তত্ত্বাবধায়ক, পরিচালক, বন্ধুভাবাপন্ন উপদেষ্টা। প্রবল উদ্দীপনার দ্বারা তিনি সক্রিয় নন। সহ-পাঠ্যসূচী প্রবর্তনে শিক্ষকের এ ভূমিকাও নীতিগত-ভাবে স্বীকৃত। তাহলে শিক্ষকের ভূমিকার ব্যবহারিক রূপ সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করা উচিত।

সহ-পাঠ্যসূচী প্রবর্তনে শিক্ষকের সক্রিয় ভূমিকা সীমিত হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ সূক্ষ্ম (delicate)। সহ-পাঠ্যসূচীর প্রতিটি কার্য বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা ও সার্থকভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্ব শিক্ষকের। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করা, সুপরামর্শ দেওয়া ও সুপরিচালনা করা শিক্ষকেরই কাজ। নীতি কথা শুনিয়ে এ দায়িত্ব পালন করা যায় না। গণতান্ত্রিক চেতনার দ্বারা শিক্ষার্থীদের একজন হয়েই তাঁকে সার্থক কর্মসূচী সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। তিনি হলেন সক্রিয় উদ্বোধক—শিক্ষার্থীদের যাবতীয় প্রেরণার উৎস। নিষ্ক্রিয় উপদেষ্টার উপদেশ ক্ষণস্থায়ী প্রেরণা জাগায়। সক্রিয়

উদ্বোধক দীর্ঘস্থায়ী প্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্যম সঞ্চার করতে পারেন। তাই তাঁকে 'আপনি আচরি ধর্ম পর কে শেখানোর' জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়। সহ-পাঠ্যসূচীব বিচিত্র কর্মের মধ্যে যেটি বা যেগুলি শিক্ষক নিজে করতে পারেন সেটি বা সেগুলির দাযিত্ব সেই শিক্ষককে প্রদান করাই বাঞ্ছনীয।

যে শিক্ষকের ওপর যে কার্য ন্যস্ত করা হয়, তা বাস্তবায়নের পূর্বে তিনি সেই কার্যের শিক্ষামূলক দিক, কর্মের স্বরূপ ও প্রকৃতি, সম্ভাব্য সমস্যা বা প্রতিবন্ধক এবং তার সমাধানের উপায বিবেচনা করবেন। শিক্ষক সহ-পাঠ্যসূচীর পরিকল্পনা প্রবর্তনের সবরকম সহায়তা প্রদান করবেন, কিন্তু শিক্ষার্থীরা সক্রিয় হয়ে উঠলেই তিনি ধীরে ধীরে সক্রিয়তা বর্জন করে শুধু পরিচালনার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। কারণ, সহ-পাঠ্যসূচী সার্থক করতে হলে শিক্ষার্থীদের উদ্যোগ, আন্তরিকতা ও আগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি করাই বড় কথা। ছাত্ররা যদি জানতে পারে যে সহ-পাঠ্যসূচীর কর্মে শিক্ষকই সক্রিয়, তাঁর কর্তৃত্বই বড় কথা, তাহলে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ স্তিমিত হযে পড়বে।

নেতৃত্ব প্রদানের বড় কথা হল গণতান্ত্রিক মনোভাব, নিরপেক্ষতা, আত্মসংযম ও কৃতিত্বের স্বীকৃতি প্রদান। অনেক সময় শিক্ষকরা প্রবল উদ্দীপনায শিক্ষার্থীদের কর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য কঠোর সমালোচনা করেন অথচ কৃতিত্বের স্বীকৃতি প্রদানে বিরত থাকেন। এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শিশুমনে নিন্দা ও প্রশংসার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। তাই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আচার-আচরণে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে গভীর সহানুভূতি ও বিচক্ষণতার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কর্মের বিচার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ত্রুটি ধরা যেমন প্রযোজন তেমনি ত্রুটি সংশোধনের দায়িত্বও শিক্ষকের ; শিক্ষার্থীর ব্যর্থতার গ্লানি দূর করতে উৎসাহ প্রদান করা যেমন প্রয়োজন তেমনি কৃতিত্বের স্বীকৃতি প্রদান করাও শিক্ষকের দাযিত্ব। সহ-পাঠ্যসূচীর নিয়মকানুন কে কতটুকু মেনে চলল এটার ওপর গুরুত্ব না দিয়ে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হল এবং শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা কতটুকু বিকাশ লাভ করল—এগুলির মূল্যায়ন করাই বড় কথা। তাই সহ-পাঠ্যসূচীর প্রকল্পে শিক্ষার্থীর প্রয়াস, উৎসাহ-উদ্যম, প্রেরণা ও আগ্রহ সর্বাগ্রে বিবেচ্য বিষয়।

বিদ্যালয়ে সহ-পাঠ্যসূচী তত্ত্বগত মর্যাদা পেলেও ব্যবহারিক মর্যাদা আজও পায়নি। পাঠ্য বিষয়গত পরীক্ষামুখী শিক্ষাব্যবস্থা এরূপ মর্যাদা প্রাপ্তির কঠিনতম অন্তরায়। যখন সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যাবলীও মূল্যায়নের বিষয়রূপে পরিগণিত

হবে তখন সহ-পাঠ্যসূচী শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হবে এবং অংশ গ্রহণকারী শিক্ষকও ব্যবহারিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবেন।

আধুনিক প্রগতিশীল বিদ্যালয়গুলিতে সহ-পাঠ্যসূচীর নানা কার্যাবলী প্রবর্তিত হয়েছে। এর ফলে এমন বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের একটি অন্যতম শর্ত হল সহ-পাঠ্যসূচীর কোন-না-কোন বিষয়ে প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করা। যাঁরা শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত তাঁদের সহপাঠ্যসূচীর বিষয়াবলীতে দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩) এবং শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) শিক্ষক শিক্ষণ প্রসঙ্গে সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যক্রম শিক্ষণের ওপর গুরুত্ব প্রদানের সুপারিশ করেছেন।

সহ-পাঠ্যসূচী প্রবর্তনে সমাজের ভূমিকা (Role of Society in Promoting Co-curricular Activities)**:** বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত-সহপাঠ্যসূচীর কার্যক্রম রূপায়ণে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার সার্থকতা আন্তঃব্যক্তি সম্পর্কের (Inter-personal relationship) ওপর নির্ভর করে। তাই এ শিক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক, আঞ্চলিক জনসাধারণের সম্পর্কের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করে। আলোচ্য সহ-পাঠ্যসূচক কার্যাবলীর অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের মানুষের মিলনক্ষেত্র গড়ে তুলতে পারে। সহ-পাঠ্যসূচীর প্রকল্পে ছেলেমেয়েরা কে কিভাবে অংশগ্রহণ করে তা দেখবার জন্য মাতাপিতা ও পরিজনসহ আঞ্চলিক সকলকেই আমন্ত্রণ করা উচিত। সাধারণতঃ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় অভিভাবকরা আমন্ত্রিত হন। কিন্তু আমরা মনে করি মাতাপিতা বা অভিভাবকদের আরও বেশী সংখ্যক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করে তাদের সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করা উচিত। এর ফলে বিদ্যালয় প্রকৃত সমাজ-উন্নয়নের কেন্দ্রে পরিণত হবে। আনন্দ উপভোগ করা ছাড়াও অভিভাবকরা স্ব-স্ব সন্তানদের আগ্রহ ও প্রবণতা লক্ষ্য করার সুযোগ পাবেন।

অভিভাবকদের মধ্যে অনেকেই সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যাবলীতে দক্ষ হতে পারেন। তাঁরা এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা দান করতেও পারেন। শুধু অভিভাবক নন সহ-পাঠ্যসূচীর সার্থক রূপায়ণে প্রাক্তন ছাত্র, আঞ্চলিক যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তিরা সমবেত হয়ে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করতে পারেন। এর দ্বারা বিদ্যালয় সমাজ-মিলনের

তীর্থভূমিতে পরিণত হবে ও শিক্ষার্থীর সঠিক বিকাশের অনুকূল শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য সার্থক হয়ে উঠবে।

২। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও ছাত্র-স্বায়ত্তশাসন (School-Discipline and Students' Self-Government):

রবীন্দ্রনাথ যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার একটা চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে "স্কুল বলিতে আমরা বুঝি যে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কলের অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাষ্টারের মুখ চলিতে থাকে। চারটার সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই-চার পাতা কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষক ও পাঠ্যসূচীর ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ, তার স্বাধীনতার (Freedom) মূল্য গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় মোটেই গুরুত্ব পায়নি।

গতানুগতিক শিক্ষার স্বরূপ

আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা (Freedom) স্বীকৃত। তার চাহিদা, আগ্রহ, অভিরুচি শিক্ষার বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রিত করবে। শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক বিকাশের জন্য আজ আর পূর্ব পরিকল্পিত পাঠ্যসূচী (Curriculum) যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যক্রম (Co-curricular Activities)। সহ-পাঠ্যসূচীর পরিকল্পনায় শিক্ষক উদ্বোধক ও পরিচালকের ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু কর্মসম্পাদনের সক্রিয় ভূমিকা হল শিক্ষার্থীর। শিক্ষার্থীর শিক্ষার ক্ষেত্র আজ বিদ্যালয়ের চারি দেওয়ালের সীমা অতিক্রম করে সমাজবক্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলা বিধানের প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, বিদ্যালয় জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, সামাজিক আচরণে নিষ্ঠা, বিধি ও নিষেধ মানার মনোভাব ইত্যাদি না থাকলে আদর্শ জীবন গঠন ও শিক্ষা সম্ভব নয়। কাজেই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তার শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনও এসে পড়ে।

স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার সমস্যা

স্বাধীনতা (Freedom) ও শৃঙ্খলার (Discipline) মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বরং একটি আর একটির পরিপূরক। অন্তর্জাত শৃঙ্খলা আত্মনিয়ন্ত্রণেরই

নামান্তর মাত্র আর আত্মনিয়ন্ত্রণহীন বা সংযমহীন স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা এবং উদ্দাম আচরণ মাত্র। সুতরাং স্বাধীনতা আত্মনিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভরশীল।

স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা পরস্পরের পরিপূরক

খেলার সময় স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার যুগপৎ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। খেলার সময় শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলে। এখানে তার স্বাধীনতা বিদ্যমান। আবার খেলার নিয়মগুলি শিশু আনন্দের সঙ্গে মেনে নেয় বলেই খেলায় শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হয়। আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে তোলা যায়। শিল্পী যখন ছবি আঁকেন, কবি যখন কবিতা লেখেন তখন তাঁদের মনের স্বাধীনতা বিদ্যমান। কিন্তু শিল্পের খাতিরে শিল্পী রঙ ও তুলি ব্যবহার করেন, কবি ছন্দের নিয়ম মেনে চলেন। এটা হল শৃঙ্খলাজনিত বিষয়। সুতরাং আত্মসংযমজনিত স্বাধীনতার সঙ্গে অন্তর্জাত শৃঙ্খলার (Internal discipline) কোন বিরোধ নেই। বরং একে অন্যের সহায়ক।

বিদ্যালয় হল একটি সংগঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান। যে-কোন প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ও উন্নয়ন শৃঙ্খলা (discipline) এবং নির্দেশ (order) মেনে চলার ওপর নির্ভর করে। এক কথায় শৃঙ্খলা ও নির্দেশ প্রতিষ্ঠানের শ্বাস, প্রশ্বাসের ন্যায় সজীব ও ক্রিয়াশীল বিষয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। ইচ্ছাকৃতভাবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে নিয়মকানুন আমরা মেনে চলি তাই শৃঙ্খলা।

শৃঙ্খলা ও নির্দেশ

বার্ট্রাণ্ড রাসেল (*Bertrand Russell*) বলেন : সত্যিকার শৃঙ্খলা বলতে বাইরের কোন বাধ্যবাধকতা বোঝায় না, ইহা মনের একটি অভ্যাস যা শিশুকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সার্থক পরিণতির দিকে এগিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্খলায় থাকে অন্তরের তাগিদ, শুভবুদ্ধি ও আত্মসংযমের ক্ষমতা। কাণ্ট (*Kant*) এ-ধরনের শৃঙ্খলাকে বলেছেন, ইচ্ছার স্বায়ত্তশাসন (Autonomy of the will), উহা আত্ম-শৃঙ্খলা (Self-discipline)। তাহলে প্রকৃত শৃঙ্খলা অন্তর্জাত। একেই আমরা বলি মুক্ত শৃঙ্খলা (Free discipline)।

নির্দেশের (Order) দ্বারা বাইরের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছা ব্যক্তির ওপর আরোপিত হয়। নির্দেশের মধ্যে একটা খবরদারী ভাব বিদ্যমান। স্যার পার্সি নান (*Sir Percy Nunn*) বিদ্যালয়-শৃঙ্খলা ও বিদ্যালয়-নির্দেশের মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। নির্দেশ হল বহির্জাত, সুতরাং আরোপিত। শৃঙ্খলা নির্দেশের মতো বাইরের জিনিস নয়; শৃঙ্খলা এমনই একটা জিনিস যা আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশকে স্পর্শ করে। আমাদের

সকল আবেগ এবং অবাঞ্ছনীয় ক্ষমতার আয়ত্তীকরণ হচ্ছে' শৃঙ্খলা। অনিয়ন্ত্রিত এবং এলোমেলো শক্তি ও আকাঙ্ক্ষাকে স্বশাসনে আনা শৃঙ্খলার কাজ। এর ফলে যা অনির্দিষ্ট এবং উদ্দেশ্যহীন তা সুনির্দিষ্ট ও উদ্দেশ্যমুখী হয়। যেখানে শক্তির অপব্যয় এবং অকার্যকারিতা ছিল সেখানে শৃঙ্খলা নিয়ে আসে মিতব্যয়িতা এবং দক্ষতা।[1]

সংকীর্ণ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত শৃঙ্খলা আর নির্দেশ (order) বা শাসনের কোন পার্থক্য নেই। বিদ্যালয়ে বা শিক্ষায় 'শৃঙ্খলা' বলতে সাধারণতঃ শাস্তির ভয়ে ও পুরস্কারের লোভেব দ্বারা শিক্ষার্থীর আচরণের নিয়ন্ত্রণ। এ শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীর ওপব আরোপিত হয। এর পিছনে তাদের অন্তরের কোন তাগিদ নেই। স্বাধীনতার সঙ্গে এ শৃঙ্খলার কোন যোগসূত্র নেই, আছে চরম বিরোধ। নব্য শিক্ষাতত্ত্বে এরূপ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত বহির্জাত বা আবোপিত শৃঙ্খলা বাতিল কবা হযেছে। বিদ্যালযের বিধি-নিষেধ বা নিযমকানুনেব প্রতি শিক্ষার্থীর আনুগত্য থাকবে কিন্তু তা শাস্তির ভযে বা পুরস্কারের লোভে নয। শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শৃঙ্খলা মেনে চলবে তার শিক্ষাকে সার্থক করার জন্য। এ শৃঙ্খলা কোন বাইরেব নির্দেশ মেনে চলা নয়, এ হবে আত্মশাসন। সত্যিকারের শৃঙ্খলা অন্তর্জাত (Internal) এবং মুক্ত (free)। তাই নির্দেশ আনুগত্য স্বীকারের জন্য খবরদারী কবে এবং এটা প্রশাসনিক ফলশ্রুতি। নির্দেশ শিক্ষার্থীকে আদেশ মেনে চলার জন্য বাধ্য করে। পক্ষান্তবে শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীর মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রয়োজনীয় বিধি মেনে চলার প্রবণতা জাগায়। তাই শৃঙ্খলা হল স্বায়ত্তশাসনের (Self-Government) প্রস্তুতি।

স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলাজনিত মনোভাবের বিবর্তন (Development of the Idea regarding Freedom & Discipline): নব্য শিক্ষাতত্ত্বে স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা সম্পর্কিত আধুনিক মনোভাব সংগঠনের পিছনে বিবর্তনের ইতিহাস জড়িত। বিদ্যালয় হল সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আর রাষ্ট্র হল বৃহত্তম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয় এবং অনুরূপ সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিবর্তন সম্পর্কিত। রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় বিশেষ ব্যক্তির শাসন

1. "Discipline" is not an external thing, like order, but something that touches the inmost springs of conduct. It consists in the submission of one's impulses and powers to a regulation which imposes form upon their chaos, and brings efficiency and economy where there would otherwise be ineffectiveness and waste."—*P. Nunn*. P. 250.

(রাজতন্ত্র) থেকে এল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গের শাসন (অভিজাততন্ত্র) এবং অবশেষে এল জনগণের শাসন (গণতন্ত্র)। আধুনিক যুগে আমরা গণতান্ত্রিক শাসনাধীনে বসবাস করি। বিদ্যালয় প্রশাসনের বিবর্তন ধারা ঠিক একই সমান্তরালে চলমান। এখানে **প্রথম স্তরে** ছিল বিশেষ ব্যক্তিব শাসন। তখন প্রধান শিক্ষক স্বৈরতান্ত্রিক উপায়ে কঠোর শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা শৃঙ্খলা বিধান করতেন। **দ্বিতীয় স্তরে** বাজতন্ত্রের ন্যায় প্রধান শিক্ষকেব স্বৈরতন্ত্রেব অবসান ঘটলো। এবার অভিজাততন্ত্রেব ন্যায এল প্রধান শিক্ষক এবং তার সহকর্মীদের যৌথ শাসন। প্রধান শিক্ষকেব শাসন এবং প্রধান শিক্ষকসহ শিক্ষকদের যৌথ শাসন ছিল কর্তৃত্বমূলক (authoritative)। এরূপ শাসনেব দ্বারা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা উপরিতলগতভাবে সংবক্ষিত হলেও নির্যাতিত শিক্ষার্থীদের মনে থাকতো প্রচণ্ড ক্ষোভ ও বিদ্রোহীভাব।

তৃতীয় স্তরে এল গণতান্ত্রিক চিন্তাধাবা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক জীবনে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাব আবির্ভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রেও এব প্রভাব পড়ে। এ ব্যাপাবে রুশোর চিন্তাধারা ছিল অগ্রদূত। তাই তিনি 'শিশুব ত্রাণকর্তা' (emancipator of the child) হিসেবে অভিনন্দিত। শিশুকে মুক্তিদানেব বাণী ঘোষণা কবলেন রুশো এবং তার অনুগামীবা। আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষা সংস্কাবকরা রুশো আর তাঁর অনুগামীদেব ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ হলেন। স্বাধীনতা (freedom) ও শৃঙ্খলার (discipline) নতুন ভাবধারা তাদেব মনে রেখাপাত করল। তাঁরা বুঝলেন বিদ্যালযেব প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও শিক্ষকদের একচেটিযা কর্তৃত্ব থেকে শিশুকে মুক্তি দেওয়া কর্তব্য। আত্মশাসনের (Self Government) জন্য শিশু বা শিক্ষার্থী হবে স্বাধীন। প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ্‌দের ধারণায় বিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণ যথেষ্ট গণতান্ত্রিক ও মঙ্গলজনক পদক্ষেপ।

বিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষার্থীদের ভূমিকার ইতিবৃত্ত (History of the Students' Participation in School Administration): রাজতান্ত্রিক ও অভিজাততান্ত্রিক রাষ্ট্রশাসনে যেমন প্রজাপুঞ্জের কোন ভূমিকা ছিল না তেমনি প্রধান শিক্ষকতান্ত্রিক বা শিক্ষকমণ্ডলীতান্ত্রিক বিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষার্থীদের কোন ভূমিকা ছিল না। তবে ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকালের আশ্রম বিদ্যালয় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি মধ্যযুগের শেষাংশের পাঠশালা, টোল ও চতুষ্পাঠীগুলিতে শিক্ষকদের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও শিক্ষামূলক ও প্রশাসনিক

কিছু কিছু দায়িত্ব যোগ্য, বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে অন্যদের চেয়ে উন্নত স্তরের বয়স্ক শিক্ষার্থীদের ওপর ন্যস্ত করা হত। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা সর্দার পড়ো প্রথায় (Monitorial System) পরিণতি লাভ করে।

আধুনিক যুগের প্রথম দিকে ভারতের দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায় (Indigenous System of Education) পাঠশালাগুলিতে এরূপ সর্দার পড়ো প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। পাঠশালার গুরুমশায় উচ্চতর শ্রেণীর দু-একটি শিক্ষার্থীকে বেছে নিয়ে তাদের ওপর সুশাসনের এমনকি তাঁর অনুপস্থিতিতে পড়ানোর দায়িত্বও অর্পণ করতেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর এণ্ড্রু বেল (*Dr. Andrew Bell*) দক্ষিণ ভারতে এই প্রথার প্রচলন লক্ষ্য করেন। এটিকে তিনি পরে ইংল্যাণ্ডে প্রচলন করেন। প্রথাটি সেখানেও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

প্রাথমিক স্তরে সর্দার পড়োর কাজের পরিধি ছিল সীমিত। দুষ্টু ছেলেদের নাম লেখা, গৃহের পাঠানুশীলন (Home task) সংগ্রহ করা, শিক্ষকের নির্দেশ ঘোষণা করা ইত্যাদি ছিল তাদের প্রধান কাজ। একজন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ে সর্দার পড়ো নিম্নশ্রেণীতে পড়ানোর কাজও পরিচালনা করত। এদের কর্মসূচীর মধ্যে শ্রেণীকক্ষের প্রশাসনিক ও শৃঙ্খলাজনিত চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে ও তাদের কর্মের পরিধিও বৃদ্ধি পায়।

এই মনিটর প্রথা ইংল্যণ্ডেও ভিন্নরূপে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশ্ববিখ্যাত প্রধান শিক্ষক ডক্টর টমাস আর্নল্ড (*Dr. Thomas Arnold*) তাঁর রাগবি-এর (Rugby) পাবলিক স্কুলে মনিটর প্রথা প্রিফেক্ট প্রথা (Prefect System) নামে প্রচলন করেন। তিনি বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর যোগ্যতম শিক্ষার্থীকে নিয়ে তার ওপর অনেক কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করতেন। প্রকৃতপক্ষে ডক্টর আর্নল্ড ছিলেন সত্যিকারের প্রতিভাবান, ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, যোগ্যতম প্রধান শিক্ষক। তাঁর চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও কর্ম সম্পাদনের যোগ্যতা সহজে শিক্ষার্থীদের মনে প্রভাব বিস্তার করত। শিক্ষার ইতিহাসে ডক্টর আর্নল্ডের যুগ প্রভাববাদের (Impressionism) যুগ নামে পরিচিত।

শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে **মনিটর** বা **প্রিফেক্ট প্রথার দুর্বলতা নানাবিধ। প্রথমতঃ,** শ্রেণী শিক্ষক শ্রেণীর মনিটর বা প্রিফেক্ট মনোনীত করেন এবং এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। কোথাও বা প্রধান শিক্ষক সকল শ্রেণীর জন্য একজন মনিটর মনোনীত করেন। এসব ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের কর্তৃত্ব পুরোপুরি বহাল থাকে।

তাই এ শাসনতন্ত্র স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রকার ভেদ মাত্র। শিক্ষার্থীদেব স্বশাসনের চিহ্নটিও এখানে লক্ষ্য করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, মনিটর বা প্রিফেক্টের ওপর বিদ্যালয়ের কিছু কিছু কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় কিন্তু কোন অধিকার অর্পণ করা হয় না। তারা যন্ত্রচালিতের ন্যায় প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষকের নির্দেশ পালন করে। এর দ্বারা শিক্ষকের কর্তৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা অনেক বেশী জোরদার হয় কিন্তু শিক্ষার্থীরা স্বাধীনতা বা স্ব-শাসন থেকে অধিক মাত্রায় বঞ্চিত হয় ; এবং এক্ষেত্রে মনিটর বা প্রিফেক্ট অতন্দ্র প্রহরীরূপে নিযুক্ত থাকে।

তৃতীয়তঃ, মনিটর বা প্রিফেক্ট ছাত্র সমষ্টির নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়। তারা শিক্ষকের বা প্রধান শিক্ষকের অনুগ্রহভাজন বা প্রীতিভাজন শিক্ষার্থী মাত্র। ফলে তাদেব আমলাতান্ত্রিকতা সাধারণ ছাত্র সমাজের নিকট অসহ্য হযে ওঠে। তাদেব মনে ঈর্ষা, ক্ষোভ ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। সুতরাং মনিটর বা প্রিফেক্ট নিযোগের দ্বারা শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসনকে মেনে নেওযা হযেছে—একথা বলা চলে না। তবে এটাকে বিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষার্থীর ভূমিকাব অঙ্কুর বলা যেতে পারে।

ডক্টর আর্নল্ড (*Dr. Arnold*) কর্তৃক গৃহীত ও প্রচলিত মনিটব এবং প্রিফেক্ট প্রথা আজকের দিনের বিদ্যালয় প্রশাসনের দাবি পূরণ করতে পারে না। আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদা হল গণতান্ত্রিক ধারায় বিদ্যালয়-জীবনের পুনর্গঠন। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিদ্যালযের **প্রথম কর্তব্য হল** শিক্ষার্থীকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিযার সঙ্গে পরিচয় করিযে দেওযা।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন অনুধাবন করতে পারে যে বিদ্যালয়-সমাজের সে একজন দায়িত্বশীল সভ্য। বিদ্যালযের উন্নযন উদ্দেশ্যে সহপাঠীদের সক্রিয় সহযোগিতায় তাকেও কর্তব্য সম্পাদনে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

তৃতীয়তঃ, বিদ্যালয় সংগঠিত ও পরিচালিত হয় গণতান্ত্রিক সমাজের জীবন্ত মানব শিশুদের নিয়ে। এসব শিশুর ভেতরেই রয়েছে সামাজিক সম্ভাবনা। বিদ্যালয়ের কর্তব্য হল সমাজের দায়িত্বশীল সভ্য ও রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিকের যাবতীয় গুণ ও দক্ষতা বিকাশে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা। শিক্ষার্থীকে গণতান্ত্রিক **সমাজবোধ ও রাষ্ট্রীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে বিদ্যালয় এ দায়িত্বপালন করতে পারে।**

চতুর্থতঃ, দমন, পীড়ন ও শাসনের দ্বারা শিক্ষার্থীর মনে দাসত্বের চেতনা সঞ্চার করা যায় এবং সাময়িক আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করা যায় কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল সভ্য হিসেবে তৈরি করা যায় না। তাই বিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষার্থীকেও অংশ গ্রহণের অধিকার দিতে হবে—শিক্ষার্থীকে নেতৃত্ব প্রদানের দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করতে হবে।

শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় প্রশাসনে অংশ গ্রহণের অধিকার দেওয়া ব৷ **শিক্ষার্থীর স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনে যথেষ্ট বাধাবিপত্তি রয়েছে।** সেগুলি হল : **প্রথমতঃ**, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকমণ্ডলী অনভিজ্ঞ নাবালক নাবালিকাদের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা তুলে দিতে চাইবেন না। কর্তৃত্বপ্রদানে অভ্যস্ত শিক্ষক-মণ্ডলীর নিকট এটা অনেকখানি মর্যাদাহানিকর কার্য। পূর্বাভিজ্ঞতা ও বিবেক-বিবেচনাহীন শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণ শিক্ষকদের নিকট বিরক্তিকর বলে মনে হবে। কিন্তু এটাকে ঠিক স্থায়ী অন্তরায় হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, একটা প্রথা চালু হয়ে গেলে অভ্যাসে পরিণত হয়। মর্যাদাহানির প্রশ্ন অনেকখানি মানসিক অন্তরায়। অভ্যাস এ বাধা সহজে দূর করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রশাসনিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ছাত্র-সংসদ এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে সেটা বিদ্যালয় ও ছাত্র সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। এরূপ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক এবং তার সহকর্মীরা গ্রহণযোগ্য পরামর্শ দিলে সংসদের নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

তৃতীয়তঃ, ভারপ্রাপ্ত ও নির্বাচিত ছাত্রকর্মী দায়িত্বশীল ও দক্ষ না হতে পারে। ফলে প্রশাসনিক কর্মে গোলযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রকট হয়ে ওঠে। এসব ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকমণ্ডলীর সুপরিচালনা কর্মীদের সঠিক পথে পরিচালনা করে তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন।

চতুর্থতঃ, ছাত্রসংসদের হাতে শাস্তিপ্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করলে অনেক সময় বিপদের সম্ভাবনা থেকে যায়। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, সহ-পাঠ্যসূচীর পরিকল্পনা ইত্যাদি কর্মে সর্বদা নিয়োজিত রাখার প্রচেষ্টা সুফল প্রদান করতে পারে।

অবশেষে বলা যায়, শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রচলনের পথে আরও অনেক অন্তরায় থাকতে পারে। কিন্তু একটু চিন্তা করলে বুঝা যায় সে-সব অন্তরায় প্রাচীন চিন্তাপ্রসূত। ধৈর্য, তিতিক্ষা, কৌশল ও গণতান্ত্রিক চেতনা

দ্বারা সেসব অন্তরায় সহজে দূর করা যায়। স্বায়ত্তশাসন প্রথায় আনীত শৃঙ্খলা হবে প্রকৃত আত্মশৃঙ্খলা (Self discipline)। এটা বহির্জাত বা আরোপিত নির্দেশজাত শৃঙ্খলা নয়।

ছাত্র স্বায়ত্তশাসনের ধরন (Types of students' Self Government): ছাত্র স্বায়ত্তশাসন সংস্থা পরিপূর্ণ (Complete) আকারের হবে, কি আংশিক (Partial) আকারের হবে, বিদ্যালয়-প্রশাসনে ছাত্র সংস্থা শুধু অংশ গ্রহণ (Students' participation) করবে না পরিপূর্ণ দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত করা হবে—ইত্যাদি সম্পর্কে মতভেদ থাকতে পারে। এরূপ মতভেদ আছে বলেই ছাত্র স্বায়ত্তশাসনের বিচিত্র স্বরূপ বা ধরন (forms) লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখযোগ্য ধরণগুলি হল:

(১) মনিটোরিয়্যাল বা **প্রিফেক্ট প্রথা** (Monitorial or Prefect system): মৌলিক সর্দার পড়ো প্রথা থেকে মনিটোরিয়্যাল বা প্রিফেক্ট-প্রথার উদ্ভব। তবে এই প্রথাকে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন সংস্থায় রূপায়িত করা যায়। বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণী থেকে মনিটার নির্বাচন বা মনোনীত করে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা' সংগঠন করা যায়। কেন্দ্রীয় সংগঠনের থাকবে নানা কর্মের জন্য পৃথক পৃথক উপ-সমিতি। উপ-সমিতিগুলি স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থা বা সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে। কেন্দ্রীয় সংস্থা প্রয়োজন অনুসারে পূর্ববন্টিত কর্মের তদারক করবে। এভাবে মনিটর বা প্রিফেক্টদের নিয়ে গঠিত সংস্থা স্ব-শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা আনয়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে।

(২) অগ্রদূত প্রথা (Pioneer System): সোভিয়েট রাশিয়াতে এরূপ অগ্রদূত প্রথা বিদ্যমান। আন্তরিকতা ও আনুগত্যের দিক থেকে প্রতিনিধি স্থানীয় এবং পড়াশুনায় ও খেলায় যাদের উল্লেখযোগ্য রেকর্ড আছে এমন দুজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাগত কর্ম ও উপস্থিতি তত্ত্বাবধানের জন্য অগ্রদূত রূপে মনোনীত করা হয়। ঠিক একই প্রণালীতে শিক্ষার স্বাস্থ্যগত বিষয় তত্ত্বাবধানের জন্য দুজন, খেলা এবং সহ-পাঠ্যসূচী তদারকীর জন্য দুজন, সাধারণ শৃঙ্খলা ও আচার-আচরণ তদারকীর জন্য আরও দুজন শিক্ষার্থীকে মনোনীত করা হয়। এই ভাবে প্রতিটি শ্রেণীতে আটজন অগ্রদূতকে বেছে নেওয়া হয়। ক্লাশ শুরু হওয়ার পরেই প্রথম দল ঠিক তাদের নিম্ন শ্রেণীতে (Next lower class) প্রবেশ করে শিক্ষাগত ও উপস্থিতির বিবরণ

সংগ্রহ করে। তারা কর্মে অবহেলা বা উপযুক্ত কারণ ছাড়া অনুপস্থিতির জন্য প্রতি ছাত্রপিছু ঋণাত্মক নম্বর ধার্য করে (Score point of negative value)। ঠিক একই প্রণালীর দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ দল পর পর স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করে। এবার উচ্চতম শ্রেণী থেকে উপরিউক্ত উপায়ে মনোনীত দুজন ছাত্রের ওপর অগ্রদূতদের নিকট থেকে রিপোর্ট সংগ্রহের ভার দেওয়া হয়। তারা যথারীতি সংগৃহীত রিপোর্ট নিয়ে চার্ট বা তালিকা তৈরি করে ও সেটিকে সভাকক্ষে বোর্ডের ওপর সংস্থাপন করে। যে শ্রেণী সর্বাপেক্ষা কম ঋণাত্মক মান পায় তার নামটি থাকে উপরে এবং সর্বাপেক্ষা বেশী ঋণাত্মক মানপ্রাপ্ত শ্রেণীব নামটি থাকে সর্বনিম্নে। দৈনিক তালিকা থেকে আবার সাপ্তাহিক তালিকা তৈরি হয়। এই তালিকা থেকে প্রতিটি শ্রেণীর ত্রুটিবিচ্যুতির তুলনামূলক বিচার করা যায়। এই ভাবে অগ্রদূত প্রথার মাধ্যমে রাশিযাব বিদ্যালয়ের Spirit or tone-টিকে অক্ষুণ্ণ বাখার চেষ্টা করা হয়। অগ্রদূতরা ছাত্র সমাজেব নির্বাচিত প্রতিনিধি না হলেও তাদের দ্বারা প্রশাসনিক কর্মে শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহণের নীতি অনেকখানি পালিত।

(৩) হাউস প্রথা (House system): হাউস প্রথা ছাত্র স্বাযত্তশাসনের দিক থেকে অতি উত্তম ও উল্লেখযোগ্য সংস্থা। ইংল্যাণ্ডের পাবলিক স্কুল এবং অন্যান্য আবাসিক মাধ্যমিক বিদ্যালযে এই প্রথার প্রচলন খুব বেশী। সেখানে হাউসের নামকরণ করা হয় প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকদেব নামে; আর ভারতে জাতীয় নেতাদের নামের সঙ্গে মিল রেখে হাউসের নামকবণ করার প্রথা চলে আসছে, যেমন—গান্ধী হাউস, টেগোর হাউস, নেতাজী হাউস, তিলক হাউস ইত্যাদি। প্রতিটি বিদ্যালযে চারটি হাউস রাখা বাঞ্ছনীয়। উচ্চতম শ্রেণী থেকে নিম্নতম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণীকে চারটি হাউসে বিভক্ত করা হয়। আবার প্রতিটি শ্রেণীতে চারটি হাউসের জন্য ছাত্রদের মধ্যে চারটি সুস্পষ্ট বিভাগ থাকে। আবাসিক বিদ্যালযের হোস্টেলগুলিতেও চাবটি হাউসের জন্য চারটি ব্লক রাখা হয়। প্রধান শিক্ষক প্রতিটি হাউসের জন্য ছাত্রদের ভেতর থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন একজন করে হাউস লিডার (House leader) এবং শিক্ষকদের ভিতর থেকে নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতাসম্পন্ন একজন করে হাউস মাস্টার (House master) নিয়োগ করেন।

প্রতিটি হাউসে বিদ্যালয়ের নিম্নতম থেকে উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্ররা থাকে। তাই উচ্চশ্রেণী, মধ্যম শ্রেণী, নিম্ন শ্রেণী—এরূপ চিন্তাধারা ছাত্রদের মনে আসে

না। তারা হাউসের সুনামের জন্য হাউসের সমষ্টিগত জীবনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। এখানে দলীয় জয় ও দলীয় পরাজয় বড় কথা, ব্যক্তিগত জয় পরাজয়ের চিন্তা ছাত্রদের মন থেকে মুছে যায়। নিম্নতম শ্রেণী থেকে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থী হাউসের কর্মসূচী ও দায়িত্ব পালনের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে।

মিঃ টেরী (*P. W. Terry*) তার "Supervising Extra-curricular Activities" নামক পুস্তকে সহ-পাঠ্যসূচী পরিচালনায় স্বায়ত্তশাসন পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচ ধরনের ছাত্র-সহযোগিতার (Pupil participation) কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল :

(১) অনিয়মিত ধরন (Informal type)

(২) নির্দিষ্ট কর্ম-বণ্টনের ধরন (The specific Service type)

(৩) সরল সংসদ ধরন (The simple Council type)

(৪) জটিল পরিষদ ধরন (The complex Council type)

(৫) বিদ্যালয় নগর ধরন (The school City type)

(১) অনিয়মিত ধরন : নাম থেকে ধারণা করা যায় যে এরূপ সংগঠন সম্পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী, জরুরী প্রয়োজনে এ ধরনের সংস্থা গঠিত হয়। ইংরেজীতে একে adhoc ব্যবস্থা বলা হয়। পারিতোষিক বিতরণী সভা বা বিদ্যালয়ের বিশেষ কোন উৎসব অনুষ্ঠানে উচ্চতর শ্রেণীর কয়েকজন শিক্ষার্থীর ওপর কিছু কিছু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যেমন, অতিথি আপ্যায়ন, সভাকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ইত্যাদি। অনুষ্ঠানের সার্থকতার উদ্দেশ্যে এরূপ সাময়িক দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের ওপর প্রদান করা হয়। এধরনের সংগঠনের ত্রুটিগুলি হল :

(ক) বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী এতে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। (খ) শিক্ষার্থীদের গুণ ও দক্ষতা বিকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে এরূপ অস্থায়ী সংস্থা গঠিত হয় না। (গ) ভারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি নয়, তাই তারা প্রতিভূজনিত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। (ঘ) বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত ছাত্রদের মানসিক ব্যবধান সৃষ্টি হয়।

(ঙ) অনিয়মিত ধরনের দায়িত্ব অর্পণের দ্বারা স্বায়ত্তশাসনের যৌক্তিকতা ও নীতি বিঘ্নিত হয়।

(২) নির্দিষ্ট কর্ম-বণ্টনের ধরন : বিশেষ উপলক্ষের পরিবর্তে বিদ্যালয়ে স্থায়িভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর্ম-বণ্টনের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। যেমন, উপস্থিতির হার পর্যবেক্ষণ, পাঠাগার তত্ত্বাবধান, গ্রন্থাগারিককে সাহায্যদান,

প্রাঙ্গণ সাফাই, টিফিন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলের ওপর ন্যস্ত করা হয়। সাময়িক দায়িত্ব অর্পণ (Informal type) অপেক্ষা স্থায়িভাবে কর্ম-বণ্টন যথেষ্ট উন্নত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভারপ্রাপ্ত কর্মিবৃন্দকে শিক্ষকরা মনোনীত করতে পারেন অথবা তারা ছাত্র-সমাজের দ্বারা নির্বাচিতও হতে পারে। তবে স্বায়ত্তশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মিবৃন্দকে নির্বাচিত করাই যুক্তিযুক্ত। তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিয়মিত ধরনের সাময়িক দায়িত্ব প্রদানের ব্যবস্থাপনার ত্রুটিগুলি বিদূরিত হবে। তবে এখানে কেন্দ্রীয় কোন কমিটি না থাকায় বিভিন্ন দলের স্বার্থ ক্রমশঃ বড় হয়ে ওঠে এবং পরস্পরের মধ্যে রেষারেষির ভাব ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করে। ফলে বিদ্যালয়ের স্বার্থ বিঘ্নিত হতে থাকে।

(৩) **সরল সংসদ ধরন**ঃ নির্দিষ্ট কর্ম-বণ্টন প্রক্রিয়ার ত্রুটি দূর করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা সংগঠনের প্রয়োজন। এদিক থেকে সরল সংসদ ধরনের সংস্থার ভূমিকা বিশেষ কার্যকর। সরল সংসদ ধরনটি প্রকৃতপক্ষে ছাত্র পরিষদ নামে পরিচিত। 'এটি ছাত্র সমাজের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত পরিষদ। দু প্রকারে এরূপ নির্বাচন হতে পারে। প্রথমতঃ, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে পরিষদ গঠন করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, শ্রেণী (Class) বা হাউস পদ্ধতিতে (House system) এক একটি হাউস তাদের নিজস্ব নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠিয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র পরিষদ গঠন করতে পারে। শেষোক্ত ব্যবস্থাটি সহজসাধ্য প্রণালী হিসেবে গণ্য।

(৪) **জটিল পরিষদ ধরন**ঃ এ ব্যবস্থায় একটি মাত্র কেন্দ্রীয় পরিষদের পরিবর্তে একাধিক কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু সকল পরিষদের ভেতর থেকে কয়েকজনকে নিয়ে একটি ছোট কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হয়। একে বলা হয় কার্যনির্বাহক সমিতি (Executive Committee)। এরা সকল পরিষদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করে। সর্বাপেক্ষা বড় পরিষদের ওপর আইন-বিষয়ক ক্ষমতা (Legislative power) অর্পিত হয়। তাই এটির কাজ হল সকল বিভাগের কর্মসূচী পালনের বিধি প্রণয়ন করা। সংক্ষেপে আমরা কার্যনির্বাহক কমিটি এবং আইন-বিষয়ক বড় পরিষদটিকে যথাক্রমে মন্ত্রিসভা (Cabinet) এবং বিধান সভা (Legislative Assemebly) বা পার্লামেণ্টের (Parliament) সঙ্গে তুলনা করতে পারি। কার্যনির্বাহক কমিটির সভ্যেরা পদাধিকার বলে (Ex-officio) সাধারণ বা আইন পরিষদের সভ্য। কার্য-

নির্বাহক কমিটি প্রায়ই একত্র মিলিত হয় কিন্তু সাধারণ পরিষদ বিধি-প্রণয়ন নির্বাচন বা কোন জরুরী প্রয়োজনে মিলিত হয়।

(৫) বিদ্যালয় নগর পরিষদ ধরনঃ শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসনের সর্বাপেক্ষা জটিল ও বৃহত্তম রূপ এই নগর পরিষদ ধরনের সংস্থায় বিদ্যমান। সামগ্রিক বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যাবলী একটি পৌর স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার অনুরূপ সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়। বিদ্যালয়টি একটি মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন রূপে গণ্য। এর প্রতিটি শ্রেণী বা হাউস এক একটি ওয়ার্ড (ward)। প্রতিটি ওয়ার্ডের ছাত্ররা তাদের প্রতিনিধি (Councillor or Commissioner) নির্বাচন করে পাঠায়। প্রতিনিধিরা নির্বাচন করেন মেয়র (Mayor) বা পৌরপতি (Chairman) ও নগরপাল (Chief of the Police)। অর্থ, ছাত্র কল্যাণ, সমাজ-কল্যাণ, ক্রীড়া, সাফাই ও স্বাস্থ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট কর্ম-পরিচালনার জন্য দক্ষ সভ্যদের নিয়ে এক-একটি Standing Committee গঠিত হয়। নগর পরিষদের শীর্ষে থাকেন মেয়র। পরিষদের হাতে আইন-প্রণয়ন (Legislative) এবং বিচার সংক্রান্ত (Judicial) ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। পরিষদ সামগ্রিক কর্মের তদারক করেন।

বিদ্যালয়ের নগর পরিষদ বহু বিস্তৃত সংস্থা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক, সহ-পাঠ্যসূচী পরিকল্পনা ও বিচিত্র শিক্ষামূলক কর্মে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাজনিত দায়-দায়িত্ব শিক্ষার্থীরাই হাতে তুলে নিতে পারে।

স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দৃষ্টান্ত (Example of Experiment re: Students' Self Government)ঃ গণতান্ত্রিক চেতনায় শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসন সংগঠন ও পরিচালন নীতিগতভাবে গৃহীত। ইউরোপ ও আমেরিকায় স্বায়ত্তশাসনের বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা চলেছে। এ নিয়ে প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Experiment) করেন আমেরিকার উইলিয়াম আর. জর্জ (*William R George*)। তিনি বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে অপরাধপ্রবণ (delinquent) শিক্ষার্থীদের নিয়ে নিউইয়র্কে দি জর্জ জুনিয়র রিপাবলিক্ (The George Junior Republic) নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে তিনি সংগঠন করেন নগর পরিষদ ধরনের (City Council type) পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন সংস্থা। ধীরে ধীরে শিক্ষকরা এই সংস্থার হাতে সকল

প্রকার দায়-দায়িত্ব তুলে দিলেন। বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলিও শিক্ষকদের হাতে ছিল না। পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েও অপরাধী শিক্ষার্থীরা স্বায়ত্তশাসনকে সার্থক করে তুলল। পরিণামে তারা হল নিরপরাধ আদর্শ নাগরিক।

জর্জের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাফল্য পৃথিবীর নব্য শিক্ষাচিন্তায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আমেরিকার অনুকরণে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও ছাত্র স্বায়ত্তশাসনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। ইংল্যাণ্ডে এরূপ অনেকগুলি গবেষণামূলক বিদ্যালয় স্থাপিত হল। তার মধ্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করে লিটল কমনওয়েলথ (Little Commonwealth) নামক প্রতিষ্ঠানটি। এখানকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলও যথেষ্ট আশাপ্রদ।

এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল যে নিরঙ্কুশ সাফল্যলাভ করেছে তা বলা যায় না। লিটল কমনওয়েলথের শিক্ষক হোমার লেন (*Homer Lane*) তাই 'মধ্য পন্থা' অবলম্বনের পক্ষপাতী।

শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসনের উপযোগিতা (Utility of Students' Self Government)**:** নব্য শিক্ষাতত্ত্বে বিদ্যালয়ের কর্ম-পরিধি বিদ্যালয়ের সীমিতি গণ্ডী ছাড়িয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। উপরন্তু বিদ্যালয় প্রশাসনে এসেছে গণতান্ত্রিক প্রভাব। তাই বিদ্যালয় প্রশাসন এখন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর কর্তৃত্বাধীনে না রেখে শিক্ষার্থীর স্ব-শাসনের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অনেক প্রগতিশীল বিদ্যালয় তাই শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসনকে নীতিগতভাবে প্রচলন করেছে। এরূপ স্বায়ত্তশাসনের উপযোগিতা প্রসঙ্গে যেসব যুক্তি দেখানো হয় সেগুলো হল :

প্রথমতঃ, প্রতিটি বিদ্যালয়ের একটা নিজস্ব ঐতিহ্য থাকে। বিদ্যালয়ের নিজস্ব জীবনধারা, ভাব বিশেষ ধরন বা ইতিহাস ছাত্র-শিক্ষকের কর্মের মাধ্যমে ভবিষ্যতের দিকে গতিশীল হল। এরূপ ঐতিহ্য (Tradition) মূলতঃ বিদ্যালয়ের নিজস্ব Spirit or Tone—এর শক্তি এত প্রবল যে শিক্ষার্থীদের ওপর বিদ্যালয় সহজে প্রভাব বিস্তার করে। অপর দিকে এই Spirit or Tone-কে সজীব গতিশীল করার দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের। শিক্ষার্থীদের স্ব-শাসনের সুযোগ থাকলে তারা বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন, রীতি-নীতি ও দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে সহজে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও নির্দেশ পালিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ছাত্র-মনস্তত্ত্বের বিচারে স্বায়ত্তশাসন একান্ত কাম্য। গতানুগতিক শিক্ষা-প্রশাসনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আইন শিক্ষার্থীদের ওপর

আরোপ করা হয়। এরূপ আরোপিত নির্দেশের বিরুদ্ধে সর্বত্র বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। আরোপিত আইন বা নির্দেশ লঙ্ঘনের দ্বারা তারা আনন্দ পায়। নব্য শিক্ষাতত্ত্বে তাই শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ স্বায়ত্তশাসন শিক্ষার্থীকে মুক্ত বা অন্তর্জাত শৃঙ্খলাবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের মতো, বাইরের কর্তৃত্বের শাস্তির ভয়ে নয় হয়ে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব শাসনের দ্বারা তাদের সভ্য আচরণ এবং আত্মশৃঙ্খলা-বোধ জাগতে পারে ব্যক্তিগত এবং বিদ্যালয়ের সমষ্টিগত মঙ্গলের জন্য। তারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করুক, আচরণবিধি মেনে চলার দিকে তারাই লক্ষ্য রাখুক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্যালয়ে হাউস ব্যবস্থা, প্রিফেক্ট, মনিটর বা ছাত্র-সংসদ সংগঠিত হোক; যেন তারা আচরণবিধি প্রণয়ন, প্রচলন ও সংরক্ষণের দায়িত্ব বহন করে।

কারণ প্রকৃত শৃঙ্খলা হল অন্তর্জাত। বাইরের নিয়ন্ত্রণ কখন শৃঙ্খলাবোধ জাগাতে পারে না।[1] তাই শিক্ষার্থীর স্বায়ত্তশাসনের ভূমিকা আত্মশাসন ও শৃঙ্খলা-বিধানের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়তঃ, স্বায়ত্তশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরা যৌথভাবে নানা কর্মে ন্যস্ত থাকে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত এবং বিদ্যালয়ের সামগ্রিক মঙ্গলার্থে শিক্ষার্থীরা কর্মসূচী প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্ম-সম্পাদনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আচরণ-বিধি প্রণয়ন ও সংরক্ষণের জন্য দায়িত্ব বহন করে। এর ফলে তাদের মধ্যে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের অনুকূল কতকগুলি গুণ ও দক্ষতা অর্জন করে। এসব গুণ ও দক্ষতা আগামী দিনের জন্য অপরিহার্য সন্দেহ নেই। উল্লেখযোগ্য গুণ ও দক্ষতাগুলি হল :

(ক) **ব্যক্তিগত :** বন্ধুপ্রীতি, পরমত সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা, দলবিশ্বস্ততা, স্বার্থত্যাগ, দায়িত্বশীলতা, উদ্যোগ, আন্তরিকতা, আত্মসংযম, আত্মনির্ভরশীলতা, বিচক্ষণতা, বিচার-বিশ্লেষণে দক্ষতা ইত্যাদি।

(খ) **সামাজিক :** সমবায় ও সহযোগিতার মনোভাব, যৌথ কর্মে নিপুণতা ও প্রবণতা, সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগের সদিচ্ছা; সমন্বয় ও সংহতি বিধানের ক্ষমতা ও প্রবণতা ইত্যাদি।

(গ) **নেতৃত্বসুলভ :** উদ্যোগ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সম্পাদনা ও সংগঠনের দক্ষতা, বক্তৃতা দানের ক্ষমতা, মতপ্রকাশের ক্ষমতা, নিজে কাজ করে অন্যের মনে প্রেরণা সঞ্চারের দক্ষতা ইত্যাদি নেতৃত্বসুলভ সামর্থ্য।

---

1. "The discipline which higher education cultivates should aim at self-discipline—discipline directed from within, which does not depend primarily on external control."—Education Commission P. 297

(ঘ) সুনাগরিকতা ঃ অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, আচরণবিধি মেনে চলার প্রবণতা, গণতান্ত্রিক সচেতনতা ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ, পাঠ্যসূচীর তত্ত্বমূলক বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সহ-পাঠ্যসূচীর প্রয়োগমূলক বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পরিচিতি লাভ করে। তাই পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার মিলন সহজসাধ্য হয়। কারণ, স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বচেষ্টায় শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মে নিয়োজিত হয়।

পঞ্চমতঃ, শিক্ষার্থীরা যেসব কর্ম-সম্পাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাকে সার্থক করার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে। তবে শিক্ষামূলক, প্রশাসনিক ইত্যাদি প্রতিটি কর্মের সার্থক রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন হয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক, পরিচালক সমিতি ইত্যাদি সকলে সক্রিয় সহযোগিতা। সহযোগিতা লাভের জন্য স্বায়ত্তশাসনের কর্মীদের সচেষ্ট হতে হয়। এর ফলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ইত্যাদি সকলের মধ্যে গড়ে ওঠে মধুর সম্পর্ক। এ সম্পর্ক গতিশীল শিক্ষাকে প্রগতিশীল করার পক্ষে পরম সহায়ক।

সার্থক স্বায়ত্তশাসনের জন্য কয়েকটি অপরিহার্য শর্ত (Factors Essential for successful Self Government) ঃ গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা-প্রশাসনকে যতটুকু বিকেন্দ্রীকরণ করা সম্ভব হয়েছে ভারতের শিক্ষা-প্রশাসনকে অতখানি বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়নি। আমাদের শিক্ষা-প্রশাসন সরকার ও পরিচালক সমিতি কর্তৃক নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত। সরকারী শিক্ষানীতি এবং পরিচালক সমিতির সিদ্ধান্ত প্রধান শিক্ষক সহকর্মীদের সহযোগিতায় বিদ্যালয় জীবনে বাস্তবায়িত করেন। এই বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর স্বায়ত্তশাসনকে গণতান্ত্রিক চেতনার দ্বারা সার্থক করার প্রয়োজনীয় শর্ত নিম্নরূপ করা প্রয়োজন ঃ

(১) সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণী বা বহির্বিভাগীয় পরীক্ষার ভূমিকা যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সেখানে শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন (Complete students' Self Government) প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। এর দ্বারা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে বাধ্য। তবে শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে বিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। উপরন্তু স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ওপর সহ-পাঠক্রমিক কার্যসূচী পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলে শুভ ফলশ্রুতির সম্ভাবনা থাকে। **এ বিষয়ে শিক্ষকদের সতর্কতার সঙ্গে সুপরিচালনা অপরিহার্য।**

(২) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের উপযোগী শিক্ষাদানের জন্যে। এখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করেন এটি গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা। নব্য শিক্ষাতত্ত্বে বলা হয় শিক্ষক **শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভে সাহায্য করেন**। তত্ত্বগতভাবে শিক্ষকরা এই নব্য শ্লোগানটি অবহিত, কিন্তু এর বাস্তবায়নের উপযোগী শিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণের সুযোগ এদেশের বিদ্যালয়গুলিতে নেই বললেও চলে। তাই বাস্তবক্ষেত্রে আজও শিক্ষকরা **শিক্ষাদান** করেন। এই শিক্ষাদানের সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করে বিদ্যালয়-প্রশাসন (School Administration)। তাই বিদ্যালয়ের সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থাকে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ করা যায় না। শুধু শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ-সংশ্লিষ্ট কর্মের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের কর্মসূচীকে সীমিত করাই বাঞ্ছনীয়। "শিক্ষকের সর্বময় কর্তৃত্ব যেমন খারাপ তেমনি ছাত্রদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতাও অবিমিশ্র কল্যাণকর নয়।" তাই শিক্ষকের হাতে প্রতিষেধ ক্ষমতা (Veto power) রাখা যুক্তিযুক্ত।

(৩) প্রচলিত অবস্থা থেকে নতুন প্রগতিশীল ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য। পরিবর্তন করতে হবে ধীর গতিতে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে। অন্যথায় নতুন অবস্থায় অনভিজ্ঞ অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব ক্ষমতার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে। আর মনে রাখা উচিত শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসন গৃহীত ও প্রচলিত হলে শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কারণ, শিক্ষকদের সজাগ দৃষ্টি ও সতর্ক চেতনার উপর স্বায়ত্তশাসনের সাফল্য নির্ভর করে।[1]

(৪) স্বায়ত্তশাসন হবে সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত। শুধু বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিধানের ওপর গুরুত্ব দিয়ে স্বায়ত্তশাসন পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত নয়। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের উপযোগী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও সংগঠন করা প্রয়োজন।

(৫) স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষার্থী কর্মিবৃন্দ যাতে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কর্ম পরিচালনা করে, প্রতিটি প্রকল্পের সংবাদ যথাযথ ঘোষণা করে কর্মে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়, সার্থক পরিচালনার জন্য যথারীতি সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, প্রকল্পের তালিকা প্রকাশ করে,

1. "A school, city state, students' council or other form of student management, requires a constant and intelligent supervision in which neither dictation nor aloofness is conspicuous."—*W. R. Smith.*

অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে পরিমিততা রক্ষা করে, অবশেষে দলীয় রাজনীতির পুতুলে পরিণত না হয়—ইত্যাদি সবদিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অপরিহার্য কর্তব্য।

(৬) স্বায়ত্তশাসন শিক্ষার্থীদের নিজস্ব গণতান্ত্রিক সরকার—এ সরকার ছাত্রদের জন্য ছাত্রদের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত। এযাবৎকাল বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলাবিধানের দায়িত্ব ছিল শিক্ষকদের। এখন শিক্ষার্থীরাই সরাসরি এ দায়িত্ব পালন করবে। এতে শিক্ষকদের দায়িত্ব কমে না, বরং বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তাই এবার অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায় শিক্ষককে অবতীর্ণ হতে হবে। তাঁর ত্রুটি শিক্ষার্থীরা ক্ষমার চোখে দেখবে না। তাঁকে সদা সতর্ক হয়ে সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গী শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে হবে।

সহ-পাঠ্যসূচীর সর্বশেষ রূপ (The End-status of Co-curricular Activitis)ঃ এক সময় যা ছিল পাঠ্যসূচী বহির্ভূত কার্যাবলী (Extra-curricular Activities) বিবর্তনের ধারায় তা হল সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যাবলী (Co-curricular Activities)। এই কার্যাবলী পাঠ্যসূচীর সহায়ক রূপে গণ্য হত। শিক্ষার্থীরা এসব কার্যে অংশ গ্রহণ করত কি করত না তা খতিয়ে দেখার জন্য কোন সংস্থার অস্তিত্ব ছিল না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অভিরুচির ওপর এই কার্যাবলীর সংগঠন নির্ভর করত। শিক্ষার্থীরা কর্মে কতটুকু সাফল্য ও দক্ষতা অর্জন করল তা পরীক্ষা করার কোন ব্যবস্থাই প্রবর্তিত হয়নি। ফলে বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবহেলিত হত। কিন্তু কার্যাবলীর গুরুত্ব সবাই অনুভব করতেন। তাই সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যাবলীর নতুন রূপ দেখতে পাই।

বর্তমানে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শিক্ষার পুনর্গঠন চলছে। জাতীয় শিক্ষা কাঠামোর (১০+২+৩) জন্য নতুন পাঠ্যসূচী ও পাঠক্রম প্রবর্তিত হচ্ছে। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রবর্তিত হল দশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নতুন পাঠক্রম। এই পাঠক্রমের সূচীতে যুক্ত হয়েছে—(ক) কর্মশিক্ষা (খ) শারীর শিক্ষা ও (গ) সমাজ সেবা মূলক কার্যাবলী। বিষয়গুলি আজ আর পরীক্ষা বর্জিত বিষয় নয়। এসব বিষয়ের পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হতে হবে। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই থেকে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসংসদ+২ শ্রেণীর জন্য নতুন সিলেবাস প্রবর্তন করেছেন। এই সিলেবাসে বিশেষ কার্যাবলীর মধ্যে—(ক) কর্মশিক্ষা, (খ) সমাজ ও জনসেবা মূলক কার্যাবলীকে নির্বাচনমূলক অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং অতীতে যে-সব কার্যাবলীকে পাঠ্যসূচীর সহায়ক বলে নীতিগতভাবে গণ্য করা হত আজ সেগুলি অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়রূপে বিধিবদ্ধ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে গণ্য হয়েছে। এখন এগুলির বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমাদের জাতীয় দায়িত্বরূপে স্বীকৃত। পশ্চিমবঙ্গ সহ সমগ্র ভারতে এরূপ কর্মভিত্তিক পাঠ্যসূচীর বাস্তবায়নের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয় খণ্ড

স্বাস্থ্য-শিক্ষা

(Health Education)

প্রথম অধ্যায়

স্বাস্থ্য-শিক্ষার মূলতত্ত্ব

[Fundamental of Health Education]

অধ্যায় পরিচয় ঃ স্বাস্থ্য-শিক্ষা কথাটির সঙ্গে যেসব কথা প্রাসঙ্গিকভাবে আসতে পারে তার সামগ্রিক অর্থ মূলতত্ত্ব কথাটি দ্বারা প্রকাশ পায়। তাই শীর্ষে এই অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে স্বাস্থ্য-শিক্ষার মূলতত্ত্ব। প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বিভিন্ন অনুচ্ছেদে পৃথক পৃথক আলোচনা করা হল। অনুচ্ছেদগুলোকে পৃথক পৃথক প্রশ্নের উত্তর হিসেবেও গণ্য করা যায়। আবার অন্যান্য অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয় আলোচনার সময় মূলতত্ত্বের অংশ পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

১। সূচনা (Introduction) ঃ

আধুনিক যুগে সামগ্রিক শিক্ষা-চেতনার একটি অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল স্বাস্থ্যশিক্ষা। অতীতে স্বাস্থ্যশিক্ষার ওপর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করা হত না। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে প্রাচীন ভারত শারীর শিক্ষার বিষয়ে (Physical Education) নিতান্ত অজ্ঞ ছিল না। অনার্য শক্তির সাথে বারে বারে যুদ্ধের তাগিদে আর্যরা সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনে শরীর চর্চা করত। 'ঢাল-তলোয়ার পরিচালনা, অশ্বারোহণ, দৌড়-ঝাঁপ, লম্ফন, মুষ্টিযুদ্ধ, তীর-ধনুক ব্যবহার এবং পশু শিকার ছিল সে যুগের সাধারণ রীতি।' পরে স্থায়ী বসতি বিস্তারের পর আর্যরা শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হল। এদেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা আর্যদের মনে এমন একটা অবস্থা এনে দিল যে, তারা চিন্তা করতে শিখল শারীরিক চিন্তাই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের অন্তরায়। খ্রীস্টপূর্ব ১০০০ থেকে ২৪২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয়দের মনে এই চিন্তাধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী কালে বৌদ্ধ মতবাদে বিলাস ও শারীরিক নির্যাতন—এ দুয়ের মধ্যবর্তী পথই নির্বাণ লাভের উপায়রূপে নির্ধারিত হয়। তাই তক্ষশীলা ও নালন্দার শিক্ষাসূচীতে সন্তরণ, মুষ্টিযুদ্ধ, তীর নিক্ষেপ, পর্বতারোহণ, যোগব্যায়াম প্রভৃতি শারীর শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হয়। হিন্দু ও

বৌদ্ধ শিক্ষায় গুরুসেবা, ভিক্ষা, জল ও কাষ্ঠ সংগ্রহ, গো-পালন প্রভৃতির মাধ্যমে শিষ্যের শারীরিক শ্রমের যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হত। যোগ-সাধনা, প্রাণায়াম প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাধিমুক্তির আনুষ্ঠানিক বিধি পালন করা ছিল তৎকালীন শিক্ষার্থীদের অপরিহার্য কর্তব্য। রোগমুক্ত শরীর ও মন, গৃহ ও পরিবেশগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান স্বাভাবিকভাবে সমাজ-প্রগতির সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই প্রাচীন কাল থেকেই চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি হয়েছে, যুগে যুগে গড়ে উঠেছে সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত গৃহ পরিবেশ—মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়েছে। তবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে এই স্বাভাবিক স্বাস্থ্য-সচেতনতার যোগসূত্র ছিল না।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে শারীর শিক্ষার (Physical Education) যোগসূত্র স্থাপিত হল ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে। এই সময় মাদ্রাজের শিক্ষাধিকর্তা প্রথম ব্যায়াম (Gymnastics), ড্রিল (Drill) ইত্যাদি বিদ্যালয়ে প্রচলনের নির্দেশ দেন। এরপর থেকে ওয়াই. এম. সি. এ. (Y.M.C.A.), ফিজিক্যাল এডুকেশন কমিটি, পরাধীন ও স্বাধীন ভারতের নানা শিক্ষা কমিশন শারীর শিক্ষার উন্নয়নকল্পে নানা সুপারিশ করেছেন। ফলে, প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য হলেও আমাদের শিক্ষায়তনগুলোতে শারীর শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা রয়েছে।

এছাড়া ইংরেজ আমলেই প্রবর্তিত হয়েছে পাঠ্যবিষয় হিসেবে স্বাস্থ্যতত্ত্ব (Hygiene) বা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা ছিল। স্বাস্থ্যতত্ত্বে অভিজ্ঞ ডাক্তাররাই এই পাঠ্যপুস্তক রচনা করতেন। পুস্তকগুলিতে ব্যাধির বিভীষিকাময় কাহিনী পরিবেশন করা হত। শিশুমনে ভীতি সঞ্চার করে তাকে স্বাস্থ্যনীতি পালনের জন্য বাধ্য করার প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হত এই স্বাস্থ্যতত্ত্বে। সুতরাং এ স্বাস্থ্যশিক্ষার স্বরূপ ছিল নেতিবাচক (negative)।

আজও আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পর্কে সুষ্ঠু চেতনার অভাব লক্ষ্য করা যায়। সামগ্রিক স্বাস্থ্যশিক্ষার একটা অঙ্গ হল শারীর শিক্ষা (Physical Education)। প্রয়োজনের তুলনায় এ শিক্ষা বিদ্যালয়স্তরে নিতান্ত অল্প এবং নিম্নমানের। দ্বিতীয়তঃ তত্ত্বগত জ্ঞান পরিবেশনের জন্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের (Hygiene) বিষয়বস্তু অসম্পূর্ণ, নিম্নমানের

ও নেতিবাচক। আধুনিক স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ক ধারণা অতি ব্যাপক এবং ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। তাই প্রকৃত স্বাস্থ্য শিক্ষার স্বরূপ, প্রকৃতি ও তার বিচিত্র দিক সম্পর্কে শিক্ষকরা অবহিত হলে সমাজের প্রতিটি স্তরে স্বাস্থ্য-চেতনা যে প্রসার লাভ করবে—এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

২। স্বাস্থ্যশিক্ষার স্বরূপ (Nature of Health Education):

স্বাস্থ্য বলতে আমরা বাহ্য দৃষ্টিতে সাধারণতঃ দৈহিক সুস্থতাকেই বুঝি। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা এত সংকীর্ণ ও লঘু হতে পারে না। কারণ ব্যক্তির দেহের সঙ্গে মন, মনের সঙ্গে নানা চেতনা ও প্রক্ষোভ জড়িয়ে আছে। আবার ব্যক্তি-মানুষকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে সমাজের বিচিত্র অবস্থার ভেতর দিয়ে চলতে হয়। এদের সামগ্রিক সুস্থতাই মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা অতি ব্যাপক ও গভীর। এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসরণ ক'রে বলা যায়—

স্বাস্থ্য কি? (What is Health?)

স্বাস্থ্য হল একটি অবস্থা, যে অবস্থায় ব্যক্তি তার বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক এবং শারীরিক সম্পদগুলোকে দৈনন্দিন আবশ্যকীয় কর্মে কার্যকরভাবে সদ্ব্যবহার করতে সমর্থ হয়।[1] কথাটি থেকে অনুমান করা যায়, স্বাস্থ্য শুধু তত্ত্বভিত্তিক বিষয় নয়, বরং এটি হল একটা বাস্তব ব্যবহারিক অবস্থা। এই অবস্থায় শরীর ও মন এবং মন ও চেতনার কার্যকর প্রয়োগকেও বোঝায়। মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং তার শরীর ও মনের সম্পদগুলোর প্রয়োগ সমাজ-জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রেই সম্ভব। সুতরাং সমাজের বা সমষ্টির স্বাস্থ্য (Community Health) চিন্তা ও মৌলিক স্বাস্থ্য কথাটির সাথে নিবিড় ভাবে অন্বিত।

'স্বাস্থ্যই সম্পদ'—এই চির সত্য কথাটি সর্বজনবিদিত। সুস্থ অবস্থা শুধু ব্যক্তি-জীবনে নয় সামাজিক জীবনেও সম্পদরূপে বিবেচিত। আনুষ্ঠানিক

1. Health is that state in which the individual is able to mobilize all his resources—intellectual, emotional and physical for optimum daily living.—*Encyclopoedia of Education*.

সুশিক্ষার মাধ্যমে সমাজ-জীবনেই ব্যক্তির সার্বিক বিকাশ সম্ভব হয়। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি শিক্ষালাভ ও তার মূল্য থেকে বঞ্চিত। কারণ অসুস্থ ব্যক্তি শিক্ষালাভ করতে পারে না, আর অংশত পারলেও সে শিক্ষা জীবনে কার্যকর হয় না। তাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভের ভিত্তি হল—স্বাস্থ্য লাভ। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় জীবন ও শিক্ষার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। শিক্ষাই জীবন আবার জীবনই শিক্ষা। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন শিক্ষা কখনও শিক্ষাপদবাচ্য হতে পারে না। স্বাস্থ্যশিক্ষা এই সামগ্রিক শিক্ষার একটা অঙ্গ বিশেষ। একে অবহেলা করলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কি ভাবে ব্যক্তি তার সমাজ ও পারিপার্শ্বিক জীবনে সুস্থভাবে শারীরিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক শক্তিকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারে সেই শিক্ষাই হল স্বাস্থ্যশিক্ষা। মূলতঃ এর দ্বারা কোন তত্ত্বগত জ্ঞান অর্জন করা বোঝায় না। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নিরোগ দেহে আনন্দধারার মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত জীবন যাত্রায় অভ্যস্থ হওয়াই হল স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রকৃত লক্ষণ। তবে স্বাস্থ্যপ্রদ জীবন ধারায় যথাযথ অভ্যস্ত হওয়ার জন্যে তত্ত্বভিত্তিক জ্ঞানের প্রয়োজনও আছে। তাই আনুষ্ঠানিক সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তবে প্রকৃত স্বাস্থ্যশিক্ষা তখনই হবে যখন বিদ্যালয়ে লব্ধ তত্ত্বগত জ্ঞান জীবনের মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুভূতির সাথে একাত্ম বা একীভূত হয়ে যাবে। তখন নবলব্ধ জ্ঞানটুকু মনে নিবদ্ধ না থেকে জীবনধারার সাথে মিলেমিশে ব্যবহারিক হয়ে পড়বে। ব্যক্তির আচরণের মধ্য দিয়ে জ্ঞান বা তত্ত্বটুকু অভিব্যক্ত হবে। এটাই হল স্বাস্থ্যশিক্ষার মৌলিক তাৎপর্য বিষয়।

স্বাস্থ্যশিক্ষা কি ? (What is Health Education ?)

স্বাস্থ্যশিক্ষা (Health Education) সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা লাভের জন্যে এর সঙ্গে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Hygiene) বা স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিষয়টির পার্থক্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। এক সময় স্বাস্থ্যশিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানকে পরস্পরের প্রতিশব্দ হিসেবে গণ্য করা হত। কিন্তু উভয়ের শব্দগত অর্থ ও ভাবগত ব্যঞ্জনার মধ্যে পার্থক্যের সুর ধ্বনিত হয়। সাধারণভাবে 'শিক্ষা' শব্দটি জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্পর্কিত। কারণ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন শিক্ষা কখনও সত্যকার শিক্ষা বলে অভিহিত হতে পারে না। সুতরাং স্বাস্থ্যশিক্ষার অর্থ হল সুস্থ জীবনযাত্রায়

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান

পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হওয়া। জীবন যাপন পদ্ধতিই হল স্বাস্থ্যনীতি পালনের শিক্ষা। এশিক্ষা জীবনসত্তার সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্বিত, পক্ষান্তরে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Hygiene) হল তত্ত্বগত জ্ঞান। ইংরেজী 'হাইজিন' শব্দটি এসেছে গ্রীক্ *Hygieinos* শব্দটি থেকে। গ্রীস দেশে স্বাস্থ্যের বা সুস্থ জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন 'Hygeia'। শরীরকে রোগমুক্ত রাখতে পারলে সুস্থজীবন লাভ করা সম্ভব হত। যে তত্ত্ব জানলে শরীরকে রোগমুক্ত বা সংকীর্ণ অর্থে স্বাস্থ্য ভাল রাখা যায়—তারই উপায় পরিবেশন করা হয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়টি দ্বারা। অভিধানগত অর্থে 'হাইজিন' হল স্বাস্থ্যরক্ষাব ও প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞান।[1] অথবা স্বাস্থ্যের অনুকূল অবস্থা বা রীতি-নীতি সংক্রান্ত তত্ত্ব।[2] বস্তুতঃ হাইজিন তত্ত্বগত জ্ঞান পরিবেশনের বিষয়, সুতরাং পঠন-পাঠন সাপেক্ষ। যখন হাইজিন পঠন-পাঠনের ভেতর দিয়ে অর্জিত তত্ত্বগত জ্ঞান জীবন ধারার সাথে মিলেমিশে ব্যবহারিক হয়ে পড়বে তখন হবে প্রকৃত স্বাস্থ্যশিক্ষা। তাই স্বাস্থ্যশিক্ষা হল আচরণ ও ব্যবহার সাপেক্ষ। সুতরাং এটা হল মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনের কলা-কৌশল (Art)—জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন তত্ত্বকথা নয়।[3]

স্বাস্থ্যশিক্ষার আধুনিক সচেতনতা অনেক বেশী ব্যাপক ও গভীর। এক সময় স্বাস্থ্য বলতে শুধু ব্যক্তির দৈহিক সুস্থতাকেই বোঝাত। দেহসর্বস্ব পশু-পক্ষী ও গাছপালার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। মানুষের ক্ষেত্রে দেহ ছাড়াও মানসিক চেতনার কথা বিবেচ্য। দেহ ও মনের পারস্পরিক প্রভাব স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষ ক্রিয়াশীল। তাই ব্যক্তির স্বাস্থ্য কথাটি দ্বারা ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক সুস্থতাকে বোঝায়। আবার ব্যক্তির অস্তিত্বের অভিব্যক্তি হল সমাজসত্তায়। ব্যক্তি যেমন তার দেহ ও মন নিয়ে সজীব তেমনি পরিবার ও সমাজ-জীবনে অন্যান্য ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে সে তার অস্তিত্বকে ব্যক্ত করে। তাই ব্যক্তির পরেই আসে পারিবারিক স্বাস্থ্যশিক্ষার চিন্তা। পরিবারের প্রতিটি সভ্যের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, বাড়ী-ঘর, আসবাবপত্র, নিত্য-

ধারণার ব্যাপকতা

1. "a science of the establishment and maintenance of Health."
2. "Conditions or Practices (as of cleanliness) conducive to Health."
3. তুলনীয়: 'Health is wholeness, it applies to man as a unity.'
—*Anonymous*

ব্যবহার্য দ্রব্য, গৃহ-পরিবেশের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য, পানীয় দ্রব্য গ্রহণ প্রভৃতি পারিবারিক স্বাস্থ্যচিন্তার অন্তর্ভুক্ত।

ব্যক্তি ও পরিবারের স্বাস্থ্যের পর আসে ব্যাপক **সামাজিক স্বাস্থ্য-শিক্ষার চিন্তা**—তাই এটিও আধুনিক স্বাস্থ্যশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। ব্যক্তিকে নিয়ে যেমন পরিবার তেমনি ব্যক্তি ও পরিবার উভয়ের সমবায়ে গঠিত হয় সমাজ। মানুষের সমাজসত্তার মধ্যে দেহের ন্যায় দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয় এবং মানসিকতার ন্যায় অদৃশ্য বিষয় বিরাজ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, বিদ্যালয় হল আমাদের বিশাল সমাজ-পরিবেশের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ। বিদ্যালয়ের বাড়ী-ঘর, আসবাবপত্র, পুস্তক ও পত্রপত্রিকা, ফুলের বাগান, খেলার মাঠ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী—এদের সামগ্রিক রূপটি দৃষ্টি-গ্রাহ্য দেহ স্বরূপ। আর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক ভাব, আচার-আচরণ, ইচ্ছা, অনুভূতি—এসব হল সামগ্রিক বিদ্যালয়-সমাজের মানসিকতা। সমাজের এই দেহ ও মানসিকতার সুস্থতা স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়বস্তু। সামাজিক স্বাস্থ্যকে আমরা রাষ্ট্র পর্যায়ে **গণস্বাস্থ্য** (Public Health) হিসেবে অভিহিত করি। কখনও বা সীমিত অর্থে **যৌথস্বাস্থ্য** (Community Health) কথাটারও উল্লেখ করি।

এই স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পর্কে আধুনিক চিন্তাধারা শুধু ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার মধ্যে সীমিত নয়। মানুষের গড়া সজীব ও পরিবর্তনশীল সমাজকে নিয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার চিন্তাধারা সুবিস্তৃত। সমাজের কোন অংশে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হলে ব্যক্তি আক্রান্ত হতে পারে আবার ব্যক্তি রোগা-ক্রান্ত হলে সমগ্র পরিবার ও সমাজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে রোগ জীবাণু নানা উপায়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। পথিপার্শ্বে গলিত শবের দুর্গন্ধ সমাজের বহু ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। আঞ্চলিক সমাজের কোন কোন অংশে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বেশী, কোথাও বা ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, কোথাও বা ক্ষয় রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং ব্যক্তি, পরিবার ও ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বৃহদায়তনের সামাজিক পরিবেশের মানসিক স্বাস্থ্যচিন্তা স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা [1](World Health

---

1. 'A State of complete physical, mental and social well-being and did not merely the absence of disease or infirmity"—*W. H. O.*

Organisation) বলেন, স্বাস্থ্য বলতে শুধু ব্যাধি বা দৌর্বল্যের হাত থেকে শরীরের মুক্তি নয়, স্বাস্থ্য হল শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক দিক থেকে ব্যক্তির পরিপূর্ণ সুস্থতা।

৩। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (Need for Health Education in Schools) :

ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার বিচারে আধুনিক সভ্য সমাজে প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজন আছে। এসম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ব্যক্তি-মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সামাজিক পরিবেশেই সম্ভব। আবার ব্যক্তি-মানুষের বিকাশের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আজ সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছে। জীবন বিকাশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সময় হল শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়-জীবনের অংশটুকু। তাই বিদ্যালয়েই স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। এই প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নরূপ যুক্তিগুলি উল্লেখযোগ্য :

ব্যক্তিভিত্তিক যুক্তি : (১) ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় জীবনের বয়ঃসীমা প্রায় সতের-আঠারো বছর। এই সময়ের মধ্যে তাদের দেহ ও মনের বৃদ্ধি ও বিকাশ পরিণতির পর্যায়ে উপনীত হয়। দেহ কাঠামোর দৈর্ঘ্য এবং বুদ্ধির বিকাশ প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। এরপর যেটুকু বৃদ্ধি সেটুকুকে দেহের ক্ষেত্রে মেদ-মাংস এবং মনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতালাভ বলা যেতে পারে। তাই পঠন-পাঠনরত শিক্ষার্থীদের দেহ ও মনের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজন আছে।

(২) দেহ ও মনের সম্পর্ক অতি নিবিড়। দেহের অস্তিত্ব আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য। পক্ষান্তরে, মন দৃষ্টিগ্রাহ্য জৈবিক সত্তা না হলেও তার অস্তিত্ব নানা দিক থেকে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। দেহ ও মনের পারস্পরিক প্রভাবও আমাদের কাছে এত প্রকট যে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কথা চিন্তা করা দুরূহ। শারীরিক সুখে মানসিক আনন্দ, শারীরিক অবসাদে মানসিক অবসাদ যেমন আমরা লক্ষ্য করি তেমনি এর উল্টোটিও লক্ষ্য করা যায়। তাই উভয়ের সুস্থতা আমরা সমানভাবে কামনা করি। তবে দেহের অস্তিত্বের ওপর মনকে নির্ভর করতে হয়। দেহ আছে কিন্তু মন নেই—এমন মানুষ পশু-পক্ষীর সঙ্গে তুলনীয়—। আর দেহ নাই কিন্তু মন আছে—এমন মানুষকে আমরা কল্পনাতেও আনতে পারি না। সুতরাং মানুষের দেহ ও

মন দুইই থাকবে। তবে সুস্থ দেহ সুস্থ মনের ধারক* (sound mind in sound body)—এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শারীরিক সুস্থতার দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় অসুস্থ শরীরে শিক্ষাপ্রচেষ্টার অপচয় ঘটে।

(৩) অধ্যয়নই শিক্ষার্থীর তপস্যা। লেখা, পড়া ও অন্যবিধ শিক্ষালাভ করাই তাদের একমাত্র কাজ। কৃষক খেত-খামারে কাজ করে, শ্রমিক কল কারখানায় কাজ করে, কেরাণী অফিস-আদালতে কলম পেষে। এদের প্রত্যেকেরই অবসর বিনোদন ও বিশ্রাম আছে। এর ভেতর দিয়ে তারা দৈহিক ও মানসিক অবসাদ ও ক্লান্তি ঘুচিয়ে নতুন উৎসাহ ও উদ্যম সংগ্রহ করে। ফলে অধিক কর্মে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। ঠিক তেমনি মানসিক কর্মরত শিক্ষার্থীর জন্য বিদ্যালয় যে স্বাস্থ্য বিধানের অনুকূল খেলাধূলা, আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করে তার দ্বারা শিক্ষার্থীরা শিক্ষা-প্রচেষ্টায় নতুন উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করতে পারে। ছাত্রজীবনে স্বাস্থ্যপ্রদ অবসর বিনোদনের ব্যবস্থাপনা শিক্ষা-উদ্দীপক—সন্দেহ নেই।

(৮) মানুষকে প্রতিনিয়ত পরিবেশের রোগ-জীবাণুর সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়। এর প্রধান কারণ আমাদের প্রত্যেকের শরীরে ব্যাধি প্রতিরোধ করার শক্তি বিদ্যমান। রোগ জীবাণুর সাথে যুদ্ধ করতে করতে এই প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। স্বাস্থ্যবিধি পালনের মাধ্যমে আমাদের এই প্রতিরোধ ক্ষমতা আরও বেশী বাড়ানো যায়। শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের সংগঠন হয় বিদ্যালয় জীবনে। এই সংগঠনের ওপর নির্ভর করে যৌবন ও পরিণত বয়সের নিরাপত্তা। তাই বিদ্যালয়-জীবনে যাতে-শিক্ষার্থীর রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তার জন্যও স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজন আছে। **দ্বিতীয়তঃ**, রোগ-জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে রোগের পূর্ব লক্ষণ প্রকাশ পায়। অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীরা এরূপ পূর্ব লক্ষণ (Symptoms) ধরতে পারে না। বিদ্যালয়ের তরফ থেকে শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলে রোগের পূর্ব লক্ষণ সহজে ধরা পড়ে ও প্রথম স্তরেই

*' Mens sana in corpore sano—'sound mind in sound body'—*Juvenal—X*

ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধ করা সহজতর হয়। তাই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ও স্বাস্থ্যশিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। উপরন্তু এ ব্যাপারে প্রয়োজনমত জনস্বাস্থ্য বিভাগ (Public Health Department) এবং চিকিৎসা বিভাগের (Medical Department) সাহায্য নেওয়াও যেতে পারে।

(৫) ব্যক্তির শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভরশীল। শিক্ষার্থীর জ্ঞান বিকাশের প্রধান ক্ষেত্র হল তার মানসিক স্তর। মানসিক ভারসাম্যহীনতা (mental imbalance) শিক্ষালাভের পরিপন্থী। অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীরা এ সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয়। তাই শিক্ষককেই শিক্ষার্থীর মানসিক সুস্থতার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। উপযুক্ত খাদ্য, পুষ্টি, বিশ্রাম, আলো-বাতাসের ব্যবহার প্রভৃতির দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা ও কর্ম-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। বিদ্যালয়ই শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের সুস্থতা ও সামঞ্জস্যের জন্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপায় অবলম্বন করতে পারে। তাই বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সমাজভিত্তিক যুক্তি: (১) বর্তমানের বিদ্যালয়-শিক্ষার্থীরা হবে ভাবী সমাজ ও রাষ্ট্রের সু-নাগরিক। সেখানে শিক্ষার্থীদের সমষ্টিগতভাবে সুস্থ জীবন যাপন করতে হবে। তাই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যশিক্ষার দায়িত্বের ন্যায় সুষ্ঠু ও উন্নততর সমাজ-জীবনের তাগিদেও স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বিদ্যালয় হল সমাজ-জীবনের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ। সমষ্টিগত ধারায় বিদ্যালয়ে খেলাধূলা, শরীরচর্চা, সহ-পাঠক্রমিক কাজকর্ম (Co-curricular activities) প্রভৃতি শিক্ষার্থীদেরকে স্বাস্থ্যকর সমষ্টিগত কার্যে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে। বিদ্যালয়ের পরিবেশটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের সমবেত প্রচেষ্টা সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও প্রতিফলিত হবে। বিদ্যালয়েই এরূপ সমাজভিত্তিক স্বাস্থ্যশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে।

সমাজের প্রয়োজনেই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। সমাজ বিদ্যালয়ের ওপর সন্তানদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের দায়িত্ব অর্পণ করে। বিদ্যালয় এ দায়িত্ব পালনের জন্য সমাজের নিকট দায়ী। স্বাস্থ্যশিক্ষা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন

বিকাশের সহায়ক। এই স্বাস্থ্যশিক্ষা মূলতঃ আচরণমূলক বিদ্যা—অনুশীলনের মাধ্যমেই স্বাস্থ্যশিক্ষা লাভ করা যায়।

শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যশিক্ষায় অভ্যস্ত হলে তার প্রভাব শিক্ষার্থীর গৃহপরিবেশ থেকে ধীরে ধীরে সমাজ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়বে। সমাজের প্রতিটি লোক স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হবে সুস্থ সমাজ-জীবন। তাই স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে বিদ্যালয় তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং এটাই বিদ্যালয়ের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(২) সমষ্টিগত জীবনের একটা মানসিক স্তর আছে। দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণ, পারস্পরিক বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য, সমবেদনা, সহ-যোগিতা ও সাহায্যের মনোভাব এই মানসিক স্তরের অভিব্যক্তি। এই মানসিক স্তরের সুস্থতার প্রয়োজনে স্বাস্থ্যশিক্ষার গুরুত্বও অনস্বীকার্য। প্রতিযোগিতা-মূলক খেলা হিংসাত্মক রূপ গ্রহণ করলে সমষ্টিগত মানসিক স্তরের অসুস্থতা প্রকাশ পায়। শ্রেণীকক্ষের কয়েকটি ছাত্রের সংক্রামক রোগ সকলের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে। এরূপ সংক্রমণজনিত ভীতি সকলের মানসিক অসুস্থতার কারণ হয়ে পড়ে। সমষ্টিগত মানসিক সুস্থতার প্রয়োজনে বিদ্যালয়েই স্বাস্থ্যশিক্ষার বিধি প্রচলন করা উচিত। তাহলে এই শিক্ষার্থীরাই সমাজ-জীবনে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে।

৪। স্বাস্থ্য শিক্ষার লক্ষ্য ও মূল্য (Amis and values of Health Education) ঃ

স্বাস্থ্যশিক্ষা সামগ্রিক শিক্ষার অঙ্গ। যুগ প্রয়োজন অনুসারে প্রতিটি দেশের শিক্ষায় জাতীয় লক্ষ্য স্থিরীকৃত হয়। আবার জাতীয় লক্ষ্যকে সার্থক করার জন্য সামগ্রিক শিক্ষার বিশেষ বিশেষ দিকের লক্ষ্য নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই ভারতের জাতীয় শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যশিক্ষার লক্ষ্য নির্দেশ করা প্রয়োজন। কারণ জাতীয় শিক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধ নাগরিকবৃন্দের ওপর। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরস্পরের পরিপূরক। শীর্ণকায় স্কন্ধের ওপর ভারাক্রান্ত বৃহদাকারের মাশুল বহন করা শিক্ষার ফল-শ্রুতি নয়। সত্যিকার শিক্ষার ফলাফল হল বলিষ্ঠ দেহের ওপর বুদ্ধিদীপ্ত

কর্মঠ মস্তিষ্ক।[1] স্বাস্থ্যশিক্ষা ভিন্ন তাই সত্যিকার শিক্ষালাভ করা কখনই সম্ভব হতে পারে না। এখন আমরা স্বাস্থ্যশিক্ষার **উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যগুলি** আলোচনা করব :

(১) স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রথম লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর মনে সামগ্রিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। সামগ্রিক স্বাস্থ্য বলতে ব্যক্তিগত শারীরিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক স্বাস্থ্য, যৌথ বা সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিধান, পারিবারিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যবিধান প্রভৃতি। সাধারণ স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখা, রোগ-আক্রমণের কারণ, তার প্রতিরোধ, প্রতিকার ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত। তবে শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যবিষয়ে সচেতন করার জন্য পরিবেশিত তথ্য হবে নিখুঁত, সত্য এবং শিক্ষার্থীর গ্রহণযোগ্য।

শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্য-সচেতন করার দুটি ধারা বিদ্যমান। প্রথমটি হল নেতিবাচক, (negative) আর দ্বিতীয়টি হল ইতিবাচক (positive) বা জীবনধর্মী শিক্ষা। প্রথমটি দ্বারা রোগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে স্বাস্থ্য পালনে বাধ্য করা হয়। আর দ্বিতীয়টি দ্বারা নীরোগ, কর্মক্ষম, উচ্ছল শরীরের আনন্দমুখর ছবিটি তুলে ধরা হয়। এটি হল আচরণমূলক শিক্ষা। জীবন ধারণ আর স্বাস্থ্যপালন—এ দুটি শিক্ষা একই ধারায় প্রবাহিত। শিক্ষার্থীর মনে ও আচরণে এই সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্য ঠিক রেখে স্বাস্থ্যশিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।

(২) স্বাস্থ্যশিক্ষার দ্বিতীয় লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যপালনে অভ্যস্ত করে তোলা। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসম্পর্কে যে জ্ঞান শিক্ষার্থীরা অর্জন করবে সেই জ্ঞান অনুসারে শিক্ষার্থীরা যাতে জীবন যাপন করতে শেখে সেটাই হল স্বাস্থ্যশিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য। এর জন্যে **প্রথমতঃ**, শিক্ষার্থীরা কথায়-কাজে লেখা-পড়ায়, চলা-ফেরায়, ওঠা-বসায়, আচার-আচরণে সর্বদা স্বাস্থ্যবিধি পালন করবে। **দ্বিতীয়তঃ**, আনন্দ উপভোগে, অবসর বিনোদনে, স্বাস্থ্যপ্রদ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করবে ও কর্মসম্পাদনার জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করবে। **তৃতীয়তঃ**, শিক্ষার্থী পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যপ্রদ

---

1. 'The result of true education is not shattered health with a loaded brain on skeleton shoulders but a wise and active brain on a chiselled physique'—*Anonymous.* (As mentioned by Prof. K. K. Mukherjee in the New Education and its Aspects.)

জীবন যাপনের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং আপন-স্বাস্থ্য পালনের দ্বারা অন্যের মনে প্রভাব বিস্তার করবে।

প্রথম লক্ষ্যে তত্ত্বগত শিক্ষার ওপর আর দ্বিতীয় লক্ষ্যে বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ তত্ত্বগত জ্ঞানার্জন ও স্বাস্থ্য পালন এক কথা নয়। অনেক চিকিৎসক ময়লা পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন ও নোংরা স্থানে আহার-বিহারে তাদেব ঘৃণা হয় না। স্বাস্থ্য সম্পর্কে উচ্চমার্গের জ্ঞানার্জন করা সত্ত্বেও তিনি নিজের জীবনে স্বাস্থ্যবিধি পালন করেন না। বিদ্যালয়-শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যশিক্ষায় এরূপ জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা আমাদের লক্ষ্য নয়। শিক্ষার্থী একদিকে যেমন সার্বিক স্বাস্থ্যবিধির তত্ত্বে জ্ঞানার্জন করবে, তেমনি আবার সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীয় জীবনে সেই অধীত জ্ঞানকে বাস্তবায়িত করবে—এটাই আমাদের লক্ষ্য করার বিষয়।

(৩) **স্বাস্থ্যশিক্ষার তৃতীয় লক্ষ্য হল স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে মানসিক সম্পর্কের উন্নয়ন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বিকাশে** শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা। শিক্ষার্থী যেন তার বন্ধুবান্ধব, পরিবারের সভ্য, প্রতিবেশী, অঞ্চল, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যভিত্তিক অবদান রাখতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ**, বিদ্যালয়, গৃহ ও সমাজ সম্পর্কের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেন সুস্থ প্রাক্ষোভিক সামঞ্জস্য স্থাপন করতে সমর্থ হয়। **তৃতীয়তঃ**,শিক্ষার্থী যেন স্বাস্থ্যগত সমস্যার সমাধানে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সর্বদা সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মনোভাব নিয়ে কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে। **চতুর্থতঃ**, গৃহস্থাপন, স্যানিটারী ব্যবস্থা, বিবাহ, মাতাপিতার পারস্পরিক (Parental) সম্পর্ক ইত্যাদির সঙ্গে স্বাস্থ্যভিত্তিক সমস্যা জড়িত। শিক্ষার্থী যেন এসব সমস্যা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হয়ে এগুলি সমাধানের দক্ষতা অর্জন করতে পারে। **অবশেষে বলা যায়**—গৃহ, সমাজ ও বিদ্যালয় পরিবেশের স্বাস্থ্যগত সুখ-সুবিধার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অনুসারে শিক্ষার্থী যেন স্ব-স্ব কর্ম প্রচেষ্টা পরিচালনা করে। কারণ শিক্ষার্থীর মাধ্যমে স্বাস্থ্যশিক্ষার ফলশ্রুতি ক্রমশঃ বিদ্যালয় থেকে গৃহে, গৃহ থেকে অঞ্চল, অঞ্চল থেকে জাতীয় এবং জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক প্রভাবে ক্রমশঃ সর্বস্তরে বিস্তৃত হবে। তাই স্বাস্থ্যসম্মত মানবিক সম্পর্কের উন্নয়ন একান্ত কাম্য।

(৪) **স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে পৌর দায়িত্ববোধের** (Civic responsibility) **সঞ্চার করা ও কর্তব্যপালনে উদ্বুদ্ধ করা স্বাস্থ্য-শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।** এর জন্য **প্রথমতঃ,** শিক্ষার্থীকে অবহিত করতে হবে যে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ যেমন তার অধিকার তেমনি যৌথ বা সমষ্টিগত স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ এবং এর উন্নয়নে সক্রিয় সাহায্য করা তার কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থী প্রচলিত স্বাস্থ্যবিধি (Health rules) যেমন আন্তরিকতার সঙ্গে নিজে পালন করবে তেমনি তাকে কোন বিধি স্বাস্থ্যসম্মত নয় প্রমাণিত হলে তার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মনোভাবও পোষণ করতে হবে।

তৃতীয়তঃ, অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে যেগুলি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্বাস্থ্যের বা অসুস্থতার কারণ স্বরূপ। শিক্ষার্থী যাতে এগুলি সম্পর্কে অবহিত হয়ে মানবিক সম্পদের কার্যকর উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা বিদ্যালয়ের কর্তব্য।

চতুর্থতঃ, বিজ্ঞানের আশীর্বাদ স্বরূপ বিশ্বের প্রতিটি দেশ আজ পরস্পরের সঙ্গে মানবিক সম্পর্কে বিজড়িত। কোন দেশে সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব অন্য দেশে বিনাবাধায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। শিক্ষার্থীকে আজ একথা অবহিত হয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের জন্য তৈরি হতে হবে।

পঞ্চমতঃ, বিদ্যালয় ও সমাজের যে-কোন স্বাস্থ্যসূচক কর্মসূচীতে শিক্ষার্থী যাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে সেদিকে লক্ষ্য নির্দেশ করতে হবে।

অবশেষে বলা যায়—বিদ্যালয়, গৃহ ও সমাজের স্বাস্থ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য শিক্ষার্থী যাতে গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে স্বাস্থ্যশিক্ষা পরিচালনা করা যুক্তিযুক্ত।

স্বাস্থ্যশিক্ষার মূল্য বা লব্ধ অভিজ্ঞতার গুরুত্ব নিতান্ত কম নয়। বলা হয়, লক্ষ্য অপেক্ষা লক্ষ্যে পৌঁছবার পথটি অনেক সময় অধিক মূল্যবান। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের একটি মাত্র ক্ষেত্র আছে যেখানে প্রতিটি মানুষ জীবনের কয়েকটি বছর অতিবাহিত করে। সেই ক্ষেত্রটি হল বিদ্যালয়। সামাজিক যে কোন স্তরের মানুষ বিদ্যালয়ে অন্ততঃ সতের বছর শিক্ষালাভ করে। সুতরাং বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে শিক্ষার্থী যখন উচ্চতর শিক্ষা অথবা কর্মক্ষেত্রে সুনাগরিক হিসেবে

ফিরে যায় তখন তারা তাদের অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস দ্বারা গোটা সমাজজীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। সুতরাং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীকে যদি অনুকূল স্বাস্থ্যবিধি শেখানো যায় এবং শিক্ষার্থী যদি সেই শিক্ষাকে জীবনের অঙ্গীভূত বিষয় হিসেবে জীবন-ধারার সঙ্গে মিশিয়ে একাকার করে নিতে পারে, তাহলে সমগ্র সমাজ ও জাতি উপকৃত হবে। এর দ্বারা জাতীয় জীবনের রূপ পালটে যাবে—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইনজীব প্রভৃতি সকলেই সমাজের এক একটি অঙ্গ। এদের প্রত্যেকেই বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্যশিক্ষা লাভ করেন। তাই সকলের প্রভাব সকল দিক থেকে সামগ্রিক জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত করবে। সুতরাং প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক। এর দ্বারা স্বাস্থ্যশিক্ষায় অভিজ্ঞ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে। সমাজ-জীবনে এই শিক্ষার্থীরাই জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য-প্রচেষ্টার গতিবেগ সৃষ্টি করবে। ফলে সমাজ হবে সুস্থ, সুন্দর ও সার্থক কর্মশীল জীবনের অধিকারী। আর এর ফলে স্বাস্থ্যশিক্ষা হবে সত্যিই ফলপ্রসূ।

৫। স্বাস্থ্যশিক্ষার সাধারণ নীতি (General principles of Health Education):

স্বাস্থ্যশিক্ষার অত্যাবশ্যকতা সম্পর্কে আধুনিক সভ্য ও সমাজ-সচেতন মানুষ দ্বিধাহীন। ব্যক্তি-বিকাশের মূলসূত্র সু-স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী সবল, কর্মক্ষম ব্যক্তির সমাবেশে যে সমাজ গঠিত হয় সে সমাজও হবে প্রাচুর্যময় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুতরাং স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্য কতকগুলি মূলনীতি অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত। এই প্রসঙ্গে আমরা নিম্নরূপ নীতিগুলি অনুসরণ করতে পারি:

(১) আধুনিক স্বাস্থ্যশিক্ষার **মূল নীতি হবে ইতিবাচক** (Positive) **ও অনুশীলন ধর্মী**। স্বাস্থ্যশিক্ষার মৌলিক দুটি ধারা বিদ্যমান। একটিতে স্বাস্থ্য পালন না করার বিভীষিকাময় কুফল বর্ণনা দিয়ে শিক্ষার্থীর মনে ভীতি সঞ্চার করা হয় এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পাঠে বাধ্য করা হয়। এর নাম নেতিবাচক শিক্ষা (negative teaching)। দ্বিতীয়টিতে স্বাস্থ্যশিক্ষার সুফল বর্ণনা

করে শিক্ষার্থীর মনকে ব্যক্তি ও সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা হয়। এর নাম ইতিবাচক বা স্বস্তিবাচক শিক্ষা (Positive teaching)। প্রথমটিতে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেই শিক্ষার সমাপ্তি ঘোষিত হয়। আর দ্বিতীয়টিতে শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে জীবন ধারণের অঙ্গ হিসেবে আচার-ব্যবহারে বাস্তবায়িত করে। এই অনুশীলনধর্মী অর্থাৎ ইতিবাচক শিক্ষাই হবে স্বাস্থ্যশিক্ষার অপরিহার্য মূলসূত্র।

(২) **স্বাস্থ্যশিক্ষার দ্বিতীয় নীতি হল জীবনযাত্রার সাথে এই শিক্ষার একীকরণ** (Fusion) **ঃ** স্বাস্থ্যপালনের নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে শিক্ষার্থীরা যাতে সেই জ্ঞানকে ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে একীকরণ করে প্রথমে অভ্যাসে ও পরে স্বভাবে (nature) পরিণত করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। এই অভ্যাস যখন চেতন মনের ধারা অবলম্বন করে অবচেতন মনের স্তরে প্রবেশ করবে তখনই হবে জীবনের সাথে প্রকৃত একীকরণ। তখন আর বাইরের জ্ঞান, নির্দেশ বা উপদেশের অপেক্ষা না করে শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্যবিধিকে স্ব-স্ব জীবনধারার সাথে স্বাভাবিকভাবে মিলিয়ে নিতে পারবে। সুতরাং বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সাথে শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাস্থ্যসম্মত বিধি পালনে স্বাভাবিক ভাবে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে সেরূপ অনুশীলনের নীতি গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

(৩) **স্বাস্থ্যশিক্ষার তৃতীয় নীতি হল সমগ্রিকতা** (Comprehensiveness) **ঃ** অনেক শিক্ষার্থী নিজের জামা-কাপড়টিকে পরিষ্কার রাখে অথচ দাঁত পরিষ্কার করতে ও নখ কাটতে ভুলে যায়। শরীরতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ অনেক ডাক্তার ময়লা কাপড় ব্যবহার করেন কিন্তু রোগীকে উপদেশ দেওয়ায় বেশ ওস্তাদ। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। স্বাস্থ্যশিক্ষার নীতি হবে ব্যাপক ও সামগ্রিক। শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব জীবনে যেমন পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যবিধি পালন করবে তেমনি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তারা স্বাস্থ্যসম্মত আচার-আচরণে অভ্যস্ত হবে। আংশিক স্বাস্থ্যবিধি পালনের অর্থ হল সামগ্রিক স্বাস্থ্যশিক্ষাকে অবহেলা করা।

(৪) **স্বাস্থ্যশিক্ষার চতুর্থ নীতি হবে প্রত্যক্ষ শিক্ষণ** (Direct teaching) **অপেক্ষা পরোক্ষ শিক্ষণের** (Indirect or informal teaching) **ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপণ ঃ** বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সময়সূচী অনুসারে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পাঠ, খেলাধূলা, ব্যায়াম ও শরীর-চর্চার ব্যবস্থা থাকবে। এটা হল প্রত্যক্ষ শিক্ষণ-ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক জ্ঞানার্জন করতেই হবে। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান যে স্বস্তি-বাচক (positive) হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আনুষ্ঠানিক জ্ঞান যাতে শিক্ষার্থীর জীবনধারার সামিল হয় সে জন্যে পরোক্ষ শিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। কিভাবে সেটা সম্ভব হবে? সম্ভব

হবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের সমবেত প্রচেষ্টায় ও সক্রিয় সহযোগিতায়। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান পরিবেশনে নিযুক্ত শিক্ষককে জ্ঞানের বাস্তবধর্মী হতে হবে। তিনি নিজের জীবনে, আচার-আচরণে স্বাস্থ্যবিধি পালন করবেন। শুধু তাই নয়, বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে এরূপ স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যদি একযোগে স্বাস্থ্যবিধি পালনের দৃষ্টান্ত রাখতে পারেন, তাহলে শিক্ষার্থীরাও জানবে জীবনযাপনের ওটাই হল আসল নিয়ম। এই সঙ্গে বিদ্যালয়ের গৃহ পরিবেশ, শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্র, ইত্যাদির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শিক্ষার্থীর মনে প্রভাব বিস্তার করবে। স্বাস্থ্যশিক্ষায় প্রত্যক্ষ শিক্ষণ অপেক্ষা এই পরোক্ষ শিক্ষণই হবে গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

স্বাস্থ্যশিক্ষার মূল নীতির (Principle of health education) সঙ্গে আনুষ্ঠানিক স্বাস্থ্যশিক্ষণের সাধারণ কতকগুলি নীতি (General principles of Health Teaching) * সম্পর্কে অবহিত হওয়া শিক্ষকদের অবশ্য কর্তব্য। সেই নীতিগুলি হল:

(১) সমাজ, পরিবার, শিক্ষার্থীর আগ্রহ এবং প্রয়োজনভিত্তিতে স্বাস্থ্যশিক্ষণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

(২) স্বাস্থ্যসম্মত আচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক উপাদানগুলির (factors) পরিপূর্ণ বিবেচনা সাপেক্ষে স্বাস্থ্যশিক্ষণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

(৩) স্বাস্থ্যশিক্ষণ প্রসঙ্গে পরিবেশিত তথ্য হবে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক।

(৪) শিক্ষার্থীর জীবনবিকাশের স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে (Commensurate with their level of maturity) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানে তাকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

(৫) স্বাস্থ্যশিক্ষণ হবে বিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত অংশ এবং শিক্ষণের নীতি (Principles of learning) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত।

(৬) অবশেষে, বিদ্যালয়-সমাজের যেসব স্বাস্থ্য-কর্মসূচী এবং অনুরূপ প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত ও সম্পাদিত হয়, আনুষ্ঠানিক স্বাস্থ্যশিক্ষণ হবে তার অপরিচ্ছেদ্য অংশ।

---

* School Health Programme in selected middle schools of Delhi.
--BEULAH RAJU—N. C. E. R. T ;Page 63.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান

[Personal and Community Hygiene]

অধ্যায় পরিচয় : ইংরাজী Hygiene শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'স্বাস্থ্যবিজ্ঞান' বা 'স্বাস্থ্যতত্ত্ব' কথাটির ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিক অংশগুলো এখানে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হল। মনে রাখা দরকার, তৃতীয় খণ্ডের প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অন্যান্য অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর পরিপূরক।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রসমষ্টি ও বিচিত্র উপাদান নিয়ে আমাদের প্রত্যেকের শরীর ও মন গঠিত। দেহ ও মনের সুস্থতা সংরক্ষণ করা আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য। আবার স্বাস্থ্যসংরক্ষণে ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির কর্তব্য এবং দায়িত্বও অনস্বীকার্য। কারণ, পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের সমষ্টিগত স্বাস্থ্যোন্নয়ন সম্ভব হয়। তাই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও সমষ্টিগত স্বাস্থ্য পরস্পর নিবিড় সম্পর্কে সম্পর্কিত, যেন একই মুদ্রার বিপরীত দিক মাত্র। সম্পর্কের নিবিড়তা থেকে আমরা স্বাস্থ্যপালনের দুটি অবিচ্ছেদ্য প্রান্ত লক্ষ্য করতে পারি—একটি হল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Personal Hygiene) এবং অন্যটি হল সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Community Hygiene)।

১। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Personal Hygiene) :

কেবলমাত্র ব্যক্তিকে নিয়ে যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব গড়ে ওঠে তাকে আমরা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলতে পারি। ব্যক্তির স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অপরিহার্য বিষয়গুলোকে আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়টিকে আমরা দুটি প্রধান স্তরে ভাগ করে নিতে পারি, যথা—(১) **দেহগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান** এবং (২) **পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান**। তবে উল্লিখিত বিভাগদ্বয়কে পৃথক প্রকোষ্ঠে রেখে চিন্তা করা যায় না। কারণ এদের পারস্পরিক সম্পর্ক অতি নিবিড়। ব্যক্তির দেহ-মনের কার্যাবলী, স্বাস্থ্য, বৃদ্ধি ও উন্নয়ন বহুল পরিমাণে প্রাকৃতিক প্রভাবের ওপর নির্ভরশীল। স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্যে ব্যক্তিকে পরিবেশের

কুস্বভাব এড়িয়ে স্বাস্থ্যসম্মত প্রভাবকে গ্রহণ করতে হয়। অন্যথায় দেহযন্ত্রের প্রক্রিয়া অচল হয়ে পড়ে এবং যুগপৎ দেহ এবং মনের স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

(১) **দেহগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ঃ** পরিমাণ ও চরিত্রগত বিচারে নরদেহ ও তার যন্ত্রাদির কার্যাবলী অতি জটিল ও সুবিস্তৃত। এ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে সম্ভব নয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাই দেহগত পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করবেন। তবে বিদ্যালয়ের ছাত্রসহ সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য দেহগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করবেন—এবিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে না। তবে শিক্ষকরা, বিশেষত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের শিক্ষক (Hygiene teacher) যে দেহতত্ত্ব (Physiology) সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করবেন—সেবিষয়েও দ্বিমত থাকতে পারে না। অন্যথায় তার পক্ষে স্বাস্থ্যবিধি পালনের সঠিক শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়। দেহগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে দেহযন্ত্রের প্রাসঙ্গিক যে বিষয়গুলো আলোচনা করা বিশেষ দরকার তা হল—

(ক) **দেহ কঙ্কাল ও মাংসপেশী ঃ** দেহ কঙ্কাল ও মাংসপেশীর সংগঠনের উপর ব্যক্তির দৈহিক সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য নির্ভর করে। অস্থি ও পেশীর উন্নয়ন এবং বৃদ্ধি নির্ভর করে বিশুদ্ধ রক্তপ্রবাহ, পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানীয় সরবরাহের ওপর। এর সঙ্গে শ্রম, বিশ্রাম, নিদ্রা ও বিশুদ্ধ বায়ুর প্রক্রিয়া জড়িত। তাই স্বাস্থ্যসম্মত ব্যায়াম, বিশ্রাম, আহার, নিদ্রা ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের বিষয় অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

অস্থি ও পেশীর পুষ্টি

অস্থি ও পেশীর পুষ্টির সাথে স্বাস্থ্যসম্মত অঙ্গবিন্যাসও (good posture) জড়িত। বিদ্যালয় জীবনেই স্বাস্থ্যসম্মত অঙ্গবিন্যাসে অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে অভ্যাসগুলোকে আর সংশোধন করা সম্ভব হয় না। শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের সামনে নানা ভঙ্গিতে বসতে, দাঁড়াতে বা চলতে দেখা যায়। সামনে ঝুঁকে বসা, ঘাড় কাত করে একপায়ে ভর করে দাঁড়ানো, ডেস্কের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো বা কথা বলা প্রভৃতি কুঅভ্যাস শিক্ষকের দৃষ্টি এড়ানো উচিত নয়। অনেক সময় এগুলি শিক্ষার্থীদের হীনমন্যতা থেকেও উদ্ভুত হয়। অল্প বয়স থেকেই শিক্ষার্থীদের বসা, দাঁড়ানো ও চলার কুঅভ্যাসগুলো দূর করা প্রয়োজন। বিশ্রামের জন্য শয়নপ্রক্রিয়াও স্বাস্থ্যসম্মত অঙ্গবিন্যাসের অবিচ্ছেদ্য

স্বাস্থ্যসম্মত অঙ্গবিন্যাস

বিষয়। স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শয়ন না করলে শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত ব্যাঘাত ও পেশীর বেদনা সৃষ্টি হতে পারে। পৃষ্ঠদেশের সমতলে শয়ন করাই বাঞ্ছনীয়। খেলা-ধূলার সময় অনেককে বিশ্রী অঙ্গভঙ্গী করতে দেখা যায়। এগুলি সংশোধনের দায়িত্ব ক্রিয়া-শিক্ষকের (Physical instructor)।

(খ) **দৈহিক পরিচালনতন্ত্র :** পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল মোটামুটি কয়েকটি তন্ত্র দেহরাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা করে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান প্রসঙ্গে এসব তন্ত্রের কার্যাবলী সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করা ও অনুকূল স্বাস্থ্যবিধি পালনে অভ্যস্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

মানবদেহের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তন্ত্র হল **স্নায়ুতন্ত্র**। সংজ্ঞাবাহী ও আজ্ঞাবাহী স্নায়ু মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় মানুষ বুদ্ধি, স্মৃতি, বিচার-বিবেচনা প্রভৃতি দ্বারা স্বীয় কর্ম পরিচালনা করতে পারে। স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস দ্বারা আমরা যে বাঞ্ছনীয় দক্ষতা অর্জন করি ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হই তা এই মস্তিষ্ক সহ স্নায়ুতন্ত্রের স্বাস্থ্যসম্মত প্রচেষ্টা। তাই স্নায়ুতন্ত্রের অবসাদ দূরীকরণ, উদ্যম ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ বিশ্রাম, অবসর বিনোদন, আনন্দ উপভোগ প্রভৃতির ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

মানবদেহের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য তন্ত্র হল **পরিপাক যন্ত্র**। পরিপাক যন্ত্রের স্বাস্থ্য প্রধানতঃ দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, দন্তসহ মুখ-গহ্বরের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রতিদিন দাঁতসহ মুখগহ্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। সকালে উঠে মুখ ধোয়া ও দাঁত মাজার অভ্যাস না থাকলে মুখে দুর্গন্ধ হয়। শ্রেণী কক্ষে কোন শিক্ষার্থীর মুখের দুর্গন্ধ অন্যের স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটে। অকালে দন্তহীন হলে একদিকে যেমন মুখের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় অন্যদিকে তেমনি এর দ্বারা পরিপাক-ক্রিয়ারও ব্যাঘাত ঘটে। দাঁত ও মুখের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মাঝে মাঝে ঈষৎ উষ্ণ জলে কুলকুচি করা উচিৎ। এর দ্বারা টন্‌সিলের রোগ থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। পরিপাকযন্ত্রের স্বাস্থ্যোন্নয়নের দ্বিতীয় বিষয় হল খাদ্য গ্রহণ ও হজমের উপযোগী স্বাস্থ্যসম্মত বিধি পালন। পরিপাক-ক্রিয়া শুরু হয় মুখগহ্বরে গৃহীত খাদ্য চর্বনের সাথে সাথে। এই প্রসঙ্গে শক্ত ও পরিচ্ছন্ন দাঁত এবং মুখগহ্বরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এছাড়া সুষম খাদ্যগ্রহণ, খাদ্য ভালভাবে চর্বন, আহারের পর বিশ্রাম করা ও পাকস্থলীকে অন্ততঃ চার ঘণ্টা

বিশ্রাম দেওয়া, আহারের সময় মানসিক শান্তি বজায় রাখা, প্রধান খাদ্য গ্রহণের পর একটু টক দ্রব্য আহার করা, লিভারের ক্রিয়া ভাল না থাকলে যতদূর সম্ভব স্নেহজাতীয় পদার্থ বর্জন করা, খেলাধূলার পর উপযুক্ত বিশ্রাম নিয়ে তার পর খাদ্যগ্রহণ করা, দ্রুত বেগে আহার না করা প্রভৃতি সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অভ্যাস নিতান্ত প্রয়োজন।

শ্বাসযন্ত্র দেহরাষ্ট্রের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য তন্ত্র। শ্বাসযন্ত্রের প্রধান দ্বার হল নাসিকা। আমরা নাসিকা দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ু প্রশ্বাসরূপে গ্রহণ করি ও দূষিত বায়ু নিশ্বাস হিসেবে ত্যাগ করি। তাই নাসিকা পরিষ্কার রাখা স্বাস্থ্যসম্মত কাজ। হাঁচি, কাশি, কণ্ঠনালী বৃদ্ধি, সর্দি প্রভৃতি নাসিকা যন্ত্রের সাধারণ রোগ। শ্রেণীকক্ষে ছেলেমেয়েদের সর্দি হলে মুখ দিয়ে শ্বাসক্রিয়া চালাতে দেখা যায়। অধিক দিন এরূপ রোগ ভোগের পর অনেকে নাসিকার পরিবর্তে মুখে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। নাক-মুখ পরিষ্কার রাখলে এসব সাধারণ রোগ থেকে অব্যাহতি যেমন পাওয়া যায় তেমনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ফলে সমষ্টিগতভাবে শ্রেণীকক্ষে অন্যের ঘৃণার পাত্র হতে হয় না।

শ্বাসযন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে **রক্তসংবহন তন্ত্র**। দৈহিক শ্রমের সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া দ্রুততর হয়, রক্তসঞ্চালন-প্রক্রিয়াও সেই হারে ত্বরান্বিত হয়। তাই স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় পরিশ্রমের সঙ্গে বিশ্রামের অনুপাত ঠিক রেখে চলা কর্তব্য। শিক্ষার্থীদের ব্যায়ামের পর বিশ্রামের প্রয়োজন। ব্যায়ামের পর বিশ্রাম না করে ঘর্মাক্তদেহে স্নান করা উচিত নয়। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় হৃদপিণ্ডের অবসাদজনিত দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এটা অসম রক্তপ্রবাহের সঙ্গে জড়িত। তাই এসব সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পরিপ্রেক্ষিতে দেহরাষ্ট্রের **রেচনতন্ত্রের কার্যাবলী** সম্পর্কে সকলের সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। ক্ষুদ্রান্ত্রে ভুক্ত দ্রব্য হজম হওয়ার পর অসার অবশিষ্টাংশ বৃহদান্ত্রের ভেতর দিয়ে অবশেষে মলরূপে মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসে। প্রয়োজনমত অথচ নিয়মিত মলত্যাগ করা স্বাস্থ্য-বিধি পালনের উপায়। রেচনতন্ত্রের এই অংশে নানাধরনের রোগজীবাণু যেমন জন্মে তেমনি পরিত্যক্ত মল রোগ-বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কে স্বাস্থ্যসম্মত উপায় অবলম্বন না করলে ব্যক্তিস্বাস্থ্য থেকে জনস্বাস্থ্য বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। **রেচনতন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ** হল বৃক্ক

(Kidney) এবং মূত্রস্থলী (bladder)। বৃক্ক রক্তরসের দূষিত অংশ নিঃসৃত করে মূত্রস্থলীতে সঞ্চয় করে। এই তরল অংশ আমরা মূত্ররূপে পরিত্যাগ করি। মলের ন্যায় মূত্র সম্পর্কেও স্বাস্থ্যসম্মত উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। মলমূত্রের বেগ পেলে চেপে রাখা কখনও উচিত নয়। তাহলে যে-কোন মুহূর্তে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা থাকে। পঠনপাঠনরত অবস্থায় অনেক শিক্ষার্থী মলমূত্র ত্যাগে লজ্জা বোধ করে। এসম্পর্কে তাদের স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনের শিক্ষা দেওয়া শিক্ষকের বিশেষ কর্তব্য। রেচনতন্ত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ যন্ত্র হল ফুসফুস এবং চর্ম। ফুসফুস শ্বাসযন্ত্রের অংশ। আমরা প্রশ্বাসরূপে অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং নিশ্বাসরূপে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি। কার্বন-ডাই-অক্সাইড শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং একের নিশ্বাস যাতে অন্যের স্বাস্থ্যহানি না ঘটাতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখা কর্তব্য। চর্মের উপরকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমকূপ দিয়ে শরীরের অতিরিক্ত দূষিত পদার্থ ঘর্মরূপে বেরিয়ে আসে। আবার চর্মের ওপর খোস-পাঁচড়া, দাদ, একজিমা প্রভৃতি রোগ হয়। এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকার জন্যই হয়ে থাকে। তাই নিয়মিত স্নান করা, জীবাণুনাশক সাবান ব্যবহার করা ব্যক্তির প্রতিদিনের কর্তব্য হওয়া উচিত।

(গ) **জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ**: চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে বলা হয় জ্ঞানেন্দ্রিয়। কারণ এদের দ্বারাই আমরা মন ও হৃদয়ের সাথে বহির্জগতের যোগাযোগ রক্ষা করি। এদের মধ্যে একমাত্র ত্বক ছাড়া সবগুলিরই অবস্থান মস্তিষ্কের পাশাপাশি। প্রতিটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজ পৃথক ও বিশেষ বিশেষ দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। তবে প্রয়োজনীয়তার বিচারে চক্ষুর কাজ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত চোখের দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। প্রতিদিন চোখ ধোয়া ছাড়াও মাঝে মাঝে চক্ষু-পরিষ্কারক লোশান ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। অনেক ছাত্র খুব নিকটে অথবা অতি দূরত্বে বই রেখে পড়ে, অনেকে আবার অতি ক্ষীণ আলোতে বা অত্যধিক উজ্জ্বল আলোতে পড়াশুনা করে। এরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রেই চোখের ক্লান্তি আনতে পারে ও দৃষ্টিসংক্রান্ত স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা থাকে। এসম্পর্কে নির্ভুল স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য স্বাস্থ্যবিধি

চক্ষু

পালনের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। আলো-বাতাসহীন শ্রেণীকক্ষ, ব্লাকবোর্ডের অস্পষ্ট লেখা অথবা চোখের পীড়াদায়ক চাকচিক্য, দূর থেকে কোন ছোট লেখা বা চিত্র দেখতে বাধ্য করা—ইত্যাদি অস্বাস্থ্যজনিত প্রক্রিয়ার ফলে দৃষ্টিসংক্রান্ত স্বাস্থ্যহানি হতে পারে। শিক্ষালাভের অপরিহার্য ইন্দ্রিয় এই চোখ। তাই চোখের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা প্রাথমিক প্রয়োজন।

চোখে দেখা ও কানে শোনা শিক্ষালাভ প্রসঙ্গে সমান গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। অথচ কর্ণের স্বাস্থ্যসম্পর্কে অনেককেই প্রায়ই অবহেলা করতে দেখা যায়।

কর্ণ

ছোট ছেলেমেয়েদের কানে ময়লা জমে, কান পাকে, পুঁজ পড়ে, ফলে শ্রবণশক্তি হ্রাস পায়। সুতরাং সাধারণভাবে কান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা কর্তব্য এবং রোগ হলে চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়াও প্রয়োজন। ছোট ছেলেমেয়েদের কর্ণের স্বাস্থ্যবিধি পালনের জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

শ্বাসতন্ত্র প্রসঙ্গে নাসিকার কথা বলা হয়েছে। শ্বাসপ্রশ্বাস ছাড়াও নাসিকার অন্যতম ধর্ম হল গন্ধ উপভোগের ক্ষমতা সঞ্চার করা। সর্দি, কাশি

নাসিকা

প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি কখনও গন্ধ অনুভব করতে পারে না। অথচ গন্ধ দ্বারা আমরা বিশুদ্ধ ও দূষিত বায়ুর পার্থক্য বিচার করে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি। তাই নাসিকার যত্ন ও সে-সম্পর্কে স্বাস্থ্যসম্মত বিধি পালন অপরিহার্য কর্তব্য।

নাসিকার পরেই উল্লেখযোগ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় হল জিহ্বা। গন্ধ ও স্বাদ

জিহ্বা

পারস্পরিক সম্পর্কে জড়িত। জিহ্বা হল সেই স্বাদ-ইন্দ্রিয়। স্বাদ অনুভূতি আমাদের খাদ্যের বিশুদ্ধতা ও দূষিত উপাদান বিচারে সাহায্য করে। আবার জিহ্বা ও তার আনুষঙ্গিক সূক্ষ্মযন্ত্রাদি শব্দ উচ্চারণ, খাদ্য গ্রহণ এবং চর্বনে সাহায্য করে। সুতরাং জিহ্বা সম্পর্কে স্বাস্থ্যবিধি পালন করা ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য।*

---

* ত্বক সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে।

(২) **পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান :** ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দ্বিতীয় পর্যায় হল পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান। কারণ শুধু দেহ ও দেহগত যন্ত্রাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য নির্ভর করে না। তার সঙ্গে পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিধি পালনের প্রয়োজন হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই আলোচ্য পরিবেশ বলতে বহু বিস্তৃত সমাজগত বিষয় নয়। এটা শুধু ব্যক্তিস্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত পরিবেশটুকুই আমাদের আলোচ্য বিষয়; যেমন, দেহের পুষ্টির অভিব্যক্তি হল এর বৃদ্ধি (growth) ও বিকাশ (development)। এর জন্য ব্যক্তি স্ব-স্ব পরিবেশে সুষম খাদ্য, বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্যালোক, উপযুক্ত তাপ, শ্রম, ব্যায়াম, বিশ্রাম ও নিদ্রা, পোষাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা, রোগ-নিরাময় ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে। এগুলিই হবে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পরিবেশভিত্তিক স্বাস্থ্যবিধি।

পরিবেশগত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উপাদান

দেহ-পুষ্টির অন্যতম ও অপরিহার্য উপাদান হল বিশুদ্ধ ও টাটকা এবং সুষম খাদ্য। কি কি উপাদানযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করলে সুষম খাদ্য হতে পারে, টাটকা ও বিশুদ্ধ খাদ্য নির্বাচন, খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি, রন্ধন ও ব্যবহারের স্বাস্থ্যসম্মতই প্রণালী প্রভৃতি সম্পর্কে বাঞ্ছনীয় অভিজ্ঞতা থাকা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। তাছাড়া খাদ্য-প্রসঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে কতকগুলি স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গঠন করা প্রয়োজন। খাদ্যগ্রহণের পূর্বে হাতমুখ ধোয়া; মানসিক উগ্রতা, দুর্ভাবনা, হিংসা-দ্বেষ বর্জন করা; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থালা-বাসন প্রভৃতি ব্যবহারের অভ্যাস অত্যাবশ্যক।

খাদ্য ও প্রাসঙ্গিক স্বাস্থ্যবিধি

বিশুদ্ধ বায়ু স্বাস্থ্যরক্ষার অপরিহার্য উপাদান, এটা সর্ববাদীসম্মত। এই বিশুদ্ধ বায়ু শুধু ফুসফুসের শ্বাসক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন তা নয়, সারা দেহের ত্বকের ওপরও বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন আছে। আবদ্ধ বায়ু অপেক্ষা সঞ্চালিত বায়ুর প্রয়োজন উভয় ক্ষেত্রে সমান। ত্বকের ওপর বায়ু সঞ্চালনের জন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পাতলা জামা-কাপড় ব্যবহার করা উচিত। স্বাস্থ্য সংরক্ষণে পরিমিত মাত্রায় সূর্যালোক ও তাপের প্রয়োজনীয়তাও সমধিক। সূর্যকিরণে থাকে ভিটামিন D ও K;

বায়ু, সূর্যালোক ও তাপ

এগুলি রোগ প্রতিরোধের অদৃশ্য উপাদান। শীতকালে আমাদের সকলেরই সূর্যস্নান করা প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে মস্তিষ্ক বাদে সর্বাঙ্গে সূর্যকিরণ লাগানো প্রয়োজন। ব্যবহৃত বিছানাপত্র মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিলে রোগজীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। শরীরের অবস্থা অনুসারে মাঝে মাঝে বায়ু পরিবর্তনের ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত।

শারীরিক শ্রমের কাজ অথবা ব্যায়াম ও খেলাধূলা উভয়ক্ষেত্রেই পরিশ্রম হয়। তবে ব্যায়াম ও খেলাধূলাতে মানসিক আনন্দের অনেকখানি সুযোগ থাকে। উভয়ক্ষেত্রেই পেশীর উত্তপ্ততা বৃদ্ধি পায় ও রক্ত-সঞ্চালন এবং শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া দ্রুত চলে। সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে এরূপ শারীরিক শ্রম নিতান্ত প্রয়োজন। আবার শারীরিক শ্রম মানসিক প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে। তবে অতিরিক্ত ক্লান্তি পরিত্যাগ করা উচিত এবং শরীরের অবসাদ বা ক্লান্তি দূর করার জন্য প্রয়োজনমত বিশ্রাম ও নিদ্রার দ্বারা ক্ষয়পূরণ করা দরকার। অবসাদ বা দুর্বলতার জন্য অথবা সুনিদ্রার অভাবে শ্রেণীকক্ষে অনেক ছাত্রকে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। এর কারণ অনুসন্ধান করে প্রতিকারের জন্য শিক্ষকের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এছাড়া ঘুম ও বিশ্রামের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গ্রহণ করা প্রত্যেকের পক্ষে প্রয়োজন। ছয় থেকে এগার বছরের ছেলেমেয়েদের অন্ততঃ সাত ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন। রাত্রি ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত নিদ্রার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা উচিত। বিনিদ্র অবস্থা যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর তেমনি অতিরিক্ত নিদ্রা জীবনী-শক্তি হ্রাস করে, আলস্যকে প্রশ্রয় দেয়। সুতরাং স্বাস্থ্যপালন প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য-সম্মত নিদ্রা ও বিশ্রামের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

শ্রম-ব্যায়াম ও বিশ্রাম

ইংরেজীতে অভ্যাসকে বলা হয় দ্বিতীয় স্বভাব বা প্রকৃতি (Habit is the second nature)। ছোট কাল থেকে স্বাস্থ্য-বিধির অভ্যাস করলে বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে সেগুলি ব্যক্তির প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। তাই বিদ্যালয়-জীবন থেকেই স্বাস্থ্যবিধি পালনের ওপর শিক্ষার্থীর প্রবণতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত। প্রসঙ্গত শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যাভ্যাসের জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকের সমদায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়গুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ,

পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে শ্রেণীকক্ষ, ব্যবহার্য আসবাবপত্র, পুস্তক ও পত্রপত্রিকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। **দ্বিতীয়তঃ,** যেখানে সেখানে কফ, থুথু না ফেলা, খালি মুখে না হাঁচা, মলমূত্রের বেগকে চেপে না রাখা এবং মলমূত্র ত্যাগের পর হস্ত পদাদি পরিষ্কারের জন্য সাবান ব্যবহার করা, পায়খানা ও প্রস্রাবখানায় প্রচুর পরিমাণে জল ব্যবহার করা প্রভৃতি অভ্যাস স্বাস্থ্যবিধিসম্মত। **তৃতীয়তঃ,** শিক্ষার্থী যাতে স্ব-স্ব পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখে, নখ কাটে, দাঁত মাজে, টিফিন গ্রহণের আগে ও পরে ভাল-ভাবে মুখ ধোয় সেদিকেও নজর দিতে হবে। **চতুর্থতঃ,** ব্যায়ামের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাস্থ্যবিধি পালন করে, প্রয়োজনীয় পোশাক ব্যবহার করে, খেলাধূলা বা ব্যায়ামের পর বিশ্রাম গ্রহণ করে, খেলতে খেলতে জলপান বা টিফিন গ্রহণ না করে সেদিকেও প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। **পঞ্চমতঃ,** সুসমঞ্জস দেহসৌন্দর্যের জন্য ওঠা, বসা, দাঁড়ানো, লেখাপড়ার ভঙ্গীমা যাতে অস্বাস্থ্যকর না হয় তাও লক্ষ্য করা এবং শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যসম্মত আচার-আচরণে অভ্যস্ত করানো প্রয়োজন। **ষষ্ঠতঃ,** খাদ্যগ্রহণের ব্যাপারে শিক্ষার্থী যাতে সময়মত আহার, পরিমিত আহার, ক্ষুধার আনুপাতিক আহার, সুসিদ্ধ সামগ্রী আহার, খাদ্যদ্রব্য গলাধকরণ না করে চর্বন করা, পরিষ্কার বাসনপত্রে আহার করা, ঠাণ্ডা ও বাসি খাদ্য বর্জন করা, গুরুপাক খাদ্য না খাওয়া, হোটেল-রেষ্টুরেন্ট ও বাজারের আলগা স্থানে রক্ষিত খাদ্য গ্রহণ না করার অভ্যাস গঠন করতে পারে সেদিকে শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়কেই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

অবশেষে বলা যায়, শিক্ষার্থীকে **রোগ প্রতিরোধের বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থায় অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।** আমাদের দেশে ঋতুতে ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। কখনও বা গ্রামের দু-একজনের মধ্যে বিশেষ রোগ দেখা দিলে সে রোগ ছড়িয়ে পড়ে সকলের মধ্যে। তাই স্ব-স্ব স্বাস্থ্যবিধির জন্য সাময়িক রোগের (কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি) টিকা, ইনজেকশন প্রভৃতি গ্রহণ করা কর্তব্য। এছাড়া হঠাৎ কেটে গেলে, পুড়ে গেলে, অস্থি ও পেশীতে আঘাত লাগলে মালিশ ও প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবহার করতে এবং প্রাথমিক* চিকিৎসায় (First aid) শিক্ষার্থীকে অভ্যস্ত করা প্রয়োজন। স্নানের সময় ও মলত্যাগের পর সাবান ব্যবহার করা, মাঝে মাঝে

গরম লবণাক্ত জলে মুখ কুলকুচি করাও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যবিধির অন্তর্ভুক্ত বিষয়। এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীকে অভ্যস্ত করানো প্রয়োজন। এরূপ অভ্যাস ব্যক্তিকে স্বস্বাস্থ্যের অধিকারী করবে—এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

২। সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Community Hygiene) ঃ

ব্যক্তিকে নিয়েই সমষ্টি। তাই সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ছাড়া ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বলা যেতে পারে উক্ত বিষয় দুটি একে অন্যের পরিপূরক। প্রাচীনকালের ন্যায় বর্তমানে মানুষ আর বিচ্ছিন্ন ভাবে বসবাস করে না। জনসংখ্যার দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটেছে ও ঘটছে। ফলে, গ্রামে ও নগরে জনবসতির ঘনত্ব বেড়ে যাচ্ছে। স্ব-স্ব স্বাস্থ্যবিধি পালনের জন্য ব্যক্তির যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তেমনি অন্যের স্বাস্থ্য যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকেও তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক কথায়, সমাজে বসবাসকারী অধিবাসীরা পরস্পরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধি পালনের জন্য পারস্পরিক দায়িত্ব পালন করবে—এটাই সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিধির মূলকথা।

সমষ্টিগত ভাবধারাকে নানা ভাবে নানা কথায় ব্যক্ত করা হয়। সমষ্টিগত বিষয়টিকে আমরা কখনও বলি সমাজ; কখনও বা অঞ্চল, পরিবেশ ইত্যাদি। গ্রাম, নগর, স্বায়ত্বশাসনের অঞ্চলগুলি স্ব-স্ব ভৌগোলিক সীমায় সামাজিক রূপ ধারণ করে। তেমনি স্কুল, কলেজ, কারখানা প্রভৃতিও এরূপ সমাজের এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্করণ। ব্যক্তি বা ক্ষুদ্রায়তনের জনসমষ্টি সব সময় সামগ্রিক স্বাস্থ্যবিধি পালনে সক্ষম হয় না, তখন প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রীয় সাহায্যের। আধুনিক রাষ্ট্র জনকল্যাণকর, তাই স্বাস্থ্য সংরক্ষণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে জনস্বাস্থ্য পালনের জন্য রাষ্ট্র বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। তাই রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে গড়ে উঠেছে জনস্বাস্থ্য বিভাগ (Public Health Department)। 'জনস্বাস্থ্য বিভাগ' কথাটির মধ্যে সমষ্টিগত ভাবধারা বিদ্যমান। সামাজিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Social Hygiene), জনস্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Public Hygiene), পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Environmental Hygiene) প্রভৃতি সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের এক একটি রূপ।

সমষ্টিগত স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের দুটি ভূমিকা বিদ্যমান, যথা—(১) বেসরকারী ভূমিকা এবং (২) সরকারী ভূমিকা।

(১) **বেসরকারী ভূমিকা:** বেসরকারী ভূমিকা হিসেবে নিম্নলিখিত স্বাস্থ্যসম্মত কর্মসূচী উল্লেখযোগ্য: **প্রথমতঃ,** স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গঠন সমষ্টিগতভাবে সকলেরই কর্তব্য। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি প্রসঙ্গে উল্লিখিত বিষয়গুলো সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্নতা দ্বারা যেমন ব্যক্তিস্বাস্থ্যের হানি হয় তেমনি সমষ্টিগত স্বাস্থ্যহানির ক্ষেত্রেও এর প্রভাব বিস্তৃত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করা সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিধির অপরিহার্য অঙ্গ। সাধারণের ব্যবহৃত পুকুরের জল পরিষ্কার রাখা, স্ব-স্ব গৃহ পরিবেশ এবং অন্যের পরিবেশের মধ্যে নোংড়া নিক্ষেপ না করা, সাধারণের ব্যবহার্য ট্রেন, ট্রাম, বাস, ট্যাক্সী প্রভৃতি যানবাহনকে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে ব্যবহার করা, রাস্তাঘাট, পার্ক, ময়দান, খেলার মাঠ প্রভৃতি স্থানে কলার খোসা, বাদামের খোসা, ময়লা, কাগজের টুকরো, সর্দি, কাশি, থুথু না ফেলা সমষ্টিগতভাবে সকলেরই কর্তব্য। সমষ্টিগত প্রচেষ্টা থাকলে সর্বত্র সুন্দর স্বাস্থ্যবিধির পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে।

তৃতীয়তঃ, সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রে রোগের সংক্রমণ ও ঋতুভিত্তিক রোগের প্রতিরোধ-পর্যায়ে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। সংক্রামক ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাবধানে সমাজের অন্য ব্যক্তি থেকে দূরে থাকতে হয়। অন্যথায় ব্যাধি ব্যক্তির জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমাজের আরও পাঁচজনের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে। আবার আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন, শীত কমে যাওয়ার সাথে সাথে বসন্তরোগ দেখা দেয়। এরূপ ঋতুগত ব্যাধির হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ইনজেকশান বা টীকা নেওয়ার প্রয়োজন। এর মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি পালনের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ছাড়া সামাজিক বা সমষ্টিগত দায়িত্ব ও কর্তব্যের ইঙ্গিত পুরা মাত্রায় বলবৎ।

চতুর্থতঃ, বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা প্রথম থেকে যাতে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ে মনোযোগী হয় ও ক্রমশঃ স্বাস্থ্যবিধি পালনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে সেদিকে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি এবং সক্রিয় প্রচেষ্টা থাকা অত্যাবশ্যক। বিদ্যালয় হল সমাজ-পরিবেশ ও সমষ্টিগত জীবনের প্রতিরূপ। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টিগত

স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ই উপযুক্ত স্থান। ছোট থেকে গণস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করলে সমাজ-জীবনে এরাই হবে স্বাস্থ্যসম্মত সমাজ-গঠনের সচেতন নাগরিক।

(২) **সরকারী ভূমিকা**ঃ আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিধানের ক্ষেত্রে। এর জন্য রাষ্ট্রের একটি বিভাগের নামই হল জনস্বাস্থ্য বিভাগ (Public Health Department)। গ্রামে, শহরে, মিউনিসিপ্যাল ও করপোরেশন এলাকায় রাষ্ট্রীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগ জনগণের স্বাস্থ্যোন্নয়ের জন্য যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করে সেগুলি পর পর উল্লেখ করা হল :

বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ

(ক) বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রথম কর্মসূচীর অন্তর্গত। জলের এক নাম জীবন। জল ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। কিন্তু দূষিত জল ব্যাধি সম্প্রসারণের অতি সহজ ও উত্তম উপায়। তাই রাষ্ট্র-পরিচালিত উপায়ে শহরে ও গ্রামে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। মিউনিসিপ্যাল ও করপোরেশন এলাকায় পাইপের সাহায্যে ঘরে ঘরে ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা হয়। গ্রামে কুয়া খনন ও নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা করা হয়। কোথাও বা গভীর পুষ্করিণী খনন করে গ্রামবাসীদের উপকার করা হয়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লাবনোত্তর ব্যবস্থা হিসেবে গভীর নলকূপ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পুষ্টিকর ও টাটকা খাদ্য সরবরাহ

(খ) পুষ্টিকর ও টাটকা খাদ্য সরবরাহ জনস্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যতম কর্তব্য। অসৎ ব্যবসায়ীরা খাদ্যে ভেজাল মেশায়, হাটে-বাজারে পচা মাছ, মাংস, ডিম বিক্রি করে। খাবারের দোকান, হোটেল, রেস্টুরেণ্টে বাসি ও দূষিত খাদ্য ক্রেতাদের কাছে সরবরাহ করে। জনস্বাস্থ্য দপ্তর হাট-বাজার, দোকান-পাট পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে ও এসব অসৎ ব্যবসায়ীদের হাত থেকে জনস্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টা করে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এরূপ প্রচেষ্টার মান যথেষ্ট উন্নত নয়। যাতে জনসাধারণ পুষ্টিকর ও বিশুদ্ধ খাদ্য, টাটকা শাক-সবজি, মাছ-মাংস, দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্য, তৈল-ঘৃত ও অনুরূপ দ্রব্য পেতে পারে সেদিকে সরকারকে আরও বেশী তৎপর হতে হবে। খাদ্য-সামগ্রীর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করে অপরাধীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এসম্পর্কে সর্বসাধারণের

মানসিক সচেতনতা ও সতর্ক দৃষ্টি না থাকলে শুধু সরকারী প্রচেষ্টায় সুফল পাওয়া যায় না।

(গ) শহরাঞ্চলে ময়লা, আবর্জনা সাফাই ব্যবস্থা পৌর কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। সাফাই ব্যবস্থার **তিনটি পদ্ধতি** উল্লেখযোগ্য। **প্রথমতঃ,** ময়লা সঞ্চয় ও রক্ষার ব্যবস্থা, **দ্বিতীয়তঃ,** নোংরা, আবর্জনা পরিবহণের ব্যবস্থা, **তৃতীয়তঃ,** এগুলিকে যথাসময়ে নষ্ট করে দেওয়া অথবা শোধিত করার ব্যবস্থা করা। প্রথমটি প্রসঙ্গে বাসগৃহ ও রাস্তাঘাট ঝাড়ু দেওয়ার পর উপযুক্ত ঢাকনাযুক্ত ডাষ্টবিনে জমা করা হয়। দ্বিতীয়টি প্রসঙ্গে জলের স্রোতে ড্রেন পরিষ্কার করা, ময়লা দূরে নিয়ে যাওয়া, ময়লা-ফেলা গাড়ীর সাহায্যে আবর্জনা পরিবহণ করা, প্রতিদিন খাটা পায়খানার মলমূত্র পরিষ্কার করা ও সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনের সাহায্যে ময়লা সরানোর ব্যবস্থা করা হয়। তৃতীয় স্তরে ময়লা নষ্ট করা হয়। সেপটিক ট্যাঙ্ক (Septic tank) দ্বারা তরলীকৃত ও বিশোধিত করা যায়। মলমূত্র ছাড়া অন্যান্য আবর্জনা মাটিতে পুতে, আগুনে পুড়িয়ে অথবা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এগুলিকে নষ্ট করা যেতে পারে। শহরাঞ্চলে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলো এ দায়িত্ব পালন করে। গ্রামাঞ্চলে সরকারী প্রচেষ্টায় এরূপ স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারিত হয়নি। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বসতির ঘনত্ব হিসেবে সরকারকেই ক্রমশঃ গ্রামাঞ্চলের সাফাই-এর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

ময়লা ও আবর্জনা সাফাই

(ঘ) এছাড়া পৌর প্রতিষ্ঠান ও জনস্বাস্থ্য বিভাগ সমষ্টিগত স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ ও ব্যাধি প্রতিকারের অন্যান্য যেসব ব্যবস্থা সাধারণতঃ অবলম্বন করে সেগুলোর মধ্যে—(১) শ্মশান ও কবরখানার ব্যবস্থা, (২) পার্ক, বাগিচা, সন্তরণের জলাশয়, খেলার মাঠ প্রভৃতির ব্যবস্থা, (৩) হাট, বাজার ও কসাইখানার পরিচ্ছন্নতা, (৪) শহরাঞ্চলের হোটেল, রেস্টুরেণ্ট প্রভৃতি পরিদর্শন, (৫) ঋতুগত ব্যাধির প্রতিকার স্বরূপ টিকা, ইনজেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা, (৬) নাগরিকদের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করার জন্য সবাক্ ও নির্বাক চিত্র প্রদর্শন, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রদর্শনী, পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক পাঠ ও প্রচার, মাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বাস্থ্যসম্মত অন্যান্য ব্যবস্থা

এছাড়া জনস্বাস্থ্য বিভাগ নাগরিকদের জন্ম-মৃত্যুর হার নির্ণয়, ব্যাধির প্রকোপ ও তজ্জনিত মৃত্যুর হার ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে ও পরিসংখ্যান অনুসারে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের ব্যবস্থা করে। আন্তর্জাতিক গণ-স্বাস্থ্য দপ্তর জাতিপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে তথ্য পরিবেশন, পরামর্শদান, ঔষুধ সরবরাহ ও স্বাস্থ্য-শিক্ষণ ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট সাহায্য করে।

(ঙ) দেশের জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। গ্রাম, শহর ও বৃহৎ নগরগুলি ক্রমশঃ জনাকীর্ণ হয়ে পড়ছে। তাই সমষ্টিগত স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য সরকারী জনস্বাস্থ্য দপ্তর এবং পৌর-প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য দপ্তরকে অনেক বেশী নিপুণ হাতে যেমন দায়িত্ব পালন করতে হবে, তেমনি কর্মক্ষেত্রকে অনেক বেশী সম্প্রসারিত করতে হবে। এর জন্যে **প্রথম প্রয়োজন** শহরের বস্তি উচ্ছেদ করে সরকারী প্রচেষ্টায় ও পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যসম্মত গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা করা। ক্রমশঃ এই পরিকল্পনাকে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে সম্প্রসারিত করাও দরকার। **দ্বিতীয় প্রয়োজন** হল সামগ্রিক স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ও ব্যাধির প্রতিরোধকল্পে জনগণকে অনেক বেশী স্বাস্থ্যসচেতন ক'রে তোলা। এর জন্য প্রশিক্ষণ, প্রদর্শন, সবাক ও নির্বাক চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা, পুস্তক প্রকাশন ও প্রচারের নিপুণ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সরকারী ভূমিকার উৎকর্ষ সাধনের উপায়

অবশেষে বলা যায়, একটা নির্দিষ্ট বয়সের (৫ থেকে ১৭ বছর) ছাত্র-ছাত্রীরা আজ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করছে। সামগ্রিকভাবে এরাই হবে দেশের ভাবী নাগরিক। সুতরাং সামগ্রিক বিদ্যালয় স্তরে যদি স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়—তাহলে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর সচেতনতা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়বে। রাষ্ট্রীয়, পৌর ও বিশ্ব-জনস্বাস্থ্য দপ্তরকে এই শুভ প্রচেষ্টায় এগিয়ে আসতে হবে। বেসরকারী উদ্যোগ যদি এরূপ প্রচেষ্টায় সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করে তাহলে সমাজের মঙ্গলময় ও স্বাস্থ্যসম্মত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এযুগের মানুষ নিশ্চিত হতে পারে।

ব্যক্তিস্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সম্পর্ক (Relation between Personal Hygiene and Community Hygiene)ঃ

সমাজ, রাষ্ট্র বা সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক অতি নিবিড়। ব্যক্তিকে নিয়ে সমাজ বা সমষ্টির উদ্ভব। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির অস্তিত্ব

চিন্তা করা যায় না। তেমনি ব্যক্তিস্বাস্থ্য ও সমষ্টিগত স্বাস্থ্য পরস্পর নিবিড় সম্পর্কে অন্বিত।

(১) স্বাস্থ্যকর সমাজ বা জনসমষ্টি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিশ্চিতি প্রদান করে, তেমনি স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তি সুস্থ সমাজ পরিবেশ গড়ে তোলে।

(২) স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দুটি ধারা—ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান—একের উন্নতি ও অবনতি, সংরক্ষণ ও অবহেলা অন্যকে সমানুপাতে প্রভাবিত করে। উভয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানই ব্যক্তির স্বাস্থ্য-সচেতনতার ওপর নির্ভর করে। ব্যক্তিকে যেমন স্বীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হতে হয় তেমনি অন্যদের বা সমষ্টির স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হতে হয়।

(৩) সীমিত গৃহপরিবেশে গৃহস্বামী এবং সকল পরিজনকে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত ভাবে স্বাস্থ্য চিন্তা করতে হয়—তবেই গৃহপরিবেশে গড়ে ওঠে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া। বিদ্যালয় সমাজে সকল শিক্ষকের সহযোগিতায় প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকর পরিবেশটিকে সংরক্ষণ করতে হয়। এর জন্য শুধু তত্ত্বগত নয় সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অনুশীলন ও বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে অবহিত, সচেতন ও সক্রিয় হতে হয়।

(৪) প্রতিটি নাগরিক যখন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বাস্থ্যানুশীলনে তৎপর হয়ে ওঠে তখন জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যবিভাগ সহজে তার ভূমিকা পালন করতে পারেন। তেমনি, বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তি যখন স্বাস্থ্যসচেতন হয়ে স্বাস্থ্যপালনে তৎপর হন তখন কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্যশিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে পারেন। কারণ ব্যক্তি-স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও গণ-স্বাস্থ্যবিজ্ঞান একই স্বাস্থ্যানুশীলনের দুটি রূপ মাত্র।

৩। সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মৌলিক নীতি (Cardinal Principles of Community Hygiene) ঃ

আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিধি পালন পৃথক বিজ্ঞান হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। তাই সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মৌলিক নীতিগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন :

(ক) সমষ্টিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করাই হল আলোচ্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রাথমিক নীতি। বিদ্যালয়-জীবন হল বৃহত্তর সমাজ-জীবনের

প্রতিরূপ। শিক্ষার্থীকে সমাজ-জীবনের উপযোগী সভ্যরূপে গড়ে তোলাই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাকে সমষ্টিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য সূচী গ্রহণ করতে হবে। এই স্বাস্থ্য-কর্মসূচী হবে সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কর্ম ও চিন্তা দ্বারা অভিসিঞ্চিত। সমষ্টিগত জীবনে যেমন স্বাস্থ্যবিধি পালন করা হয়, বিদ্যালয়ে ঠিক একই উপায়ে স্বাস্থ্যবিধি পালনের চেষ্টা করলে শিক্ষার্থীর মনে সমষ্টিগত স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, শৌচাগার ব্যবহারের পর জল ঢেলে পরিষ্কার রাখতে হয়। অন্যথায় পরবর্তী সময়ে অপরিষ্কার শৌচাগার ব্যবহারের সময় নিজের যেমন ঘৃণা হয়, অন্যের মনেও ঘৃণার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। সমষ্টিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে চেতনার অভাবে সাধারণের ব্যবহার্য স্নানাগার, পুষ্করিণী, শৌচাগার, পার্ক, ময়দান প্রায়ই অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। বিদ্যালয় থেকেই শিক্ষার্থীকে সমষ্টিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়াই আধুনিক শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ।

সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি

(খ) সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষণের দ্বিতীয় নীতি হল পরোক্ষ ও দৃষ্টান্ত সহযোগে বয়স্ক ও অল্পবয়স্ক সকলকেই স্বাস্থ্যসচেতন করা এবং ক্রমশঃ স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গঠনের জন্য তৎপর হওয়া। এক্ষেত্রে উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত পরিবেশন করা প্রেরণা সঞ্চারণের প্রকৃষ্ট উপায়। ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস এক্ষেত্রে বড় কথা। বিদ্যালয়ে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষাকর্মী সকলেই যদি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হন তাহলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই অভ্যাস সঞ্চারিত হবে ও সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিধির প্রভাব সামগ্রিক বিদ্যালয় জীবনকে প্রভাবিত করবে। ক্রমশঃ বিদ্যালয় হবে একটা স্বাস্থ্যসম্মত সমাজ-জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। এর দ্বারা সমাজ ও বিদ্যালয়, বিদ্যালয় ও সমাজ পরস্পরকে স্বাস্থ্যবিধি পালনে প্রভাবিত করবে।

দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বাস্থ্যসম্মত আচরণের অভ্যাস গঠন

(গ) যৌথ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে শিশুকে অভ্যস্ত করানো সহজ। শৈশবই হল জীবনের অঙ্কুর-কাল। এই সময় তাদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস সৃষ্টি করে দেওয়া যায়। শিশুর মধ্যে যৌথ স্বাস্থ্য-প্রচেষ্টার মনোভাব

সৃষ্টির জন্য মাতাপিতা, অভিভাবক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, জনস্বাস্থ্য বিভাগ প্রভৃতির সক্রিয় সহযোগিতা অত্যাবশ্যক।

সমাজকে বিদ্যালয় স্তরে ও বিদ্যালয়কে সমাজস্তরে নিয়ে আসতে হবে

বিদ্যালয়ে একটা সমাজ-জীবনের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। সুতরাং বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন কালেই শিক্ষার্থীর মনে যৌথ স্বাস্থ্যসচেতনতা জাগানো প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এই দায়িত্ব ও কর্তব্য নিঃশেষ হয়ে যায় না। বিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাইরে গৃহে, প্রতিবেশীর সঙ্গে, কর্মক্ষেত্রে যেখানেই শিক্ষার্থী অবস্থান করবে সেখানেই বিদ্যালয়ের কর্তব্য ও দায়িত্বের পরিধি প্রসারিত হবে। বিদ্যালয় যদি গৃহ ও সমাজ পরিবেশের প্রভাবকে অবহেলা করে তাহলে বিদ্যালয়বহির্ভূত প্রভাব শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যবিধি-সম্পর্কিত শিক্ষা-প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।[1] সমষ্টিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত মৌলিক নীতিরূপে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, বিদ্যালয়কে নিয়ে আসতে হবে সমাজস্তরে আর সমাজ-বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে যেতে হবে বিদ্যালয় স্তরে। বিদ্যালয় থেকে লব্ধ জ্ঞান শিক্ষার্থী সমাজের যৌথ জীবনে কার্যকর করবে। তাহলে শিক্ষার্থীর মনে, চিন্তায়, ভাবনায়, বাস্তব আচার-আচরণে যৌথ বা সমষ্টিগত স্বাস্থ্যচেতনা প্রয়োগ সিদ্ধ হয়ে উঠবে।

1. Report of the Secondary Education Commission—Page 146.

তৃতীয় অধ্যায়

খাদ্য ও পুষ্টি

[Health and Nutrition]

অধ্যায় পরিচয়ঃ খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত কোন বিষয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু বিষয়টি স্বাস্থ্য প্রসঙ্গের অঙ্গ। স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন সুষম খাদ্য (balanced diet) ও বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যসংরক্ষণ প্রসঙ্গে প্রয়োজন মধ্যাহ্ন আহার বা টিফিনের ব্যবস্থাপনা। শেষোক্তটি বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। সুতরাং 'খাদ্য ও পুষ্টি' বিষয়টিকে অবহেলা করা যায় না। 'খাদ্য ও পুষ্টির' সঙ্গে বিদ্যালয় টিফিনের ব্যবস্থাটিও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হল। এটা স্বাস্থ্যকর্মসূচীর (Health Programme) অন্তর্ভুক্ত বিষয়। এছাড়া আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিকেও বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আলোচ্য অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

১। স্বাস্থ্য ও খাদ্য (Health and food):

মানব জীবনের তিনটি মৌলিক অত্যাবশ্যক সামগ্রী হল খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান। এখানে খাদ্যের অগ্রাধিকার সর্বাগ্রে স্বীকৃত। কয়লা বা জ্বালানির অভাবে ইঞ্জিন অচল হয়ে পড়ে, তেমনি খাদ্যের অভাবে দেহ-যন্ত্রটিও অকর্মণ্য হয়। কিছুক্ষণ কাজ করতে করতে আমরা ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করি। কখনও বা আমরা ক্ষুধা অনুভব করি। এর ফলে আমাদের কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা হ্রাস পায়। এগুলি হল শরীরযন্ত্রের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের ঘাটতির লক্ষণ। এই ঘাটতি সুষম খাদ্য, বিশুদ্ধ বায়ু, সূর্যালোক, তাপ, সুনিদ্রা, বিশ্রাম প্রভৃতি উপাদানের দ্বারা পূরণ হতে পারে। তবে শরীরের ঘাটতি পূরণের উপাদান হিসেবে সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। কারণ, মানবদেহে খাদ্য তিন প্রকার কাজ করে। **প্রথমতঃ,** খাদ্যের প্রধান কাজ হল দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ (Growth and development) সাধন। জন্মসূত্রে অনুসারে মাত্র একটি জীবকোষ থেকে আমাদের এই উদ্ভূত দেহ খাদ্যগ্রহণ ক'রে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত এরূপ বৃদ্ধি ও বিকাশের লক্ষণ সুস্পষ্ট। **দ্বিতীয়তঃ,** খাদ্য দেহের ক্ষয় পূরণ করে। দেহের অভ্যন্তরে রয়েছে অসংখ্য যন্ত্রাদি আর বাইরে

খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

রয়েছে মাংসপেশী ও চর্ম। মাতৃগর্ভের ভ্রূণ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দেহের ভেতর ও বাইরে নানাকার্য সম্পাদনার ফলে দেহযন্ত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। খাদ্য এই ক্ষয় পূরণের সহায়ক। তৃতীয়তঃ, দেহের কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন তাপ ও শক্তি। খাদ্য দেহের প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি (energy) যোগান দেয়। তাপ ও শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ভিটামিনরূপে খাদ্যের মধ্যে অবস্থান করে। একমাত্র খাদ্যই এসব ভিটামিন যোগান দিতে পারে।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারছি যে, জন্ম থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ বা এক কথায় পুষ্টি সাধিত হয়। এই সময়টা বালক-বালিকাদের স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভের কাল। সুতরাং স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রসঙ্গে যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীদের দেহের পুষ্টিসংক্রান্ত বিষয়ে মনোযোগ না দেয় তাহলে সুস্থ সমাজ-জীবনগঠনে যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় তা আর পূরণ করা কোন দিনই সম্ভব হবে না। আমাদের দেশে সমাজভিত্তিক অর্থনৈতিক (Socio-Economic) অবস্থা এত নিম্নমানের যে মাতাপিতা বা অভিভাবক সন্তানদের দু-বেলা দু-মুঠো সুষম খাদ্য ত দূরের কথা সাধারণ খাদ্যও যোগান দিতে পারেন না। ফলে, দেহের পুষ্টি সেই সময় ব্যাহত হয় যখন দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ একান্ত প্রয়োজন। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২—৫৩) বলেন, 'অপুষ্টিই হল ছাত্রদের শারীরিক স্বাস্থ্যের অন্যতম ত্রুটি। বয়ঃসন্ধিক্ষণে ত্রুটিপূর্ণ বিকাশ অথবা অস্বাস্থ্যের কারণ হিসেবে অপুষ্টি যতটা গুরুত্বপূর্ণ, জীবনের অন্য কোন সময় তত গুরুত্বপূর্ণ হয় না। অথচ আজও শিশুর জীবনের পুষ্টির জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তত মনোযোগ দেওয়া হয় না।' ফলে জাতীয় স্বাস্থ্যও ক্রমশঃ অবনতির দিকে গতিশীল। তাই আজ গুণগত ও পরিমাণগত বিচারে সুষম খাদ্য যোগানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর দেহ-পুষ্টিতে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব

খাদ্য তরল অথবা শক্ত হতে পারে। শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশ, ক্ষয়পূরণ, তাপ ও শক্তি সঞ্চার এবং শরীরযন্ত্রের পরিচালনার জন্য উপযুক্ত রক্ত-রস সৃষ্টি করাই খাদ্যের ধর্ম। শারীরিক প্রয়োজনেই আমরা খাদ্য চিবিয়ে বা গিলে খাই। অনেক কিছু আমরা খেতে পারি—কিন্তু খেলেই বস্তুটি খাদ্য হিসেবে গণ্য হবে এমন কোন শর্ত নেই। অনেকে বিষ পান করে বা খায় কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই খাদ্য নয়।

প্রকৃত খাদ্য অনেক সময় অখাদ্যে পরিণত হয়। শারীরিক প্রয়োজনে ক্ষুধাতৃপ্তির জন্য গৃহীত খাদ্য প্রকৃত খাদ্য হিসেবে পরিগণিত। প্রলোভনে, সামাজিক প্রয়োজনে, অন্যের অনুরোধে, অসময়ে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত গৃহীতখাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে নিশ্চয়ই ক্ষতিকারক। সুতরাং যখন তখন যা-ইচ্ছা খেলেই ব্যক্তি-স্বাস্থ্যের উপযোগী হবে—এমন কোন কথা নেই।

খাদ্য সম্পর্কে সতর্কতা

আবার ব্যক্তিগত বয়স, প্রাকৃতিক পরিবেশ, কর্মের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি খাদ্য-বিচার প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শৈশব, বাল্য, কৈশোর, বয়ঃসন্ধিকাল, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব প্রভৃতি বয়স খাদ্য বিচারে গৃহীত হয়। বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত দেহের বিকাশ ও বৃদ্ধির সময়। সুতরাং এসময় কথনও পেটখালি রেখে খাওয়া উচিত নয়। বরং দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশের সহায়ক খাদ্য এই বয়সে গ্রহণ করা কর্তব্য। সামাজিক স্তরে বয়স্ক ব্যক্তিদের কম খেয়ে কম কাজ করার চেয়ে অধিক খেয়ে অধিক কাজ করাই যুক্তিসঙ্গত। পঁচিশ বছরের উর্ধ্ববয়স্ক ব্যক্তির দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ থেমে যায়। তাই আনুপাতিক হারে তাদের কম খাদ্য হলেও চলে। জলবায়ু, বয়স ও কর্মের বিচারে এমন খাদ্য নির্বাচন করা উচিত যা ব্যক্তির তৃপ্তি ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হয়। বিষম (ill-balanced) খাদ্য স্বাস্থ্য সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলে।

২। মানবদেহের প্রয়োজন হিসেবে খাদ্যে যেসব অত্যাবশ্যক উপাদান থাকা উচিত সেগুলি হল ঃ

প্রোটিন (Protiens) ঃ উৎস বিচারে প্রোটিনকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে প্রাণীজ প্রোটিন; যেমন—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও দুধ থেকে তৈরি নানা সামগ্রী প্রভৃতি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন; যেমন—সয়াবিন, বাদাম, ডাল, আটা, আলু, গাজর, শাক-সবজী—ইত্যাদি।

প্রোটিন শরীরের মাংসপেশী বৃদ্ধি করে। এছাড়া দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধির জন্য প্রোটিনযুক্ত খাদ্য অত্যাবশ্যক। শিশু এবং সদ্য সন্তানপ্রসবা মাতার প্রোটিনযুক্ত খাদ্য অপরিহার্য। প্রোটিন থেকেই হজমের সহায়ক এনজাইম, এণ্ডোক্রাইন প্রভৃতি গ্রন্থি নিঃসৃত রস তৈরি হয়। প্রোটিনের অভাবে দৈহিক রুগ্নতা, শক্তিহীনতা, কর্মবিমুখতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। বলা

বাহুল্য, অতিরিক্ত প্রোটিন জাতীয় খাদ্য বেশী পরিমাণে গ্রহণ করা শরীরের পক্ষে আদৌ মঙ্গলজনক নয়।

কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate): শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় খাদ্য হল কার্বোহাইড্রেটের উৎস। আটা, ময়দা, আলু, ডাল ও চাউল জাতীয় দ্রব্য, গুড়, চিনি ও নানাবিধ মিষ্টি ইত্যাদি হল কার্বোহাইড্রেট উপাদান বিশিষ্ট খাদ্য। এসব দ্রব্যে প্রধানতঃ থাকে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। এগুলি দেহাভ্যন্তরে জ্বালানি দ্রব্যের কাজ করে। তাই এসব খাদ্য তাপ ও শক্তি উৎপাদকের পরম সহায়ক।

ফলের রস ও মধু থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক শর্করা এবং গ্লুকোজ পরিপাক-ক্রিয়ার সাহায্য না নিয়েই দেহ কর্তৃক শোষিত হয়। কিন্তু ইক্ষু, চিনি, আলু, আটা ইত্যাদি হজম হওয়ার পর দেহযন্ত্র কর্তৃক শোষণের উপযোগী গ্লুকোজ তৈরি হয়। কার্বোহাইড্রেট সহজে হজম হয় এবং প্রধানতঃ উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকে এই উপাদান পাওয়া যায়।

তৈল ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ (Fats and Oils): স্নেহজাতীয় পদার্থ ঘি, মাখন, পশুর চর্বি প্রভৃতি প্রাণীজ সামগ্রী এবং সরিষা তেল, বাদাম তেল, জলপাই তেল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ সামগ্রী থেকে পাওয়া যায়।

কার্বোহাইড্রেটের ন্যায় স্নেহ জাতীয় পদার্থও দেহের তাপ ও শক্তিসঞ্চারে সাহায্য করে। এগুলি কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা তৈরি হলেও আনুপাতিক হার দ্বিগুণ। অল্প তাপে যে স্নেহ-পদার্থ গলে যায় সেগুলি দ্রুত হজম হয়। যেমন, মাংসের চর্বি অপেক্ষা মাখন সহজে হজম হয়। স্নেহ জাতীয় খাদ্যের সঙ্গে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য মিশিয়ে খেলে হজম হয় আরও সহজে। তাই মাখনের সঙ্গে রুটি খাওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রাণীজ স্নেহপদার্থে ভিটামিন A এবং D থাকে। অধিকন্তু এটা তাপ-শক্তি সঞ্চারে সাহায্য করে।

প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা উচিত, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ জাতীয় পদার্থ দেহের কাজ করার শক্তি যোগান দেয় কিন্তু এরা কখনও আমাদের কর্মে উৎসাহী (energetic) ক'রে তোলে না। কারণ উৎসাহ, উদ্দীপনা ইত্যাদি সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার এবং এটা নির্ভর করে ব্যক্তির মেজাজ ও ব্যক্তিত্বের ওপর।

ধাতব লবণ (Mineral Salts): ভিটামিনের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম

উপাদান হিসেবে ধাতব লবণ আমাদের নানা জাতীয় খাদ্যের মধ্যে থাকে এবং ভিটামিনের ন্যায় দেহের পক্ষে এগুলি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। ভিটামিনের ন্যায় ধাতব লবণও সামগ্রী রন্ধনের সময় নষ্ট হয়ে যায়; ফলে খাদ্যের গুণ হ্রাস পায়।

শরীরের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় ধাতব লবণ হল সোডিয়াম (Sodium), ক্লোরাইড (Chloride), ক্যালসিয়াম (Calcium), ফসফেট (Phosphates), লৌহ (Iron), আয়োডিন (Iodine), সালফার (Sulphur) প্রভৃতি। উল্লিখিত প্রতিটির উপযোগিতা বিভিন্ন রকমের।

সোডিয়াম ও ক্লোরাইড আমরা সাধারণ লবণ থেকে পাই। শরীরে লবণের যোগান অব্যাহত থাকা চাই। কারণ শরীরের ক্ষয়সাধনের ফলশ্রুতি স্বরূপ ঘাম, চোখের জল, প্রস্রাব প্রভৃতির সঙ্গে লবণ জাতীয় পদার্থ বেরিয়ে যাচ্ছে। পানীয় জল, শাক-সবজি, সাধারণ লবণ প্রভৃতির দ্বারা উক্ত ক্ষতি পূরণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সোডিয়াম ক্লোরাইড শরীরের রক্ত-রস প্রবাহকে সহজতর করে, হজম ক্রিয়াকে তরান্বিত ও সহজ করে তোলে।

ক্যালসিয়াম অস্থি ও দাঁতের গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তাছাড়া হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনকে নিয়ন্ত্রণ করে নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়াকে তীক্ষ্ণ করে, মাংসপেশী ও শিরা উপশিরাগুলির কর্মশক্তি বাড়ায় এবং রক্তের জমাট বাঁধাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ক্যালসিয়ামের অভাবে নার্ভের ক্রিয়া নিস্তেজ হয়ে আসে, মাংসপেশীর ক্রিয়া হ্রাস পায়, নানা প্রকার চর্মরোগ দেখা দেয় এবং অস্থি ও দাঁত দুর্বল হয়ে পড়ে। শাক-সবজি, ফল, দুধ ও দুধ থেকে তৈরি খাবার, মাছ, মাংস, ডিম, চাল, গম প্রভৃতি থেকে এই ক্যালসিয়াম জাতীয় ধাতব পদার্থ আমরা সংগ্রহ করতে পারি।

ফসফেট শরীরের অন্যতম প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থ। দই, পনীর, ডিমের কুসুম, লিভার, মুরগীর মাংস, মাছ, গম, গাজর, সয়াবিন, আলু, টমেটো ও অন্যান্য শাক-সবজি থেকে আমরা ফসফেট সংগ্রহ করতে পারি। ফসফেট অস্থি ও দাঁতের পুষ্টি, নার্ভতন্ত্রের কর্মক্ষমতা এবং রক্তের জলীয় ভাগ গঠনে ও কার্যকারিতায় সাহায্য করে। এর অভাবে দাঁত ও হাড়গুলি দুর্বল হয় এবং দেহের পুষ্টি ব্যাহত হয়।

রক্তের লাল কণিকার সংগঠনে লৌহের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। হিমোগ্লোবিনে লৌহের ভাগ বেশী থাকে। লৌহ আবার শরীরের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অংশে অক্সিজেন বহনে সাহায্য করে এবং ইহা পিত্তরস (Bile) গঠনের সহায়ক। সুতরাং শরীরের বৃদ্ধির সময় অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিক্ষণের পূর্ব পর্যন্ত শরীরে লৌহের ঘাটতি হওয়া মোটেই উচিত নয়। লৌহের অভাবে শরীরে রক্তহীনতা প্রকাশ পায়। প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকে আমরা লৌহযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করতে পারি।

আমাদের থাইরয়েড গ্রন্থির গঠনে আয়োডিনের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। এর অভাবে গলগণ্ড (Goitre) রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। থাইরয়েড গ্রন্থি মস্তিষ্কের ক্রিয়ায় সাহায্য করে। গলগণ্ড রোগে আক্রান্ত প্রসূতির সন্তান মানসিক দুর্বলতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সামুদ্রিক মাছ থেকে আয়োডিন বেশী সংগ্রহ করা যায়। সমুদ্রের নিকটে উৎপন্ন শাক-সবজিতেও আয়োডিনের পরিমাণ বেশী থাকে।

ভিটামিন (Vitamins): দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি, বিকাশ ক্ষয়পূরণ, তাপ ও শক্তি সঞ্চার প্রভৃতির জন্য প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহজাতীয় পদার্থ, ধাতব লবণ প্রভৃতি কম বেশী সরাসরি কাজ করে। খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে আমরা এসব উপাদানের সন্ধান পাই। এসব উপাদান ছাড়াও খাদ্য-সামগ্রীর সঙ্গে আর একটি আনুষঙ্গিক উপাদান থাকে; তাকে আমরা ভিটামিন বলি। ভিটামিন জীবনের অপরিহার্য অংশ। শরীরের বিভিন্ন অংশে বিচিত্র কার্যকারিতা অনুসারে ভিটামিনের নামকরণ করা হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে এসব নাম গবেষকরা প্রকাশ করেন। বর্তমানে A, B, C, D, E, K, P প্রভৃতি নামে ভিটামিন আমাদের কাছে পরিচিত। এর মধ্যে B, C এবং P জলে দ্রবণীয় এবং A. D, E, K স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবণীয়। ভিটামিন আজো গবেষণা সাপেক্ষ উপাদান।

সামগ্রিকভাবে **ভিটামিনের কাজ** সম্পর্কে **প্রথমতঃ** বলা যায়, ভিটামিন শরীরকে রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা প্রদান করে। **দ্বিতীয়তঃ**, সাধারণভাবে শরীরের পুষ্টিবিধান করে। **তৃতীয়তঃ**, স্বাস্থ্যকর নার্ভতন্ত্র বজায় রাখতে সাহায্য করে। **চতুর্থতঃ**, খনিজ লবণ ও কার্বো-হাইড্রেটকে

শারীরিক প্রয়োজনে প্রয়োগ এবং পরিপাক শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। পঞ্চমতঃ, শারীরিক ও মানসিক সাধারণ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সংরক্ষণে সাহায্য করে। ভিটামিনের অভাবে শরীরটি ব্যাধির মন্দিরে পরিণত হয়। প্রসঙ্গতঃ প্রধান প্রধান কয়েকটি ভিটামিনের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে :

অন্যান্য উপাদানের ন্যায় ভিটামিন A পাওয়া যায় প্রাণীজ এবং উদ্ভিজ্জ সামগ্রী থেকে। প্রাণীজ সামগ্রীর মধ্যে চর্বি, মাংস, মাখন, পনীর, দুধ ও দুধ থেকে তৈরি খাদ্য, ডিম, কড মাছের তৈল প্রভৃতি। উদ্ভিজ্জ সামগ্রীর মধ্যে বাঁধাকপি, গাজর, টমেটো, সবুজ শাক-সবজি প্রভৃতি থেকে ভিটামিন A বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।

উপযোগিতা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ভিটামিন A (ক) চর্মকে মসৃণ ও পুষ্ট করে, এবং চর্মরোগ নিবারণে সাহায্য করে। (খ) শারীরিক শক্তি, পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। (গ) সংক্রামক রোগ নিবারণে প্রয়োজনীয় শরীরের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। (ঘ) দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে। ভিটামিন A-এর অভাবে শরীরে নানা ব্যাধির লক্ষণ দেখা দেয়। এর ফলে চক্ষুরোগ, চর্মরোগ, অন্ত্রের রোগ, সর্দি, কাশি প্রভৃতি ছোঁয়াচে রোগ, মূত্রগ্রন্থির ব্যাধি ইত্যাদি প্রকট হয়ে ওঠে।

ভিটামিন B নানা শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—B_1, B_2, B_3, B_4 প্রভৃতি। প্রতিটির কর্ম-বৈশিষ্ট্য ভিন্নতর। তবে ভিটামিন B কমপ্লেক্স এর মধ্যে সকল প্রকার বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটানো হয়। তাই শরীরের পক্ষে এই B কমপ্লেক্স বিশেষ উপকারী। সাধারণত বেরি বেরি রোগ, ক্ষুধামান্দ্য, স্নায়ুবিক দুর্বলতা প্রভৃতি রোগে এই ভিটামিনের উপযোগিতা অসামান্য।

আমাদের গ্রহণযোগ্য নানা খাদ্য বস্তুর মধ্যে ভিটামিন B পাওয়া যায়। তবে ঢেঁকীছাটা চাল, আটা, অঙ্কুরিত ছোলা, সয়াবিন, টমেটো, বাদাম, ফলের রস, খোসা ও সবজিতে ভিটামিন B-এর পরিমাণ বেশী থাকে।

ভিটামিন C কমলালেবু, আঙুর, পাতিলেবু এবং বাঁধাকপি, টমেটো, অঙ্কুরিত ছোলা প্রভৃতির মধ্যে বেশী পাওয়া যায়। দাঁত, মাড়ি, অস্থি, রক্ত-কণিকার পুষ্টির পক্ষে ভিটামিন C বিশেষ উপকারী। এছাড়া সর্দি, কাশি প্রভৃতি সংক্রামক রোগ নিবারণে ভিটামিন C-এর উপযোগিতা লক্ষ্য করা

যায়। C-এর অভাবে দাঁত ও দাঁতের মাড়িতে রোগ দেখা দেয়, রক্তহীনতা প্রকাশ পায়, হাতে-পায়ের গাঁট ফোলে ও ব্যথা হয়।

ভিটামিন D পাওয়া যায় প্রাণীজ খাদ্য থেকে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ এবং এসব থেকে তৈরি খাদ্যে ভিটামিন D অধিক পাওয়া যায়। খোলা বায়ু ও রৌদ্র কিরণ থেকেও আমরা ভিটামিন পেতে পারি। অস্থি ও দাঁতের বৃদ্ধি ও পুষ্টিতেও ভিটামিন D-এর উপযোগিতা খুব বেশী। কারণ এই ভিটামিন ক্যালসিয়াম ও ফসফেট সংগ্রহে এবং কার্যকর দেহের স্বাস্থ্য বিধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ক্ষমতা রাখে। ভিটামিন D-এর অভাবে অস্থি ও দাঁত রুগ্ন ও দুর্বল হয়, শিশু রোগাটে হয়, বসন্ত রোগ ও হুপিং কাশি এবং অস্থির যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়।

ভিটামিন E পাওয়া যায় সবুজ শাকসবজি, সবুজ বীজ, মাংস, দুধ প্রভৃতির মধ্যে। এই ভিটামিন সাধারণতঃ প্রজনন ক্রিয়ার সহায়ক উপাদান। এর অভাবে মূত্রাশয় ও প্রজনন যন্ত্রে নানা ব্যাধি দেখা দেয়। মাতার দেহে এই ভিটামিনের অভাব থাকলে সন্তান ভ্রূণেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

প্রসঙ্গতঃ আরও কয়েকটি ভিটামিনের কথা বলা যেতে পারে। যেমন, ভিটামিন K রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে। ভিটামিন K-এর অভাব থাকলে ক্ষতস্থানের রক্তপাত শীঘ্র বন্ধ হয় না। পিত্তজনিত ব্যাধি নিবারণে এই ভিটামিন বিশেষ সাহায্য করে। সবুজ শাকসবজি, মাংস, ডিম প্রভৃতিতে ভিটামিন K পাওয়া যায়। ভিটামিন K-এর ন্যায় P-ও রক্তের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। আর শেষোক্ত ভিটামিনদ্বয়ের অভাবে হৃৎপিণ্ডে নানা প্রকার ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

ভিটামিন সংক্রান্ত খাদ্যগুলি দেহের অপরিহার্য প্রয়োজনীয় উপাদান। তবে ভিটামিনের শ্রেণী ও গুণাগুণ সম্পর্কে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে।

৩। সুষম খাদ্য ঃ (Balanced Diet) ঃ

আমরা প্রতিদিন যে খাদ্য গ্রহণ করি সেই সব খাদ্য বস্তুর অত্যাবশ্যক উপাদান ও তাদের গুণাগুণ বিচার করে দেখা প্রয়োজন, বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তিদেহের প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ কত। দেহগঠনের জন্য প্রোটিন, স্নেহ জাতীয় পদার্থ কার্বোহাইড্রেট, বিভিন্ন ধাতব লবণ, ভিটামিন এবং জল—এর কোনটারই অভাব থাকা উচিত নয়। তবে এই প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির

একটা অনুপাত আছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দেহের জন্য প্রয়োজন হল ১০০ গ্রাম প্রোটিন, ১০০ গ্রাম স্নেহ জাতীয় পদার্থ, ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৩০ থেকে ৫০ গ্রাম ধাতব লবণ, সকল প্রকার কিছু ভিটামিন এবং ৪ থেকে ৫ পাইন্ট জল।

পূর্বেই বলা হয়েছে, আমাদের দেহের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও সুস্থ জীবনযাত্রার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। ইঞ্জিনের জ্বালানির ন্যায় খাদ্য দেহযন্ত্রের তাপ ও শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ জাতীয় উপাদান, প্রশ্বাস থেকে লব্ধ অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে তাপ উৎপন্ন করে। সাধারণ তাপমাত্রা থেকে দেহের তাপ ৪০ থেকে ৫০ ফারেনহাইট বেশী থাকা বাঞ্ছনীয়। খাদ্য মূলতঃ-দেহের প্রয়োজনীয় তাপ বজায় রাখে। গৃহীত খাদ্য কর্তৃক উৎপাদিত তাপ মাত্রার ওপর দেহযন্ত্রের শক্তি উৎপাদন নির্ভর করে। ক্যালোরি (calorie) হিসেবে এই তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। এক লিটার জলের উষ্ণতাকে ১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড করতে যতটুকু তাপ প্রয়োজন হয় ততটুকু তাপকে এক ক্যালোরি তাপ ধরা হয়। ক্যালোরি হল তাপ পরিমাপের একক।

প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ জাতীয় পদার্থ ইত্যাদি শরীরের শক্তি (energy) যোগান দেয়। দিনে বিভিন্ন কাজে আমরা যতটুকু শক্তি ক্ষয় করি তার পরিমাণ যত আমরা তত ক্যালরি তাপের জন্য খাদ্য গ্রহণ করবো। প্রয়োজনীয় তাপ উৎপাদনের জন্য আবার এক প্রকার উপাদান যুক্ত খাদ্য (যেমন, শুধু প্রোটিন) গ্রহণ করা উচিত নয়। শুধু প্রোটিন উপাদানবহুল খাদ্য গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ক্যালোরি তাপ সঞ্চার করার চেষ্টা করলে বিপদ অনিবার্য। এর দ্বারা বদহজমের খুব বেশী সম্ভাবনা থাকে। বিভিন্ন উপাদান-যুক্ত খাদ্যের জন্য মিশ্র খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ—সকলের দেহের জন্য একই ক্যালোরি প্রয়োজন হয় না। বয়স, কর্ম, বিশ্রাম প্রভৃতির অনুপাতে দেহের শক্তি যেমন ক্ষয় হয় সেই অনুপাতে ক্যালোরির মাত্রা ধার্য হয়। যাদের শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে হয় তাদের খাদ্যের পরিমাণের সঙ্গে অনুপাতে ক্যালোরি বেশী মাত্রায় প্রয়োজন। শিশুর দেহ গঠন, বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য বেশী মাত্রায় ক্যালোরি প্রয়োজন। অন্যথায় দেহের পুষ্টি হতে পারে না।

সুষম খাদ্য তালিকা

(ক)	ঢেঁকিছাটা চাল	৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম
(খ)	আটা	২০০ „ ২২৫ „
(গ)	ডাল	১০০ „ ১৫০ „
(ঘ)	চিনি বা গুড	৫০ গ্রাম
(ঙ)	দুধ	১ লিটার
(চ)	মাছ বা মাংস	১০০ গ্রাম
(ছ)	তরিতরকারি	৩০০ থেকে ৩৫০ গ্রাম
(জ)	তেল-ঘি	২০—২৫ গ্রাম
(ঝ)	ফল	১৫০ গ্রাম

দুধ ছাড়া মোট ১৩৫০ থেকে ১৫০০ গ্রাম পরিমাণ খাদ্যবস্তু একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির দেহের পক্ষে প্রয়োজন। এর দ্বারা ৩০০ ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয়। একজন সুস্থ বয়স্ক ব্যক্তির দেহের পক্ষে এটাই প্রয়োজন। তবে উক্ত খাদ্য তালিকা পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন, নিরামিষাশীদের জন্য মাছ মাংসের পরিবর্তে সম পরিমাণ খাদ্যগুণ পাওয়ার মতো তরিতরকারি ও রুটির পরিমাণ বাড়াতে হবে। তরিতরকারি পর্যায়ে সবুজ শাক-সবজির পরিমাণ বাড়ানো চলে। স্নেহজাতীয় পদার্থের জন্য তেল ঘির পরিবর্তে মাখন ব্যবহার করা চলে। অর্থাৎ খাদ্যতালিকা এমনভাবে তৈরি করা প্রয়োজন যেন দেহের প্রয়োজন অনুসারে গৃহীত খাদ্যে আনুপাতিক হারে অপরিহার্য উপাদানগুলির সুষম সন্নিবেশ হয় হয়। তাহলে তালিকাটি সুষম খাদ্য তালিকায় রূপান্তরিত হবে।

সুষম খাদ্য-নির্বাচনে পালনীয় নীতি : প্রথমতঃ, বয়সের তারতম্যই হল খাদ্য-নির্বাচনের প্রাথমিক নীতি। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা শিশুদের খাদ্য পরিমাণগত বিচারে কম হলেও উপাদনগত বিচারে শিশুখাদ্যে অধিক প্রোটিন থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ, মাতৃগর্ভে ভ্রূণ থেকে শুরু করে সাধারণতঃ পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ হয়। সেজন্য এই বয়সের ব্যক্তির জন্য প্রোটিন উপাদান যথেষ্ট পরিমাণ থাকা বাঞ্ছনীয়।

বয়সের তারতম্য

দ্বিতীয়তঃ, দৈহিক ও মানসিক শ্রমভেদে খাদ্যের পরিমাণ ও উপাদানে তারতম্য হয়। যেমন, একজন অফিস কেরানীর জন্য দৈনিক ২০০০—২৫০০,

শারীরিক শ্রমে নিযুক্ত মজুরের জন্য ৪৫০০—৫০০০, আবার স্বাভাবিক পরিশ্রমী ব্যক্তি অথবা সদ্য সন্তান প্রসবা মাতার জন্য দৈনিক ২৫০০—৩০০০ ক্যালোরি তাপমূল্যের উপাদান প্রয়োজন। শারীরিক পরিশ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তির প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ জাতীয় পদার্থের খাদ্য যত প্রয়োজন মানসিক শ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তির জন্য ঐ একই খাদ্য কম পরিমাণে প্রয়োজন হয়।

দৈহিক ও মানসিক শ্রমের তারতম্য

তৃতীয়তঃ, দেশ, কাল অথবা জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে খাদ্য নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়। শীতপ্রধান দেশে প্রোটিন ও স্নেহ জাতীয় পদার্থযুক্ত খাদ্য বেশী প্রয়োজন। কারণ এই দুটি পদার্থ বেশী তাপশক্তি উৎপাদনের সহায়ক। তেমনি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন বেশী। আবার ঋতু অনুসারে খাদ্যের তারতম্য হয়। একই অঞ্চলে শীতকালে প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় উপাদান ভিত্তিক খাদ্য বেশী গ্রহণ করা উচিত।

জলবায়ুর তারতম্য

চতুর্থতঃ, মিশ্র খাদ্য নির্বাচন স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। একই খাদ্য বস্তুর মধ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ জাতীয় পদার্থ, ভিটামিন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপাদান থাকতে পারে। কিন্তু খাদ্য নির্বাচনের সময় একপ্রকার খাদ্যবস্তু যেমন, সবুজ-শাকসবজী বেশী পরিমাণে গ্রহণ করে সকল প্রকার উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করা উচিত নয়। এর দ্বারা হজমের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ পদার্থ যেমন, রুটি, মাখন অথবা পূর্ণ খাদ্য (Full meal) গ্রহণের সময় ভাত বা রুটি, মাছ, মাংস, ডাল, তরকারী, মিষ্টি প্রভৃতি নির্বাচন করাই বাঞ্ছনীয়। মিশ্রখাদ্য রুচি ও আগ্রহ সঞ্চারে সাহায্য করে। উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে সহজে খাদ্য বস্তু হজম হয়।

মিশ্র খাদ্য ও উপাদান সংগ্রহ

অবশেষে বলা যায়, শরীর ও স্বাস্থ্যের অনুকূল উপাদান ও ক্যালোরি মূল্য পাওয়া যাবে এমন খাদ্যবস্তু নির্বাচনের পরেও বিশেষ বিশেষ খাদ্যবস্তুর মধ্যেও বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে খাদ্য নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। চাল, ডাল, আটা, ময়দা, তৈল, ঘি, মাখন, দুধ, প্রভৃতিতে ভেজাল থাকে। শুকনো তরিতরকারি, শাকসবজীর পরিবর্তে টাটকা ও সবুজ দ্রব্য সংগ্রহ করা বিধেয়। এক কথায় বিশুদ্ধ ও টাটকা খাদ্য সংগ্রহ করা কর্তব্য।

বিশুদ্ধতার বিচারে খাদ্য সংগ্রহের নীতি

৪। খাদ্য তৈরি ও গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা:

খাদ্যবস্তু নির্বাচনের পর খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে নানা প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আমরা খাদ্য গ্রহণ করি দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান, ভিটামিন ও ক্যালোরি মূল্য সরবরাহের জন্য। খাবার তৈরি বা রান্নার সময় অতিরিক্ত তেল-মশলা ব্যবহার করা, টাটকা জিনিসকে অত্যধিক ভাজার জন্য বস্তুর অনেক মূল্যবান উপাদান নষ্ট হয়ে যায়। আবার গুরুপাক খাদ্য সহজে হজম হয় না। ফলে, খাদ্যগুণ থেকে দেহ বঞ্চিত হয় এবং বদ হজম থেকে নানা ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়। সুতরাং এবিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ, রোগগ্রস্থ পাচক কর্তৃক তৈরি খাদ্য রোগ জীবাণু ছড়াতে পারে। আবার রোগগ্রস্থ না হয়েও অনেক পাচক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে মনোযোগী নয়। সেসব ক্ষেত্রে রান্নার জল, বাসন-পত্র, হাড়ি-কড়া পরিষ্কার রাখার সম্ভাবনা কম হয়। সুতরাং পাচকের স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাসের দিকেও নজর রাখা কর্তব্য।

খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে যেমন তেমনি গ্রহণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও নানা সাবধানতা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত।

প্রথমতঃ, রুচির বিরুদ্ধে আহার করা উচিত নয়। হোটেল, রেস্তোঁরা বা গৃহ পরিবেশ যেখানেই হোক বিতৃষ্ণার ভাব নিয়ে আহার করা স্বাস্থ্য বিরোধী কর্ম।

দ্বিতীয়তঃ, ঠাণ্ডা, বাসি, আলগা, অপরিচ্ছন্ন খাদ্য গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যধিক ক্ষতিকারক। গৃহ পরিবেশে আহারের সময় আমরা এবিষয়ে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলেও হোটেল, রেস্তোঁরা, মিষ্টির দোকানে আহারের সময় এদিকে লক্ষ্য করি না। এছাড়া শহরের পথিপার্শ্বে ধুলা-বালির মধ্যে অনেক খাবার আঢাকা অবস্থায় রেখে বিক্রি করা হয়। কিছু বিবেচনা না করে অনেকে এসব খাদ্য গ্রহণ করে। এর দ্বারা রোগবিস্তারের সম্ভাবনা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

তৃতীয়তঃ, রুগ্ন ও ব্যাধিগ্রস্থ পাচকের দ্বারা পরিবেশিত খাদ্য, খালি হাতে পরিবেশিত খাদ্য গ্রহণ করা এবং অন্যের উচ্ছিষ্ট আহার করার অর্থ ব্যাধিকে আমন্ত্রণ করা। গুরুজনের উচ্ছিষ্ট আহারের নিয়ম অনেক স্থানীয় সমাজের সংস্কার। অনেক গুরুজন স্নেহবসে ছোট ছেলেমেয়েদের নিজের

উচ্ছিষ্ট আহার করিয়ে আনন্দ পান। এর দ্বারা রোগ বিস্তার যে কত সহজসাধ্য হতে পারে তা বলাই বাহুল্য।

চতুর্থতঃ, খাদ্যবস্তু সংগ্রহের সময় যেমন টাটকা খাদ্য সংগ্রহ করা কর্তব্য, তেমনি রন্ধন করার পর খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত। ধূলাবালি, কীটপতঙ্গ, মশামাছি প্রভৃতি খাদ্যের মধ্যে রোগ জীবাণু ছড়িয়ে দেয়। তাই রন্ধনের পর খাদ্যদ্রব্যগুলিকে সাবধানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত।

পঞ্চমতঃ, অতিরিক্ত আহার ও অসময়ে আহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ক্ষুধার তাড়নায় হোক অথবা লোভবশতঃ হোক কখনও অতিরিক্ত আহার করা উচিত নয়। এর দ্বারা যেমন খাদ্য হজম হয় না, তেমনি দেহে চর্বি জমার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া বদহজম জনিত পীড়া থেকে অনেক কঠিন রোগ হওয়ার পথ সুগম হয়। সুতরাং অতিরিক্ত আহার ও অসময়ে আহার স্বাস্থ্যবিরোধী প্রক্রিয়া।

ষষ্ঠতঃ, অতিরিক্ত ও অসময়ে আহারের ন্যায় খুব অল্প আহারও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। অপুষ্টি দু-প্রকারে হতে পারে—প্রথমতঃ, প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ কম হলে আর দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজনের তুলনায় অত্যাবশ্যক উপাদান কম হলে অপুষ্টির সম্ভাবনা থাকে। প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত কম আহার করলে এবং এরূপ কম আহারের কাল দীর্ঘস্থায়ী হলে দেহের অপুষ্টি অবশ্যম্ভাবী। প্রয়োজনভিত্তিক আহারে অভ্যস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অল্প আহারে অভ্যস্ত ব্যক্তি তাড়াতাড়ি রোগাক্রান্ত হন।

৫। বিদ্যালয়ে আহার অথবা জলযোগ (School meal or tiffin) ঃ

আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে দুধরনের মধ্যাহ্নকালীন বিরতি প্রথার প্রচলন আছে। প্রথমতঃ, যেসব বিদ্যালয় সকালে ও বিকালে বসে সেখানে একটু দীর্ঘকালীন মধ্যাহ্ন বিরতি দেওয়া হয়। আবার যেখানে ১০-৩০ মি, থেকে ৪-৩০ অথবা ১১ থেকে ৫টা পর্যন্ত স্কুল বসে সেখানে স্বল্পকালীন মধ্যাহ্ন বিরতির ব্যবস্থা করা হয়। মধ্যাহ্নকালীন বিরতিকে ইংরেজীতে 'টিফিন পিরিয়ড' বলা হয়। শব্দগত অর্থে 'টিফিন' হল জলযোগ।

প্রকৃতপক্ষে ঐ সময় জলযোগের ব্যবস্থা করা উচিত বলেই ঐ পিরিয়ডকে টিফিন পিরিয়ড বলা হয়। টিফিন পিরিয়ড এখন বিরতির সময় রূপে আখ্যায়িত। দু-একটি বিদ্যালয় ছাড়া কোথাও জলযোগের ব্যবস্থা করা হয় না। যেসব বিদ্যালয় সকালে ও বিকালে বসে সেখানে মধ্যাহ্নে আহার উপলক্ষে দীর্ঘকালীন বিরতির ব্যবস্থা থাকে। শান্তিনিকেতনে এরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান। স্বল্পকালীন বিরতির সময় অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিজেরাই টিফিন নিয়ে আসে অথবা বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী দোকান থেকে খাবার কিনে খায়। যেখানে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা শিক্ষার্থীদের বিদ্যাচর্চা করতে হয় সেখানে তাদের যে কিছু জলযোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

বিদ্যালয়ে টিফিনের প্রয়োজনীয়তা (Need for tiffin at school) **:** বিদ্যালয়ে টিফিনের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নরূপ যুক্তিগুলি অবতারণা করা যেতে পারে :

প্রথমতঃ, মাতৃগর্ভ থেকে শুরু ক'রে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত দেহের বৃদ্ধি (growth) ও বিকাশ (development) হয়। বৃদ্ধি ও বিকাশ বা এককথায় পুষ্টির জন্য পরিমিত খাদ্য প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই বয়সের অন্তর্ভুক্ত। দিনে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে কাটাতে হয়; এতক্ষণ অভুক্ত থাকলে তাদের দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশের ব্যাঘাত ঘটে।

দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়-শিক্ষার্থীদের বয়স সাধারণতঃ পাঁচ-ছয় থেকে ষোল-সতের বছর। এই বয়সের বালক-বালিকারা স্বভাবতঃ চঞ্চল প্রকৃতির হয়। তাই বিদ্যাচর্চার জন্য মানসিক শ্রম ছাড়াও তারা দৌড়-ঝাঁপ, খেলাধূলা এবং এঘর থেকে ওঘরে যাতায়াত করে। ফলে তাদের দেহের ক্ষয়সাধন দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। ক্ষয়পূরণের জন্য পরিমিত ক্যালোরি মূল্যের ভিটামিনযুক্ত খাদ্য প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ, আমাদের দেশের দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে নিম্ন মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা গৃহে পরিমিত আহার করতে পারে না। শুধু অর্ধভুক্ত নয় অনেককেই অভুক্ত অবস্থায় স্কুলে থাকতে হয়। এসব ক্ষেত্রে জলযোগের দ্বারাও শারীরিক অভাব পূরণ করা সম্ভব নয়। এজন্যই বিদ্যালয়ে আহারের ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত। যারা পূর্ণ আহার গ্রহণ করে

১০টা বা ১০-৩০ মিনিটে বিদ্যালয়ে আসে তারাও সুষম খাদ্য গ্রহণ করে থাকে এমন কল্পনা করাও যায় না। সুতরাং প্রতিটি বিদ্যালয়ে আহার বা জলযোগের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ, শিক্ষালাভের জন্যই বিদ্যালয়ে থাকাকালীন খাবার খাওয়া শিক্ষালাভের একটি অঙ্গ। তাই কিভাবে সুষম খাদ্য নির্বাচন করতে হয়, কিভাবে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত, পরিবেশন ও গ্রহণ করতে হয়, সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা ও অভ্যাস গঠন করার দায়িত্ব বিদ্যালয়কেই নিতে হবে। শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস, তার গৃহপরিজন ও প্রতিবেশীদের প্রভাব বিস্তার করবে। এর দ্বারা সমাজের প্রতি বিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালন করাও সহজ সাধ্য হবে।

টিফিন সম্পর্কে প্রচলিত অবস্থা (Prevalent practices of School Tiffin) : বিদ্যালয়ে টিফিন গ্রহণেব প্রথা প্রচলনের আগে ও পরে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরাই বিদ্যালয়ে টিফিন নিয়ে যেত। চিড়া, মুড়ি, গুড়, পাটালি, কলা, শশা, বিভিন্ন ঋতুর ফল ছিল তাদের সাধারণ টিফিন। বাড়ী থেকে মা-বোনেরা পিঠা, নারকেল সন্দেশ ইত্যাদিও তৈরি করে দিতেন। গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলিতে এরূপ প্রথা আজও চালু আছে। উন্নত গ্রাম অথবা শহরাঞ্চলে ছেলে মেয়েরা বাড়ী থেকে টিফিন কৌটায় ভর্তি খাবার নিয়ে আসে ; অথবা বিরতির সময় বাড়ীর চাকর বা পরিবারের কেউ টিফিন পৌছে দিয়ে যায়। এছাড়া যেসব বিদ্যালয়ের পাশে বাজার-হাট, দোকান-পাট আছে সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা দোকান থেকে নানা সামগ্রী কিনে জলযোগ করে। এর জন্যে প্রয়োজন হয় নগদ পয়সা সংগ্রহ করা। যেসব পরিবারের ছেলেমেয়েরা নগদ পয়সা বা তৈরি খাবার বাড়ী থেকে পায় না তারা অবাঞ্ছনীয় প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে পারে। সুতরাং শিক্ষার্থীদের অথবা অভিভাবকদের স্ব-স্ব প্রচেষ্টার ওপর টিফিন গ্রহণের ব্যবস্থাপনা ছেড়ে দেওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তাই এই সাধারণ নীতির পরিবর্তে বিদ্যালয়ের তরফ থেকে স্বাস্থ্য সম্মত টিফিনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে সরকারী শিক্ষাবিভাগের তরফ থেকে বিদ্যালয় টিফিন প্রসঙ্গে একটা পরিকল্পনা এদেশে প্রচলিত হয়েছিল। তখন ছাত্রদের মাথাপিছু ছয় আনা বা সাইত্রিশ পয়সা প্রতি বিদ্যালয়কে সরকার কর্তৃক দেওয়া হত।

শর্ত ছিল অভিভাবককেও সমহারে ব্যয় করতে হবে। এই পরিকল্পনায় শতকরা ১৬ জনকে বিনা ব্যয়ে টিফিন পরিবেশন করা হত। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়।

বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নকালীন টিফিন প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক সংস্থাগুলির (যেমন—U. N. I. C. E. F.; C. A. R. E. প্রভৃতি) কর্মধারা প্রশংসার দাবি রাখে। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটীর (Indian Redcross Society) অবদানও নিতান্ত কম নয়। তবে এসব পরিকল্পনার পরিধি এত সীমিত যে প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্ত।

ভাবী নাগরিকদের স্বাস্থ্যচিন্তা জাতীয় এক সমস্যা। সুন্দর, কর্মক্ষম, সুস্থ নাগরিক জীবন গড়ে তোলা জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের অপরিহার্য কর্তব্য। দেশের সর্বত্রই সরকারী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালিত হচ্ছে না। এর পশ্চাতে রয়েছে দেশের অপরিকল্পিত, অনুন্নত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা। এই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য একটি অভিমত হল—কৃষকের নিকট থেকে কিছু ফসল সংগ্রহ, মুষ্টিভিক্ষা, ছেলেদের দ্বারা গ্রাম থেকে ফলমূল সংগ্রহ, শিক্ষকদের পকেট থেকে মাসে মাসে কিছু ব্যয় করা, হোটেল-রেস্তরাঁ ও মিষ্টান্নের দোকানদারকে কিছু ব্যয় করার জন্তে অনুপ্রাণিত করা দরকার। প্রাক্ স্বাধীনতার যুগে এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হত। বর্তমানে রাষ্ট্রকেই সরকারের মাধ্যমে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এর জন্য চাই সাম্যবাদী, সমাজতান্ত্রিক জনকল্যাণকর শাসনব্যবস্থা।

জলযোগ পরিকল্পনায় অর্থ সংগ্রহ : প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মধ্যাহ্ন বিরতির সময় জলযোগ সরবরাহের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। বছরে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৫২টি শনিবার, ৫২টি রবিবার এবং সাধারণ ছুটির দিনের সংখ্যা ৯৬ ধরলে বাকি থাকে ৩৬৫—(৫২+৫২+৯৬)=১৬৫ দিন। ১৬৫ দিনের জলযোগের হিসাব ধরা প্রয়োজন। মাথাপিছু ২৫ পয়সা ধরলে ৫০০ ছাত্রের জন্য ১৬৫ দিনে খরচ হয় ২০৬২৫ টাকা। আবার একজন ছাত্রের জন্য বছরে প্রয়োজন হয় (২৫ পয়সা × ১৬৫ =) ৪১ টাকা পঁচিশ পয়সা। একে দুভাগ করলে অভিভাবক ও সরকারকে প্রায় ২১ টাকা হারে ব্যয় করতে হয়। সুতরাং সরকারী মঞ্জুরী হবে বার্ষিক প্রায় ১১০০০ টাকা। জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিকদের প্রয়োজনে জাতীয় সরকারের এই ব্যয় ভার বহন করা খুবই যুক্তিসঙ্গত।

বাকী অর্ধাংশ অভিভাবকরা যে ব্যয় করতে পারবেন এমন সম্ভাবনা এদেশে স্বপ্নমাত্র। তাই দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হল—শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়ের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য। শহরাঞ্চলে অভিভাবকরা ব্যয় বহনে সক্ষম। তাই তাদের ওপর অধিক ব্যয় ভার অর্পণ করে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলির জন্য সরকার অধিক ব্যয় করতে পারেন।

তৃতীয় প্রচেষ্টায় অভিভাবক, শিক্ষক ও উচ্চশ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের নিয়ে প্রতি বছর একটি করে 'টিফিন কমিটি' সংগঠন করে এই কমিটির ওপর জলযোগ সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পণ করা যায়। 'টিফিন কমিটিকে' সক্রিয় সহযোগিতা দেবেন 'ছাত্র সংসদ', শিক্ষক পরিষদ (Teachers Council) এবং অভিভাবক-শিক্ষক সংঘ (Parent-Teacher Association)। এদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে 'টিফিন কমিটি' হাটবাজার, মেলা, আঞ্চলিক উৎসব অনুষ্ঠানে নগদ টাকায় বা সামগ্রীর মাধ্যমে সংগ্রহ কার্য পরিচালনা করতে পারেন। স্বল্পকালীন অর্থাৎ একবছরের জন্য পৃথক কমিটির ওপর দায়িত্ব অর্পিত হলে টিফিন কমিটি সার্থকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য চেষ্টা করবে। এর দ্বারা অভিভাবকদের প্রদত্ত অংশের হার কম হতে পারে।

চতুর্থ প্রচেষ্টায় খরচ কমানোর পক্ষে বলা যায়—'টিফিন কমিটির' ব্যবস্থাপনায় জলযোগ প্রস্তুত ও বিতরণের ব্যবস্থা রাখা যুক্তিযুক্ত। হোটেল, রেস্তঁরা বা কোন বাইরের সরবরাহকারীর হাতে দায়িত্ব অর্পণ করলে অপরিমিত ব্যয়ের সম্ভাবনা বেশী থাকে। তাছাড়া ব্যবসায়ী বৃত্তি অনুসারে অধিক লাভের আশায় জলযোগের সামগ্রী নিম্নমানের হতে বাধ্য। 'টিফিন কমিটির' দায়িত্বে টিফিনের অর্থ ও সামগ্রী সংগ্রহ, টিফিন প্রস্তুতি ও পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে খরচ যে যথেষ্ট কম হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

জলযোগের ব্যবস্থাপনা: অর্থ ও সামগ্রী সংগ্রহের পর জলযোগের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা করা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনার কয়েকটি দিক আছে; যেমন—(ক) জলযোগের খাদ্যতালিকা (Menu) নির্বাচন ও নির্ধারণের নীতি, (খ) খাদ্য ও তার সাপ্তাহিক তালিকা এবং (গ) জলযোগ প্রস্তুতি, পরিবেশন ও গ্রহণ।

(ক) জলযোগের খাদ্য তালিকা নির্বাচন ও নির্ধারণের নীতিঃ

প্রথমতঃ, টিফিনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করে খাদ্য সামগ্রী নির্বাচন করা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয়তার মূল কথা দেহপুষ্টি। সুতরাং পুষ্টিকর খাদ্যবস্তু নির্বাচন করা কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ে বালক-বালিকারা পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা বোঝে না। স্বভাবতঃই তারা রসনা তৃপ্তির প্রতি বেশী আকর্ষিত হয়। সুতরাং খাদ্য-বস্তু নির্বাচনের সময় পুষ্টিকারিতার পাশাপাশি রসনাতৃপ্তির উপযোগী খাদ্যের ওপরও কিছু গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ, খাদ্যবস্তুর বৈচিত্র্যের মধ্যে জলযোগের উপযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। একটি বা দুটি সামগ্রীর পরিবর্তে সপ্তাহের পাঁচটি দিনে (শনিবার ও রবিবার ছাড়া) পাঁচ প্রকার খাদ্য হলে ছাত্র-ছাত্রীরা সহজে বৈচিত্র্যপূর্ণ, রুচিকর জলযোগ দ্বারা আকৃষ্ট হবে। প্রতিদিন এক রকম খাদ্য নির্ধারণ করলে ছাত্রদের মনে একঘেয়েমি জনিত অরুচি সক্রিয় হয়। এর দ্বারা হজমেরও ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে।

চতুর্থতঃ, খাদ্যরুচি ও তৃপ্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মিশ্র খাদ্যবস্তু নির্বাচন করাও যুক্তিযুক্ত। রুটির সঙ্গে মাখন, গুড়, চিনি; শুধু ভিজে ছোলার পরিবর্তে ছোলা ও গুড়; মুড়ির পরিবর্তে দুধ, চিড়া ও কলা—এইভাবে বৈচিত্র্যসহ মিশ্র খাদ্যবস্তু নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখলে জলযোগের প্রতি শিক্ষার্থীরা আকৃষ্ট ও যথেষ্ট উপকৃত হবে।

অবশেষে বলা যায়, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসারে বিদ্যালয়গুলির পরিমিত খরচের দিকে লক্ষ্য রেখে জলযোগের খাদ্য নির্বাচন ও সংগ্রহ করা কর্তব্য। কারণ অর্থনৈতিক সমস্যা আমাদের সকল কাজের প্রাথমিক অন্তরায়। সেই বাধা অতিক্রম কবার জন্য খাদ্যবস্তু নির্বাচনের অন্যান্য নীতির সঙ্গে পরিমিত খরচের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ।

(খ) সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকা : উল্লিখিত নীতিগুলির ওপর গুরুত্ব দিয়ে **সাপ্তাহিক জলযোগের একটা তালিকা** নিম্নে দেওয়া হল :

সোমবার—অঙ্কুরিত ছোলা + মসলা মুড়ি + কলা

মঙ্গলবার—একপোয়া দুধ + চিড়া + চিনি বা গুড়

বুধবার—একটি কলা + আধ পোয়া দুধ + ভিজা চিড়া

বৃহস্পতিবার—ছোলার ডাল বা আলুর দম+চাপাটি

শুক্রবার—পাউরুটি+আধখানা ডিম+কলা

এছাড়া বিভিন্ন ঋতুতে আমাদের দেশে নানা প্রকার ফল পাওয়া যায়। যেমন—পেঁপে, কমলালেবু, আম, জাম, পেয়ারা প্রভৃতি। এগুলিকেও খাদ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহার করা চলে। এছাড়া শশা, খেজুর-পাটালী, নারকেল, সন্দেশ, আখের গুড় প্রভৃতি জলযোগের খাদ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

দৈনন্দিন জলযোগের সামগ্রী নির্বাচন প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন—বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সমান নয়; অনেকেই নানা ভাবে রুগ্ন থাকতে পারে। নির্দিষ্ট দিনের খাদ্যবস্তু কোন ছাত্রের পেটের পক্ষে বা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নাও হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিদর্শক বা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে পৃথক খাদ্যতালিকার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

(গ) **জলযোগ প্রস্তুতি, পরিবেশন ও গ্রহণ :** হোটেল, রেস্তরা, মিষ্টির দোকান বা বাইরের সরবরাহকারীর ওপর বিদ্যালয়ের জলযোগের ভার অর্পণ করা মোটেই উচিত নয়। বিদ্যালয়কে 'টিফিন কমিটির' মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। এর জন্য **প্রথমতঃ,** দরকার একখানি পৃথক কক্ষ। এই কক্ষে খাদ্যবস্তুকে টাটকা ও বিশুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। এই কক্ষের একদিকে থাকবে রন্ধনশালা ও অন্য দিকে আহারের স্থান ও আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম ও আসবাবপত্র।

দ্বিতীয়তঃ, আরশোলা, মশা-মাছি, পোকামাকড়, ইঁদুর-পিঁপড়ে প্রভৃতির উপদ্রব নিবারণ, পাচকসহ বাসনপত্র ও সাজসরঞ্জামের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ধৌতকার্য এবং পানের জন্য বিশুদ্ধ জল সরবরাহ প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। টিফিন গ্রহণের জন্য শালপাতা বা কলাপাতা ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

তৃতীয়তঃ, পরিবেশনের পর আবর্জনাদি নির্দিষ্ট স্থানে নিক্ষেপ করা, হাতমুখ ধোয়া, বিশুদ্ধ জল পান করা প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ, শিক্ষকদের আচার-আচরণের দৃষ্টান্ত নিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাস্থ্যবিধি পালনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তার জন্যে শিক্ষার্থীদের টিফিন গ্রহণের

সময় শিক্ষকদেরও পালা করে টিফিন গ্রহণ করা কর্তব্য। টিফিন ছাড়া আহার বা ভোজন সম্পর্কে স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষার জন্য বছরে অন্ততঃ দু-এর অধিকবার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমবেত ভোজের ব্যবস্থা করাও যুক্তিযুক্ত।

পঞ্চমতঃ, টিফিন ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা বিধানের প্রশ্ন অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাধিক শিক্ষকের টিফিন গ্রহণ করা উচিত। তাছাড়া খাদ্য পরিবেশনের সময় পৃথক হল-ঘরের মধ্যে লাইন দিয়ে অথবা শ্রেণী বা হাউস প্রথায় (House system) পরিবেশন করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার ওপর এসব শৃঙ্খলার মান নির্ভর করে।

ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ঃ বিদ্যালয়ে জলযোগ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থা-পনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

প্রথমতঃ, শিক্ষক-ছাত্র ও অভিভাবকদের দ্বারা সংগঠিত ও কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত বার্ষিক পরিবর্তনশীল 'টিফিন কমিটি' সকলের আস্থাভাজন বলা চলে। সুতরাং এখানে অপচয়, মুনাফার দুরাশা, পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা কম থাকবে—আশা করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, খাদ্য সামগ্রী বা অর্থ সংগ্রহ, খাদ্য তালিকা প্রস্তুতি, পরিবেশন ও গ্রহণ প্রসঙ্গে যেসব শিক্ষার্থী দায়িত্ব গ্রহণ করে তারা কতকগুলি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বাঞ্ছনীয় গুণ, প্রবৃত্তি ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পায়; যেসব গুণ ও স্বভাব সভ্য দায়িত্বশীল নাগরিক জীবনে নিতান্ত অপরিহার্য।

তৃতীয়তঃ, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার যে নীতি নির্ধারিত হয়েছে সেগুলি যথাযথ অনুশীলনের দ্বারা ব্যক্তিস্বাস্থ্য ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সচেতন হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ এই জ্ঞান অভ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে গৃহ ও সমাজ পরিবেশে প্রভাব বিস্তার করে। টিফিন পরিবেশন ও গ্রহণের সময় শৃঙ্খলা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পরম সম্পদরূপে পরিগণিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাস্থ্যশিক্ষার পরিকল্পনা ও কার্যক্রম

(Plans and programme for Health Education)

অধ্যায় পরিচয়: স্বাস্থ্যশিক্ষার পরিকল্পনা ও কার্যক্রম বিষয়টি খুব বেশী জটিল। কারণ একটির শীর্ষ (Head) এবং উপশীর্ষ (Subhead) অন্য একটি বিষয়ের (topic) সঙ্গে এত বেশী সম্পর্কযুক্ত যে, কোন শীর্ষের অধীন কতটুকু বিষয়বস্তু থাকবে এটা বিচার করা দুরূহ। যেমন, ৩নং অনুচ্ছেদের অংশ হওয়া সত্ত্বেও A বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যপ্রদ জীবনচর্চা, B স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষণ এবং C বিদ্যালয় স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করতে হয়। আবার C বিদ্যালয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হওয়া সত্ত্বেও [১] স্বাস্থ্য পরিদর্শন, [২] প্রতিরোধ ও অনুসরণমূলক বিষয়, [৩] বিদ্যালয় আরোগ্যশালা, [৪] পরিচ্ছন্নতা, [৫] বিদ্যালয় সেনিটেশন ব্যবস্থাকে পৃথক পৃথক বিষয় হিসেবে গণ্য করতে হল।

কোন জাতি যখন প্রগতি ও আত্মনির্ভরশীলতার প্রয়োজনে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তখন শিশুর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নে যথাসাধ্য বিনিয়োগ করার প্রয়োজন হয়। কারণ ব্যক্তির শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে নির্ধারিত জাতীয় লক্ষ্য সার্থক হয়ে ওঠে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরস্পরের পরিপূরক। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক এত নিবিড় যে একটির অভাবে অন্যটির কোন সার্থকতা নেই। সুস্থ শরীরে সুস্থ মনের আবির্ভাব না হলে কোন শিক্ষাই সার্থক হয় না। শিক্ষার মাধ্যমে সুস্থদেহে সুস্থ ও সক্ষম মনের প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এরূপ শিক্ষা-প্রচেষ্টার উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য কাল হল শিক্ষার্থীর শৈশব থেকে বয়ঃসন্ধিক্ষণ পর্যন্ত। কারণ এই সময়েই শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের বিকাশ ও বৃদ্ধি হয়। নীরোগ দেহ-মন শিক্ষালাভের সহায়ক, আর এ শিক্ষা জাতীয় লক্ষ্যকে সার্থক করতে পারে। তাই বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার অনুকূল পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য।

১। স্বাস্থ্য শিক্ষায় পরিকল্পনা গ্রহণের নীতি (Principles of planning in Health Education) :

স্বাস্থ্যশিক্ষার কর্মসূচী যাতে সমগ্র বিদ্যালয় জীবনের প্রতিটি স্তরের সঙ্গে সংযুক্ত হয় সেজন্যে কতকগুলি নীতির ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। সে নীতিগুলি হল :

(১) বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পাঠ্যসূচী ও সহ-পাঠ্যসূচীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যশিক্ষার পরিকল্পনা গৃহীত হবে।

(২) স্বাস্থ্যশিক্ষার কর্মসূচী বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত হবে।

(৩) স্বাস্থ্যকর্মসূচীর পরিকল্পনা গ্রহণে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় সহযোগিতা ও কার্যকর অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

(৪) বিদ্যালয়ে গৃহীত স্বাস্থ্যশিক্ষার কর্ম প্রকল্পের সঙ্গে বিদ্যালয় ও সমাজের সামগ্রিক প্রকল্পের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র থাকবে।

(৫) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর্মসূচীর পরিকল্পনা গ্রহণের সময় আঞ্চলিক অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সক্রিয় সহায়তা গ্রহণ করতে হবে।

(৬) পরিকল্পনা হবে সর্বদা গতিশীল এবং প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তনীয়।

(৭) পরিকল্পনা প্রণয়নে ও রূপায়ণে শিক্ষার্থীদেব নেতৃত্ব প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

(৮) পরিকল্পনার সার্থকতা আত্মপ্রকাশ করবে বাস্তব কর্মের ভিত্তিতে। পরিকল্পনা গ্রহণ করা সহজ কিন্তু তার বাস্তবায়ন সমস্যাপূর্ণ বিষয়। তাই এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করা কর্তব্য যার বাস্তবায়ন করা বিদ্যালয়-শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভব হয়।

২। সার্থক স্বাস্থ্যশিক্ষার কর্মসূচীর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sound Health Education Programme) :

এক সময় স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পর্কে মানুষ ভুল ধারণা পোষণ করতেন। তারা মনে করতেন গতানুগতিক শিক্ষার ন্যায় স্বাস্থ্যশিক্ষাও অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের একটি বিষয়—এই সংকীর্ণ ধারণা আজ আর যেমন সাধারণ শিক্ষা-প্রসঙ্গে অচল, তেমনি স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রসঙ্গে এর কোন মূল্য নেই। সত্যিকার স্বাস্থ্যশিক্ষার মৌলিক বিষয়টি আচরণমূলক ও জীবনধর্মী। জীবনধারার সঙ্গে

অনুশীলন ক'রে এ শিক্ষা লাভ করতে হয়। তাই স্বাস্থ্যশিক্ষা-সংক্রান্ত যে কর্মসূচীর বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করা দরকার, তা হল:

(১) স্বাস্থ্যানুশীলনের কর্মসূচীতে ব্যক্তিগত ও যৌথ আচরণের উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়। বাক্যালাপ বা তত্ত্বগত আলোচনার কোন স্থান এখানে নেই। অনুশীলনই এখানে বড় কথা।

(২) স্বাস্থ্যানুশীলনের কর্মসূচী ব্যক্তিগত এবং যৌথ আগ্রহ ও প্রয়োজন মেটাবার দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করে। আগ্রহ ও প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোন ভাবগত বিষয়ের কর্মসূচী এটা নয়।

(৩) শিক্ষানুশীলনের ধারা অবলম্বনে স্বাস্থ্যোন্নয়নের প্রচেষ্টাই এ অনুশীলনের বড় কথা। এখানে প্রত্যক্ষ চিকিৎসার দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নয়ন প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। স্বাভাবিক জীবনধারাই হল শিক্ষাধারা, আর শিক্ষাধারার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হল স্বাস্থ্যশিক্ষা। সুতরাং স্বাস্থ্যানুশীলন আর জীবনধর্মীশিক্ষা একসঙ্গে পরিচালিত হবে।

(৪) স্বাস্থ্যশিক্ষা যাতে সৃজনধর্মী ও বাঞ্ছনীয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভব হয় তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে কর্মসূচী তৈরি করা হয়। এটা কোন বাক্যালাপ বা তত্ত্বগত আলোচনার বিষয় নয়, এটা মূলতঃ অনুশীলনমূলক কর্মে অংশ গ্রহণ করা। এখানে শিক্ষার্থীর আত্মপ্রকাশের সুযোগ অব্যাহত থাকবে। এখানে স্বাস্থ্যসম্মত কর্মের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

(৫) ব্যক্তিগত ও যৌথ স্বাস্থ্যসমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত সমাচার (Information) প্রয়োগের ওপর এই কর্মসূচী গুরুত্ব আরোপ করে। শুধু সমাচার সংগ্রহ করা বা তার মৌলিক আলোচনা নয়, প্রয়োগ বা অনুশীলনই এখানে বড় কথা।

(৬) মূল কর্মসূচীকে সার্থক ও কার্যকর করার জন্য বিদ্যালয়ে প্রয়োজন হলে ছোট ছোট সমন্বিত প্রকল্প (Co-ordinated Project) গ্রহণ করা যেতে পারে। এরূপ কোন কর্মসূচী যাতে মূল কর্মসূচীর অন্তরায় না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার।

(৭) সমাজ-উন্নয়নের স্বাস্থ্য-কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিদ্যালয়-স্বাস্থ্য-কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হয়। বৃহত্তর সমাজের স্বাস্থ্য-কর্মসূচীর সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যালয়ের কোন কর্মসূচীকে সার্থকভাবে বাস্তবায়িত করা যায় না।

(৮) মনে রাখা উচিত বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকর্মসূচী ছোট ছোট ক্ষণস্থায়ী প্রকল্পের সমষ্টি নয়। মূলতঃ এটা হল চলমান, দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যসূচীর পরিকল্পনা এবং এটা বিদ্যালয়ের কর্মধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও শিক্ষাসূচীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৩। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার কর্মসূচী (School Health Education Programme) :

স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যাপকতা শিক্ষার্থীর জীবনধারার সঙ্গে সংযুক্ত বিষয়। শিক্ষার্থীর জীবন বিদ্যালয়, বিদ্যালয় পরিবেশ, বাসগৃহ ও সমাজ পরিবেশের বিস্তৃত ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত। স্বাস্থ্যশিক্ষার বিষয় ও ক্ষেত্রও তাই বহুবিস্তৃত। এই ব্যাপকতার কথা স্মরণ রেখে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ, (Preservation of Health), স্বাস্থ্য-উন্নয়ন (Promotion of Health) এবং রোগাক্রমণের প্রতিবিধান (Prevention of disease), নিরাময় ও অনুসরণমূলক ব্যবস্থা (Remedial measure and follow-up service) ইত্যাদি করার প্রয়োজন হয়। বিদ্যালয় কর্তৃক স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত এই সার্বিক আয়োজনকে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার কর্মসূচী বলা হয়।

স্বাস্থ্যশিক্ষার বিপুল কর্মসূচী প্রণয়নের সময় মৌলিক তিনটি দিকের প্রতি (aspects) লক্ষ্য নির্দেশ করা হয়, যথা—

(ক) স্বাস্থ্যপালন ও সংরক্ষণ (Preservation and Protection of Health) :

(১) বিদ্যালয় পরিবেশের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ,

(২) বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ,

(৩) স্বাস্থ্যসম্মত বিদ্যালয় কার্যক্রম,

(৪) শিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য-সচেতনতা সৃষ্টি ও আচরণ সংগঠনে সাহায্য করা।

(খ) স্বাস্থ্য উন্নয়ন (Promotion of Health) :

(১) পরিবেশগত স্বাস্থ্যোন্নতি।

(২) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বাস্থ্যোন্নতি,

(৩) তত্ত্বগত স্বাস্থ্যশিক্ষার উন্নতি।

(গ) পুনরুদ্ধার, সংশোধন, প্রতিকার, ও অনুসরণমূলক ব্যবস্থা (Restorative, Corrective, Remedial and follow-up measures) :

(১) প্রাথমিক চিকিৎসা,

(২) প্রতিবিধানমূলক শরীর-চর্চা,

(৩) চিকিৎসা ও পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা।

উল্লিখিত তিনটি উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্মবিভাজন পরস্পরের সঙ্গে অতি নিবিড়-ভাবে অন্বিত। এই তিনটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বিচিত্র কার্যাবলীকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনটি সুস্পষ্ট উপায় (means) অবলম্বন করা যেতে পারে, যেমন—

A. বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যপ্রদ জীবনচর্চা (Healthful School Living)

B. স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষণ (Health Instruction)

C. বিদ্যালয়-স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা (School Health Service)

A. বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যপ্রদ জীবনচর্চা (Healthful School Living) :

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যানুকূল জীবনচর্চার জন্য প্রথম প্রয়োজন বিদ্যালয় গৃহ ও পরিবেশগত স্বাস্থ্যপালন ও সংরক্ষণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে সেগুলি হল : (ক) **গৃহপরিবেশকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য :**

(১) শিক্ষাকর্মের অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে এমন স্বাস্থ্যকর স্থানে গৃহনির্মাণের জন্য ভূমি নির্বাচন করা প্রয়োজন।

(২) বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনা অনুসারে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করা প্রয়োজন। গৃহ-পরিকল্পনার সময় প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, বিষয়কক্ষ, গ্রন্থাগার ইত্যাদি, কক্ষগুলিতে আলোক ও বায়ু প্রবাহের প্রাচুর্য, ল্যাট্রিন ও সেনিটারী ব্যবস্থাপনা, খেলার মাঠ, জল সরবরাহ ইত্যাদি যাতে স্বাস্থ্যসম্মত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৩) বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা অনুসারে নির্মিত গৃহের কক্ষগুলি, পায়খানা, প্রস্রাবখানা, পার্শ্ববর্তী নালা ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রতি বছর দেওয়াল চুনকাম করা, জানালা-দরজায় রঙ দেওয়া, মাঝে মাঝে দুর্গন্ধ ও

রোগজীবাণুনাশক ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা এবং প্রতিদিন ও প্রতিবার ব্যবহারের পর পায়খানা ও প্রস্রাবখানা ধৌত করা একান্ত প্রয়োজন।

(৪) বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়োজনে গৃহ-সংলগ্ন জমিতে বিচিত্র ফুলের বাগিচা রচনা করা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া শ্রেণীকক্ষ, অলিন্দ ইত্যাদির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বিচিত্র ফুলের টব দিয়ে সাজানো এবং কক্ষাভ্যন্তরের দেওয়াল চিত্রিত করা (Decorate) প্রয়োজন।

(৫) শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ব্যবহার্য আসবাবপত্র, যেমন—চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ডেস্ক, টুল প্রভৃতি তৈরির সময় এগুলি যাতে স্বাস্থ্যসম্মত হয়—সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের বসা, দাঁড়ানো ও আনুষঙ্গিক ভাব-ভঙ্গিমাকে স্বাস্থ্যসম্মত করার জন্যেই আসবাবপত্রগুলিকে স্বাস্থ্যানুকূল করে তৈরি করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি না হলে আসবাবপত্র শুধু যে শিক্ষার্থীর দৈহিক স্বাস্থ্যহানি ঘটায় তা নয়,—এর দ্বারা শিক্ষাপ্রচেষ্টাতেও অন্তরায় সৃষ্টি হয়। আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম যাতে ঝাড়ামোছা করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায় তার ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত।

(৬) বিদ্যালয় গৃহপ্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য-সম্মত অভ্যাস সৃষ্টির প্রয়োজনে প্রাঙ্গণে একাধিক ডাষ্টবিন স্থাপন করা, থুথু ও সর্দি ফেলার জন্যে অলিন্দে স্পিটুন বক্স এবং শ্রেণীকক্ষে একাধিক বাজে কাগজ ফেলার চুপড়ি (Waste paper box) রাখা যুক্তিযুক্ত।

(খ) **শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসূচী**ঃ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনানুশীলনের প্রয়োজনে শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে কতকগুলি স্বাস্থ্যকার্যসূচী পালন করা যুক্তিযুক্ত। উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী হল:

(১) শিক্ষার্থীদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্যে তত্ত্বাবধান (Supervision) এবং পরিদর্শনের (Inspection) ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত। স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকবে শিক্ষকদের ওপর। তাঁরা প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, দাঁত, চোখ, মুখ, হাত, পায়ের নখ, চলাফেরা দেহভঙ্গী ইত্যাদি স্বাস্থ্যসম্মত কিনা তা তত্ত্বাবধান করবেন। প্রার্থনা সভায়, শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করার সময়, খেলা-ধূলা বা শরীর-চর্চার পূর্বে, ছুটি ঘোষণার সময় অথবা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকরা তাদের স্বাস্থ্যসূচীর দায়িত্ব পালন করতে পারেন। স্বাস্থ্য-পরিদর্শনের দায়িত্ব অর্পিত হবে

বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের ওপর সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন ঐ কর্মসূচী পালন করা বাঞ্ছনীয়।*

(২) শিক্ষার্থীর ব্যাধি ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেমন প্রয়োজন তেমনি সংক্রামক ব্যধির হাত থেকে শিক্ষার্থীকে রক্ষার জন্য ঋতু অনুসারে টিকা, ইনজেকশান দেওয়ার ব্যবস্থা করাও বিদ্যালয়ের অবশ্য কর্তব্য কর্ম।

(৩) স্বাস্থ্যপালন ও উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, মধ্যাহ্নকালীন জলযোগ বা খাদ্য গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। খাদ্য নির্বাচন, খাদ্য গ্রহণের স্বাস্থ্যসম্মত-অভ্যাস, সময়মত খাদ্য গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টির জন্য বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমবেত ভোজন কর্মসূচী পালন করাও কর্তব্য।

(গ) স্বাস্থ্যসম্মত বিদ্যালয়-কার্যক্রম : বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী অনুসারে যেসব কার্যক্রম পালন করা হয় সেখানেও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনচর্চার সূত্র নিহিত আছে। তাই বিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল :

(১) সারাদিন কাজকর্মের মধ্যে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তাই রুটিন বা সময়-তালিকা প্রয়োজনের সময় বিষয়-ঘটিত এবং সময়-ঘটিত ক্লান্তি অনুসারে কর্মসূচী প্রণয়ন করা যুক্তিযুক্ত।†

(২) শ্রেণীকক্ষে কর্মরত শিক্ষার্থীদের ওঠা-বসা; কথা বলা, প্রশ্নের উত্তর দানের ভঙ্গিমা, শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার ইত্যাদি যাতে স্বাস্থ্যসম্মত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

(৩) অভিজ্ঞ শারীর শিক্ষকের (Physical Instructor) তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের খেলাধূলা, ব্যায়াম ও শরীর চর্চার ব্যবস্থা করতে হবে। বলা বাহুল্য শারীর-শিক্ষক শুধু খেলাধূলা দ্বারা নিজ কর্তব্য শেষ করবেন না। দিনের পর দিন তাঁকে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্যপালন ও উন্নয়ন

---

* বিদ্যালয়-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচিত।

† দ্বিতীয় খণ্ডে সময়-তালিকা দ্রষ্টব্য।

পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে তিনি তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে চার্ট, গ্রাফ প্রভৃতি সংরক্ষণ করবেন এবং স্বাস্থ্য সপ্তাহ পালন ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য-সচেতনতা বৃদ্ধি ও অভ্যাস গঠনে সাহায্য করবেন।

(৪) স্বাস্থ্যসম্মত জীবনচর্চার জন্য শিক্ষার্থীদের যৌথ কর্মসূচী পালনে উৎসাহিত করা কর্তব্য। স্কাউটস, গার্ল গাইড, বিদ্যালয় ক্যাম্পিং, এ. সি. সি., এন. সি. সি., স্কুল রেডক্রশ, সমাজ-সেবা প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেমন কর্ম-অভিজ্ঞতা (Work experience) এবং যৌথ জীবন যাত্রায় (Community living) অভ্যস্ত হয় তেমনি তারা ব্যক্তিগত ও যৌথ স্বাস্থ্যচর্চায় উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

(৫) স্বাস্থ্যসম্মত জীবনচর্চার অন্যতম উপায় হল বাঞ্ছনীয় অবসর বিনোদন ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাপনা। এর দ্বারা কর্ম ও অবসরের মধ্যে যেমন ভারসাম্য রক্ষা করা যায় তেমনি দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা করাও সম্ভব হয়।

তবে বিদ্যালয়ের পাঠ্য ও সহ-পাঠ্যকর্মসূচী পালনের সময় শিক্ষার্থীর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কর্ম ও বিশ্রাম প্রভৃতির দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কারণ, এগুলিই হল স্বাস্থ্যরক্ষার ও পালনের মৌলিক ও অপরিহার্য বিষয়।

স্বাস্থ্যসম্মত জীবনচর্চায় শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য: স্বাস্থ্যশিক্ষা মূলতঃ আচরণের বিজ্ঞান, তাই এটা সম্পূর্ণ অনুশীলন সাপেক্ষ। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনানুশীলনের দ্বারা একটা স্বাস্থ্য-সচেতন পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়। সেই পরিমণ্ডলের মধ্যে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এই পরিমণ্ডল সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পিত হয় শিক্ষকদের ওপর। তাঁরা স্ব-স্ব আচার-আচরণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন। সেই স্বাস্থ্যবিধি ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। বিদ্যালয় জীবনকে স্বাস্থ্যসম্মত করার জন্যে শিক্ষকরা **যেসব দায়িত্ব পালন করবেন সেগুলি হল:**

প্রথমতঃ, প্রত্যেক শিক্ষককে স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করিতে হবে। এটা হবে তাঁদের পেশাগত যোগ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

দ্বিতীয়তঃ, 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখাবার' প্রবণতা নিয়ে শিক্ষক স্বাস্থ্যবিধি পালন ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনচর্চার জন্য শিক্ষার্থীকে পরোক্ষভাবে উদ্বুদ্ধ করবেন।

তৃতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের সামগ্রিক স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ও উন্নয়নের উপায় এবং ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য প্রধান শিক্ষককে শিক্ষা-পরিষদ, শিক্ষক ও অভিভাবক সঙ্ঘের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মাঝে মাঝে অধিবেশন ডাকতে হবে। এর ফলে **শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী সকলের সমবেত চেষ্টা বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনানুশীলনকে সার্থক করে তুলতে পারে।**

চতুর্থতঃ, স্বাস্থ্যশিক্ষার সংগঠন ও পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসন সংস্থার সক্রিয় সহযোগিতাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। যতদূর সম্ভব স্বাস্থ্যবিধি প্রণয়ন, প্রবর্তন ইত্যাদির দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের ওপর অর্পণ করতে হবে। এর দ্বারা শিক্ষকের দায়িত্ব হস্তান্তরিত হল, একথা বোঝায় না বরং শিক্ষার্থীর হাতে দায়িত্ব দেওয়ায় শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেশী বেড়ে যায়। কারণ শিক্ষার্থীদের দ্বারা কর্মসম্পাদনের দায়িত্ব তখন শিক্ষককেই বহন করতে হয়। শুধু তাই নয়, তাদের কাজকর্মের ওপর প্রখর দৃষ্টি রাখতে হয়। তা না হলে শিক্ষার্থীর দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতা বাস্তবে শিক্ষকের ব্যর্থতারূপেই পরিগণিত হয়।

প্রসঙ্গতঃ আমরা এ দেশের বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের বাস্তব অবস্থাটা বিবেচনা করতে পারি। এদেশের শতকরা সাতানব্বইটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক সহ সাধারণ শিক্ষকদের ক্ষমতা সীমিত। সুন্দর গৃহ-পরিবেশ, প্রশস্ত-কক্ষ, স্বাস্থ্যসম্মত দরজা-জানালা, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, উত্তম সেনিটারী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি আছে, এমন বিদ্যালয়ে চাকরি করার ভাগ্য অধিকাংশ শিক্ষকের ভাগ্যে আছে বলে মনে হয় না। অথচ শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে নানা আদর্শের কথা শুনে শিক্ষকরা যখন তা বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন তখন স্বভাবতঃই তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েন ও গতানুগতিকতার পথে চাকরিটা বজায় রাখেন।

তবুও মনে করা যেতে পারে যে, আত্মোৎসর্গী প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই মানুষ শিক্ষকতা কর্ম গ্রহণ করেন। উপযুক্ত পরিবেশ শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভে সাহায্য করে। সুতরাং শিক্ষকের দায়িত্ব হল বিদ্যালয়ের পরিবেশগত

অবস্থার উন্নয়ন করা। এই কাজের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষককে স্বাস্থ্যসম্পর্কিত দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন করতে হয়। এ বিষয়ে তিনটি উপায় নির্দেশ করা যেতে পারে, যথা—

(১) শিক্ষককে স্ব-স্ব বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থাটি সূক্ষ্মভাবে মূল্যায়ন (assess) করতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষক কতটুকু এবং কিভাবে বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থার উন্নতিবিধান করতে পারেন তা প্রথমেই তাঁকে স্থির করে নিতে হবে। পরে এই মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে তিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন।

(২) বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন তা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যথাযথ অবহিত করতে হবে। কারণ, ক্ষমতাবলে কর্তৃপক্ষই শিক্ষককে সাহায্য করবেন।

(৩) বিদ্যালয়ের পরিবেশগত স্বাস্থ্যোন্নয়নে শিক্ষক কর্তৃপক্ষের সাহায্য না নিয়ে নিজে যেটুকু দায়িত্ব পালন করতে পারেন তা তাঁকে করতে হবে। একজন সাধারণ শিক্ষক নিজে যে সম্ভাব্য **দায়িত্বগুলি পালন করতে পারেন সেগুলি হল ঃ**

(i) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা যাতে পড়াশুনার জন্য পরিমিত আলোক ও পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ু-প্রাপ্তির সুযোগ পায় সেভাবে শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা করা যে-কোন শিক্ষকের সাধ্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

(ii) ঠাণ্ডা, গরম, ঝড়ো হাওয়া, রৌদ্র ইত্যাদি থেকে শিক্ষার্থীকে সংরক্ষণ করা এবং অধিক আরামে লেখাপড়ার সুবিধার জন্য শিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা করতে পারেন তেমনি প্রয়োজন অনুসারে দরজা-জানালা বন্ধ, অর্ধ-উন্মুক্ত বা উন্মুক্ত রাখারও ব্যবস্থা করতে পারেন।

(iii) এক একটা শ্রেণীতে খর্বাকৃতি, সাধারণ ও দীর্ঘাকৃতির শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করে। আকৃতির পার্থক্য থাকে বলেই তাদের বেঞ্চ বা ডেস্কগুলিকে ছোট বড় আকারের তৈরি করা হয়। শিক্ষার্থী এবং বেঞ্চ বা ডেস্কের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে বসার ব্যবস্থা করা শিক্ষকেরই দায়িত্ব। সামনে থেকে ক্রমশঃ পিছন দিকে খর্বাকৃতি থেকে দীর্ঘাকৃতির শিক্ষার্থীদের বসবার ব্যবস্থা করাই যুক্তিযুক্ত।

(iv) বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও সমষ্টিগত স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান (Supervision), পরিচালন (Guidance), তথ্য-সংরক্ষণ (main-

tenance of Health records) শিক্ষকের সাধ্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, শিক্ষার্থীর পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা, নখ কাটা, দাঁত মাজা, চুল আঁচড়ানো ; আহার গ্রহণ, মলমূত্র ত্যাগ ও আনুষঙ্গিক স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গঠনের জন্য শিক্ষককে নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না।

'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়'—শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী, পরিচালক সমিতি ইত্যাদি সকলের আন্তরিকতা, ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রচেষ্টা বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যসম্মত জীবনানুশীলনকে সার্থক করে তুলতে পারে।

B. **স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষণ** (Health Instruction) : স্বাস্থ্যশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরামর্শদান (Counselling) স্বাস্থ্যশিক্ষার কর্মসূচীর (Programme for Health Education) অন্তর্ভুক্ত। যদিও স্বাস্থ্যশিক্ষা মূলতঃ আচরণগত অনুশীলনের বিষয় তবুও এ সম্পর্কে কতকগুলি তত্ত্বগত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শরীরের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির কার্যাবলী, ব্যাধির লক্ষণ, রোগাক্রমণের কারণ ও প্রতিকার ইত্যাদি সাধারণ কতকগুলি স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে তত্ত্বগত জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

একসময় বিদ্যালয়ে পৃথক 'হাইজিন' পাঠের ব্যবস্থা ছিল। একজন শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে 'হাইজিন' সম্পর্কে পাঠদান করে নিজ কর্তব্য শেষ করতেন। তখন 'হাইজিনের' বিষয়বস্তু ছিল ভীতি সঞ্চারক। ব্যাধির বিভীষিকাময় বর্ণনা দ্বারা শিক্ষার্থীর মনে ভীতির সঞ্চার করা হত। শিক্ষার্থীরা ভয়ে ভয়ে স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে বাধ্য হত। তাই তখনকার এই শিক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনবোধের সঙ্গে কোন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারত না। মনে রাখা উচিত, নেতিবাচক শিক্ষার (Negative Education) পরিবর্তে অস্তিবাচক শিক্ষা (Positive Education) ; নীতিগর্ভ শিক্ষণের (Didactic teaching) পরিবর্তে পরোক্ষ শিক্ষণ (Casual teaching) ; উপদেশের পরিবর্তে স্বীয় জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষাদানই হল স্বাস্থ্য তত্ত্ব শিক্ষার কার্যকর পদ্ধতি। স্বাস্থ্যশিক্ষণের ধারা শ্রেণীকক্ষে, খেলার মাঠে, বিদ্যালয় বা সমাজের উৎসব অনুষ্ঠানে, গৃহপরিবেশ ও সমাজস্তরে—সর্বত্র শিক্ষার্থীর জীবনচর্চার সঙ্গে পালিত হবে। শ্রেণীকক্ষে তত্ত্বগত পাঠদানের দুটি প্রণালী

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হল অনুবন্ধ প্রণালী (Correlation technique)। যে-কোন বিষয় পঠন-পাঠনের সময় স্বাস্থ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধারণ বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে এই প্রণালী প্রয়োগ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। দ্বিতীয় প্রণালী হল সময়সাপেক্ষতা বা সময়োপযোগিতা। ঋতুভেদে যেসব ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে সেই সেই ঋতুতে ঐ সব রোগের বিবরণ পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত।

আজও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পাঠের সুব্যবস্থা আছে। ভারতের কোন কোন রাজ্যে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরেও এই ধরনের পৃথক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রকৃত হাইজিন বিষয়টির সঙ্গে বিদ্যালয়পাঠ্য অন্যান্য বহু বিষয়ের যথেষ্ট সামঞ্জস্য ও আছে। মুদালিয়র কমিশন প্রদত্ত সিলেবাসটিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সাধারণ বিজ্ঞান (General Science), শরীরতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Physiology and Hygiene—Science group), গার্হস্থ্যবিজ্ঞান (Home Science) ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষার বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষণপ্রসঙ্গে যৌন-শিক্ষায় (Sex Education) ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন। যৌন-শিক্ষা সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও এটা সত্যি যে, বিদ্যালয় ও সামাজিক পরিবেশে যৌন-জিজ্ঞাসা ও উত্তেজনাপূর্ণ বহু উপকরণ ছড়িয়ে আছে। আজকাল অশ্লীল চিত্র প্রদর্শনী ও পুস্তকাদিরও অভাব নেই। ফলে, ছাত্র বয়সেই শিক্ষার্থীরা নানা মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। বর্তমান যুগে নৈতিক চাপ কোন ক্ষেত্রেই কার্যকর নয়। তাই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিচারে বিদ্যালয়ে অন্ততঃ উচ্চতর শ্রেণীগুলিতে যৌন-শিক্ষার ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাদ্বারা যদি শিক্ষার্থীকে সামাজিক মানুষ করে গড়ে তোলার দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করা হয় তাহলে সামাজ-জীবনের অপরিহার্য ও স্বাভাবিক অঙ্গ হল যৌন-শিক্ষাদান। অতএব যৌন-শিক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মসূচীর অপরিহার্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা উচিত।

যৌনশিক্ষা

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে নিরাপত্তা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ প্রসঙ্গে বিপদ

এড়ানোর কৌশল শিক্ষার গুরুত্ব এত বেশী। আজকাল গৃহে, বিদ্যালয়ে, পরীক্ষাগারে, মাঠে-ময়দানে, উৎসব-অনুষ্ঠানে, অবসর যাপনে—সর্বত্রই বিপদ। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের কর্মক্ষেত্রে এরূপ বিপদের সংখ্যা আরও বেশী। তাই নিরাপত্তা শিক্ষা করার অপরিহার্যতা সম্পর্কে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। বাস্তায় কলার খোসা ফেলে রাখা, বর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল রাস্তায় দ্রুত সাইকেল চালানো, স্টেশনে প্লাটফর্ম বদল, চলন্ত গাড়ীর বাইরে হাত-পা বাড়ানো, যেখানে সেখানে স্নান, আহার, চা-পান, জলপান করা, ইলেকট্রিক-এর তারে হাত দেওয়া, পানাহারের সময় উচ্চহাস্য করা, ঠাণ্ডার মধ্যে হঠাৎ বেরিয়ে পড়া প্রভৃতি থেকে যখন তখন বিপদে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে নিরাপত্তা শিক্ষার ব্যবস্থাও অপরিহার্য। রুগ্ন, ক্লান্ত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লে, কিংবা অতিরিক্ত উত্তেজিত হলে কিভাবে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত সে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করা যায় না। নিরাপত্তা শিক্ষাপ্রসঙ্গে নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, তথ্য চত্র প্রদর্শন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

নিরাপত্তার শিক্ষা

তবে নিয়মমাফিক (Formal) স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষণের জন্য নিম্নরূপ কর্মসূচীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত :

(ক) শ্রেণীকক্ষে তত্ত্বগত পাঠদান।

(খ) স্বাস্থ্য সম্পর্কে বক্তৃতা, আলোচনাচক্র, সেমিনার, পত্রিকা প্রকাশন ইত্যাদি।

(গ) বছরে অন্ততঃ দুবার স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, মাঝে মাঝে নিরাপত্তা সপ্তাহ, স্বাস্থ্য সপ্তাহ পালনের ব্যবস্থা।

(ঘ) স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ।

(ঙ) গ্রন্থাগারে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানা ধরনের চিত্রগ্রন্থ সহায়ক পুস্তক, রেফারেন্স বুক, চার্ট ইত্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা।

(চ) মাঝে মাঝে সাধারণ স্বাস্থ্য-পালন, যৌন-শিক্ষা, নিরাপত্তা শিক্ষার উপযোগী তথ্যনির্ভর ছায়া-ছবি (Documentary Films) প্রদর্শনের ব্যবস্থা।

(ছ) আকাশবাণীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কর্মসূচী শোনাবার ব্যবস্থা।

উল্লিখিত কর্মসূচী ছাড়াও আঞ্চলিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজন অনুসারে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষার অনুকূল ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একান্ত কর্তব্য।

C. **বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যব্যবস্থা** (School Health Service): আধুনিক ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা ব্রিটিশ ভারতেই জন্ম গ্রহণ করে। তাই বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার পূর্ব ইতিহাস ইংল্যাণ্ডের শিক্ষার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধের সময় (১৮৯৯ খ্রী:) প্রথম ইংল্যাণ্ডের যুবস্বাস্থ্য সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষিত হয়। তখন অধিক সংখ্যক যুবককে ক্রটিযুক্ত স্বাস্থ্যের কারণে সৈনিক দলে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য ইংল্যাণ্ডে ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে রয়াল কমিশন নিয়োগ করা হয়। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে যুব-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব অর্পিত হয় বিদ্যালয়ের ওপর। L. E. A. পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরিদর্শনকে অত্যাবশ্যক বলে প্রথম ১৯০৭ সালে আইন তৈরি হল। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দ হতে বিদ্যালয়-আরোগ্যশালা (School clinic) স্থাপনের নীতি ও পরিকল্পনা গৃহীত হল। এর পর ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে শিক্ষা-আইন অনুসারে ইংল্যাণ্ডে বিদ্যালয়-চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে।

পূর্ব ইতিহাস

স্বাধীন ভারতে প্রথমদিকে জাতীয় স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি বললেও চলে। মুদালিয়র কমিশনের মতে দেশের যুবস্বাস্থ্যের উৎকর্ষ বিধান করা হল রাজ্য সরকারের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। অন্যথায় ব্যক্তির স্বাভাবিক সুস্থতার মানদণ্ড থেকে বিচ্যুতির অর্থ হল দেহে রোগজীবাণু অনুপ্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা। গত দুই মহাযুদ্ধের আমলে পৃথিবীর বহু দেশে ক্রটিপূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য সামরিক বিভাগে প্রয়োজনীয় যুবশক্তি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ভারতে স্বেচ্ছায় সামরিক ব্রত গ্রহণকারী যুবকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখা গেল তাদের অধিকাংশই শারীরিক দিক থেকে অযোগ্য। কমিশনের মতে, বলাই বাহুল্য যে, যে বয়সে সামরিক বিভাগে যুবকদের ভর্তি করা হয় সেই বয়সের প্রতিটি যুবককে যদি পরীক্ষা করা যায় তাহলে দেখা যাবে ভারতে অযোগ্য যুবকদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী।

মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ

সুতরাং এদেশে স্বাস্থ্যশিক্ষা মোটেই অবহেলিত হতে পারে না। তাই কমিশনের মতে ভারতের সব রাজ্যেই সুসংগঠিত বিদ্যালয়-চিকিৎসাব্যবস্থা (School Medical Service) প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ে সমস্ত শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য-পরীক্ষা, প্রয়োজনমত চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং অনুসরণকারী স্বাস্থ্য-রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয়তঃ, কিছু কিছু শিক্ষককে রোগ প্রতিরোধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে শিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন, যেন তাঁরা স্বাস্থ্য-চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে পারেন।

চতুর্থতঃ, হোস্টেল এবং আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পঞ্চমতঃ, বিদ্যালয়ের পারিবেশিক স্বাস্থ্য যাতে অক্ষুন্ন থাকে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণ ও কায়িক শ্রমে অভ্যস্থ করে তোলা অত্যাবশ্যক।

ষষ্ঠতঃ, বিদ্যালয়ে নিয়মিত শারীর শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। খেলাধূলা ও শরীর চর্চার মাধ্যমে যেমন স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় তেমনি আবার রোগপ্রতিরোধমূলক শক্তিও অর্জন করা যায়।

বিদ্যালয়-স্বাস্থ্যব্যবস্থা (School Health Service) বলতে মূলতঃ পরীক্ষা (Health appraisal), স্বাস্থ্যরক্ষণ (Health Protection) এবং স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের (Health Correction) উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সমবেত প্রচেষ্টা বুঝায়। এ প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন চিকিৎসক, দন্তচিকিৎসক, রেডক্রশ, মানসিক রোগ চিকিৎসক, ক্রীড়াবিভাগ, টিফিন বিভাগ প্রভৃতি। শিক্ষার্থীকে শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক দিক থেকে সুস্থ, কর্মঠ ও যোগ্য ব্যক্তিরূপে গড়ে তোলার সার্বিক প্রচেষ্টা বিদ্যালয়-স্বাস্থ্যব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। তাই প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়-স্বাস্থ্যব্যবস্থা (School Health Service) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনচর্চার (Healthful School living) অঙ্গীভূত বিষয়। তবে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার অংশে—(ক) শিক্ষার্থীসহ বিদ্যালয়ের সামগ্রিক স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ও পরিদর্শন (Health inspection and appraisal), (খ) প্রতিকার ও অনুসরণমূলক ব্যবস্থা (Correction and follow up

measures), (গ) জরুরী ব্যবস্থাপনা (Emergency care) এবং (ঘ) সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ (Control of Communicable disease) ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাই বিদ্যালয়-স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বিদ্যালয়-স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থাও বলা যেতে পারে।

বিদ্যালয়-স্বাস্থ্যব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীগুলি হল :

[১] **স্বাস্থ্যপরিদর্শন** (Health Inspection) : বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় স্বাস্থ্য-পরিদর্শন প্রক্রিয়ার দুটি ধারা বিদ্যমান, যথা—(ক) শিক্ষক কর্তৃক প্রাত্যহিক স্বাস্থ্য-পরিদর্শন এবং (খ) চিকিৎসক কর্তৃক স্বাস্থ্য-পরিদর্শন।

(ক) বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দৈনিক শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণ, ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ, লিখন-পঠনের সামগ্রী, দাঁত, কান, চোখ, হাত-পায়ের নখ ইত্যাদি স্বাস্থ্যসম্মত কি না তা পরীক্ষা করবেন। সাধারণভাবে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির ত্রুটি, অপুষ্টিকর খাদ্যজনিত ত্রুটি, দাঁত ও মাড়ির রোগ, খোস-পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতি চর্মরোগের লক্ষণ সহজে ধরতে পারেন এবং যাতে এসব রোগ বিস্তার লাভ না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে পারেন। অনেক ব্যাধি আছে যেগুলি প্রথম অবস্থায় খুব বেশী সংক্রমণশীল, যেমন—হাম, ডিপথিরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, মাম্পস, বসন্ত, হুপিং কাশি প্রভৃতি। রোগের লক্ষণ অনুসারেই এসব রোগ সহজে ধরা পড়ে। শিক্ষক ব্যাধির লক্ষণ ধরার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন।

শারীরিক ব্যাধি ছাড়াও শিক্ষকরা শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করার প্রাত্যহিক কর্মসূচী পালন করতে পারেন। শিক্ষার্থীর হীনমন্যতা, উৎকণ্ঠা, ভয়, নিরানন্দ ভাব, হিংসা-দ্বেষ, উগ্রতা ও মানসিক উত্তেজনা ইত্যাদি মানসিক অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। এগুলি তাদের স্বাভাবিক শিক্ষালাভের অন্তরায়। শিক্ষার্থী যাতে এরূপ মানসিক ও প্রাক্ষোভিক অসুস্থতায় না ভোগে সেদিকে লক্ষ্য রাখা ও তার প্রতিকারের সুব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত।

(খ) স্বাস্থ্য-পরিদর্শনের দ্বিতীয় ধারাটি হল চিকিৎসা ঘটিত বিষয়। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন বিদ্যালয়ের চিকিৎসক দ্বারা শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার কর্মসূচী পালন করা প্রয়োজন। যেসব বিদ্যালয়ে চিকিৎসা কেন্দ্র থাকে

সেখানে এই কর্মসূচী পালন করা সহজসাধ্য। অন্যথায় বাইরের কোন চিকিৎসকের সঙ্গে চুক্তি করে এই পরিদর্শন কর্মসূচীপালন করা যায়। তাই এ সম্পর্কে জনস্বাস্থ্য বিভাগ এবং চিকিৎসা বিভাগের ন্যায় স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সংস্থাগুলির সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগসূত্র স্থাপন করা প্রয়োজন।

চিকিৎসক কর্তৃক পালিত কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল :

(১) বিদ্যালয় গৃহ, সেনিটারী ব্যবস্থা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত কি না তা পরীক্ষা করা ও কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া।

(২) বিদ্যালয়ের পানীয় জল, টিফিন বা জলখাবার ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপনা স্বাস্থ্যসম্মত কি না তা পরীক্ষা করা ও পরামর্শ দেওয়া।

(৩) বিদ্যালয়ের সময়-তালিকা ও পঠন-পাঠন কর্ম পরিচালনা স্বাস্থ্যসম্মত কি না তা পরীক্ষা করা ও পরামর্শ দেওয়া।

(৪) শিক্ষক কর্তৃক স্বাস্থ্যকর্মসূচী পালনের সুবিধার্থে স্বাস্থ্যবিষয়ে অনভিজ্ঞ শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া।

(৫) শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা, দেহের ওজন, উচ্চতা, বুকের মাপ, দেহের পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ পরীক্ষা করা ও সে সম্পর্কে রেকর্ড সংরক্ষণ করা।

(৬) কোন ব্যাধির লক্ষণ ধরা পড়লে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অথবা চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য প্রধান শিক্ষককে পরামর্শ দেওয়া।

পরিদর্শক চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে প্রধান শিক্ষক রোগের প্রতিকার, প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যপুনরুদ্ধারের নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। **প্রথমতঃ,** প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাতাপিতা বা অভিভাবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। **দ্বিতীয়তঃ,** তিনি বিদ্যালয়-চিকিৎসা কেন্দ্রের দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন। **তৃতীয়তঃ,** বিদ্যালয়ে নিজস্ব চিকিৎসা কেন্দ্র না থাকলে প্রধান শিক্ষক আঞ্চলিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মেডিক্যাল কলেজ বা এরূপ কোন সংস্থায় রুগ্ন শিক্ষার্থীকে পাঠাতে পারেন। এবিষয়ে শিক্ষক-অভিভাবক সঙ্ঘের সহযোগিতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আবার চিকিৎসার সুব্যবস্থার অভাবে স্বাস্থ্যসম্মত অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। পরিদর্শক চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে **প্রথমতঃ,** রুগ্ন শিক্ষার্থীকে পৃথক আসনে বসানোর ব্যবস্থা করা যায়। **দ্বিতীয়তঃ,**

ব্যাধির সংক্রমণশীলতা ও জটিলতার বিচারে শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে আসতে নিষেধ করা যায়। **তৃতীয়তঃ**, রুগ্ন শিক্ষার্থী ছাড়া অন্যদের প্রতিষেধক টীকা বা ইনজেকশান দেওয়ানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। **চতুর্থতঃ**, বিদ্যালয় কক্ষ ও আসবাবপত্রাদি প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারা ধৌত করানোর ব্যবস্থাও বিশেষ যুক্তিযুক্ত। **পঞ্চমতঃ**, বিদ্যালয় ও তার আঞ্চলিক সমাজে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ দেখা দিলে সাময়িকভাবে বিদ্যালয় বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করাও যেতে পারে।

[২] **প্রতিরোধ এবং অনুসরণমূলক কর্মসূচী** (Remedial and follow-up measures)ঃ ব্যাধির প্রতিরোধমূলক কর্মসূচীর মধ্যে **প্রথমতঃ**, প্রাথমিক চিকিৎসার (first aid) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। স্কুল ক্লিনিক থাকলে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। **দ্বিতীয়তঃ**, আমাদের দেশে প্রচলিত যোগব্যায়াম ব্যাধি নিরাময়ের কাজ করে। বিদ্যালয়ে এরূপ যোগব্যায়াম অনুশীলনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আবার গৃহে অনুশীলনের জন্য ব্যায়াম শিক্ষক যথাযথ নির্দেশ দান করতে (Direction) বা শিক্ষণ (Training) দিতে পারেন। **তৃতীয়তঃ**, রোগজীবাণু যাতে ছড়িয়ে না পড়তে পারে তার জন্য বিদ্যালয় পরিবেশ, আসবাবপত্র, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ব্যবহৃত সামগ্রী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও সেনিটারী ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রতিরোধ

অনুসরণ কর্মসূচীতে **সর্ব প্রথম প্রয়োজন** প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য স্বাস্থ্যলিপি (Health record card) ও স্বাস্থ্যপালনের গ্রাফ সংরক্ষণ করা। এসব রেকর্ড থেকে স্বাস্থ্যের অবনতি, উন্নতি অথবা রোগের গতি নির্ণয় করা সহজ হবে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের সঙ্গে মাতা-পিতা বা অভিভাবক এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্যসংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যেতে পারে। এর ফলে রোগ সম্পর্কে পরামর্শদান ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা সহজ সাধ্য হয়। **চতুর্থতঃ**, শারীরিক-মানসিক ত্রুটিযুক্ত শিক্ষার্থীর খেলাধুলা, অবসর বিনোদন, আহার-নিদ্রা-বিশ্রাম প্রভৃতি সম্পর্কে সুব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

অনুসরণ

৪। বিদ্যালয় আরোগ্যশালা (School Clinics) :

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই দেশের ভবিষ্যত নাগরিক। শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা আগামী দিনের নাগরিককে সুস্থ ও সবল করে তুলবে। সুস্থ মন ও কর্মক্ষম দেহের ওপর নির্ভর করছে—ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন। সুতরাং বিদ্যালয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীদের যথোপযুক্ত স্বাস্থ্যশিক্ষা ও স্বাস্থ্যচর্চার ব্যবস্থা করা জনগণ, রাষ্ট্র এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অপরিহার্য কর্তব্য। এ কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ আমাদের দেশে বিরল, কিন্তু পৃথিবীর শিক্ষায় উন্নত দেশগুলি বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার, স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও রোগ প্রতিরোধের জন্য গড়ে তুলেছে বিদ্যালয় আরোগ্যশালা (School Clinic)।

আমাদের দেশে স্কুল ক্লিনিক দরকার

শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিচারে বিদ্যালয়-আরোগ্যশালাকে দুটি শীর্ষে ভাগ করা যায়—যথা, (১) হেল্‌থ ক্লিনিক ও (২) গাইড্যান্‌স্ ক্লিনিক। প্রথমটি শারীরিক চিকিৎসা এবং দ্বিতীয়টি মানসিক চিকিৎসার সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অতি নিবিড়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের ওপর বিশেষ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

ক্লিনিক দু প্রকারের

(১) হেল্‌থ ক্লিনিক (Health Clinic) :

School Health Clinic-কে ধরা যেতে পারে শিশু হাসপাতাল। কলকাতার মতো বড় বড় শহরে এরূপ একাধিক হাসপাতাল থাকতে পারে। কিন্তু এগুলিকে School Health Clinic মনে করলে ভুল করা হবে। School Health Clinic হল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল। প্রতিটি বিদ্যালয়ে এরূপ হাসপাতাল থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের সমাজভিত্তিক অর্থনীতির (Socio-Economic) বিচারে আজও এরূপ সম্ভাবনার কথা কল্পনা করা যায় না। তবে সরকার ও জনগণের সমবেত ও সক্রিয় প্রচেষ্টায়—আঞ্চলিক অনেকগুলি বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে একটি করে School Health Clinic প্রতিষ্ঠা করা যায়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান ও সরকারের যুক্ত প্রচেষ্টা ও আর্থিক অবদানে এরূপ প্রতিষ্ঠান সহজে গড়ে উঠতে পারে। সাধারণ হাসপাতালের ন্যায় বিদ্যালয় হেল্‌থ ক্লিনিকে বহির্বিভাগ (Outdoor)

সংগঠন

এবং অভ্যন্তরীণ বিভাগ (Indoor) থাকবে। অভ্যন্তরীণ বিভাগে থাকবে কয়েকটি শয্যা। তাহলে রুগ্ন শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা এখানে থেকে রোগমুক্তির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। বলা বাহুল্য, বহির্বিভাগে হবে ক্ষণস্থায়ী রোগ থেকে মুক্তির জন্য রোগী পরিদর্শন ও চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা।

স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদ্যালয় ক্লিনিকের জন্য নিম্নরূপ কক্ষ ও ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন : (i) **বহির্বিভাগ** (Outdoor) : বহির্বিভাগে ঔষধ ও সাজসরঞ্জাম রক্ষণের কক্ষ, রোগী দেখার কক্ষ, ঔষধ তৈরি ও বিতরণের কাউণ্টার এবং শিক্ষার্থীদের অপেক্ষা করার স্থান বহির্বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হবে। (ii) **অভ্যন্তরীণ বিভাগ** (Indoor) : এখানে কয়েকটি শয্যা, ঔষধ ও সাজসরঞ্জাম সংরক্ষণের কক্ষ, পায়খানা, বাথরুম, রন্ধনশালা ইত্যাদি। এছাড়া, (iii) সংক্রামক রোগীদের জন্য বিশেষ প্রতীক্ষালয়, (iv) চক্ষু পরীক্ষার সাজসরঞ্জাম সহ বিশেষ ঘর, (v) এক্সরে সরঞ্জাম সহ বিশেষ ঘর এবং অস্ত্রোপচার ও রোগীদের বিশ্রামের জন্য বিশেষ বিশেষ কক্ষ।

ক্লিনিক কক্ষ ও ব্যবস্থাপনা

স্কুল হেল্‌থ ক্লিনিকে ঠিক কতজন কর্মী থাকবেন সেটা নির্ভর করে কাজের পরিধির ওপর। আর এই পরিধির সৃষ্টি হয় বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যার ওপর। মনে করা যেতে পারে একটা অঞ্চলে দশ-বারটি বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা প্রায় 8000। এরূপ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত School Health Clinic-এ থাকবেন অন্ততঃ (১) দুজন শল্যচিকিৎসায় অভ্যস্ত অভিজ্ঞ ডাক্তার। এরা পারস্পরিক সহযোগিতায় বহির্বিভাগ ও অভ্যন্তরীণ বিভাগ পরিচালনা করবেন। (২) দুজন কমপাউণ্ডার উক্ত দুজন চিকিৎসকে সাহায্য করবেন। (৩) একজন বাড়তি কমপাউণ্ডার হিসাব-নিকাশ ও রেকর্ডরক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হবেন। (৪) অভ্যন্তরীণ বিভাগের জন্য অন্ততঃ একজন নার্স একান্ত প্রয়োজন। (৫) এরূপ চিকিৎসা কেন্দ্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য অন্ততঃ দুজন সুইপার আবশ্যক। (৬) সর্বোপরি থাকবেন একজন স্কুল মেডিকেল অফিসার (School Medical Officer)। তিনি বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-পরিদর্শন, একজন কেরানির সহযোগিতায় রেকর্ড সংরক্ষণ এবং চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা করবেন। বলা বাহুল্য তাঁকে সাহায্য করবেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক প্রভৃতি।

কর্মীবৃন্দ

বিদ্যালয়-স্বাস্থ্য ক্লিনিকের কার্যাবলীকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—(১) বিদ্যালয় পরিবেশ ও শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ, (২) প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার ও ঔষধ সরবরাহ; (৩) রক্ত, মল-মূত্র, কফ-থুথু প্রভৃতির ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা ও ব্যবস্থা অবলম্বন, (৪) অনুসরণীয় ব্যবস্থা (follow-up-service); এবং (৬) রাষ্ট্রীয় বড় বড় হাসপাতালের সঙ্গে চিকিৎসা সম্পর্কিত যোগাযোগ।

ক্লিনিকের কর্মবিভাগ

(২) **গাইড্যান্স ক্লিনিক** (Guidance Clinic): শিক্ষার্থীদের শারীরিক অসুস্থতা বা ব্যাধি দূরীকরণের জন্যে বিদ্যালয়-চিকিৎসার (Health Clinic) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষের দেহের সঙ্গে তার মানসিক চেতনার সংযোগ ঘটে বলেই সে মানুষ। তাই দৈহিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টিও আমাদের চিন্তা করতে হবে। শিক্ষার্থী দৈহিক দিক থেকে রোগমুক্ত হয়েও মানসিক দিক থেকে রোগাক্রান্ত হতে পারে। তাই আমরা অনেক শিক্ষার্থীকে অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছনীয় আচরণ করতে দেখি। হিংসা-দ্বেষ, ভীরুতা, উগ্রতা, মিথ্যাভাষণ, নেতিবাচক মনোভাব (negativism), ক্লাশ পালানো (Truancy), নানা ধরনের যৌন অপরাধ (Sex offence), প্রচণ্ড ক্রোধ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মানসিকতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এগুলি স্বাভাবিক শিক্ষালাভের বিশেষ অন্তরায়। এরূপ মানসিকতা থেকে দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধি আসতে পারে। তাই এরূপ মানসিক চিকিৎসার জন্য বিদ্যালয়ে শিশু-পরিচালনাগারের (Child Guidance Clinic) পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

শিশু-পরিচালনাগারের জন্য পৃথক গৃহ নির্মাণের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। বিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রে (School Health Clinic) একদিকে দৈহিক চিকিৎসা এবং অন্যদিকে মানসিক চিকিৎসার বিভাগ খোলা যেতে পারে।

সুষ্ঠু মানসিক চিকিৎসার জন্যে কমপক্ষে তিন শ্রেণীর কর্মী প্রয়োজন হয়—যথা, (১) মনোবিজ্ঞানী (Psychologist), (২) মনোচিকিৎসক (Psychiatrist), (৩) নার্স (Nurse) ও কমপাউণ্ডার-কাম-ক্লার্ক (Com-Pounder-cum-clerk)।

মনোবিজ্ঞানী হবেন মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ। শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা পরীক্ষার জন্য তিনি যেমন পরিচালনাগারে অবস্থান করবেন, তেমনি পরিবেশগত প্রভাব বিচার করার জন্য তাঁকে শিক্ষার্থীর গৃহ-পরিবেশেরও পরীক্ষা করতে হবে। তাই তাঁকে একাধারে মনোবিজ্ঞানী ও সমাজকর্মী হতে হবে।

মনোচিকিৎসককে সাধারণ চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে মনোচিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ হতে হবে। তাহলে তিনি মানসিক অসুস্থতায় দৈহিক ভিত্তি আছে কি না তা সহজে অনুধাবন করতে পারবেন। তবুও এসম্পর্কে সাধারণ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। হেল্‌থ ক্লিনিকের সাধারণ চিকিৎসক এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। পরিচালনাগারের জন্য পৃথক সাধারণ চিকিৎসকের (Physician) প্রয়োজন হয় না।

মনোবিজ্ঞানী ও মনোচিকিৎসক উভয়কে সাহায্য করার জন্যে নার্স ও কম্পাউণ্ডার-কাম-ক্লার্ক স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

সুস্থ সমাজব্যবস্থার জন্যে সুসমঞ্জস, কর্মক্ষম মানসিকতার অধিকারী স্বাস্থ্যবান, নিরোগদেহী, কর্মঠ মানুষের প্রয়োজন। শরীর ও মন উভয় দিক থেকে সুস্থ মানুষ পেতে হলে বিদ্যালয়ে আরোগ্যশালা (School Clinic) স্থাপন করা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় সরকারের অবশ্য কর্তব্য। বিদ্যালয়-জীবনেই শিক্ষার্থীদের দেহ ও মনের বিকাশ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই সময় তাদের দেহ ও মনকে ব্যাধিমুক্ত করতে পারলে সমাজ ও রাষ্ট্র সুস্থ নাগরিক পাবে; সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন সুস্থ হয়ে উঠবে।

৫। পরিচ্ছন্নতা (Cleanliness):

পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যশিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস স্বাস্থ্যানুশীলনের সহায়ক। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা একদিকে যেমন শারীরিক স্বাস্থ্যহানিকর ও রোগাক্রমণের সহায়ক তেমনি মানসিক স্বাস্থ্যবিধানের পরিপন্থী। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, পোশাক-পরিচ্ছদ, দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা মনের প্রফুল্লতা হ্রাস করে ও অশুচির ভাব জাগিয়ে তোলে এবং শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির আক্রমণের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস স্বাস্থ্যশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে স্বাস্থ্যের নিবিড় সম্পর্কের কথা সর্বজনবিদিত।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস গঠনের উপযুক্ত সময় হল বাল্যকাল। এই সময় শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের বিকাশ ও বৃদ্ধি (Development and growth) আপন গতিপথে পরিচালিত হয়। এই বয়সে দেহ ও মনটি থাকে নমনীয়, পরিবর্তনশীল ও সংস্কারমুক্ত। তাই যা কিছু অনুশীলন করা হবে তা দেহ ও মনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করবে। ক্রমশঃ শিক্ষার্থীর আচার-আচরণে সেগুলি প্রতিফলিত হবে এবং জীবনধারার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাসসৃষ্টির অপূর্ব সময় এই বাল্যকাল।

বিদ্যালয়, গৃহ, আঞ্চলিক সমাজ প্রভৃতির ওপর শিক্ষার্থীর জীবনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসসৃষ্টির দায়িত্ব অর্পিত। বিদ্যালয়-শিক্ষার্থী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় আঠারো ঘণ্টা অতিবাহিত করে গৃহ ও আঞ্চলিক পরিবেশে ; আর মাত্র ছয় ঘণ্টা অতিবাহিত করে বিদ্যালয়ে। অধিক্ষণ অতিবাহিত করলেও গৃহ ও আঞ্চলিক পরিবেশ আশানুরূপ উন্নত নয়। এখনও অশিক্ষাজনিত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। তাই গৃহ-পরিবেশে সংগঠিত অভ্যাস আশানুরূপ নয়। পক্ষান্তরে বিদ্যালয় হল আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভের প্রতিষ্ঠান। এখানে যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস সৃষ্টির ব্যবস্থা করা যায় তাহলে সকল স্তরের শিক্ষার্থীই উপকৃত হবে। উন্নত পরিবারের শিক্ষার্থীরা আরো বেশী স্বাস্থ্যসম্মত জীবনচর্চায় অভ্যস্ত হবে। তাদের দৃষ্টান্ত নিয়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্যসম্মত জীবনানুশীলনে অনেক বেশী উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হবে। তাহলে বিদ্যালয় হল পরিচ্ছন্নতা শিক্ষার উপযুক্ত স্থান। এ দায়িত্বের সম্পূর্ণ অংশটুকুই বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বহন করতে হবে। তাহলে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীরা পরিচ্ছন্ন থাকতে অভ্যস্ত হবে তেমনি তাদের পরিচ্ছন্ন জীবনচর্চার প্রভাব গৃহ ও সমাজে প্রতিফলিত হবে। এর ফলে গড়ে উঠবে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন সমাজ-জীবন।

পরিচ্ছন্নতার অভিযান চালনায় অংশ গ্রহণ করবেন প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অভিযান পরিচালনার নীতি মূলতঃ নেতিবাচক (Negative) না হয়ে হবে অস্তিবাচক (Positive), প্রত্যক্ষ (Direct) না হয়ে হবে অপ্রত্যক্ষ (Indirect), উপদেশের (advice) মাধ্যমে

না হয়ে হবে দৃষ্টান্তের (Example) মাধ্যমে, জ্ঞানার্জনের বিষয়বস্তু (Knowledge subject) না হয়ে হবে আচরণ ও অনুশীলনের বিষয় (Subject of behaviour and Culture)।

শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস সৃষ্টির দুটি ধারা বিদ্যমান—যথা, (১) ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও (২) পরিবেশগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

(১) ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা : প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যগত জীবনানুশীলনে অভ্যস্ত করার জন্য দরকার দেহগত স্বাস্থ্যাভ্যাসের দিকে লক্ষ্য রাখা। হাতে-পায়ের নখ কাটা, দাঁত মাজা, নাক, চোখ, মুখ পরিষ্কার করা, মাথার চুল আঁচড়ানো প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে যত্নবান হয় তার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর ব্যবহার্য পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। জুতা-মোজা, প্যান্ট-শার্ট, ধুতি-পাঞ্জাবী, গেঞ্জি, রুমাল প্রভৃতি প্রতিটি পরিধেয় সামগ্রী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও ময়লা হলে পরিষ্কার করার প্রয়োজন সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সচেতন করা প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষণ প্রসঙ্গে ব্যবহার্য পুস্তক, খাতা-পত্র, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সামগ্রীগুলি ব্যবহার করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। অনেকে পেন্সিল বা কলম মুখে দিয়ে চিন্তা করে, বই-এর পাতা উল্টাবার সময় আঙ্গুলে থুথু লাগিয়ে নেয়, ময়লার ওপর পুস্তকাদি রাখতে দ্বিধা করে না—এসব কু-অভ্যাস থেকে শিক্ষার্থীরা যাতে বিরত থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

(২) পরিবেশগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা : বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ শিক্ষার্থীর মনে সহজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রবণতা সৃষ্টি করতে পারে। তবে পরিচ্ছন্নতার প্রতি সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিদ্যালয়-পরিবেশের পরিচ্ছন্নতাবিধানে শিক্ষার্থীকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। **প্রথমতঃ**, এসম্পর্কে 'পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ' পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। এই সপ্তাহে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা-

বিধানের জন্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। **দ্বিতীয়তঃ**, পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে প্রদর্শনী ও তথ্যমূলক (documentary) ছায়াচিত্র দেখানোর ব্যবস্থা করা যায়। **তৃতীয়তঃ**, শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসনের ওপর পরিচ্ছন্নতা বিধানের দায়িত্ব অর্পণ করা যায়। তারাই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আচরণ বিধি (Code of Health Conduct) প্রণয়ন করবে এবং স্বাস্থ্য-পরিষদ স্বাস্থ্যবিধি পালনের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের তৈরি স্বাস্থ্যবিধি নিজেরা লঙ্ঘন না ক'রে পালন করার চেষ্টা করবে। ফলে তাদের মধ্যে সহজেই পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে ওঠবে।

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও বিদ্যালয়ের পরিবেশগত **পরিচ্ছন্নতার প্রভাব** যাতে **গৃহ ও সমাজ পরিবেশে বিস্তৃত** এবং **প্রতিফলিত হতে** পারে তার ব্যবস্থা করাও বিদ্যালয়ের দায়িত্ব। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজের প্রয়োজনে। বিদ্যালয় হল সমাজ-উন্নয়নের কেন্দ্র (Community development Centre)। তাই বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যসম্মত জীবনচর্চা ও পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস যাতে গৃহ ও সমাজ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য—**প্রথমতঃ**, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার কর্মসূচীতে মাতাপিতা বা অভিভাবকদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। **দ্বিতীয়তঃ**, বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিধান পরিপ্রেক্ষিতে যখন কোন অনুষ্ঠান (পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ উদ্‌যাপন, স্বাস্থ্য প্রদর্শনী, ছায়াছবি প্রদর্শন প্রভৃতি) উদযাপন করা হবে তখন মাতাপিতা বা অভিভাবক ও আঞ্চলিক ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ করা কর্তব্য। **তৃতীয়তঃ**, মাঝে মাঝে শিক্ষক-অভিভাবক সঙ্ঘের দ্বারা বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আলোচনা চক্র, সেমিনার, বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এখানে একাধিক স্বাস্থ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করে তাদের অমূল্য বাণী শ্রবণ করা যায়। এর ফলে অভিজ্ঞ, অনভিজ্ঞ সকল স্তরের মাতাপিতা বা অভিভাবকরা স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং গৃহ পরিবেশ ও সন্তানদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাবিধানের জন্য সকলেই তৎপর হয়ে উঠবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৬। বিদ্যালয় সেনিটেশন (School Sanitation)ঃ

বিদ্যালয় একটি সমষ্টিগত জীবনধারার প্রতিরূপ। সামগ্রিক শিক্ষণ কর্মসূচী পালনের জন্য বহু ব্যক্তির সমাগম হয় বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশের স্বাস্থ্যবিধান হল শিক্ষণ কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। স্বাস্থ্যসম্মত জীবনানুশীলনের প্রয়োজনে যেমন গৃহ, কক্ষ ও প্রাঙ্গণকে আবর্জনামুক্ত করা প্রয়োজন তেমনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যপালন, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করাও অত্যাবশ্যক। এরূপ স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের একটি অঙ্গ হল বিদ্যালয়ের সেনিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন। সেনিটেশন

ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের স্বাস্থ্যসম্মত উন্নয়নের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, হস্তপদাদি ধৌতকরণ, আবর্জনা ও ময়লা পরিষ্কারকরণ, দূষিত পদার্থ নিষ্কাশন এবং মলমূত্র ত্যাগের জন্য সাধারণ জল সরবরাহ, রৌদ্র, আলোক ও মুক্তবায়ুর সুবিধা ইত্যাদি সেনিটেশন ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। সেনিটেশন ব্যবস্থা উত্তম না হলে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যপ্রদ জীবনযাপন করা অসম্ভব। সেনিটেশন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য যেসব বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন সেগুলি হল—

(১) বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ: পানীয় জল যে কক্ষে সরবরাহ করা হবে সেখান থেকে ময়লা জল যাতে সহজে নিষ্কাশিত হতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(২) সাধারণ জল সরবরাহ: আবর্জনা ও হস্ত-পদাদি ধৌতকরণের জন্য প্রচুর সাধারণ জল সরবরাহ করা প্রয়োজন। ময়লা জল যাতে সহজে বেরিয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন।

(৩) রৌদ্র, আলোক ও বায়ু: বিদ্যালয়-পরিবেশ যাতে যথেষ্ট রৌদ্র পেতে পারে, গৃহাভ্যন্তরে, অলিন্দে ও প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রচুর আলোক ও বিশুদ্ধ বায়ু পেতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৪) সেনিটেশন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হল মলমূত্র ত্যাগের সুবিধা। মলমূত্র ত্যাগের জন্য ল্যাট্রিন ও ল্যাভাটরী বৈজ্ঞানিক প্রথায় তৈরি করতে হবে। রৌদ্র ও বায়ু প্রবাহের দিকে লক্ষ্য রেখে ল্যাট্রিন ও ল্যাভাটরী স্থাপন করতে হবে। লক্ষ্য রাখা দরকার, মলমূত্রের দুর্গন্ধ যেন বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যহানির কারণ না হয়। এখানেও জল সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে ল্যাট্রিন ও ল্যাভাটরীর সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের ল্যাট্রিন, ল্যাভাটরী ইত্যাদি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে জল ঢেলে দেওয়া এবং দিনে অন্ততঃ দুবার ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো একান্ত প্রয়োজন। এ ছাড়া রোগ জীবাণুনাশক অন্যান্য ঔষধপত্র ব্যবহার করা খুবই যুক্তিযুক্ত।

বিদ্যালয়-গৃহের স্থান নির্বাচন ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় গৃহ-নির্মাণের সময় সেনিটেশন ব্যবস্থাপনার দিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। বিদ্যালয়ের ড্রেন পাকা ও ঢাকনাযুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত। ময়লা জল ড্রেন দিয়ে যত দূরে চলে যায় গৃহপ্রাঙ্গণ ততই স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। মনে রাখা উচিত, বিদ্যালয়ের উত্তম সেনিটেশন ব্যবস্থা স্বাস্থ্যবিধানের মৌলিক বিষয়। তাই সেনিটেশন ব্যবস্থার দিকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত।

পঞ্চম অধ্যায়

শারীর শিক্ষা

[Physical Education]

[**অধ্যায় পরিচয় :** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে শারীর শিক্ষা (Physical Education) বিষয়টি সহ-পাঠ্যসূচী সংগঠনের (Organisation of Co-curricular Activities) সঙ্গে যুক্ত। খেলাধুলা ও ব্যায়াম নিশ্চয়ই সহ-পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত কর্ম-তালিকার বিষয়। এগুলির সংগঠন ও পরিচালনার জন্য শিক্ষার্থীর স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট কার্যকারী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু বিষয়বস্তুর মূলতত্ত্ব (fundamentals) স্বাস্থ্যশিক্ষার অঙ্গ হিসেবে গৃহীত। তাই শারীর শিক্ষা পৃথক অধ্যায় হিসেবে তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হল। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি এখানে সন্নিবেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।]

১। ভূমিকা (Introduction) :

শারীর শিক্ষা সামগ্রিক স্বাস্থ্যশিক্ষার একটি বিশেষ ও অপরিহার্য অঙ্গ। শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের ওপর শারীর শিক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে। স্বাস্থ্যশিক্ষার আধুনিক ধারণা বহু বিস্তৃত। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য থেকে পরিবেশ, সমাজ, জাতি এমনকি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যচিন্তার সঙ্গে স্বাস্থ্যশিক্ষার ধারণা সুবিস্তৃত। স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানানুশীলন অপেক্ষা আচরণ অনুশীলনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যচেতনা ও স্বাস্থ্যাভ্যাস অর্জন করে। স্বাস্থ্যশিক্ষা রোগ-আক্রমণের সম্ভাবনাকে বিদূরিত করে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে সুস্থ ও সবল করার উপায় নির্ধারণ করে। এই সুস্থতাই হল শারীরশিক্ষার ভিত্তি।

স্বাস্থ্যশিক্ষাই শারীর শিক্ষার ভিত্তি

শারীর শিক্ষা সুস্থ ও নিরোগ দেহ-মনকে অধিকতর সবল, সুগঠিত, কর্মক্ষম ও আনন্দমুখর করে তোলে। তাই স্বাস্থ্যশিক্ষা সামগ্রিক স্বাস্থ্যানুশীলনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে; আর শারীর শিক্ষা শারীরবৃত্ত (Physiology) বিষয়ক জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে শারীরিক গঠন ও স্বাস্থ্য চর্চার দিকে বেশী লক্ষ্য নির্দেশ করে। তবে উভয় শিক্ষার লক্ষ্য স্বাস্থ্যোন্নয়ন—তাই এরা পরস্পরের পরিপূরক।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শারীর শিক্ষার সম্পর্ক

গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়ে খেলাধূলা বা শরীর চর্চার কোন স্থান ছিল না। এগুলিকে সুশিক্ষার অন্তরায় হিসেবে গণ্য করা হত। মনে করা হত শারীরিক স্বাস্থ্যোন্নয়নের দায়িত্ব পালন করবেন মাতাপিতা। বর্তমানে এই সঙ্কীর্ণ চিন্তাধারা নব্য শিক্ষাচিন্তা থেকে বিদূরিত। নব্য শিক্ষার ভাবধারা হল শিক্ষার্থীর দেহ-মনের পরিপূর্ণ বিকাশসাধন করা। দেহ-মনের সুস্থতা, শ্রীবৃদ্ধি, কর্মক্ষমতা ভিন্ন এশিক্ষা সার্থক হতে পারে না। তাই আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে খেলাধূলা, ব্যায়াম ও শরীর চর্চাকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। তাই পাঠ্যসূচীর (Curriculum) সঙ্গে সহ-পাঠ্যসূচীর কার্যাবলী (Co-curricular Activities) সম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বর্তমানে শারীর শিক্ষাকে আবশ্যিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ফলে শ্রেণীকক্ষ, গ্রন্থাগার, পরিক্ষাগারের ন্যায় খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার শিক্ষাকর্মে সমান গুরুত্ব অর্জন করেছে। গতানুগতিক শিক্ষাধারায় যেটাকে অভিভাবকের দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হত তা আজ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। বিদ্যালয় গ্রহণ করেছে সমাজের সুসভ্য ও রাষ্ট্রের সুনাগরিক তৈরির গুরু দায়িত্ব। আজ শারীর শিক্ষা (Physical Education) সুস্থ, সবল, কর্মঠ ভাবী মানব-সম্পদ (Human resources) সৃষ্টির উপায় হিসেবে পরিগণিত। কারণ, যদি আমরা মানুষের সার্বিক বিকাশ চাই তাহলে ব্যক্তির সার্বিক বিকাশের অনুকূল বিদ্যানুশীলনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। গতানুগতিক শিক্ষায় শুধু বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত। কিন্তু সুস্থ দেহ ভিন্ন সুস্থ ও স্বাবলীল চিন্তার বিকাশ হয় না। তাই রুশো[1] (*Rousseau*) বলেছিলেন, 'সুস্থ ও সুগঠিত দেহ মানসিক কাজকর্মকে সহজ ও সুনির্দিষ্ট করে দেয়।' শুধু মনের অনুশীলনের কুফলকে ইঙ্গিত করে কারলাইল (*Carlyle*) বলেছেন, 'আমরা হাজারে হাজারে চতুর শয়তান উৎপাদন করে চলেছি কারণ স্বাস্থ্য দলগত রাজনীতির বিষয় নয়।'[2] সুতরাং আজ মনের অনুশীলনের সঙ্গে দেহের অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনস্বীকৃত। ভারতের

শারীর শিক্ষায় বিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য

1. "It is the sound constitution of the body that makes the operation of the mind easy and certain"

2. "We manufacture clever devils by the thousands because health is not the object of Party politics."

ক্ষেত্রে শারীর শিক্ষা আজ জাতীয় প্রয়োজন ও লক্ষ্য হিসেবে স্বীকৃত। অনেক পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ একথা স্বীকার করে গেছেন। তিনি বলতেন, 'আজ ভারতের যা প্রয়োজন তা ভগবৎগীতা নয়, ফুটবল খেলার মাঠ'।[1] তাই আজ শারীর শিক্ষার কর্মসূচীকে ভারতের শিক্ষাধারার বিস্তৃত ক্ষেত্রে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

সুখের কথা, পশ্চিমবঙ্গ সহ সমগ্র ভারতে জাতীয়শিক্ষার সংস্কার ও পুনর্গঠন প্রসঙ্গে শারীর শিক্ষা অবশ্য পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়রূপে পরিগণিত হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম থেকে দশমশ্রেণীর বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর জন্য অবশ্য শিক্ষনীয় বিষয়রূপে শারীর শিক্ষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ঠিক একই উপায়ে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ+2 শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে শারীর শিক্ষাকে অবশ্য পাঠ্যরূপে নির্দেশ করেছেন। সুতরাং, এখন এটি আর সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রম (Co-curricular Activities) হিসেবে গণ্য নয়। অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের ন্যায় শারীর শিক্ষার বিষয়টিতে শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে ও তাকে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। বিদ্যালয় আর এটিকে অবহেলা করে শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করতে পারবে না। শারীরশিক্ষা আজ যখন অবশ্য শিক্ষনীয় বিষয় তখন এই শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা ও সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য।

২। শারীর শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Physical Education)* ঃ

'শারীর শিক্ষা' বিষয়টিকে যদি সংকীর্ণ অর্থে চিন্তা করা যায় তাহলে মনে হবে এটি দৈহিক কলা-কৌশল শিক্ষার একটা বিশেষ বিষয়। এরূপ সংকীর্ণ অর্থে বিষয়টিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসেবে ধার্য করা সত্যিই অবিবেচনা-প্রসূত ও অযৌক্তিক। প্রকৃতপক্ষে শারীর শিক্ষা কথাটির অর্থ যেমন গভীর তেমনি সুবিস্তৃত। তাই বিষয়টি একটি বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যালয়-পদ্ধতি (School-method)। এ-পদ্ধতি ছাত্রদেরকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনধারণে উৎসাহিত করে, তাদেরকে বিচার ও যুক্তি বিকাশে, আত্মসংযমে, মানসিক ও নৈতিক গুণাবলী

1. "What India needs to day is not the Bhagbad Gita but the foot-ball field.'

* Curriculum and Syllabuses for Reorganised Patteran of Secondary Education—P. 97.

বিকাশে সুযোগ দান করে। আধুনিক যুগে আমরা যখন জীবনধর্মী শিক্ষার পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছি তখন নিয়মমাফিক শারীরিক অনুশীলন আমাদের অপরিহার্য শিক্ষামূলক কার্যরূপে স্বীকৃত।

(শিশু, তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশে শারীর শিক্ষা যাতে প্রকৃত সহায়ক হয় সেই দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করে এই শিক্ষাধারা পরিচালনা করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে যেসব উদ্দেশ্য সর্বদা প্রণিধানযোগ্য সেগুলি হল : (ক) আমাদের দেহ, অস্থি, রক্ত, মাংস সহ বিচিত্র যন্ত্রাদি নিয়ে গঠিত। মাতৃগর্ভ থেকে এসবের বৃদ্ধি ও বিকাশ হতে থাকে। শিক্ষার্থীর দেহ-যন্ত্রের বিকাশ ও বৃদ্ধি যাতে স্বাভাবিক ও যথাযথ হয় সেদিকে লক্ষ্য নির্দেশ করা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। যেন, শিক্ষার্থীর সামগ্রিক দেহ-যন্ত্র যে কোন প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও ক্রিয়াশীল থাকার সক্ষমতা অর্জন করে।

(খ) মাংসপেশীর ক্রিয়াশীলতার মধ্যদিয়ে দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদি সক্রিয়, পুষ্ট ও বর্ধিত হয়। সুতরাং পেশীর ক্রিয়াশীলতা যাতে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পরিচালিত হয় এবং দৈহিক যন্ত্রাদি যাতে সুদৃঢ় হয় ও প্রতিকূল অবস্থায় সক্রিয় থাকতে পারে সেদিকে লক্ষ্য নির্দেশ করা অপরিহার্য কর্তব্য।

(গ) দৈহিক মাংসপেশী ও স্নায়ুকেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে নিবিড় ও সূক্ষ্ম সম্পর্ক। এই সম্পর্ক যত সহজ ও গভীর হবে, উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ যত দ্রুত হবে ততই পঞ্চেন্দ্রিয় পরিবেশগত প্রয়োজনে বুদ্ধিযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করতে পারে। তাই শারীর শিক্ষা প্রসঙ্গে মাংসপেশী ও স্নায়ুকেন্দ্রের মধ্যে সহজতর সহযোজন ও সমন্বয় বিধানে সাহায্য করা অন্যতম কর্তব্য।

(ঘ) শারীর শিক্ষা শুধু দৈহিক যন্ত্রাদির পুষ্টি ও বৃদ্ধির অনুশীলনে সাহায্য করে তা নয়, বিষয়টি মানসিক শক্তি-বিকাশ ও বাঞ্ছনীয় গুণাবলী অনুশীলনে বিশেষ সহায়ক। মানসিক শক্তি ও বাঞ্ছনীয় গুণাবলী হবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও ভাবী নাগরিক জীবনের অতি মূল্যবান বিষয়। যেমন, (চরিত্র গঠনের জন্য অভ্যাসের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তাই বাঞ্ছনীয় অভ্যাস সুশিক্ষার অঙ্গ। সুতরাং শারীর শিক্ষার পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদের বাঞ্ছনীয় অভ্যাস গঠনের জন্য শিক্ষক তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত করবেন।) বিনয়, সংযম, সহযোগিতার প্রয়াস, সমবেদনা, সততা ইত্যাদি

গুণরাজি যাতে শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে সেদিকে শারীর শিক্ষার লক্ষ্য নির্দেশ করা বাঞ্ছনীয়।

(৬) শারীর শিক্ষা মৌলিক স্বাস্থ্য শিক্ষারই ব্যবহারিক অংশ।* সুতরাং শারীর শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যাতে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য, খাদ্য-পুষ্টি, দেহসৌষ্ঠব, বিপদ-মুক্তি, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্যকর অবসর বিনোদন ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞানার্জন ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং সেই পথে স্ব-স্ব জীবনকে পরিচালিত করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য নির্দেশ করা একান্ত কর্তব্য।)

৩। শারীর শিক্ষার ক্ষেত্র ও বিষয়বস্তু (Scope and Subject matter of Physical Education) :

শারীর শিক্ষা (Physical Education) কথাটির দ্বারা দেহের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখা, সুন্দর দেহ গঠনের প্রচেষ্টা, দেহগত সক্ষমতা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধির প্রয়াস, কতকগুলি বাঞ্ছনীয় মানসিক গুণের বিকাশ, স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গঠন, এবং সর্বোপরি পরিপূর্ণ মানবিক বিকাশের বিষয় অভিব্যক্ত হয়। প্রকৃত পক্ষে এগুলিই হল শারীর শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য।

উল্লিখিত লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য শারীর শিক্ষা প্রসঙ্গে প্রয়োজন হল—

প্রথমতঃ, শারীরবৃত্ত (Physiology) সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করা। আমাদের দেহ অফুরন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ যন্ত্র সহযোগে গঠিত। দেহমনের বিকাশ ও বৃদ্ধির প্রয়োজনে এসব যন্ত্রপাতি এক বা একাধিক দায়িত্ব পালন করে। এদের সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে পারলে তবেই শরীর ও স্বাস্থ্যানুশীলনে সাফল্য লাভ করা সহজ হয়। শারীরবৃত্তের জ্ঞানই হল বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার উপায়।

দ্বিতীয়তঃ, শরীরচর্চা সুস্থ ও নীরোগ শরীরের ওপর নির্ভর করে। তাই কিভাবে শরীরকে নীরোগ ও সুস্থ রাখা যায় তার জন্যে (১) রোগাক্রমণের কারণ, লক্ষণ, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও অনুসরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার প্রয়োজন হয়। (২) স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস স্বাস্থ্যপালনের উপায়। এগুলি সাধারণতঃ অনুশীলনের ওপর নির্ভর

* Curriculum and Syllabuses for H. S. Education—P. 226.

করে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিয়মাবলী সম্পর্কেও যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গঠন ও স্বাস্থ্যানুকূল জীবনচর্চায় দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

তৃতীয়তঃ, শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য, বিশুদ্ধ বায়ু, রৌদ্র ও আলোক প্রভৃতি মৌলিক উপাদান আহরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ, সুস্বাস্থ্যলাভ ও কর্মক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন হয় পরিচ্ছন্নতা, সময়মত ও পরিমিত আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, অবসর বিনোদন প্রভৃতি। শারীর শিক্ষাপ্রসঙ্গে এগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভ্যাস প্রয়োজন।

পঞ্চমতঃ, শারীর শিক্ষাপ্রসঙ্গে শরীর-চর্চার বিভিন্ন পদ্ধতি, নীতি, কৌশল ও উপায় সম্পর্কে যেমন তত্ত্বগত জ্ঞানার্জন প্রয়োজন তেমনি ব্যবহারিক কৌশল ও দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন হয়। শরীরকে সুদৃঢ় ও সুগঠিত করার জন্য খেলাধূলা, ব্যায়াম, স্পোর্টস প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। এগুলি মূলতঃ, অনুশীলনমূলক প্রক্রিয়া। তবুও এসবের তত্ত্বগত বিষয়ের সঙ্গে অনুশীলন প্রক্রিয়ার যোগসাধন করতে পারলে বিজ্ঞানভিত্তিক ধারায় সহজে শরীর ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

৪। শারীর শিক্ষার কর্মসূচী (Physical Education Activities):

শারীর শিক্ষার কার্যাবলীকে আমরা মোটামুটি নিম্নরূপ উপায়ে শ্রেণীবিভক্ত করতে পারি:

(১) **খেলাধূলা** (Games): খেলাধূলার দুটি অংশ।

(ক) গৃহাভ্যন্তরীণ খেলা (Indoor games); যেমন—টেবিল টেনিস, তাস, দাবা, পাশা, ক্যারাম, চাইনিস চেকার, পাঠ্যবিষয় (অঙ্ক, ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি) অবলম্বনে নানা খেলা।

(খ) বহির্ভাগস্থ খেলা (Outdoor games); যেমন—ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন, লন-টেনিস, হকি, ক্রিকেট, হা-ডু-ডু, কপাটি ইত্যাদি।

(২) **স্পোর্টস্** (Sports): (ক) নানা ধরনের দৌড়বাজি; যেমন—যৌথ দৌড় (relay race), বাধাপূর্ণ দৌড় (Obstacle race), দীর্ঘ দূরত্বে দৌড়, অল্পদূরত্বে দৌড়, অঙ্কযার দৌড় ইত্যাদি।

(খ) নানা ধরনের লম্ফ : যেমন—উচ্চ-লম্ফ, দীর্ঘ-লম্ফ, নির্দিষ্ট মাপের লম্ফ, দণ্ডের সাহায্যে লম্ফ ইত্যাদি।

(গ) এছাড়া বর্শা নিক্ষেপ, সাইকেল রেস, নৌকা বাইচ, সাঁতার কাটা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী।

(৩) ব্যায়াম ও ড্রিল (Exercise & Drill) : (ক) ড্রিল জাতীয় খেলার জন্য মাঠ প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে শরীর চালনা (P. T.), খালি হাতে যৌথ ব্যায়াম (free-hand exercise), যন্ত্র সহযোগে (with appliances) ব্যায়াম ; যেমন—স্কিপিং, লাঠিখেলার নৃত্য, ব্রতচারী ইত্যাদি।

(খ) সংকীর্ণ প্রাঙ্গণে নানা প্রকার দেহভঙ্গী ও কৌশল আয়ত্বের ব্যায়াম ; যেমন—ডন, বৈঠক, ডিগবাজী (Somersault), উল্লম্ফন (Vault) প্রভৃতি। এছাড়া রিং (Ring), আনুভূমিক বার (Horizontal bar), সমান্তরাল বার (Parallel bar), দোলনবার (Swing bar) প্রভৃতি যন্ত্র সহযোগে ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে নানা কৌশল অনুশীলন করা যায়।

(গ) কুস্তি (Wrestling), মুষ্টিযুদ্ধ (Boxing), যুযুৎসু প্রভৃতি পেশাদারী খেলার ভিত্তি হল ব্যায়ামাগারের শরীর চর্চা।

(ঘ) যোগব্যায়াম বা আসন : শীর্ষাসন, সর্বাঙ্গাসন, শবাসন, গোমুখাসন প্রভৃতি নানা ধরনের স্বাস্থ্যপ্রদ ও রোগ প্রতিরোধক ব্যায়াম এদেশে প্রচলিত আছে।

ক্রীড়াগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ শারীর শিক্ষার কার্যাবলীকে যে ভাবে শ্রেণীবিভক্ত করেছেন তা হল :

(১) আনুষ্ঠানিক কর্মসূচী (Formal activity) : (ক) শক্তি ও সৌন্দর্যবৃদ্ধিকর ব্যায়ামাদি (Callisthenies) ; (খ) নিয়মিত অগ্রগমন (Marching) ; (গ) হাল্‌কা যন্ত্রাদি নিয়ে ড্রিল—যেমন, লাঠিখেলা, ডাম্বেল খেলা ইত্যাদি ; (ঘ) যৌগিক ব্যায়াম ; (ঙ) দেশী ব্যায়াম—যেমন, ডন, বৈঠক, সূর্যপ্রণাম ইত্যাদি।

(২) ব্যক্তিভিত্তিক কর্মসূচী (Individual activity) : জিমনাস্টিকস্ (মেঝের ওপর অথবা যন্ত্র নিয়ে), (খ) দৌড়-ঝাঁপ, (গ) জলে নেমে খেলা—যেমন সাঁতার।

(৩) সংগঠিত ক্রীড়া (Organised Games) : (ক) ফুটবল, (খ)

হকি, (গ) ক্রিকেট, (ঘ) ভলিবল, (ঙ) বাস্কেট বল, (চ) কাবাডি, (ছ) খো-খো, (জ) নরম বল, (ঝ) টেনিকয়েট, (ঞ) ব্যাডমিন্টন, (ট) টেবিল টেনিস।

(৪) হালকা সংগঠিত ক্রীড়া (Games of low Organisation): (ক) হিন্দুস্থান-বল, (খ) নেট-বল, (গ) নিক্ষেপ-বল (Throw Ball), (ঘ) দাঁড় টেনিস (Paddle Tennis), (ঙ) দাড়ি বান্ধা, (চ) ভাগে ভাগে স্থান গ্রহণের খেলা (Relay Games), (ছ) অনুসরণমূলক খেলা (Tag/Chasing Games), (জ) অনুরূপ পরিচালনমূলক খেলা।

(৫) আত্মরক্ষামূলক/প্রতিরোধমূলক কর্মসূচী (Defensive activity): (ক) লাঠি, (খ) জুডো, (গ) মুষ্টিযুদ্ধ।

(৬) নৃত্যমূলক কর্মসূচী (Rhythmic activity): (ক) লোকনৃত্য ও লোকগীতি (ব্রতচারী), (খ) কর্মগীতি (action Songs)।

(৭) বহির্বিভাগীয় কর্মসূচী (Outdoor acitvity): (ক) শিবিরস্থাপন (খ) ভ্রমণ (Excursion), (গ) আমোদ বা ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে দীর্ঘ ভ্রমণ (Hiking), (ঘ) পর্বতারোহণ, (ঙ) গরুর গাড়ীতে দীর্ঘ ভ্রমণ (Trekking)।

(৮) জাতীয় আদর্শ ও নাগরিক চেতনা সৃষ্টির কর্মসূচী (National ideals & Citizenship developing activity): (ক) জাতীয় এবং গণ সঙ্গীত, (খ) জাতীয় উৎসব ও বিদ্যালয়-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন, (গ) ব্যক্তিগত ও জনস্বাস্থ্য সচেতনতা ও বাঞ্ছনীয় আচরণের অভ্যাস, (ঘ) প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি।

৫। কর্মসূচী সম্পাদনের স্থান (Accommodation for implementation of the activities):

(১) শ্রেণীকক্ষ (Class-room): প্রথমতঃ, শারীর শিক্ষার ভিত্তি হবে শারীরতত্ত্ব-বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান। ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচিত্র যন্ত্র সহযোগে দেহযন্ত্র পরিচালিত হয়। এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন শিক্ষার্থীর প্রাথমিক কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, দেহের বিকাশ ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সুষম খাদ্য, বিশুদ্ধ পানীয়, আলো-বাতাস, পরিমিত নিদ্রা, বিশ্রাম, অবসর বিনোদন প্রভৃতি। শারীর শিক্ষণপ্রসঙ্গে এসব বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা দরকার। তৃতীয়তঃ, সুস্থ দেহ শরীর চর্চার

ভিত্তি। সুস্থতার প্রয়োজনে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বা স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যদিও স্বাস্থ্যশিক্ষা (Health Education) এবং শারীর শিক্ষা (Physical Education) মূলতঃ আচরণ ও অনুশীলনের বিষয় তবুও উপরিউক্ত বিষয়ে তত্ত্বগত জ্ঞান কর্মসম্পাদনের প্রাথমিক সহায়ক। তাই শ্রেণীকক্ষ এরূপ তত্ত্বগত আলোচনার ক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে এরূপ তত্ত্বগত শিক্ষণের (Instruction) ক্ষেত্রে বৃক্ষতলের বেদীমূল বা খোলা জায়গা নির্বাচন করাই যুক্তিযুক্ত।

(২) **শিক্ষার্থীদের বিশ্রাম কক্ষ** (Students' Common Room): এখানে গৃহাভ্যন্তরীণ ক্রীড়া অনুশীলনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ক্যারাম, তাস, দাবা, টেবিল টেনিস ইত্যাদি খেলা অবসর যাপনের বাঞ্ছনীয় সহায়ক। এরূপ কক্ষের আয়তন, জানালাদরজা, সাজসরঞ্জাম, আলোক প্রাপ্তি, বায়ু প্রবাহ স্বাস্থ্যসম্মত হবে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(৩) **খেলার মাঠ** (Play-ground): গৃহ-বহির্ভূত খেলাধুলা (games) এবং স্পোর্টস (sports)-এর জন্যে খেলার মাঠ অত্যাবশ্যক। খেলার মাঠবিহীন বিদ্যালয় কোনক্রমে পরিপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রূপে গণ্য হতে পারে না। প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য খেলার মাঠ অত্যাবশ্যক। গ্রামাঞ্চলে খেলার মাঠের অভাব না থাকলেও শহরাঞ্চলে এর অভাব যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যালয়ের এরূপ নিজস্ব পৃথক মাঠ না থাকলে পাড়া বা অঞ্চলের ক্লাবের মাঠ অথবা কয়েকটি বিদ্যালয় মিলে অন্ততঃ একটি মাঠের ব্যবস্থা রাখা যুক্তিযুক্ত।

(৪) **ব্যায়ামাগারসহ প্রাঙ্গণ** (Gymnasium along with a space): ড্রিলজাতীয় ব্যায়ামগুলি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পরিচালনা করা যেতে পারে। কিন্তু কসরত শিক্ষা ও শরীর চর্চার জন্য পৃথক ব্যায়ামাগার একান্ত প্রয়োজন। এখানে যেমন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ করা যায় তেমনি ঝড়-বৃষ্টির সময় এই ব্যায়ামাগারেই শরীর চর্চা করা যায়। আবহাওয়া অনুকূল হলে খোলা জায়গায় শরীর চর্চা করাই বাঞ্ছনীয়।

খেলাধুলা বা স্পোর্টস্-এর জন্য নিয়মনিষ্ঠার প্রয়োজন হলেও এগুলি অনেকখানি বিনোদনমূলক (recreational) কর্ম। এখানে সময়ানুবর্তিতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। কিন্তু ব্যায়াম বা দেহচর্চা এমন-কতকগুলি সুদৃঢ় নীতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয় যা লঙ্ঘন-

করলে দৈহিক ও মানসিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে অত্যধিক। তাই ব্যায়ামের ক্ষেত্রে নিয়মিত চর্চা, বয়সানুপাতিক চর্চা, এবং পদ্ধতিগত চর্চা, ইত্যাদি নীতি মেনে চলতে হয়। আবহাওয়া অনুকূল নয়, সুতরাং কিছুদিন ব্যায়াম করা বন্ধ থাকুক—এরূপ ব্যবস্থা স্পোর্টস-এর ক্ষেত্রে চলতে পারে কিন্তু ব্যায়ামের ক্ষেত্রে এরূপ অনিয়ম চলে না। তাই পৃথক ব্যায়ামাগারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রতিটি ব্যায়ামাগারের সঙ্গে একটু খোলা প্রাঙ্গণ রাখাও যুক্তিযুক্ত।

৬। সংগঠন ও পরিচালনা (Organisation & Guidance):

বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা, দৌড়-ঝাঁপ, শরীর চর্চার কার্যাদি সংগঠন ও পরিচালনার জন্য কতকগুলি শর্ত (Some essentials) * আমাদের প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয়। সেগুলি হল:

(১) বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থান ও পরিবেশ;

(২) খেলাধূলা ও শরীর চর্চার কক্ষ, খেলার মাঠ, ব্যায়ামাগার, সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির প্রাপ্তব্যতা;

(৩) যোগ্য শারীর শিক্ষক (Physical Instructor) ও তাঁকে সাহায্য করার যোগ্য শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলী;

(৪) অভিভাবক ও আঞ্চলিক যুবশক্তির সক্রিয় সহায়তা ইত্যাদি।

সংগঠন ও পরিচালন প্রসঙ্গে কতকগুলি নীতি (Some Principles for Organisation and Guidance): (১) শারীর শিক্ষার বিচিত্র কার্যাবলীকে কার্যকর করার জন্য এমনভাবে পরিকল্পনা রচনা করা প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, যেন তারা শ্রান্তি-বিনোদনের আগ্রহ ও নৈপুণ্য অনুশীলন করতে পারে এবং যৌথ কর্মপ্রেরণা, ক্রীড়ামুলভ মনোভাব, সম্মানজনক আচরণের উৎকর্ষ বিধান করতে পারে। কারণ, শারীর শিক্ষামূলক কার্যাবলী দেহ ও মনের বিকাশ সাধনের সহায়ক।

(২) শারীর শিক্ষার পরিকল্পনাটি হবে ব্যাপক (Comprehensive) যেন সকল স্তরের শিক্ষার্থী এখানে সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। সেজন্য

* দ্বিতীয় খণ্ডে সহ-পাঠ্যসূচী প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

যৌথ বা দলগত ক্রিড়াসূচীর ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। তবে বিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চার (যেমন, ব্যায়াম) সুযোগও যথেষ্ট থাকবে —তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(৩) শারীর শিক্ষাকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ফলশ্রুতির ওপর নির্ভর করা কর্তব্য। সকল প্রকার খেলাধূলা, স্পোর্টস ও ব্যায়ামে সকলের দৈহিক যোগ্যতা সমান নয়। তাই দৈহিক সুস্থতা ও যোগ্যতা বিচার করে শারীর শিক্ষার কার্যাবলী সংগঠন করা কর্তব্য।

(৪) শারীর শিক্ষার কার্যসূচী সংগঠনে ও পরিচালনায় শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ ও প্রেরণাকে যতদূর সম্ভব অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তবে এসম্পর্কে দেহগত স্বাস্থ্য ও যোগ্যতা প্রধান বিচার্য বিষয়।

(৫) প্রতিটি বিদ্যালয়ে সকল প্রকার খেলাধূলা, ব্যায়াম ও ক্রীড়া কৌশল শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে শারীর শিক্ষার পরিপূর্ণতার প্রয়োজনে সমাজ বা আঞ্চলিক সহযোগিতার ওপর নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত। স্বাস্থ্যশিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন বিদ্যালয়কে যেতে হয় সমাজের ('go to the community') কাছে, শারীরশিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি সামাজিক সহযোগিতা সর্বথা কাম্য। শিক্ষার্থীর নিজ নিজ অঞ্চলে হয়ত সন্তরণ, নৌচালন, দ্রুতচলন (Hiking) বা কোন যৌথ খেলাধূলা পরিচালনার উপযুক্ত ক্লাব থাকতে পারে। শিক্ষার্থী যাতে সেসব ক্লাবে শরীর চর্চা ও ক্রীড়ানুশীলনের সুযোগ পায় বিদ্যালয়কেই সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাই বিদ্যালয়ের সঙ্গে আঞ্চলিক ক্লাবগুলির যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। শিক্ষক-অভিভাবক সঙ্ঘ এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

(৬) ক্রীড়া সংগঠন ও পরিচালন প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি অপরিহার্য নীতি পালন করা অত্যাবশ্যক। সেগুলি হল :

(ক) ক্রীড়া সম্পর্কে পৃথক সময়-তালিকা রচনা করা প্রয়োজন।

(খ) দেশী ও বিদেশী সকল প্রকার খেলা সংগঠনের চেষ্টা করা প্রয়োজন।

(গ) উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শারীর শিক্ষক (Physical Instructor) নিয়োগ করা কর্তব্য।

(ঘ) খেলা ও ব্যায়াম অনুশীলনের প্রতিটি বিষয় তদারক (Supervision) করা প্রয়োজন।

(ঙ) শারীর শিক্ষকের বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের কর্মসূচী যত হালকা হয় ততই ভাল। কারণ, তাঁকে শারীর শিক্ষার বিষয়ে অধিক চিন্তা, শ্রম ও সময় দিতে হয়।

(চ) খেলাধূলা ও শরীর চর্চার জন্য বিদ্যালয়ে পৃথক বাজেট সংরক্ষণ করা কর্তব্য।

(ছ) বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ঋতুগত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাময়িক (Casual) প্রতিযোগিতা, অনিয়মিত (Informal) প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত।

(জ) পরিকল্পনা, সংগঠন ও পরিচালনায় ছাত্রসংসদের ক্রীড়া বিভাগ ও দক্ষ শিক্ষার্থীদের উদ্যোগকে (initiation) উৎসাহিত করা ও স্বীকৃতি দেওয়া কর্তব্য।

৭। খেলাধূলা ও শরীর চর্চার মূল্য (Value of Games, Sports and Physical Culture) :

দেহ-মনের বিকাশ-বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যগত মূল্য : (১) খেলাধূলা, দৌড়-ঝাঁপ ও ব্যায়াম দেহের প্রতিটি যন্ত্রের ক্রিয়াকে দ্রুততর করে। শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্রুততা বৃদ্ধি পায়। হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের ক্রিয়া দ্রুততর হয় ও রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। দ্রুত রক্ত সঞ্চালনের ফলে একদিকে যেমন শরীরের দূষিত পদার্থ ঘর্মাকারে বহির্গত হয় তেমনি বিশুদ্ধ রক্ত সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। এর দ্বারা লিভারের শক্তি বৃদ্ধি পায় ও ক্ষুধার উদ্রেক হয়। নার্ভতন্ত্র ও গ্রন্থিগুলির ক্রিয়াশক্তি বৃদ্ধি পায়।

(২) এই সময় সুষম খাদ্য, আলো ও বিশুদ্ধ বায়ু এবং পানীয় জল বা দেহপুষ্টির অনুকূল উপাদান যোগান পেলে দেহ সহজে সুস্থ, সবল ও সক্ষম হয়ে ওঠে।

(৩) নিয়মিত ব্যায়াম দেহের সৌষ্ঠব ও বিকাশসাধনের সহায়ক। আবার কোন কোন ব্যায়াম বিকৃত অঙ্গভঙ্গী সংশোধন করতে পারে। ব্যায়াম প্রত্যক্ষভাবে দেহবিকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে।

(৪) খেলাধূলা, দৌড়-ঝাঁপ ও ব্যায়ামের সময় দেহ ও মন একত্রে ক্রিয়াশীল হয়। তাই দেহবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক কর্মক্ষমতা, দ্রুত চিন্তনের ক্ষমতা, আত্মসংযম, আত্মবিকাশ প্রভৃতি গুণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক চরিত্র সুদৃঢ় হয়।

(৫) দেহ-মনের পুষ্টি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অনেক ব্যায়াম (আসন) দেহের বিকলাঙ্গতা দূর করার ও ব্যাধি চিকিৎসার উপায় হিসেবেও কার্যকর।

খেলাধূলা, স্পোর্টস, ব্যায়াম ইত্যাদি সুন্দর, সৌষ্ঠবযুক্ত, সক্ষম, কর্মঠ ও নীরোগ দেহে বাঞ্ছনীয় গুণ, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরম সহায়ক।

শিক্ষাগত মূল্য : গতানুগতিক প্রথায় বিদ্যালয়-গৃহ ছিল শিক্ষাকর্ম পরিচালনার স্থান। নব্য শিক্ষাতত্ত্ব বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের আবেষ্টনী অতিক্রম করে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করেছে। তাই খেলার মাঠ আজ উন্মুক্ত বিদ্যালয় হিসেবে গণ্য। এই উন্মুক্ত বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর শিক্ষাগত মূল্য আজ সর্বজনস্বীকার্য।

তাই **খেলাধূলা ক্রীড়ানুশীলন** শিক্ষার্থীকে :

(১) **সহযোগিতা** (Co-operation) **শেখায়।** খেলাধূলা ও ক্রীড়ানুশীলন মূলতঃ যৌথ কর্মসূচীর অনুশীলন। কোন দলের জয় ব্যক্তির গর্বের বিষয়। খেলাধূলায় ব্যক্তি দলের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। দলীয় জয়ের উন্মাদনায় সে ব্যক্তিস্বত্তা বিসর্জন দেয়। দলের প্রতিটি সভ্যের মনে জাগে সহযোগিতার প্রেরণা। ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন, হকি, ক্রিকেট, হা-ডু-ডু ইত্যাদি খেলায় অংশগ্রহণকারীরা সহযোগিতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

(২) **যে কোন অবস্থার মোকাবিলা** (Meeting any situation) **করার সামর্থ দান করে।** দলগত খেলাধূলায় খেলোয়াড়রা অনেক সময় অস্বাভাবিক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। সে সময়—ধৈর্য, স্থিরতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মসংযমের অদম্য ইচ্ছাশক্তি পোষণ করার প্রয়োজন হয়। তাই খেলার মাঠে শিক্ষার্থীরা সহজে এসব বাঞ্ছনীয় গুণ অর্জন করতে পারে। আদর্শ নাগরিক জীবনে এসব গুণের মূল্য অনস্বীকার্য।

(৩) **উদ্যম প্রয়োগের শিক্ষা দেয়** (Prepare for struggling)। খেলাধূলা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জয় করাই বড় কথা নয় ; অংশগ্রহণ করাই হল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ জীবন-দর্শনের সার কথা হল উদ্যম প্রয়োগ, পরিশ্রম করা (struggle), চেষ্টা করা। এখানে ফলশ্রুতির চিন্তা না করাই

1. The playground is the uncovered school.—Anonymous.

বাঞ্ছনীয়। এই চিন্তাধারা শিক্ষার্থীকে অধিক শ্রমশীল, উদ্যোগী ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

(৪) **সঙ্ঘচেতনার বিকাশ সাধনে** (Development of Esprit de Corps) **সাহায্য করে।** বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অথবা একই বিদ্যালয়ের ভিন্ন হাউসে (যেখানে House system আছে) বা শ্রেণীর মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার (Tournament) ব্যবস্থা করা হয়। এসব প্রতিযোগিতায় সচেতনতা বা সঙ্ঘ চেতনা বড় হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়, হাউস, বা শ্রেণীর খেলোয়াড় ছাড়াও সকলেই একত্রে জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। 'ভাই ভাই' ভাব সুসংহত হয়। পরাজিত দল তেমনি সংযত ভাবে পরাজয়ের গ্লানিকে খেলোয়াড় সুলভ ভাবধারায় মেনে নেওয়ার চেষ্টা করে। এসবের মাধ্যমে যেসব বাঞ্ছনীয় গুণ শিক্ষার্থীরা অর্জন করে তা জাতীয় জীবনের অমূল্য সম্পদ—সন্দেহ নেই।

(৫) **নেতৃত্বপ্রদানে দক্ষতা দান করে** (Provide Opportunities for leadership) : খেলাধূলা, স্পোর্টস, শিক্ষার্থীকে নেতৃত্বসুলভ দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে। সংগঠন ও পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী যে সাংগঠনিক ও পরিচালন সংক্রান্ত দক্ষতা অর্জন করে তেমনি খেলোয়াড়রাও দলের সংহতি ও সমন্বয়বিধানে উদ্যোগ, আত্মসংযম, আত্মবিশ্বাস, পক্ষপাতশূন্য বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়ে ওঠে।

(৬) **বহুবিধ ইচ্ছা,-আবেগ প্রকাশের সুযোগ দেয়** (Offer to express various urges of the Pupil) : খেলার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীর অনেক প্রয়োজনীয় আবেগ, ইচ্ছা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। খেলা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই স্বাভাবিকতা শিক্ষালাভের উপায় হিসেবে স্বীকৃত। খেলার মাধ্যমে শিশু অভিজ্ঞতা আহরণ করে এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়। নিষ্ঠা, সততা ও সামাজিকতা বোধ খেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে ও পরে জীবনদর্শনে বিকশিত হয়। শিশুর খেলাই পরিণত জীবনে কাজে রূপান্তরিত হয়।

(৭) **চারিত্রিক শিক্ষালাভ করায়** (Offer Training in Character) : আত্মবিশ্বাস, আত্মসংযম, সাহস, ধৈর্য, তিতিক্ষা, আনুগত্য, নৈতিকতা, ভদ্রতা, মননশীলতা, বিচার-বিশ্লেষণী ক্ষমতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, দৈহিক সুস্থতা ও সক্ষমতা ইত্যাদি ভিন্ন সুচরিত্র গঠিত হয় না। খেলাধূলা, স্পোর্টসও শরীর সাধনার মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীরা এসব গুণ ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে। তাই তারা সহজে প্রকৃত চরিত্রবান মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

এক কথায় বলা যায়, বিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে যা শেখাতে পারে, খেলার মাঠ তার তুলনায় এতটুকুও কম শিক্ষা দেয় না। তবে সার্থক পরিকল্পনা, সংগঠন

ও পরিচালনা ভিন্ন খেলাধূলা, স্পোর্টস ও ব্যায়ামের যথার্থ মূল্য অর্জন করা সম্ভব নয়।

৮। শিক্ষক এবং শারীর শিক্ষা (Teacher & Physical Education):

বিত্মালয়ের ফিজিক্যাল ইন্স্ট্রাক্টরের বিশেষ দায়িত্বে শারীর শিক্ষা পরিচালিত হয়। এরূপ একজন বা দুজন শিক্ষক বিত্মালয়ের সমস্ত শিক্ষার্থীকে পরিচালিত ও সংগঠিত করতে পারবেন এরূপ কল্পনা করা যায় না। অন্যান্য শিক্ষকদেরও ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টরকে সক্রিয় সাহায্য করতে হবে। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করেছেন যে, শিক্ষণরত শিক্ষকরা শারীরিক শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করবেন। উপরন্তু ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর উক্ত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা লাভ করবেন। চল্লিশ বছর বয়সের কম বয়স্ক শিক্ষকরা বিত্মালয়ের শারীর শিক্ষায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলে এসব শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর নিশ্চয়ই বিত্মালয়ে সম্বলহীন মনে করবেন না। সকলের উৎসাহে ও সহযোগিতায় শারীর শিক্ষা হবে বিত্মালয় শিক্ষাকর্মের সংহত কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

বিত্মালয়ের শারীর শিক্ষার কর্মসূচীর মধ্যে দলগত খেলাধূলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এরূপ খেলাধূলায় শিক্ষার্থীরা সমষ্টিগতভাবে যেমন আনন্দ উপভোগ করতে পারে তেমনি তাদের শারীরিক সুস্থতার ওপর নজর রাখা সম্ভব হয়। বিভিন্ন বিত্মালয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা সত্যই অনাবিল আনন্দ উপভোগ এবং মিলেমিশে সামাজিকতা শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক ক্রিয়াকর্মে মুষ্টিমেয় নির্বাচিত শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় এবং অন্যেরা শুধু দর্শকের ভূমিকা পালন করে। তাই প্রতিযোগিতার মাত্রা কমিয়ে যাতে অধিকাংশ শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় সেরূপ স্বাস্থ্যকর ও আনন্দদায়ক খেলাধূলার ব্যবস্থা করাই যুক্তিযুক্ত। বিত্মালয়ের স্বাস্থ্যরক্ষার বিচারে প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যচর্চার সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত। বৃত্তিগত দক্ষতা অর্জনের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে শিক্ষায়তনের সম্মান বৃদ্ধি করতে পারে। তবে প্রতিযোগিতায় যাতে উগ্রতা বৃদ্ধি না পায় বা শিক্ষাসূচীর অন্যান্য কর্মে যাতে অবহেলা না আসে সেদিকে নজর দেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষকের। খেলাধূলা ও শরীর চর্চার উৎকর্ষের জন্য শিক্ষার্থীদের কাজকর্মের পরিমাপসূচক গ্রাফ এবং সামগ্রিক রেকর্ড রাখাও যুক্তিসঙ্গত। তবে এসব কর্মে একাকী ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর কিছুই করতে পারেন না। অন্যান্য শিক্ষকদের সহযোগিতা অবশ্য প্রয়োজন। তাই শিক্ষণরত শিক্ষকরা যাতে শারীর শিক্ষাসম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে পারেন সেদিকে নজর দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

---

1 Report of the S. E. C., Page—115 Chap. X

প্রশ্নাবলী

এ অংশে আছে

এক : কলিকাতা বিশ্ববিত্থালয়।

তুই : যাদবপুর বিশ্ববিত্থালয়।

তিন : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিত্থালয়।

চার : কল্যাণী বিশ্ববিত্থালয়।

পাঁচ : পি. জি. ডি. ই. পরীক্ষার প্রশ্নাবলী।
(Evening Course)

ছয় : পি. জি. বি. টি. কোর্সের প্রশ্নপত্র।